উৎসর্গ

পরম প্রীতিভাজন

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মজুমদার

প্রিয়বরেষু

লেখকের নিবেদন

'শতাব্দীর মৃত্যু' উপন্যাসখানি 'নবকল্লোল' মাসিক পত্রিকায় ১৩৭৬ সালের আশ্বিন মাস থেকে ১৩৭৮ সালের ভাদ্র মাস পর্যন্ত বাবা ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন। তাঁর কার্তিক মাসে লিখবার জন্য লেখার ধরতা হিসেবে দুটি প্যারাগ্রাফ লেখা ছিল। সে লেখার জন্য আর তিনি কলম ধরতে পারেন নি। তাঁর পূর্বেই ভাদ্র মাসের শেষে তাঁর দেহান্ত হল। কার্তিক মাসের জন্য তিনি যে দুটি প্যারাগ্রাফ লিখে রেখেছিলেন সেই অংশটুকুর প্রতিলিপি এই সঙ্গে মুদ্রিত হল। প্যারাগ্রাফ দুটির পর তারকাচিহ্ন, তারপর আর নেই, আর লেখা হয়নি।

এরপর নবকল্লোলের কর্তৃপক্ষ তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ উদারতায় আমাকে তার পরবর্তী অংশ লিখতে বলেন। তাঁদের অনুরোধে ও নির্দেশে আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও দ্বিধাগ্রস্তভাবে বাবার রচিত শেষ দুটি প্যারাগ্রাফ থেকে লিখতে আরম্ভ করি। সে লেখা এখনও ধারাবাহিকভাবে নবকল্লোলে প্রকাশিত হচ্ছে। এই রচনা লিখি আর মনে হয় আমার বাবাই যেন হাত ধরে যেখানটায় তিনি ছেড়েছিলেন সেইখানে তাঁর পায়ের ছাপের উপর আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁকে নিত্য প্রণামের সঙ্গে আর একটি প্রণাম যুক্ত করি। এবং যাঁদের আনুকূল্য ও সহানুভূতিতে নবকল্লোলে আমার এ রচনা প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে সেই শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন মজুমদার মহাশয়দের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও নম্র প্রীতি নিবেদন করি। এ রচনার যদি কোনো প্রশংসা প্রাপ্য হয় তবে তার অগ্রভাগ তাঁদের প্রাপ্য। তাঁরা যেন প্রসন্ন মনে সে প্রশংসা গ্রহণ ক'রে আমাকে পরিতৃপ্ত করেন।

আরও একজনের কথা এই প্রসঙ্গে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে উল্লেখ করি। যে দুজনের নাম পূর্বে উল্লেখ করেছি তাঁদেরই মত এঁকেও আমি আমার ভাগ্যগুণে লাভ করেছি। লাভ করেছি আকস্মিকভাবে, জীবনের ভিন্নতর ক্ষেত্রে। আকস্মিক পরিচয়ের পর আমার এই রচনার প্রেসকপি তাঁর হাতে তুলে

১

দ্বিজু মুন্সী আনন্দে যাকে বলে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া ছেলে নিজের বড়লোক কাকার বাড়ি ছেড়ে, মাধববাবুর মতো বড়লোকের বাড়ি ছেড়ে তার বাড়িতে নিজে থেকে এসে উঠেছে এর জন্যে অহংকার রাখবার যেন ঠাঁই ছিল না তার।

মুন্সীর বড় মেয়ে তাকে সমাদর করে বলেছিল, আঃ—তোমার মায়ের ভাগ্যি দেখ দেখি, এমন চাঁদের মতো ছেলে ফেলে অকালে চলে গেল। সে কথাগুলি মন্মথর মনে সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে।

চারু বাল-বিধবা, বয়স বাইস তেইশ হবে, কথায় বার্তায় আচার আচরণে নিজের মায়েরও গুরুজনের মতো। সংসারের সেই হলো গিন্নী। মুন্সী বলেছিল—তোমার মতো আমার চারুর যদি একটা ছেলে থাকত! দ্বিজু মুন্সীর আবেগ যেন বাড়ছিল। সে 'তুমি' থেকে 'তুই'য়ে পৌঁছে বলেছিল—আজ থেকে চারুকে মা বলবি মন্মথ, আমি তোর দাদু, বুঝলি! মন্মথ হেসে বলেছিল—বেশ।

দ্বিজু মুন্সীর কথাবার্তা কিছুটা সৃষ্টিছাড়া কথার মতো। ভেবে চিন্তে কথা সে বলে না (অবশ্য উকিলবাবুর সেরেস্তার বাইরে) ; মন্মথর 'বেশ' উত্তর শুনে দ্বিজু বলে উঠেছিল—চারি এমন ছেলে তোকে মা বলবে বলেই তোর ছেলেপুলে হয় নি। চারুর চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে শুরু হয়েছিল। মন্মথর মাথাটির উপর হাত রেখে, সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

সরস মানুষ দ্বিজু মুন্সী, সেই সরসতা আজ সব বাধা ভেঙে যেন সব ভাসিয়ে দিচ্ছে। সে মনের উচ্ছ্বাসে কথার পর কথা বলে যাচ্ছে, তাতে প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ, বাইরে থেকে শুনলে মনে হয় পারম্পর্যহীন। সে বললে—আরে, ছেলেটা যে নিজে থেকে আদর করে কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কিছু মুখে বললাম—আমি তোর দাদু হলাম, আমি তোর মা হলাম, ব্যস, তাতেই দাদু হওয়া আর মা হওয়া হয়ে গেল। সংসার অত সহজ স্থান নয়। মুখের কথার সঙ্গে হাতের কাজের মিল চাই, তবে তো! নইলে সবটাই ভণ্ডামি।

দ্বিজু মুন্সীর সহর্ষ চিত্তের এমনি অর্থহীন বাক্যস্রোত কতক্ষণ চলতো বলা যায় না, কিন্তু মাঝখান থেকে বাধা পড়ল। বাধা সেই দিলে যে এই ছোট্ট সংসারটির সব

কিছু আনতো হাতে, প্রায় না জানিয়েই নিমন্ত্রণ করে। চারু বাঁ হাতে কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে একটু হেসে বললে— হ্যাঁ বাবা, এখন মন্মথর দাদু হতে হলে তোমাকে কি করতে হবে বাবা? একবার বাজার যেতে হবে, এই তো?

ধরা-পড়া মানুষের মতো দ্বিজু মুন্সী চিৎকার করে উঠল—বেশ, যাব না আমি, বাজার যাব না! আমার কোনো দরকার নেই। যা আছে ঘরে তাই দিয়ে ছেলের পেট ভরাও, দেখি তুমি কেমন মা! গরমের দিন, সারা দিনের পর চারটি ভাত ফুটিয়ে সিদ্ধ দিয়ে ভালই লাগবে। তার সঙ্গে একটু মাছ!

বাধা দিয়ে চারু বললে—রাত্তিরে আর নাতিকে মাছের ঝোল-ভাত খাওয়াতে হবে না বাবা! আর আমি যদি পারতাম তবে রেঁধে দিতাম। তা তো হবে না। ওই কচি ছেলেকে আর রাত্তিরে উনুন তাতে যেতে হবে না! গরমের দিন! তুমি বরং খানিকটা দৈ আর দুটো ভালো আম এনে দাও। বাড়িতে ভালো চিঁড়ে আছে; তোমার উকিলবাবুর সেই দিনাজপুরের মক্কেল দিয়েছিল! ওতেই তোমার নাতির রাত্তিরের খাওয়া হয়ে যাবে!

চিন্তাভারমুক্ত মুন্সী দু হাত মাথার উপর তুলে গভীর ও নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে বললে—ব্যস, ব্যস! নিশ্চিন্তি!

তারপর মন্মথকে বললে—ভাই নাতি, এইবার হাত-মুখ ধুয়ে, কাপড়-চোপড় ছেড়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করে একটু বিশ্রাম কর। আমি এই তোমার কাছেই, শোভা-বাজারের রাজবাড়ি থেকে একটু পাঠ শুনে আসি। এসে তোমার সঙ্গে কথা বলব। তার আগে বাজারটা ঘুরে আসতে হবে।

রাত্রিতে পাঠ শুনে ফিরে এসে সে গিয়ে বসল মন্মথর বিছানার কাছে একটা টুলে। মন্মথ খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়েছিল, একটু তন্দ্রাও এসেছিল বোধহয়। তা সত্ত্বেও দ্বিজু মুন্সীকে খাতির ও সমাদর দেখাতে বিছানার উপর উঠে বসতে হলো তাকে। উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠল দ্বিজু মুন্সী।

তার গৃহে মন্মথর এই স্থিতি তাকে যে এক আশ্চর্য সম্মানে সম্মানিত করেছে, সেটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। সেই আনন্দই মুহূর্তে মুহূর্তে নানান আতিশয্যের চেহারা নিয়ে বেরিয়ে আসছে। সে বললে—আহা-হা, তুমি যেন কি হে নাতি? বেশ তো, বিশ্রাম করছিলে, আবার উঠে বসলে কেন?

মন্মথ সাধারণত কোনো কিছুতেই খুব বেশী বিচলিত ও চঞ্চল হয় না। সে শুধু একটু হাসল। মুখে বললে না কিছু। শুধু হাসি মুখে এই আত্ম-নিযুক্ত মাতামহের স্নেহশীল মুখখানির দিকে চেয়ে রইল।

—কবে ভর্তি হবে কলেজে? দ্বিজু মুন্সীর প্রশ্ন।

—আগে একবার কলেজে গিয়ে সব জেনে আসি।

—সেই সবচেয়ে ভালো। একবার কলেজে গিয়েই খোঁজ নিয়ে এস।

—কালকেই যাব একবার। তার আগে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। মাধববাবু, হেডমাস্টার মশাই, রমেশ স্যার, কাকার বাড়ি—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দ্বিজু মুন্সী বললে—তারপর তোমার, আমাদের কত্তার বাড়ি মানে তোমার সত্যর বাড়ি আর কি—

—হ্যাঁ, সত্যদের বাড়ি।···কথাটা সে অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে শেষ করল। ও বাড়ির সঙ্গে তার হৃদয়ের সবচেয়ে মধুর ও সবচেয়ে গোপন অংশ জড়ানো আছে। তার নাম কি সবারই সামনে উচ্চারণ করে প্রকাশ করা যায়। তা ছাড়া তাকে একবার গঙ্গাজলের বাড়িও যেতে হবে পাথুরেঘাটায়। দশহরার দিন সে যেতে লিখেছে। সেও তো কাউকে বলার নয়। লজ্জার কিছু নেই কিন্তু বড় গোপন।

পরদিন সকালবেলা সে বের হলো মাধববাবুর বাড়ি যাবে বলে।

যাবার পথে তার একটা সৌভাগ্যের কথা মনে হলো বিশেষভাবে। সে সৌভাগ্য তার লেখাপড়ায় অতুলনীয় কৃতিত্বের থেকে পৃথক কিছু। কথাটা এর আগে তার মনে হয় নি, মনে হয়েছে এই দ্বিতীয়বার কলকাতায় এসে। সে সামান্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঘরের ছেলে। যৎসামান্য তার সংগতি। কিন্তু কলকাতায় এসে সমাজের অতিবিশিষ্ট ও উচ্চতম অংশের যে সব মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে, এমন কি প্রার্থীর ভূমিকাতে দাঁড়িয়েই যাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁরা কেউ অবহেলা কি করুণা করে এক মুষ্টি ভিক্ষা তার প্রসারিত অঞ্জলিতে ছুঁড়ে দেন নি, বরং তাঁরা প্রত্যেকেই এক ধরনের আশ্চর্য সমাদরে তাকে আপ্যায়িত করেছেন। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে চরিত্রের বিভিন্নতার জন্যে প্রকাশের ভিন্নতা ঘটেছে, কিন্তু আপ্যায়ন ও সমাদর করতে কেউ ভুল করেন নি।

এই তো দ্বিজু মুন্সী! কি প্রয়োজন ছিল তার তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসবার, আশ্রয় দেবার? সাধারণ সংসারী মানুষ, টাকা-আনা-পাই বোঝে, পাপ-পুণ্য বোঝে। তাতে তাকে আশ্রয় না দিলে দ্বিজু মুন্সীর কোনো পাপ হতো না, পুণ্যের খাতায় এতটুকু ঘাটতি হতো না!

এই নবলব্ধ আত্ম-নিযুক্ত মাতামহটির কথা মনে হতেই তার চিত্ত সরস হয়ে উঠল। সে তাকে সমাদরে-মনোযোগে প্রায় অস্থির করে রেখেছে। সেই কোন্ ভোরে উঠেছে দ্বিজু মুন্সী। তারপর প্রাতঃকৃত্য স্নান সেরে 'ব্রহ্মা মুরারি ত্রিপুরান্তকারী' আবৃত্তি করতে করতে শ্লোক উচ্চারণ অর্ধসমাপ্ত রেখেই মধ্যপথেই তার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন হলো—ও নাতি, উঠেছ নাকি ভাই?

ইচ্ছা করেই কণ্ঠস্বরে বেশ খানিকটা উৎসাহ ঢেলে সে জবাব দিলে—হ্যাঁ দাদু, উঠেছি!

—আচ্ছা, আমি আসছি দাঁড়াও পুজো সেরে।···আবার অর্ধসমাপ্ত শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে চলে গেল মুন্সী।

পুজো সেরে বেরুবার জন্য তৈরি হয়ে মন্মথর দরজায় এসে দাঁড়াতেই মন্মথ তাকে সম্মান করে তাড়াতাড়ি চৌকি থেকে নেমে দাঁড়াল। মুন্সী অবাক্, বললে—কই তুমি তৈরি হও নি। চল। কাল বলেছিলে না মাধববাবুর কাছে যাবে!

মন্মথ একটু মাথা চুলকে অপ্রস্তুত হবার ভান করে বললে—তাতো বলেছিলাম।

দ্বিজু মুন্সী সোৎসাহে ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ, আমিও তো সেই জন্যে ডাকছিলাম তোমাকে। আর দেরি করে গেলে তো মাধববাবুকে পাবে না। উনি দশটায় বেরিয়ে যাবেন। তার আগে স্নান, পুজো, খাওয়া সব আছে তো! একবার বসবার ঘর থেকে ওপরে চলে গেলে আর পাবে না তাঁকে।

মন্মথ বললে—আমি ভাবছিলাম, আগে মাধববাবুর কাছে না গিয়ে কাকা-কাকীমার সঙ্গে দেখা করে আসি। সেইটাই বোধহয় ঠিক হবে! তাই কথা হলো!

—কথা হলো? চারু বলছিল তাই? তা ভালই বলেছে। হাজার হোক, বাপের ভাই, এক রক্ত! তার কাছেই আগে যাওয়া ভালো! ঠিক কথা! তাই যাও তুমি! তুমি তা হলে পরেই যেও, জলটল খেয়ে বেরিও।

বলেই বেরিয়ে গেল দ্বিজু মুন্সী জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ির দিকে। মুন্সী বেরিয়ে যেতেই চারু এসে দাঁড়াল তার দরজায়। মুখে এক মুখ হাসি, একরাশ কৌতুক। মন্মথর মুখের দিকে তাকিয়ে চারু বললে—কি ছেলে, ছাড়ান পেয়েছ তো? না হলে এতক্ষণ 'হণ্টন' শুরু হয়ে যেতো! কি যে মুশকিল আমাদের ওই মানুষকে নিয়ে। বিরক্ত যদি হলো কি খুশী যদি হলো তাহলে ওই বিজ বিজ করে সারাদিন কথা বলে, পিছনে পিছনে ঘুরে তাকে অতিষ্ঠ করে দেবে, ভালো কথা বলেও অতিষ্ঠ করে দেবে! একেবারে ছেলেমানুষের বেহদ্দ!

পুত্রহীনা বিধবা চারুর দুই চোখ পিতৃস্নেহের স্মৃতিরোমন্থনে চকচক করে উঠল। সে সরে গেল মন্মথর সামনে থেকে। যেতে যেতে গলা উঁচু করে বলে গেল—মিষ্টি জল না খেয়ে বেরিও না যেন!

মাধববাবুর বাড়ি যাবার জন্যই বের হলো সে, যদিও চারু তাকে প্রথমে কাকার বাড়ি যাবার কথাই বলেছিল। চারুর বলা সত্ত্বেও তার কলকাতার দেখাশোনা মাধববাবুকে দিয়েই আরম্ভ করার ইচ্ছা ছিল। সুন্দর মানুষটির কথা মনে হলেই

মনটিতে এক ধরনের মাধুর্যের সঞ্চার হয়, এমন সুন্দর মানুষ মাধববাবু। গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, শ্বেতশুভ্র চুল মানুষটি, পরনে ধবধবে সাদা জামা-কাপড় ; সব মিলিয়ে একেবারে একান্ত শুভ্র, পরিষ্কার। সেই সঙ্গে মিষ্টি মধুর হাসি, শান্ত ধীর কথা-বার্তা। কথাবার্তা আর হাসির ভিতর দিয়ে যে মনটি বেরিয়ে আসে সে অমনি সুন্দর! সব মিলিয়ে, একবার তাঁর কাছে গেলে আবার যেতে ইচ্ছে হয়। তার মন কেবল কল্পনা করছিল সেই মানুষটি তার এই আশ্চর্য কৃতিত্বে কতখানি খুশী হবেন, আর সেই খুশী তিনি কেমন ভাবে, কেমন ভাষায় প্রকাশ করবেন। সেইটি জানার একটি কৌতূহল এবং সেটি আস্বাদ করবার আগ্রহ মনে তীব্র হয়ে উঠেছিল।

চলার গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ চারুর কথাটা মনে হলো তার। কাকার কাছেই তো আগে যাওয়া উচিত। হাজার হোক সে কাকা।

আসলে কাকার বাড়ি যেতে তার একেবারে ইচ্ছা করছিল না। বহুদিন না যাওয়ার জন্যে এক ধরনের লজ্জাও মনে জমে আছে!

পায়ের চলার গতি মন্থর হয়ে পড়েছে। সেটা মনে হতেই তার মন নিজেরই উপর বিরক্ত হয়ে উঠল। এ কি কথা? সংসারে কোনো জায়গায় যেতে ভয় লাগবে, মন সংকুচিত হবে—এ কেমন কথা!

সে চলার দিক পরিবর্তন করে গতি দ্রুততর করে দিলে।

তারপর কিছুক্ষণ নিশ্চয়ই কেটেছিল এক ধরনের অস্বস্তি, অভিমান বিরক্তি, লজ্জা, তার সঙ্গে এক ধরনের অপ্রস্তুতভাব সবরকম মিলিয়ে এক মনোভাবের মধ্য দিয়ে। তারপর এক সময় মন আপনিই স্বস্তি পেয়েছিল। সে স্বস্তি বাইরে কাকা-কাকীমার বাড়িতে, কি তাঁদের বাক্যে-ব্যবহারে ও মনে থাকুক বা না থাকুক সে নিজের মনে তা অনুভব করেছিল। যেমন ভেবেছিল ঠিক তেমনিভাবেই কাকা আর কাকীমা কথা বলতে আরম্ভ করলেন তার সঙ্গে।

কাকা তো তার থেকে বেশী অপ্রস্তুত মনে মনে। সেই জন্যে তাকে দেখে হইচই করলে আরও বেশী করে—আরে বাপরে, বাপরে, বাপরে, আয়, আয়! বাপধন এস! বংশের মুখ উজ্জ্বলকারী সন্তান! এমন ছেলে কার হয়!

তারপর গলা তুলে ডাকতে লাগল স্ত্রীকে—কই, কোথায় গেলে, শীঘ্রি এস, এসে দেখ কে এসেছে!

জটাধরের মিঃ জে. ভট্‌চাজ হওয়া সত্ত্বেও জীবনে এই এক দুর্বল ক্ষেত্র রয়ে গিয়েছে। জ্যেষ্ঠ সহোদর গঙ্গাধর ও তার এই সন্তানটির সামনে দাঁড়ালে জটাধরের পোশাকী মিঃ জে. ভট্‌চাজের চেহারা খসে পড়ে যায়। সেই প্রাচীন জটাধর তার

সমস্ত দুর্বলতা ও অর্ধশিক্ষিত মনটি নিয়ে যেন এসে সবিনয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ায় আর তাদের অন্তরের কৃপা ভিক্ষা করে! কী এক আশ্চর্য দীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় সে তখন। তখন এই অর্থ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা কোনো কাজে লাগে না। তাই সেই দীনতাকে ঢাকবার জন্যে সে ডাকতে লাগল তার সব শক্তির আশ্রয় কৃষ্ণভামিনীকে। সে এলে জটাধর খানিকটা সাহস ও শক্তি ফিরে পাবে।

জটাধরের ডাকাডাকিতে জটাধরের সংসারের ঈশ্বরী কৃষ্ণভামিনী এসে উপস্থিত হলো দুই চোখে ভ্রূকুটি নিয়েই। ঘরের বাইরে থেকেই বলতে বলতে ঢুকল—কে এমন গুরু-গোঁসাই এলো যে ছুটে আসবে হবে? আর তার জন্যে ডেকে বাড়ি মাথায় করতে হবে? জানি না বাবা!

ঘরে ঢুকেই মন্মথকে দেখে কৃষ্ণভামিনীও কিন্তু এক মুহূর্ত বিব্রত বোধ করলে। কিন্তু সে ওই এক মুহূর্তই। মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে তিনি এগিয়ে এসে কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললেন—ওমা, মন্মথ! কত বদলে গিয়েছ, কত বড় হয়েছ?

মন্মথ সপ্রতিভভাবে হেসে, চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে কাকীমাকে প্রণাম করলে। তার বদলে যাওয়া এবং বড় হয়ে যাওয়ার ফলে কাকীমার মনোভাব কি তা ঠিক ধরা পড়ল না তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে। সেটা যেন আনন্দেরও নয়, দুঃখেরও নয়। কাকা-কাকীমার সম্পর্কে এইটাই সব চেয়ে খারাপ লাগে মন্মথর।

কাকীমা প্রশ্ন করলেন—কবে এসেছ কলকাতা?

কাকীমা প্রশ্নটা কেন করলেন অভ্রান্তভাবে বুঝতে পেরেছে মন্মথ। প্রশ্নটার উদ্দেশ্য হলো, উঠেছ কোথায় এবং আমাদের এখানে আসার আগে আর কোথাও গিয়েছিলে কি না—এই দুটি জানা। সে প্রশ্ন দুটির উত্তর দুটি বাণের মতো সংগোপনে প্রস্তুত করে রেখে হাসিমুখেই বললে—কাল এসেছি! আজ সকালেই এই এখন তোমাদের এখানে। এই উত্তরের মধ্যে মুখ ভার করার মতো কি ছিল তা বুঝতে পারলে না মন্মথ। কাকীমা বললে আমাদের ভাগ্যি বলতে হবে বাবা, যে কলকাতা এসে প্রথমেই আমাদের এখানে এসেছ!

মন্মথ মনে মনে কাকীমার মুখভাব ও কথা বলার ভঙ্গি দেখে বিরক্ত হলো, কিন্তু মুখে কিছু বললে না। বরং হাসি মুখেই বললে—এখানে প্রথমে না এসে অন্য কোথায় যাব? তাই কি যাওয়া যায়?

তার এমন সুন্দর সরস উত্তরও কাকীমাকে প্রসন্ন করতে পারলে না। সে এই উত্তরের সুতো ধরেই বললে—সে কথা তো আজ বেশ বলছ বাবা হাসিমুখে। কিন্তু যেদিন চলে গিয়েছিলে এই বাড়ি ছেড়ে সেদিন তো এ কথা মনে রাখ নি, বিচারও কর নি।

মন্মথর অন্তরের সমস্ত সহানুভূতি ও আনন্দ এক মুহূর্তে এই কথাগুলোর তাতে শুকিয়ে গেল। নিদারুণ রাগে তার সমস্ত মন ভরে উঠল। তার ফর্সা মুখের রক্তাভায়ও তার ছায়া পড়ল। তবু সে বললে—ওসব পুরোনো কথা ছেড়ে দাও কাকীমা! আর সেও তো কম দিন হলো না! বেশ ক' বছর হয়ে গেল। সেই সামান্য কথা এখনও কেন মনে করে রেখেছ?

বলে সে তাকাল কাকার মুখের দিকে। তার চোখে চোখ পড়তেই তার মুখের সরসতায় কেমন এক ধরনের অপ্রস্তুত হওয়ার ছোঁয়াচ লাগল। সে মুখ সরিয়ে নিলে, সরিয়ে নিতে হলো তাকে। কারণ কাকীমার নূতন আক্রমণ হঠাৎ এসে পড়ল, তার উপর। কাকীমা বেশ ভারী মুখেই বললে—তুমি তো বাবা, সামান্য কথা বলে উড়িয়ে দিলে, বললে—কেন এখনও মনে রেখেছি! তা সত্যি কথাই তো এ কি মনে রাখার মতো কথা! তুমি খুড়োর বাড়িতে থাকতে, তারপর ভালো লাগল না, খুড়োর বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে! গেলে গেলে, তা বলে খুড়ো-ভাইপোর সম্পর্কটা তো উড়ে গেল না।

মন্মথ এতক্ষণ সমস্ত কথাবার্তার মধ্যেই একটা স্পষ্ট অভিযোগ আর বিরূপতার স্পর্শ পেয়ে মনে মনে কঠিন ও তিক্ত হয়ে উঠছিল, এতক্ষণে কথার মধ্যে একটা অভিযোগহীন সহজ জায়গা পেলে নিশ্বাস ফেলবার। সে কাকীমার শেষ কথা সমর্থন করে বললে—সত্যি কথাই তো!

তার সমর্থনে কাকীমা খুশী হলো। বললে—তুমি জ্ঞানবান বুদ্ধিমান ছেলে, তুমি ঠিক ধরেছ কথাটা! তা বাবা, তুমি তো কথাটা ছেড়ে দিতে বললে, কিন্তু লোকে কি ছাড়ে? সেদিন মল্লিকবাবুদের গানের আসরে এবারকার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফল নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল!

অকস্মাৎ প্রয়োজনবোধে স্বামীর দিকে ফিরে তাকাল, মৃদু ধমক দিয়ে বললে—তুমি বল না গো! আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আমি কি অত সব জানি, না মনে রাখতে পারি।

স্ত্রীর নির্দেশে মুখ খুললে জটাধর। বললে—জানিস, সেদিন, মানে এই দিন তিনেক আগে চোরবাগানের মল্লিকবাবুদের বাড়ি গানের জলসা ছিল। আসর বসার আগে এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফল নিয়ে কথা হচ্ছিল। ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসার ছিলেন সেখানে। তিনিই বলছিলেন এবার যে ছেলেটি এণ্ট্রান্সে ফার্স্ট হয়েছে সে যদি ইংরেজীটা অন্য বিষয়গুলোর মতো জানত তাহলে রেকর্ড মার্ক পেত। তার অঙ্ক, সংস্কৃত, বাংলার খাতা নাকি দেখবার মতো। তা বুঝলি, শুনে আমার বুকটা ফুলে উঠল! হাজার হোক, মায়ের পেটের ভাই, তার ছেলে!

তার প্রশংসা হলে ভাগ না নিয়ে পারি! বড় মুখ করে বললাম—কার কথা বলছেন, মন্মথ ভট্‌চাজের কথা বলছেন তো! এবার হিন্দু স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স দিয়েছিল। হুগলী জেলা বাড়ি! আমার ভাইপো! আমার কথা শুনে সবাই অবাক। একজন হেসে উঠল। যেন ঠাট্টা করেই হাসলে। বললে—বলেন কি জটাধরবাবু, আপনার ভাইপো? গ্রাম সম্পর্কে না জেলা সম্পর্কে? শুনে রাগ হয়ে গেল বুঝলি! বললাম—না মশাই, নিজের ভাইপো! ভাইয়ের ছেলে!

জানিস, তাতেও মানে না কিছুতে। ঠাট্টা করে বললে—কি রকম ভাই তাই তো জিজ্ঞাসা করছি মশাই! আপনার ভাইপো ফার্স্ট হয়েছে বললে যে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের কথা মনে হয়!

বুঝলি, শুনে বড় রাগ হয়ে গেল। যার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল তার নাম তুই জানিস না, শহরের অনেকে জানে। তার নাম হল কার্তিক মল্লিক, বাবার নাম মহাদেব মল্লিক। বাপের এক রক্ষিতার ছেলে আছে, দুর্দান্ত লোক। কি নাম ছিল তার জানি না। সে নিজের নাম বলে গণেশ মল্লিক। গণেশের সঙ্গে যে তার কোনো সম্পর্ক আছে তা কার্তিক মল্লিক স্বীকার করতে চায় না। তাই বললাম—কার্তিক মল্লিকের সঙ্গে গণেশ মল্লিকের যে সম্পর্ক আছে আমার সঙ্গে মন্মথর বাবার সম্পর্ক তার চেয়েও আপনার। আমি আর মন্মথর বাবা দুই সহোদর ভাই?

ব্যস, আর যায় কোথায়! যারা এতক্ষণ ধরে কার্তিক মল্লিকের কথায় হাসছিল এবার তারা আমার কথায় হেসে উঠল। কার্তিক মল্লিক আমার কথা আর লোকের হাসি শুনে, সে জানিস সে কেমন একরকম করে, আমার মুখের দিকে তেরছা করে তাকিয়ে রইল। মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে গিয়েছে—

হঠাৎ বাধা দিলে কৃষ্ণভামিনী, বললেন—এই দেখ, তুমি যে মহাভারত বলতে বসে গেলে। আসল কথা যেটুকু সেইটুকু শুধু বল! অত কাহিনী ফাঁদবার দরকার কি?

—হ্যাঁ, তাই বলছি। তা বুঝলি, তেরছা করে আমার দিকে তাকিয়ে কার্তিক মল্লিক বললে—তা এ তো খুব আনন্দের কথা। তা আপনার ভাইপোকে একদিন আনুন, আমরা আলাপ করি। তা একদিনই বা কি দরকার, সে যখন আপনার ভাইপো, তখন আপনার বাড়িতেই আছে নিশ্চয়! আমার গাড়িটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাকে নিয়ে আসুক, আলাপ করিয়ে দেন আমাদের সঙ্গে।

আমি তো বুঝলি, বোকা বনে গেলাম! বললাম—তাকে এখানে এখন কোথায়

পাবেন ? সে কি এখানে আছে ?

—সে কোথায় ? আমাকে প্রায় ধমকে উঠল কার্তিক মল্লিক।

আমি কি জবাব দি ? মহা মুশকিলের ব্যাপার। তুই যে তখন কোথায় তাও সঠিক জানি না। কলকাতায় না গোবিন্দপুরে। তাই চুপ করে রইলাম। তখন কার্তিক মল্লিকের সে কি দাপট! আরও জোরে চিৎকার করে বললে—বলুন, সে কোথায় ?

আমি জবাব দিতে পারি না। মহা ফ্যাসাদ। তখন ব্যাটা আমাকে প্রায় ধমকে উঠল—লায়ার, ভেরিটেবল লায়ার! তারপর সে প্রায় হাতাহাতি ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত সবাই আমাকে মিথ্যেবাদী ভেবেছে জানিস! তা—

কৃষ্ণভামিনী এইবার কাকার মুখের কথা কেড়ে নিলে; বললে—তা হলে বল তো বাবা, তোমার জন্যে তোমার কাকার কি অপমানটা হলো।

এতক্ষণ এই বিচিত্র গল্প, যার কেন্দ্রে সে নিজে নায়ক, তা শুনতে শুনতে মনের তিক্ততা আর রাগটা জুড়িয়ে এসেছিল, তাকেই যেন আবার খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিলে কাকিমা। সে বললে—তুমি এমন করে বলছ কেন খুড়ীমা ? 'আমার জন্যে' বলছ কেন ? আমি এতে কি করলাম ?

কৃষ্ণভামিনী কি বলত এর উত্তরে কে জানে, কিন্তু তার এই কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠল জটাধর। শশব্যস্ত হয়ে বললে—সত্যিই তো, এসব তুমি কি বলছ ছোট বৌ! কার্তিক মল্লিকের সঙ্গে আমার যে ব্যাপারটা তাতে মনু কি করবে ?

কৃষ্ণভামিনী এক মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল, স্বামীকে ধমক দিয়ে বললে—থাম তো তুমি! যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলো না।

মন্মথ চেয়ারে বসেছিল, নিজেকে একটা ঝাঁকি দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। কৃষ্ণভামিনীকে ভ্রূক্ষেপ না করে জটাধরের মুখের দিকে তাকিয়ে সে একটু চড়া গলায় বললে—আমি আসি কাকা। পরীক্ষার পর কলকাতা এসে তোমাদের প্রণাম করতে এসেছিলাম।

সমস্ত ব্যাপারটা যে নিমেষে অনেকদূর অবাঞ্ছিত পথে গড়িয়ে গিয়েছে বুঝতে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘটনাটা পরিপাক করে নিলেন কৃষ্ণভামিনী। যুদ্ধ থেকে সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎপসরণ করলেন তিনি। এক মুহূর্তে স্বর বদলে বললেন—আমাদের স্বামী-স্ত্রীর কথা শুনে ছেলের রাগ হয়ে গেল! তুইও তো বাবা বেশ ছেলে, কতদিন পরে এলি, বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছিস তুই, একটু মিষ্টিমুখ করে যাবি তো! আর তোরই বা কি জ্ঞান বুদ্ধি ? আমাদের ওপর নয়তো রাগ করলি,

কিন্তু তোর ছোট ভাই? সে কি দোষ করলে? তাকে একবার দেখে যাবার কথাটাও তোর মনে হলো না?

কৃষ্ণভামিনীর যুদ্ধের পদ্ধতিটি বড় বিচিত্র। আক্রমণ ছাড়া আর কিছু জানেন না তিনি। এখনও আক্রমণ চলছেই। কামান-বন্দুক নামিয়ে রেখে এমন মৃদু আঘাতের জন্য লাঠি ধরেছেন। আবার সুযোগ ও সময় হলেই বন্দুক তাগ করবেন।

কৃষ্ণভামিনী তার জন্য জলপান আনতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পিছন থেকে ডেকে মন্মথ বললে—আমি কিছু খাব না খুড়ীমা। আমি সকালে একপেট চিঁড়ে দই খেয়ে বেরিয়েছি। এখন আর কিছু খেতে পারব না।

কৃষ্ণভামিনী ঘুরে দাঁড়ালেন, আবার বোধহয় তীব্রতর ও বৃহত্তম আক্রমণের উদ্দেশ্যে তার দিকে বেশ ভালো করে তাকিয়ে বললেন—আমাদের বাড়িতে আর খাবি না বুঝি?

এবার সব রাগ বিরক্তি ভুলে হাসল মন্মথ। এক মুহূর্তের জন্য ষোল-সতের বছরের মন্মথর মনে হলো তার সামনে পরিণতবয়স্ক তুটি ছেলে আর মেয়ে বুকভর্তি কাঙালপনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্তরের কাঙালপনা ঢাকার জন্য, ভরে তুলবার জন্য তুজনেরই আপ্রাণ চেষ্টা। পাড়াগাঁয়ের জটাধর ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রথমে জটাধরবাবু, তার পর মিঃ জে. ভট্চাজ হবার তপস্যা করছে, কাকীমাও যোগ দিয়েছেন তাতে; টাকা-পয়সা, বাড়ি-ঘর, মান-সম্মান, সব তিল তিল করে যোগাড় করছেন জড়ো করছেন সেই কাঙালপনা ভর্তি করবার জন্যে। ভারী মায়া লাগল মন্মথর ওদের তুজনের জন্যেই। হাসি মুখেই খুব মিষ্ট করেই বললে—তুমি পাগল কাকীমা! তোমার বাড়ির ভাত আমার পেটে গজগজ করছে, আর আমি বলব—তোমার বাড়িতে খাব না? এখন খানিকটা জল কি চিনির শরবত করে দাও।

—তাই বল। বস তুই, আমি নিয়ে আসি! লঘু-পদক্ষেপে চলে গেল কৃষ্ণভামিনী।

কাকার দিকে ফিরে মন্মথ বললে—খোকনকে নিয়ে এস, দেখি কত বড় হলো!

—সে তোর খুড়ী এখুনি নিয়ে আসছে। ও থাকতে কি আর আমার খোকনকে কিছু বলার কিছু করার উপায় আছে?

বলেই সঙ্গে সঙ্গে জটাধর বললে—জানিস মনু, আমি ঠিক করেছি, তুই কলেজে ভর্তি হলে আমি তোকে বাড়িতে নিয়ে এসে একটা বড় 'ফিস্ট' মানে নেমন্তন্ন করব বুঝলি। নেমন্তন্ন করব ওই কার্তিক মল্লিককে ঠাণ্ডা করবার জন্যে। তুই যে আমার ভাইপো, আমার মায়ের পেটের ভায়ের ছেলে এইটা আমাকে দেখাতেই

হবে। তার জন্যে পাঁচশো কি হাজার টাকা খরচা হলে জে. ভট্‌চাজ মরে যাবে না! না কি বলিস?

মন্মথ হাসল। ছোট ছেলের অপটু মিথ্যাভাষণ ও অপ্রচ্ছন্ন দাম্ভিকতা দিয়ে তৈরি প্রলাপ শুনে পরিণত বয়স্ক আত্মীয় যেমন কৌতুক বোধ করে তেমনি হাসি লাগল মন্মথর। সে একটু হাসলও আপন মনে। কোনো উত্তর দিলে না। তাকে খুশী করার জন্যে কাকা মিথ্যাটা রচনা করে ফেললে। পর মুহূর্তেই এই বলাটা সে ভুলে যাবে। যদি ভুলে নাও যায় তাহলে কাকীমা ধমক দিয়ে ভুলিয়ে দেবে। সে ভালো করেই জানে—কাকা-কাকীমার জীবনে, তাদের কল্পনা ও স্মৃতির ভূগোলে তার অস্তিত্বও নেই। যদি সাময়িক অস্তিত্ব এসেই পড়ে তবে তা অন্য কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে সেই আলাদা জিনিসটার জন্যে।

কাকা আরও কি সব বলত কে জানে। এই সময় ঘরে ঢুকল একজন স্ত্রীলোক, বোধহয় ঝি, তার দুই হাতে দুটি গ্লাস। এঁটো গ্লাসটা বাড়িয়ে দিতেই ঝি সেটি বাঁ হাত দিয়ে নিলে। অভ্যাস বশে উচ্ছিষ্ট ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলে মন্মথ। ঝি এঁটো গ্লাসটা তার প্রসারিত হাতের নিচে রেখে অপর জলের গ্লাস থেকে জল ঢেলে দিলে তার হাতে।

কাকীমা কৃষ্ণভামিনী এই সময় ঘরে ঢুকলেন ছেলেকে কোলে নিয়ে। সে তো কোলে নিয়ে আসা নয়, যেন হৃদয়ের ধনকে পরমাদরে বুকে ধরেই নিয়ে এলেন কাঁথায় মুড়ে। কাঁথাও যেন সেই চিরকালের পুরানো কাপড় একত্র করে ফোঁড় দিয়ে সেলাই করা কাপড়ের টুকরো নয়, সে যেন দেবতার গাত্রবাস। অন্তত কাকীমার ধরন দেখে তাই মনে হলো মন্মথর। কাকীমার যে মুখখানি এতক্ষণ তার সঙ্গে বাক্যযুদ্ধের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে স্ফুরিত, উজ্জ্বল, তির্যক্ ও বক্র হয়ে উঠছিল সে মুখ এখন ছেলেকে কোলে নিয়ে একেবারে অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। কোমল লাবণ্যময়, হাসিতে সরস হয়ে উঠেছে সে মুখ। যেন সাত রাজার ধন তার হাতে তুলে দিচ্ছেন এমনিভাবে হাসিমুখে কাঁথাসুদ্ধ ছেলেকে তার হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—নে, ধর। ভালো করে হাত বাড়িয়ে দে। দেখিস, না পড়ে পড়ে যাবে।

কাকীমার মুখের মাধুর্যের ছায়া পড়ল যেন তারও মুখে। কাকীমার মুখের হাসি দেখে তার মনেও যেন তার ছোঁয়াচ লাগল। সে পরমাদরে একান্ত আগ্রহে হাত বাড়িয়ে কাঁথাসুদ্ধ ছেলেটিকে দুই প্রসারিত হাতের উপর সযত্নে গ্রহণ করলে।

হঠাৎ তার চোখ পড়ল কাকার মুখের দিকে একটি সহজ সরল হাসিতে তার সমস্ত মুখটি ভরে আছে। তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলো না। এই দুজনের এই

কিছুক্ষণ, কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও, নিজেদের ছেলে-মানুষের মতো অহংকার ও ক্ষুদ্রতার জন্যে তাকে কথার বাণে বাণে বিদ্ধ করছিল।

সে তাকাল ছেলেটার মুখের দিকে। ছেলেটা নতুন কোলে গিয়েও কাঁদছে না। তার মুখের দিকেই যেন তাকিয়ে আছে আর অর্থহীন হাসি হাসছে। এক মুখ হাসি। অকারণ হাসি।

তার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে উঠল। কোনো শিশুকে কোলে নিয়ে তার মনে কখনও এমন অনুভব হয় নি। সে ছোটবেলায় নিজের সহোদর প্রমথকে কোলে করেছে। প্রমথকে কোলে করা কেন, অল্প বয়সে নিজের সাধ্যেরও অতিরিক্ত ভার হতো যখন প্রমথ, তখনও সে প্রমথকে কোলে টেনে টেনে ফিরেছে। তারপর এই তো কয়েকদিন আগে পর্যন্ত নবজাত সৎভাইকে কোলে করে আদর করে এসেছে। কিন্তু এমনটি কখনও মনে হয় নি। আজ ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার দুই চোখ ঝাপসা হয়ে এল। মনে হলো সেও যেন ছেলেবেলায় এমনি ছিল দেখতে। কথাটা ঠিক কি বেঠিক তা একবারও মনে হলো না ; শুধু মনে হলো কথাটা। মনে হতে এক ধরনের আতুরতায় বুকের ভিতরটা আকুল হয়ে উঠল। একান্ত উন্মুখ চিত্তে সে নিজের মুখটি এই অকারণে হাস্যমুখর মোটাসোটা দামাল শিশুটির বুকের উপর চেপে ধরলে পরমাদরে। ছেলেটা গলায় শব্দ করে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠল কৃষ্ণভামিনী। বললে—এই, এই মনু, ও কি করছিস তুই, ওর দম বন্ধ হয়ে যাবে। আর এখনও ওর ভাত হয় নি, তোর মুখ ঠেকাস না ওর মুখে।

মুখ তুলল মন্মথ। কাকা-কাকীমা দুজনেই আশ্চর্য হয়ে গেল তার চোখে জল দেখে। তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মন্মথর দিকে। মন্মথ কাঁদছে। কেন কাঁদছে তারা জানে না, বুঝতে পারে নি, কিন্তু এটা দুজনে ঠিক বুঝেছে যে এ কান্না দুঃখের নয়, ঈর্ষার নয়।

মন্মথ হাসি মুখে চোখের জল মুছতে মুছতে বললে—নাও, তোমার ছেলে নাও কাকীমা।

কাকীমা হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কোলে ফিরে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

মন্মথ বললে—সুন্দর ছেলে হয়েছে খুড়ী। আমি ওকে এবার থেকে সুন্দর বলে ডাকব।

প্রগল্‌ভ জটাধরও কোনো উত্তর দিতে পারলে না, শুধু হাসল বোকার মতো। কৃষ্ণভামিনী হাসিমুখে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন।

উঠবার সময় কৃষ্ণভামিনী বললেন—আবার আসিস বাবা।
জটাধরের প্রগল্‌ভতা এবার স্বাভাবিকভাবে আবার আত্মপ্রকাশ করলে। সে হৈহৈ করে বললে—না এলে ওকে আমি ধরে নিয়ে আসব না! হ্যাঁঃ।
মন্মথ শুধু বললে—আসব, আবার আসব, নিশ্চয় আসব। তোমাদের জন্যে যদি নাও আসি, আমি সুন্দরের জন্যে আসব।
স্বামীর দিকে চেয়ে একটু তীব্রভাবেই বললেন—শুনলে, ছেলের কথা শুনলে! বলি হ্যাঁরে, আজ যাকে সুন্দর বলে বুকে তুলে আদর করছিস তাকে পেলি কোথা থেকে রে? তোর খুড়ো-খুড়ী না থাকলে তাকে পেতিস কোথায়?
কথাগুলো বোধহয় কানেও গেল না মন্মথর। ওই কাচ ছেলেটার সুন্দর মুখের হাসি আতরের গন্ধের মতো তার সমস্ত অনুভবকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঘন দুধের উপরে সরের একটা পুরু আস্তরণের মতো ওই কাঁচ ছেলেটার হাসি যেন তার বুকের ভিতর ভরাট করে বিছিয়ে দিয়েছে কেউ।

মধু রায় লেন থেকে বেনেটোলায় সে এসে দাঁড়াল গোপীনাথ ভট্চাজ মশাইয়ের বাড়ির সামনে। কলকাতায় তাকে এখন দেখা করতে হবে কতজনের সঙ্গে! হেড-মাস্টার মশাই, রমেশ স্যার, মাধববাবু, এঁরা তো রয়েছেনই। তারপর আছে তার গঙ্গাজল। আর আছে সত্যদের বাড়ি।
মধু রায় লেন থেকে বেনেটোলা যেতে যেতেই একবার মনে হলো একটু ঘুরে সত্যদের বাড়িটা হয়েই যাই। কিন্তু নিজের মনকে আটকালে মন্মথ। খাওয়ার প্রথমে যে আরম্ভ তেতো দিয়ে তাই শেষ হয় পায়স মিষ্টান্ন দিয়ে। তেমনি দেখা-শোনা যেমন আরম্ভ হলো কাকা-কাকীমার সঙ্গে দেখা করে, সেটা শেষ করবে সে সত্যদের বাড়িতে।
পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকতেই পণ্ডিতমশাই নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। তাকে দেখে তিনি প্রায় বিস্মিত আনন্দে বিগলিত হয়ে বললেন—কে মন্মথ? এস এস বাবা! এস।
বলেই তিনি চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন—রাধাশ্যাম, অরে রাধাশ্যাম, কে এসেছে দেখে যা!
গোপীনাথ পণ্ডিতমশায়ের এই আতিশয্য তার একটু অবাকই লাগল আজ। অবশ্য পণ্ডিতমশাই তার সংস্কৃতে আসক্তি এবং ব্যুৎপত্তি ও মেধার জন্য তাকে বড় বেশী সমাদর করেন। তার সঙ্গে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ফার্স্ট হবার পর এই তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হচ্ছে। সেই কারণেই হয় তো খুশী হয়েছেন অত বেশী!

গোপীনাথ রাশভারী ভারিক্কী মানুষ, কিন্তু এই ছেলেটির সঙ্গে একটি হৃদ্য প্রসন্ন সম্পর্ক তাঁর হয়েছে সেই জটাধরের বাড়িতে প্রথম দেখার সময় থেকেই। সে হৃদ্যতা দিনে দিনে বেড়েছে বই কমে নি। তিনি হাঁকডাক তুলে দিলেন—কই, কোথায়, আসন দিয়ে যাও, আমাদের মন্মথ এসেছে! আরে রাধাশ্যাম কোথায় গেল ?

পণ্ডিতমশায়ের কনিষ্ঠা কন্যা ছ' বছরের অন্ন ঘুটিং নিয়ে খেলা করছিল বারান্দায় —ফুল, ফুল, ফুলটি ! একলাফে জোড় ফুলটি। কদম, কদম, কদমটি ! একলাফে জোড় কদমটি ! সে তার ঘুটিং রেখে দিয়ে ছুটে ভিতরে গেল আসনের জন্যে। ততক্ষণে পণ্ডিত-গৃহিণী উৎকৃষ্ট গালচের আসন এনে পেতে দিয়েছেন।

প্রণাম শেষ করে আসনে বসতেই আর একটি ভদ্রমহিলা মাথায় মস্ত ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়ালেন পণ্ডিত-গৃহিণীর সামনে। গোপীনাথ বললেন—মন্মথ প্রণাম কর, আমার ভগিনী।

সঙ্গে সঙ্গে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল মন্মথ। পণ্ডিতমশাই ও পণ্ডিত-গৃহিণী তার একান্ত পরিচিত জন। কিন্তু তাঁদের কোনো আত্মীয় তার কাছে স্বভাবতই কুটুম্বতুল্য এবং বিশেষ সম্মানের পাত্র। ভদ্রমহিলার দিকে ফিরে তাকিয়ে সে দেখতে পেলে, দুটি পায়ের প্রান্ত, আর প্রায় কনুই পর্যন্ত দুখানি অনাবৃত হাত। হাত দুখানি বড় সুডৌল, বর্ণ তাদের একেবারে সুগৌর, চামড়াও বড় চিক্কণ। দেখে মনে হয় বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়। সে সসম্ভ্রমে পায়ে হাত দিয়ে ধুলো নিয়ে পায়ের কাছে মাথা মাটিতে ঠেকালে। ঘোমটার আড়াল থেকে ভদ্রমহিলা তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, ফিসফিস করে কিছু আশীর্বাদ বাক্যও বোধহয় উচ্চারণ করলেন, শোনা গেল না। হাতখানি বড় সুন্দর, বড় তরুণ, কিন্তু হাতে সোনার শাঁখা-বাঁধা ছাড়া আর কোনো গহনা নাই। দুটি পায়েই অবশ্য রূপোর চুটকি রয়েছে। মন্মথর প্রণাম নিয়েই তিনি ঘরের ভিতরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনিই আবার জলখাবারের থালা নিয়ে এসে হাজির হলেন। মন্মথ আপত্তি করতেই তিনি অতি মৃদুস্বরে বললেন- খাও বাবা, দেখ মিষ্টি কিছু দিই নি। গরমের দিন, নারায়ণের বাল্যভোগের প্রসাদ ছিল, তাই দিয়েছি।

বাল্যভোগের প্রসাদ ? তাকিয়ে দেখল মন্মথ। তাইতো ! একটু মাখন, এক টুকরো মিছরি, একটু নারকেলের শাঁস, দু টুকরো খরমুজ আর কয়েক টুকরো শসা! জটাধরের বাড়িতে খেতে সে আপত্তি করেছিল, কিন্তু এখানে আপত্তির কথা তার মনেও এলো না।

পণ্ডিতমশাই কাছে বসে তামাক খাচ্ছেন আর কথা বলছেন ; আর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন পণ্ডিত-গৃহিণী আর পণ্ডিতমশায়ের নবাগতা ভগিনী। আর ও পাশে বসে অন্ন ঘুটিং নিয়ে খেলে চলছে—ফুল, ফুল, ফুলটি !

পণ্ডিতমশাই বললেন—আমার ভগিনী কদিন হলো এসেছিলেন কালীঘাটে মা কালীকে দর্শন করতে, প্রণাম করতে। কালী দর্শন হয়ে গিয়েছে, যাই যাই করছেন। তা আমি বলি যখন এসেছ, দু দিন থেকে যাও।

এই সময়ে রাধাশ্যাম এসে উপস্থিত হলো। মন্মথ বাঁচল যেন। কারণ তার মনে হচ্ছিল পণ্ডিতমশায়ের ভগ্নী যদিও ঘোমটায় নিজের মুখখানি সম্পূর্ণ ঢেকে রেখেছেন কিন্তু তিনি পাশে দাঁড়িয়ে তাকেই এক দৃষ্টিতে দেখছিলেন, যেন তাকে এক দৃষ্টিতে দেখবার জন্যই তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

হৈ-হৈ করে উঠল রাধাশ্যাম—আরে, আরে, কখন এসেছিস তুই ? তোর জন্যে তোকে দেখবার জন্যে হেদিয়ে গেলাম, আর তুই কোথায় কোনো পাত্তা নেই। এসেছিস কবে ? উঠেছিস কোথায় ?

সমস্ত অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সামান্য মৃদু হাসল মন্মথ। শুধু বললে—বস, চুপ করে বস !

সচিৎকারে রাধাশ্যাম বললে—বসব কিরে ? তুই এণ্ট্রান্সে প্রথম হয়েছিস, আমি তো নেচে বেড়াব, পাথরে কিল মেরে বেড়াব। ডান হাতে কিল মারব তোর সত্যদের নাকে, বাঁ হাতে মারব বিভূতিদের নাকে, ভাবছিস কি !

মন্মথ একটু হাসল শুধু। তাও নিঃশব্দে !

জ্যৈষ্ঠ মাস। চড়া রোদের মাঝখানে হঠাৎ মেঘ উঠে ছায়া নেমে এলো। মন্মথ বললে—যা, বাড়ি যা রাধাশ্যাম, আমি ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় ছায়ায় ছায়ায় চলে যাই !

তুই সত্যদের বাড়ি গিয়েছিলি ?—স্ত্রীলোকের মতো কৌতূহলী ঈর্ষাকাতর রাধাশ্যামের চিরাচরিত সশঙ্ক প্রশ্ন।

একবার তার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারপর হেসে, নিশ্বাস ফেলে মন্মথ বললে—তোকে নিয়ে আর পারলাম না রাধাশ্যাম। তুই সত্যদের ভয়েই মরে গেলি। না, আমি এখনও সত্যদের বাড়ি যাই নি !

—যাবি না ? সত্যর খবর জানিস ?

চঞ্চল হয়ে উঠল মন্মথ—কি খবর ?

—তুই ফার্স্ট হয়েছিস আর সত্য থার্ড হয়েছে এণ্ট্রান্সে।

এক মুখ পরিতৃপ্তির হাসি হেসে মন্মথ বললে, হ্যাঁ রে, জানি।

—মন্মথ !

—কি রে ?

—একটা কথা বলি, বাবার ভগ্নীকে তো দেখলি ! উনি কে জানিস ?

মন্মথ তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। রাধাশ্যাম সরস হাসি হেসে বললে—উনি মহামহোপাধ্যায় রামরাম স্মৃতিতীর্থের কন্যা। তোর হবু শাশুড়ী ! বুঝলি !

বলে তার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে দিলে তার হাতে। তারপর বললে—ওঁর মেয়ে ওঁর থেকেও ফর্সা, দেখতে আরও সুন্দর ! মেয়ে অবিশ্যি এখন ছ' সাত বছরের, আমাদের 'অন্ন'র মতো।

মন্মথ আর কোনো কথা শুনলে না রাধাশ্যামের। রাধাশ্যামের দিকে পিছন ফিরে তাকে পিছনে ফেলে রেখে হনহন করে হেঁটে চলল মন্মথ।

অনেকটা হেঁটে এসে প্রায় জনহীন আমহার্স্ট স্ট্রীটে একটা গাছের তলায় চুপ করে দাঁড়াল সে। সত্যদের বাড়ি আরও আগে না যাওয়ায় বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে ! মালতীর সুকুমার মুখখানি মনে পড়ল একবার। মনে হলো মালতী যেন কত দূর থেকে তার বড় বড় চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই বিষণ্ণ প্রিয় মুখের কল্পিত ছবি মনে আসতেই চোখে জল এসে গেল চোখ জ্বালা করে।

একটা নিশ্বাস ফেলে সতর্ক ও সচেতন হয়ে উঠল সে। চারিদিকে চেয়ে দেখলে বেশ ছায়া রয়েছে। আকাশের এই দাক্ষিণ্যের সুযোগে হিন্দু স্কুলের দেখাশোনা সেরে ফেলাই ঠিক করল সে। খানিকটা পিছিয়ে হিন্দু স্কুলের মুখে এসে দাঁড়াল মন্মথ। দাঁড়াল ফুটপাথের অন্যদিকে। থমকে দাঁড়াল। এখন মনে মনে ঠিক করে নেওয়া দরকার স্কুলে ঢুকবে কিভাবে, কার সঙ্গে প্রথম দেখা করবে, কি বলবে।

তার ষোল বছরের মনটি স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে স্ফীত হয়ে উঠেছে। সমুদ্র সে দেখে নি, কিন্তু যারা দেখেছে তাদের কাছে শুনেছে এবং পড়ে জেনেছে যে পূর্ণিমার দিনে সমুদ্রের জল আকাশের পূর্ণ চাঁদের টানে ফুলে ওঠে, উথলে ওঠে। আজ তার স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে তার মনটিও তেমনি ফুলে উঠছে, উথলে উঠছে। তার তো আর সেই আগের মতো হিন্দু স্কুলের সকলকে মান্য-করা, কথায়-কথায়-ভয়-পাওয়া মনটি নেই। মনের উপর অকারণ ভয়ের আর অকারণ খাতির করার যে দুটো ভারী পাথর চাপানো থাকত, যার পীড়ন কি স্কুলে কি স্কুলের বাইরে মনে মনে তাকে অহরহ পীড়ন করত আজ সে দুটো আপনা আপনি খসে দুপাশে পড়ে গিয়েছে। তার জন্যে অনেক হালকা, অনেক সহজ লাগছে নিজেকে। তার উপর

সে তো আর সাধারণ কোনো ছাত্র নয়। সে মন্মথনাথ ভট্চাজ, এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে।

স্কুলে ঢুকলে সে কেমনভাবে সমাদৃত হবে তার একটা কাল্পনিক প্রত্যাশা ও ছবি ভেসে উঠল তার মনের ভিতর। মাস্টারমশাইরা সবাই মুখে একমুখ করে হাসি নিয়ে নানান ভালো ভালো কথায় তাকে সমাদর করবেন, হেডমাস্টার মশাই গম্ভীর মুখে আশীর্বাদ করবেন, স্কুলের পড়ুয়া ছাত্ররা অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকবে। আর ছাত্রদের মধ্যে যারা লেখাপড়ায় ভালো তারা চোখ বড় বড় করে তাকে দেখবে, সেই সঙ্গে হিংসে করবে তাকে। সে তো নিজেই তা জানে। কোনো কৃতী ছাত্রকে দেখলে, কিংবা কোনো কৃতী ছাত্রের কথা শুনলে বা গল্প হলে সে তো তাদের প্রতিটি জনকে হিংসে করেছে মনে মনে। তারিফও করেছে বইকি! আর যে-হিংসে করেছে সেটাও তো পরোক্ষ তারিফ।

স্কুলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল সে এপারের ফুটপাথ থেকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের খর রৌদ্র মুছে-যাওয়া ছায়াচ্ছন্ন আকাশের নিচে অতিকায় স্কুল বাড়িটা একটা পাহাড়ের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার তীক্ষ্ণ, সক্রিয় মন উপমা-টাকে বদলে নিল। না, না, পাহাড় কেন হবে, স্কুলটা যেন একটা অতিকায় সাদা পাখির মতো উড়তে উড়তে এসে এই কলকাতায় মাধববাবুর বাজারের পাশে বসেছে। এখানে থাকবে কিছুকাল। কত কাল? তা ধর দুশো, পাঁচশো, কি হাজার দু হাজার বছর! তারপর আবার উড়ে যাবে। অনন্তকালের পট-ভূমিতে দুশো, পাঁচশো, কি দু-পাঁচ হাজার বছর আর কি! কিন্তু তারপর? তার-পর কি হবে? তার মনই আবার উত্তর যুগিয়ে দিল—কি আবার হবে? এই তো একশো বছর আগেই এখানে হয়তো জঙ্গল ছিল; আজ হিন্দু স্কুল হয়েছে; আবার তার জায়গায় অন্য কিছু হবে। হবেই কিছু! ঈশ্বরের পৃথিবী, বিষ্ণুর স্পর্শপূতঃ, বিষ্ণু কর্তৃক ধৃত এই পৃথিবী কি শূন্য থাকবে, না থাকতে পারে? আহ্নিকের সময়ের আসনশুদ্ধির মন্ত্রের 'বিষ্ণুনা ধৃতা' কেমন হঠাৎ মনে এসে ভাবনাটাকে কোন্ পথে ঘুরিয়ে নিয়ে গেল।

ভাবনার সঙ্গে ভাবনার উদ্ভবের ক্ষেত্রটি সম্পর্কে সচেতন হতেই অসংলগ্ন চিন্তার ঘোরটা কেটে গেল মন থেকে। একটু হাসি মনের ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসে খেলা করে গেল ঠোঁটের উপর। সে আবার সচেতন হয়ে উঠল। রাস্তা পার হয়ে স্কুলের গেটের মুখে পৌছল। যে স্কুলকে রাস্তার ওপার থেকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ও নীরব মনে হচ্ছিল, গেটের মুখে দাঁড়াতেই তার অন্য আর এক মূর্তি তার মনের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই চার বছর স্কুলে পড়েও এ চেহারাটা এমন স্পষ্টভাবে

মন কোনোদিন জানতে পারে নি।

মনে হলো স্কুলটা যেন একটা অতিকায় মৌমাছির চাকের মতো। স্কুলের ডিসিপ্লিন অত্যন্ত কড়া। হেড মাস্টারমশাই স্কুলের একপ্রান্তে ঘরে বসে নিজের কাজ করছেন হয়তো। কিন্তু তাঁর জাগ্রত দৃষ্টি সারা স্কুলটার উপর সমস্তক্ষণ ছড়িয়ে আছে। তারই প্রভাবে স্কুলের প্রতিটি শিক্ষক, প্রতিটি ছাত্র অতি সতর্কতার সঙ্গে নিজের নিজের কাজ করে যায়। সমস্ত স্কুলটায় কয়েক শো চাপা গলার আওয়াজ একটা চাপা গুনগুনানির মতো উঠছে ছেদহীনভাবে। কিন্তু ঘরের বাইরে কি বারান্দায় একটিও ছাত্রের দেখা নেই।

সে গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকল। চাপা গুঞ্জনের শব্দটা ছেদহীন হয়ে কানে বাজছে। হঠাৎ তার মনে হলো—আচ্ছা, এই যে শব্দ, ওঙ্কার ধ্বনিও কি এইরকম। একবার একজন সন্ন্যাসী গঙ্গাসাগর যাবার পথে তাদের দেশের বাড়িতে একরাত্রি আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে বাবা অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেদিন গল্প করেছিলেন। সেও বাবার পাশে বসে অনেকক্ষণ তাঁদের কথাবার্তা শুনেছিল। মনে পড়ল সন্ন্যাসী বলেছিলেন কথায় কথায়—হিমালয়ের উপরের দিকে যেখানে মানুষ তো দূরের কথা, পশুপাখিও নাই, এমন কি গাছপালার পরিমাণও যৎসামান্য, যেখানে অখণ্ড অনন্ত নীরবতা আর নিস্তব্ধতা, সেখানে অবিরাম নাকি ওঙ্কার ধ্বনি উঠছে। ধ্বনি উঠছে—হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ! অবশ্য তা কান পেতে, মন পেতে শুনতে হয়। সন্ন্যাসী আর সাধকরা তা শুনতে পান।

হঠাৎ তার চিন্তায় ছেদ পড়লো—আরে মন্মথো বাবা, তুমি এসে গিয়েছো? বহুত আচ্ছা!

সে তাকিয়ে দেখলে তার সামনে স্কুলের দারোয়ান দীর্ঘরাম! দীর্ঘরাম তাকে হাসিমুখে সমাদর করে ডাকছে। অথচ এই দীর্ঘকে তারা কি ভয়ই করতো! এক চাঁই কালো পাথরের মতো প্রকাণ্ড, শক্ত কালো চেহারা, বাজখাঁই গলা, স্কুলের সব ছেলেই তাকে প্রচণ্ড ভয় পেত? বিশেষ করে ছোট ছেলেরা। তার সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে কোনো ছোট ছেলের স্কুলের বাইরে যাবার উপায় ছিল না। আজকের মতো না হলেও তখনও সামনের রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার বেশ চলাচল ছিল। মোটর গাড়ি তখনও আসে নি কলকাতা শহরে। নানান রকমের ঘোড়ায় টানা নানান রকমের ঘোড়ার গাড়ি জোর কদমে, টগবগ করে ছুটতো কলকাতার রাস্তায়। কাজেই বিবেচনাহীন খেলায় মত্ত শিশুদের চাপা পড়ার কি আঘাত পাবার আশঙ্কা তখন তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাই কোনো ছোট ছেলে টিফিনের সময়ও রাস্তায় যেতে পারতো না স্কুলের গেট পার হয়ে। সেদিকে হেডমাস্টার মশায়ের কড়া

হুকুম ছিল। কোনো ছেলে ভুল করে কিংবা ইচ্ছা করে দীর্ঘরামের দৃষ্টি এড়িয়ে স্কুলের গেট পার হয়েছে কি দীর্ঘরাম তার কড়া, বাজখাঁই গলায় চীৎকার করে ওঠে—এই লেড়কা, কাঁহা যাতা ? ভয়ে ছোট্ট ছেলে ছুটে এসে আবার সুট করে স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়ে। ওরই মধ্যে কোনো দুর্বিনীত চপল বালক তার কথা অবহেলা করলে সে ছুটে গিয়ে তাকে বকাবকি করতে করতে হাত ধরে টেনে স্কুলে ঢুকিয়ে দেয়। বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সে কান ধরে টেনে এনেও স্কুলে ঢুকিয়েছে বলে শোনা যায়। বড় ছেলেরা, উঁচু ক্লাসের ছেলেরাও তাকে সমীহ করে চলে। এমন কি বিভূতি যে বিভূতি, তার মতো বেপরোয়া জনও তাকে সমীহ করতো। তাকে বকশিশ দিয়ে প্রসন্ন রাখবার চেষ্টা করতো। তবে বকশিশের লোভে দীর্ঘ কখনও কোনো মারাত্মক বে-আইনী কাজ করে নি কি নিজের কর্তব্যে অবহেলা করে নি। তবে তার দোষের মধ্যে ওই এক দোষ ছিল, তার বড় বকশিশের লোভ। বকশিশ না পেলে সে খুশী হতো না। কাজেই সে দিক দিয়ে মন্মথকে দীর্ঘরামের খুব একটা খাতির করবার কোনো কারণ ঘটে নি। কিন্তু অন্যদিকে তেমনি দু একটি আশ্চর্য গুণ ছিল দীর্ঘরামের। সে যাকে বলে একেবারে পুরোপুরি 'মাস্টারস্ ম্যান' প্রভুর বশংবদ ব্যক্তি। হেডমাস্টার মশায় যাকে পছন্দ করেন, সমাদর করেন, সম্মান করেন সে তাকে ঠিক তেমনি পছন্দ, সমাদর ও সম্মান করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সে বিশেষ খাতির ও সমাদর করে ইস্কুলের ভালো ছেলেদের। তাদের আদর করে কি সস্নেহ ধমক দিয়ে বলে—দেখ বাবা, হামার এই হাত দিয়ে বহুত লেড়কা ইখান থেকে বাহার হয়ে জজ, ম্যাজিস্টর, উকীল, ব্যালিস্টার ডকটার, পেপেচার হইয়ে গেল। এই দীরঘ্‌রাম না দেখলি সব ইধার উধার হইয়ে যেত। তাই স্বাভাবিক ভাবেই মন্মথর জন্যেও তার সমাদরের কমতি ছিল না। আজ তার সেই সম্মান সমাদরের পূর্ণ প্রতিদান দিয়েছে মন্মথ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হয়ে। আজ সে তাকে বিশেষ সমাদর করবে বই কি ! সে সমাদর করে বললে—সব কোই তুমকো দেখনে কো লিয়ে পাগল হো গয়া ! আও বাবা ! তারপরই কি ভেবে বললে—আচ্ছা জেরা ঠহরো।

হেসে মন্মথ বললে—কেন, এখানে দাঁড়াব কেন ?

তার মস্ত কাঁচা পাকা চুলওয়ালা মাথাটা নেড়ে দীর্ঘরাম বললে—আরে বাবা, এতনা রোজ দীরঘজীর বাত শুনেছ, আজ ভী তো শুনো ! ঠহরো তো রমেশ মাস্টারজীকো বোলায় পহেলে।

রমেশ স্যার ? আশ্চর্য হয়ে মন্মথ বললে—কেন রমেশ স্যারকে ডাকবে কেন আগে ?

—আরে বাবা, উ তো তুমহারা লিয়ে আনন্দসে পাগল হো গয়া! হমকো রোজ পুছতা, দীরঘ, তুম জান্‌তা কিয়া কব মন্‌মথ কলকাত্তা আয়েগা?
মন্মথ হাসল। সামান্য হাসি। এ তো জানা কথাই! এ সবই তো তার পাওনা সে হেসে বললে—আচ্ছা আমি দাঁড়াই, তুমি রমেশ স্যারকে খবর দাও।
যেতে যেতে দীর্ঘ বলে গেল—ইস্কুলসে সব কোই বহুত খুস হুয়া। বাকী সবসে খুস হুয়া বড়া সাব আউর রমেশ মাস্টারজী।
দীর্ঘ তার কালো গাছের গুঁড়ির মতো পা জলদি চালিয়ে চলে গেল স্কুলের ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের ভিতরের গুঞ্জনটা আবার একটানা মন্ত্রধ্বনির মতো তার কানে এবং মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।
ওদিক তখন দীর্ঘরামের পিছন পিছন দ্রুত লঘু পদক্ষেপে ছুটে আসছেন রমেশ স্যার। গেটের মুখ থেকেই মন্মথ দেখতে পাচ্ছে তাঁর ছুঁচালো দাড়ি-গোঁফ সমন্বিত মুখখানি খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দাড়ি গোঁফ চোখ মুখ ছাপিয়ে হাসি উপচে পড়ছে যেন। তিনি ছুটে এসে মন্মথকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন—ওয়েল ডান মাই বয়। ওয়েল ডান। ইংরেজী যদি আর খানিকটা ভালো করতে পারতিস তবে একটা ভীষণ ব্যাপার হতো! তা যাক, যা করেছিস, তাই বা কম কি!
আজ আবেগের আতিশয্যে তাঁর অভ্যাস করা আধুনিক-কালের অভ্যাস ও ভাষার আড়াল থেকে তাঁর সনাতন বাঙালী চেহারাটা বেরিয়ে এলো। সেই কাটা কাটা, খোঁচায় তীক্ষ্ণ, রসিকতায় সরস কথার বদলে সহজ বাংলা বেরিয়ে এলো; চিরকালের অভ্যস্ত 'তুমি'র বদলে 'তুই' বেরিয়ে এলো আরও সহজে।
মন্মথ তাঁর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।
তিনি তার মাথায় হাত দিয়েই থাকলেন, হাসিমুখে তার প্রণাম গ্রহণ করে বললেন—কর, আজ তুই নমস্কারের বদলে প্রণামই কর। প্রাণ ভরে তোর প্রণাম নি!
তারপর বললেন—আয় তোকে সব ক্লাসে ক্লাসে নিয়ে যাই।
মন্মথ প্রস্তাবটা শুনেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললে—আমাকে ক্লাসে ক্লাসে নিয়ে যাবেন স্যার? সে কেমন দেখাবে যেন! তার চেয়ে আগে গিয়ে বরং হেডমাস্টার মশাইকে প্রণাম করি।
দীর্ঘরাম ঘাড় নেড়ে তাকে সমর্থন করে বললে—সোহি ঠিক হোগা! ওহি চলিয়ে পহেলে!

সহৃদয় ও শিশু-হৃদয় রমেশ স্যার সঙ্গে সঙ্গে বললেন—ঠিক বলেছিস। হেডমাস্টার মশায়ের কাছেই আগে যাওয়া ভালো, আর সেটা উচিতও। আমারই ভুল হচ্ছিল বুঝলি ভটচাজ!

হেডমাস্টার মশায়ের ঘরের পর্দা ঠেলে ধরলে কেতাদুরস্ত দীর্ঘরাম। তারই অবকাশে প্রথমে রমেশ স্যার, তাঁর পিছনে পিছনে ঢুকল মন্মথ। সেই চিরাচরিত পরিচ্ছন্ন চোগা-চাপকান-পরা হেডমাস্টার মশায় নিবিষ্ট মনে কিছু লেখার কাজ করছিলেন। রমেশ স্যার আগে এই স্কুলেই হেডমাস্টার মশায়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁর প্রতি হেডমাস্টার মশায়ের স্নেহ সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ। তাই সমস্ত ভয়, নিয়মানুবর্তিতা ও অনুশাসন সত্ত্বেও তিনি একান্ত সহজে গলা তুলে বললেন—স্যার, কাকে এনেছি দেখুন।

সঙ্গে সঙ্গে রুষ্ট দৃষ্টিতে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন হেডমাস্টার মশাই। পরমুহূর্তেই দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকালেন রমেশ স্যারের আবাহন করে আনা মানুষটির দিকে। মন্মথ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টির চেহারা বদলে গেল। দৃষ্টি অতি কোমল, সস্নেহ ও হাস্যময় হয়ে উঠল। তিনি সাগ্রহে অথচ সুহজ গাম্ভীর্যের সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দক্ষিণ হাতখানি প্রসারিত করে বললেন—মন্মথ! এস, এস! কবে কলকাতায় এসেছ?

মন্মথ দ্রুতপদে মাথাটি নামিয়ে একান্ত আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গিয়ে তাঁর শু জুতো-ঢাকা দুই পা ছুঁয়ে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলে। প্রণাম সেরে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল।

হেডমাস্টার মশাই তাঁর মস্ত টেবিলের সামনে চেয়ার দেখিয়ে বললেন—বস। তুমিও বস রমেশ।

বসতে বসতে মন্মথ বললে—কাল এসেছি স্যার। সে বসবার আগে দেখে নিলে হেডমাস্টার মশায় ও রমেশ স্যার বসেছেন কিনা। রমেশ স্যারের বসা হলে সে বসল চেয়ারে। সে লক্ষ্য করলে হেডমাস্টার মশায় তার এই ছোট্ট হিসাবটুকু উজ্জ্বল দৃষ্টিতে দেখে নিলেন। হেডমাস্টার মশাইয়ের এই দেখাটুকু তারও ভালো লাগল।

শান্ত গম্ভীর প্রসন্ন কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন—কলকাতায় এসে সকলের সঙ্গে দেখা করেছ? 'সকল' বলতে হেডমাস্টার মশাই কাকে কাকে বোঝালেন সেটাও সম্পূর্ণ বুঝতে পারলে মন্মথ। তার কলকাতা বাসের ইতিহাসের সবটাই তো জানেন তিনি! সে তো কম লোকের কাছে উপকার পায় নি! কাজেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সকলেরই কাছে যাওয়ার প্রয়োজন তো নিশ্চয়ই আছে! তাই সে

সসম্ভ্রমে বললে—এই তো কাল বিকেলের দিকে এসেছি। আজ গিয়েছিলাম প্রথমে কাকার বাড়ি, তারপর গোপীনাথ পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়ি।
তিনি একটু হাসলেন, বললেন—তুমি লেখাপড়ায় বুদ্ধিমান তার প্রমাণ তুমি দিয়েছ। কিন্তু সাংসারিক ব্যবহারেও পূর্ণ শীলতার পরিচয় দিয়েছ তুমি। তোমার ভুল হয় নি। জান তো রামায়ণে আছে—রাম বনবাস থেকে ফিরে এসে অযোধ্যার প্রাসাদে ঢুকে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করেছিলেন বিমাতা কৈকেয়ীর সঙ্গে। সাক্ষাৎ করার পর হৃষ্ট কৈকেয়ী বলেছিলেন—রাম, তুমি প্রত্যাবর্তন করে প্রথম যদি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করতে তা হলে আমি বিষ গ্রহণে প্রাণ পরিত্যাগ করতাম। তা তুমিও এক্ষেত্রে সেই শীলতারই পরিচয় দিয়েছ। তোমার খুড়ো মশাই আর খুড়ীমা ঠাকরুন তোমার সঙ্গে যে ব্যবহারই করে থাকুন, তুমি যে সঙ্গত ব্যবহার করেছ তাঁদের সঙ্গে এতে আমি খুব তৃপ্তি পেলাম। অবশ্য তোমার খুড়ো মশায় আর খুড়ীমা এটার অর্থ পুরো বুঝতে পারবেন কিনা জানি না। তা যাই হোক, সর্বপ্রথম সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এসো! সত্যদের বাড়িও যেও। সত্যও খুব ভালো ফল করেছে। প্রথম দশ জনের মধ্যেই আছে তার নাম। সত্যর বাবা-মাকেও প্রণাম করে এসো।
এই বিশেষ নির্দেশটির অর্থ বুঝতে ভুল হলো না মন্মথর মতো বুদ্ধিমান ছেলের। তার ব্রাহ্মদের সঙ্গে, সত্যদের বাড়ির মারফত, যোগাযোগের কথা নিয়ে তার জীবনে অনেক যন্ত্রণা, অনেক সমস্যা নেমে এসেছিল। কাজেই সত্যদের বাড়ি গিয়ে আবার নতুন সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কায় যদি মন্মথ সেখানে যাওয়াটা এড়িয়ে যায় সেই জন্যই এই বিশেষ নির্দেশ। সে একটু হেসে বললে—আজ্ঞে স্যার, যাব। আর সত্যর সঙ্গে দেখা করার জন্যে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি চলে যাই।
কথাগুলি বলে তার মনে হলো যেন খানিকটা প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করা হয়ে গেল। কিন্তু তার এই প্রগল্‌ভতায় হেডমাস্টার মশায়ও যেন আরও কোমল, আরও তরল হয়ে এলেন। বেশ একটু হেসে তিনি বললেন—মন্মথর প্রথম দিন হিন্দু ইস্কুলে আসা মনে আছে রমেশ?
রমেশ স্যার ও মন্মথ দুজনেই তাকিয়ে থাকল তাঁর মুখের দিকে। দুজনের কেউই ঠিক ধরতে পারছে না উনি কি বলতে চান।
হেডমাস্টার মশাই বললেন—তোমার সেটা মনে থাকার কথা নয়। তুমি তো তখন আমার ঘরে ছিলে না! আমার স্পষ্ট মনে আছে। ওর কাকা ওকে নিয়ে এলেন আমার কাছে। তার আগে অবশ্য গোপীনাথ পণ্ডিত মশাই ওর কথা

আমাকে বলে রেখেছিলেন। আমি ওর পরীক্ষা করেছিলাম এই ঘরে, ওই টেবিলে বসে ও পরীক্ষা দিয়েছিল!

মন্মথর চোখ হঠাৎ জলে ঝাপসা হয়ে এলো। অকারণেই। অকারণেই ছাড়া আর কি বলা যাবে? আসল কারণটা কে বলবে? হতে পারে যে, হিন্দু স্কুলের হেড-মাস্টার, মন্মথর কাছে এখনও পর্যন্ত প্রায় প্রথম কি দ্বিতীয়তম মান্যজন, তাঁর এই অতি সস্নেহ সম্ভাষণ ও সমাদর তার হৃদয়ের অন্তর্লোকবাসী আসল মানুষ-টিকে দ্রব করে দিয়েছিল। অথবা এও হতে পারে যে, এক শতাব্দী পূর্বের এক শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ-বংশের পরিশীলিত-চিত্ত সন্তান, যার চরিত্রে এই বিশ্বসংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে একটি প্রচ্ছন্ন বোধ রক্তধারার মধ্যে অবিরাম ক্রিয়া করে, এই সরস কথাগুলির ক্রিয়ায় তার রক্তধারার মধ্যে সেই বোধ হয়তো প্রকট হয়ে উঠে তাকে একবার অনুভব করালে এই দ্রুত-চলমান অস্থির জীবনের কথা। হেডমাস্টার মশাই বলার সঙ্গে সঙ্গে তার সেই প্রথম দিন এখানে আসার কথা আগেই মনে পড়েছিল। মনে হলো, সেই প্রথম দিন আসার সময় একবার এই ঘরে ওই কোণের বড় কনফারেন্স টেবিলের সামনে বসে পরীক্ষা দিয়েছিল। তারপর এই চার বছরে এ ঘরে অনেক অনেকবার এসেছে, আসতে হয়েছে; কিন্তু কখনও এঘরে আর চেয়ারে বসবার সুযোগ কি আমন্ত্রণ আসে নি। আজ চার বছর পরে আবার এসেছে এই স্কুল ছেড়ে চিরকালের জন্য যাবার মুহূর্তে। তার মনটি বোধ-হয় এই চিরকালের জন্য ছেড়ে যাবার মমতায় আকুল হয়ে উঠল। হয়তো স্কুলের গেট দিয়ে এখানে ঢুকবার আগে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তার বুকের ভিতরে এই বোধই আচ্ছন্নভাবে পুঞ্জিত হয়ে উঠছিল; এতক্ষণে হেডমাস্টার মশাইয়ের সস্নেহ কথার শীতল স্পর্শে সেই পুঞ্জিত অন্তর্বাষ্প চোখে জল হয়ে ধরা দিলে।

সে শুনতে পাচ্ছে, হেডমাস্টার মশাই বলছেন একান্ত স্বাদু স্মৃতিস্মরণের মতো—ওই টেবিলে ওকে অঙ্ক, বাংলা আর ইংরেজী পরীক্ষা করেছিলাম। তোমায় কি ইংরেজী অনুবাদ করতে দিয়েছিলাম, মনে আছে মন্মথ?

সলজ্জভাবে হেসে মন্মথ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের লেখা থেকে।

হেডমাস্টার মশাই হেসে বললেন—মনে আছে দেখছি। তা তোমার স্মৃতি তো ভালই!

তারপর রমেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—তা রমেশ, আমি সেই দিনই বুঝতে পেরেছিলাম, ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান। যা থেকে অনুমান করেছিলাম সেটি খুব সামান্য ঘটনা। আমি ওকে ডিকটেশন দিচ্ছি, লেখাটা চিনতে পেরে ও খুব

অস্পষ্টভাবে বলে উঠল—বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতি! যেন নিজেকেই শোনালে কথাটা। অথচ আসলে আমাকে শোনানোই ওর উদ্দেশ্য ছিল। সজ্ঞান ভাবে না থাকলেও ছিল। আর ওর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধও হয়েছিল। আমি শুনতে পেয়েছিলাম। ও যে সুন্দর ভঙ্গিতে ওর সামান্য জ্ঞান ও বিদ্যা সেদিন প্রচার করতে চেয়েছিল তাতে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারি নি।

রমেশ স্যার ও মন্মথ দুজনেই আশ্চর্য হয়ে হেডমাস্টার মশায়ের মুখের দিকে তাকাল। মন্মথ জানত যে হেডমাস্টার মশাই তার স্কুলে ঢোকার প্রথম দিন থেকেই তার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। কিন্তু সে দৃষ্টি কতখানি তীক্ষ্ণ, তার অন্তরালে কতখানি মমতা ছিল তার পরিমাণ সে কোনোদিন অনুমানও করতে পারে নি। রমেশ স্যারও মন্মথ সম্পর্কে হেডমাস্টার মশাইয়ের এই স্নেহ নতুন করে অনুভব করলেন। এবং যে কথাটা এতক্ষণ তাঁর মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, প্রকাশের পথ পাচ্ছিল না, সে কথার আত্মপ্রকাশের জন্য তিনি যেন অতি প্রশস্ত এক দরজা উন্মুক্ত দেখতে পেলেন। তিনি সাগ্রহে বললেন—আমি একটা কথা বলছিলাম স্যার।

সস্নেহে হেডমাস্টার মশাই বললেন—বল।

রমেশ স্যার বললেন—মন্মথকে স্যার, একবার সব ক্লাসে ক্লাসে নিয়ে গিয়ে দেখালে হতো না?

বিস্মিত হয়ে হেডমাস্টার মশাই প্রশ্ন করলেন—কেন?

তারপরই তাঁর প্রস্তাবের অর্থ অনুধাবন করে হা হা করে হেসে উঠলেন। গম্ভীর সরস দীর্ঘকায় মানুষটির ভরাট কণ্ঠের ও অকপট প্রাণের হা হা হাসিতে ঘরখানা ভরে উঠল, গোটা ঘরখানাই হাসতে লাগল যেন। হেডমাস্টার মশায়ের এমন হাসি রমেশ স্যার শুনে থাকতে পারেন, মন্মথ শোনে নি। হাসতে হাসতে হেড-মাস্টার মশাই বললেন—মন্মথ এণ্ট্রান্সে ফার্স্ট হয়েছে সেইজন্য ওকে ক্লাসে ক্লাসে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাও? বলে আবার একদফা হাসলেন হা হা করে। মন্মথর মনে হলো যেন প্রস্তাবটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন তিনি। আশ্চর্য, সে একটু আহত হলো মনে মনে।

তারপর হাসি থামিয়ে হেডমাস্টার মশাই বললেন—তোমাকে এই জন্যেই ভাল-বাসি রমেশ। তুমি এখনও তোমার ওই কাঁচা-পাকা দেহের মধ্যে কচি মনটাকে ধরে রাখতে পেরেছ!

তারপরই সকৌতুকভাবে তিনি এক বিচিত্র প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা রমেশ, তোমার কত বয়েস হলো?

বিস্মিত রমেশ স্যার প্রশ্নের অর্থ ধরতে না পেরে বললেন—এই চুয়াল্লিশ চলছে স্যার !

—পাকা আম পছন্দ কর তো ? খেতে ভাল লাগে ?

তাঁর চিন্তার গতিপথ ধরতে না পেরেও রমেশ স্যার বললেন—হ্যাঁ স্যার। খুবই ভালো লাগে ! ল্যাংড়া তো অতি উৎকৃষ্ট !

হেডমাস্টার মশাইও হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন—কিন্তু এখনও কাঁচা আম শুধু মুখে খেতে পার ?

—না স্যার। আর কি কাঁচা আম খাবার বয়স আছে ? দাঁত জিভ কোনোটাতেই সহ্য হবে না।

হেডমাস্টার মশাই মুচকে মুচকে হাসছেন। মন্মথ কিন্তু তাঁর চিন্তার গতিপথটি এতক্ষণে ধরতে পেরেছে। তার মুখেও হাসি ফুটে উঠেছে।

হেডমাস্টার মশাই বললেন—কিন্তু আমের মুকুল ? খেতে পার ? মন্মথও এখনও মুকুল আছে রমেশ। ও পাকুক তখন হাজার মানুষ আপনিই ওর আস্বাদ নেবার জন্যে ওর কাছে আসবে। আজ নয়। তার অনেক দেরি আছে !

তারপর গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন—তা ছাড়া রমেশ, সংসারে দর্শনীয় কে আছে বল তো ! রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য, প্রতিষ্ঠা, এমন কি জ্ঞান—এ সবই দেখে আমরা মুগ্ধ হই, বিস্মিত হই। কিন্তু তার কোনোটাই অন্তরকে স্পর্শ করে না। সে দর্শনে মানুষের সাময়িক কৌতূহল নিবৃত্ত হয় এই পর্যন্ত, তাতে স্থায়ী কোনো লাভ হয় না। এই বিরাট প্রাচীন দেশের মানুষদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ কোনো দিন ? ভালো করে যদি দেখে থাক দেখতে পাবে—এ দেশের মানুষ দলে দলে ছুটে গিয়েছে কখনও সখনও। তারা রূপসীর কাছে যায় নি, রাজার কাছে যায় নি, জ্ঞানীর কাছে যায় নি, খ্যাতিমানের কাছে যায় নি, শক্তিমানের কাছে যায় নি। তারা এমন সব মানুষের কাছে গিয়েছে যারা গাছের তলায় বসে থাকেন, অঙ্গে যাদের সামান্যতম বস্ত্র। এঁরা কেউ ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন বলে কথিত। কেউ ঈশ্বরের স্পর্শ ও প্রসাদ লাভ করেছেন। মানুষ যখন এঁদের কাছে হাত জোড় করে গিয়েছে তখন অন্তরের যা শ্রেষ্ঠ সামগ্রী তাই তাঁদের চরণপ্রান্তে নিবেদন করবার জন্যে ছুটে গিয়েছে অন্তরের গভীর আকুতি নিয়ে। ফিরবার সময় গভীর পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে এসেছে, যা জীবনের অন্যত্র মেলে নি, পায় নি তারা। আরও একটা কথা রমেশ, মানুষের কাছে গিয়ে কেন বলতে হবে, আমি এসেছি, আমাকে দেখ ! তার চেয়ে মানুষ নিজের অন্তরের চাহিদায় তোমার কাছে ছুটে আসুক।

তাঁর গম্ভীর আবেগপূর্ণ কথাগুলি নিস্তব্ধ মস্ত ঘরখানার মধ্যে যেন গমগম করে ফিরতে লাগল। মন্মথর অন্তত তাই মনে হলো। শুনতে শুনতে তার মনটি কেমন নম্র, স্তব্ধ এবং একান্ত স্থির হয়ে গেল।

এইবার হেডমাস্টার মশাই হেসে বললেন—আমার কথায় তোমার মনে ছোঁয়া লাগল কিনা জানি না, বোধহয় লাগে নি। তুমি তো ঈশ্বরকে মৃত বলে নিজের এবং বস্তুবাদের জয় ঘোষণা করছ, কাজেই তোমার অন্তর স্পর্শ করা কঠিন। কিন্তু আজ আবার মন্মথর প্রথম দিনের আর একটা কথা মনে পড়ল।

তারপর একটু থেমে চেয়ার ছেড়ে উঠে তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে মন্মথর গায়ে হাত দিয়ে বললেন—আমি প্রথম দিনই ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি লেখা-পড়া শিখে কি করবে? দাঁড়াও ঠিক কি কথাগুলো হয়েছিল একটু মনে করে নি।

একটু চিন্তা করে বললেন—মনে পড়েছে, শোনো! জিজ্ঞাসা করলাম—লেখাপড়া শিখে কি হবে তুমি?

তা প্রশ্ন করলে—কি হব?…বোধহয় নিজের মনটা খুঁজতে লাগল।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁ, কি হবে? কি করবে?

মন্মথ বললে—লেখাপড়া শিখে বাবার কাছে বাড়ি চলে যাব। বাবা যা করেন তাই করবো।

বুঝলে আমার মনে হলো অদ্ভুত উত্তর, বিচিত্র বাসনা। তাই ওকে বাজিয়ে নেবার জন্যে আবার প্রশ্ন করলাম—তাই কি? ঠাকুর সেবা? শাস্ত্র পড়া? যজমানের কাজ করা?

আমার প্রশ্নের মধ্যেই ওর খুঁজে না-পাওয়া উত্তর যেন খুঁজে পেলে।

বার বার গভীর তৃপ্তির সঙ্গে বললে ঘাড় নেড়ে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ!

জিজ্ঞাসা করলাম—ভালো লাগবে?

তা ও অবলীলাক্রমে ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ।

তা জান রমেশ, ওর উত্তর শুনে ওর মনের বিচিত্র আকৃতিকে যেন সেদিনই খানিকটা বুঝতে পেরেছিলাম। খুশী হয়েই সেদিন বলেছিলাম—বাঃ! তা হলে খুব খুশী হবো!

একটু চুপ করে থেকে হেডমাস্টার মশাই বললেন—কথাগুলো পুনরুক্তি করার আজ কারণ আছে। আমি অকারণেই কথাগুলো আবার বললাম না। পুরানো কথাগুলো মনে করিয়ে দিয়ে আবার আজ ওকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে—আজও ও সেই উত্তর দেবে কি না!

আশ্চর্য, সমস্ত আলোচনাটির মধ্যে যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মতো হেডমাস্টার মশাই তার সামনে ফেলে দিলেন তার কোনো উত্তর দিলে না, দিতে পারলে না মন্মথ। এ প্রশ্নের যে উত্তর সেদিন এক কথায় একান্ত অকুণ্ঠচিত্তে অসংশয়ে দিয়েছিল, দিতে পেরেছিল সে উত্তর হারিয়ে গেছে। মন্মথ কথা না বলে মাথা নিচু করে বসে রইল। হেডমাস্টার মশাই আর রমেশ স্যার দুজনেই হয়তো একে মন্মথর স্বাভাবিক অপ্রগল্‌ভ বিনয় বলে গ্রহণ করলেন। কিন্তু মন্মথ জানে ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে সে অকুণ্ঠ উত্তর মন থেকে হারিয়ে গেছে, সে মনও বুঝি হারিয়ে গেছে। সে স্পষ্ট অনুভব করছে লেখাপড়া শেষ করে বাবার কাছে ফিরে যাবার পথ তার চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। হুগলী জেলার গোবিন্দপুর নামক যে পল্লীগ্রাম থেকে সেদিন সে কলকাতায় এসেছিল, সেখানে ফিরে যাবার পথরেখা চিরদিনের জন্য তার চোখের সামনে ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সেখানে আর ফেরা চলবে না। গ্রামের কাছেও না, বাবার কাছেও না, গৃহ-দেবতার কাছেও না। পিছন ফিরে যাবার কোনো উপায় নাই, পথও নাই। এখন সামনে চলতে হবে ; সে পথ গোবিন্দপুর থেকে কলকাতায় আসার পথের অনুবৃত্তি নয়। সে ভিন্ন পথ, সে পথের দু পাশে ভিন্ন শোভা, পথের সঙ্গী ভিন্ন মানুষ।

নিজের ভাবনার নিবিষ্টতার মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনি ঝরে পড়ল তার বুক থেকে। মনে হলো যেন বাবার শীর্ণ সাধাসিধে মুখখানি ধীরে ধীরে তার পিছনে পড়ে যাচ্ছে, মুখখানি কেমন বিষণ্ণ হয়ে ম্লান হয়ে গেল, তারপর যেন মুছে গেল চোখের সামনে থেকে। বুকের ভিতরটা তার মোচড় দিয়ে উঠল।

প্রায় নিস্তব্ধ শান্ত কক্ষের মধ্যে তার নিবিষ্টতা ভেঙে গেল হেডমাস্টার মশাইয়ের ডাকে। তিনি হাঁক দিলেন—দীর্ঘরাম!

তিনি ততক্ষণে ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে একটা কাগজে খসখস করে কি লিখছেন।

দীর্ঘরাম এসে দাঁড়াল। কাগজখানা তার হাতে দিয়ে বললেন—সব মাস্টার মশাইদের টিফিনের আগে দেখিয়ে আন। আর টিফিনের পর স্কুল বসার ঘণ্টা আমি বললে দেবে, বুঝলে!

হেডমাস্টার মশাইয়ের দেওয়া কাগজ নিয়ে দীর্ঘরাম বেরিয়ে গেল সেনাপতির আদেশপত্র পাওয়া সেনানীর মতো। হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে সংযুক্ত তার প্রতিটি ব্যবহারে এমন একটি সশ্রদ্ধ গাম্ভীর্য প্রকাশ পায়, যা মনে হাস্যোদ্রেক করে, কিন্তু হাসা যায় না ; বরং তাকে এক ধরনের সম্ভ্রম করতে হয়।

আগের কথার জের টেনে হেডমাস্টার মশাই বললেন—ওর উত্তর জানতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু ওর হয়ে আমাকে উত্তর দিতে বললে আমিই কি আজ উত্তর দিতে পারি ?

একটু থেমে আবার বললেন—আমরা এই চার বছরে ওকে যা শিখিয়েছি তাতে তার আগের একান্ত সহজ উত্তর আর ও সহজে দিতে পারবে না।

কথাটা শুনে রমেশ স্থার নড়েচড়ে বসলেন। সমস্ত আলোচনাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা গম্ভীর বিষণ্ণতা ছিল যার প্রভাবে সকলেই নিশ্চুপ হয়ে ছিলেন। হেডমাস্টার মশায়ের কথা থামলেই ঘরের ভিতর একটা নীরবতা থমথম করছিল।

রমেশ স্থারকে নড়াচড়া করতে দেখে হেডমাস্টার মশাই সকৌতুকে একটু হাসলেন। সকৌতুক হাসি হলেও তার মধ্যে যেন বিষণ্ণতার আভাস ছিল না। তিনি বললেন—তোমার চঞ্চল হবার দরকার নেই রমেশ। কারণ আমি তোমার কথাই, মানে নূতন বস্তুবাদের কথাই বলছি। শিক্ষার আর জ্ঞানের যে প্রশস্ত রাজপথ আজ আমাদের চোখের সামনে খোলা, যা দিন দিন প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততম হচ্ছে সেই পথেই আমাদের সকলকে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক চলতে হবে। না চলে উপায় নেই। আর আপত্তি করলে পথের পাশে পড়ে থাকতে হবে। পড়ে থাকার চেয়ে বরং চলাই ভালো, মন্দের ভালো। অতএব—

বলে সমস্ত বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলে আবার অনেকখানি হেসে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—অতএব রমেশ, আমি বা আমরা চাই বা না চাই, তোমারই জয় জয়কার। তুমি যে বস্তুবাদের কালকে প্রত্যুদ্গমন করে আনবার জন্যে প্রতীক্ষা করছ সে আসবেই। তাকে কেউ আটকাতে পারবে না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক তুমি।

বলে যেন আলোচনাটা শেষ করে দিলেন। বললেন—চল, আমাদের নতুন বাড়ি হচ্ছে মন্মথকে দেখিয়ে আনি। শিক্ষার বিশেষ করে বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য কত আয়োজন আমরা করছি তা দেখুক মন্মথ, মনে মনে বুঝুক কি ঘটতে যাচ্ছে !

তিনি ঘর থেকে বের হলেন। তাঁর পিছনে রমেশ স্থার, সব পিছনে মন্মথ। বলতে বলতে চললেন—আজকের মন্মথর সঙ্গে আমার এই সব কথা শুনে তোমার বোধহয় অবাক্ লাগছে। মনে হচ্ছে, একটি বালকের সামনে আমি এ সব কোন্ কথা বললাম ! কিন্তু কথা কি জান রমেশ, কথাগুলো অনেক দিন থেকে আমার মনে জমে ছিল। আজ মন্মথকে উপলক্ষ্য করে বেরিয়ে এলো।

ব্যস, তিনি একেবারে নীরব হয়ে গেলেন। হেডমাস্টারের পোশাকটা যেন পরি-

পূর্ণভাবে নিজের মনের উপর চাপিয়ে নিলেন। মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, পদক্ষেপ দীর্ঘতর হলো, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। তিনি ক্লাসরুমের পাশে পাশে যে চওড়া বারান্দা সেই বারান্দা ধরে এঁকে-বেঁকে স্কুলের মাঠ পার হয়ে অপর প্রান্তে চলে গেলেন। কোন্ কোন্ জায়গায় নতুন ইমারত কেমনতরো হবে তাই বোঝাতে লাগলেন মন্মথকে। ঠিক এই সময়েই স্কুলের টিফিনের ঘণ্টা ঢং ঢং করে দ্রুত ছন্দে বেজে উঠল।

মন্মথ যেন এতক্ষণ কিছুই শোনে নি। তার বুকের ভিতরে একটা অসহায় বেদনা যেন পাক খেয়ে ফিরছিল। মন তার চোখের সামনের ইমারতের উপর ছিল না। মার-খাওয়া ছেলের মতো, দুই চোখে জলের ধারা নিয়ে, আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে, ছুটতে ছুটতে তার মন তখন হুগলী জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে ঢুকতেই গোবিন্দসাগর নামক পুকুরটির গায়ে গাছে গাছে ছায়াচ্ছন্ন সরু পায়ে-চলা নির্জন পথ ধরে ধরে, তাদের হাঁস-চরা, সজনের ডালে জল-ছোঁয়া ডোবার পাশ দিয়ে আকুল হয়ে ছুটছিল তার নিজের খড়ো বাড়ির প্রাঙ্গণকে উদ্দেশ করে, যেখানে প্রৌঢ় পিতা স্বভাব-বিষণ্ণ শীর্ণ মুখে স্নিগ্ধ প্রসন্নতা, শিবের ললাটের চিরস্থির চন্দ্র-কলার মতো ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন যুগল-বিগ্রহ আর লক্ষ্মী-জনার্দনের ঘরের দিকে মুখ করে। হেডমাস্টার মশাইয়ের কথায় যে আচ্ছন্নতা কাটে নি, টিফিনের ঘণ্টার আওয়াজে তা কেটে গেল।

সে চমকে উঠে চাইতে লাগল চারি দিকে। সে আশ্চর্য হয়ে দেখলে পিছনে স্কুলের চওড়া বারান্দা ধরে টিফিনের সময় বেরিয়ে-আসা ছাত্ররা একজনও বোধহয় বাইরে যায় নি। না গিয়ে বিস্মিত হয়ে দূর থেকে তাদের তিন জনের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখছে। মন্মথ বুঝতে পারলে, আজ তারা অন্য দুজনকে দেখছে না দেখছে শুধু তাকেই। তাকে তারা এতদিন হিন্দু স্কুলের ছাত্র হিসাবে একান্ত সহজভাবে প্রতিদিন দেখেছে, আজ দেখছে সবিস্ময়ে। দেখছে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া মন্মথকে।

মন্মথ আপন মনে একটু হাসল। সে হেডমাস্টার মশায়ের কৌশলটি বুঝতে পারলে।

যদিও তাকে ক্লাসে ক্লাসে নিয়ে যাবার প্রস্তাবে হেডমাস্টার মশায় রমেশ স্যারকে মৃদু তিরস্কার করেছিলেন, তবু তাঁর অনুরোধ রেখেছেন তিনি। পুরোপুরি রক্ষা করেছেন। রমেশ স্যারও বুঝেছেন ব্যাপারটা। তিনি একবার তাকালেন মন্মথর দিকে। চোখের ইঙ্গিতে যেন বুঝাতে চাইলেন—ব্যাপারটা দেখ। কিন্তু যিনি ব্যাপারটা সুকৌশলে কাউকে, এমন কি মন্মথ ও রমেশ স্যারকেও বুঝতে না

দিতে চেয়েছেন, তিনি যেন এ বিষয়ে উদাসীন, যেন ব্যাপারটা তাঁর নজরেই আসে নি। অকস্মাৎ কথার মাঝখানে ব্যাপারটা চোখে পড়তেই বললেন—এ কি, ছেলেরা সব টিফিন করতে না গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! মন্মথকে দেখছে বুঝি? না, এ ঠিক নয়! চল মন্মথ, আমরা ফিরে যাই।

বলতে বলতে তিনি ফিরলেন। বললেন—মাস্টার মশাইদের সব একবার আমার ঘরে টিফিনের সময় আসার জন্য সার্কুলার দিয়েছি। মাস্টার মশাইরা সব অপেক্ষা করে আছেন তোমার জন্যে। চল তাড়াতাড়ি। গুরু শিষ্যের জন্যে, ছাত্রের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবেন, এটা ঠিক নয়। ছাত্রেরই শিক্ষকের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবার কথা।

তিনি আবার আপনার ঘরে ঢুকলেন মন্মথ ও রমেশ স্যারকে নিয়ে। মাস্টার মশাইরা সবাই ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে জমায়েত হয়েছিলেন। হেডমাস্টার মশাই ঢুকতেই সবাই শশব্যস্ত হয়ে তাকালেন তাঁর মুখের দিকে। হেডমাস্টার মশাই বললেন—ঘরে তো বেশী চেয়ার নেই, তাই আপনাদের বসতে বলতে পারছি না। আর আয়োজন খুব সামান্যই। মন্মথ আপনাদের প্রণাম করবে বলে সবাইকে একসঙ্গে ডেকেছি। আপনাদের না ডাকলে, ওর আপনাদের এক একজনকে খুঁজে খুঁজে প্রণাম করতে অসুবিধা হতো। তাই আপনাদের ডেকেছি। ও আপনাদের প্রণাম করুক, আপনারা ওকে আশীর্বাদ করুন। ওর প্রণাম নেবার জন্যে আপনাদের ডেকে এনে যদি আমার ত্রুটি হয়ে থাকে, তা ওর প্রণামে খণ্ডিয়ে যাবে। এও তো ঠিক কথা যে ওর মতো ছাত্রের প্রণাম পাওয়াও শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা।

মন্মথ ততক্ষণে প্রণাম করতে আরম্ভ করেছে। যে সব শিক্ষক ব্রাহ্মণ তাঁরা ওর পদস্পর্শ করে প্রণাম গ্রহণ করলেন, ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। যাঁরা ব্রাহ্মণ নন, তাঁদের মন্মথ জোড় হাতে কোমর পর্যন্ত হেঁট হয়ে আনত নমস্কার করলে। তাতেই তাঁদের অধিকাংশ জন শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। প্রণাম শেষ হবামাত্র হেডমাস্টার মশাই হাসিমুখে বললেন—এইবার আপনাদের ছুটি! আপনারা টিফিন করুন গিয়ে, বিশ্রাম-টিশ্রাম করুন।

তারপর সরল-হৃদয় রমেশ স্যারের দিকে ফিরে বললেন—রমেশ, তুমিও যাও, টিফিন কর গিয়ে। অনেকক্ষণই তো আছ তুমি আমাদের সঙ্গে, ক্লাস ছেড়ে। টিফিনের পরেই তো বোধহয় তোমার ক্লাস আছে।

রমেশ স্যারকে বিশেষভাবে কথাগুলি বলার কারণ ছিল। না হলে রমেশ স্যার সবাই চলে গেলেও উৎসাহের আতিশয্যে ও মন্মথর প্রতি স্নেহাধিক্যবশত হেড-

মাস্টার মশাইয়ের ঘরে থেকেই যেতেন। অস্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত তিনি বুঝতেন না। আবার এই যে হেডমাস্টার মশাই তাঁকে যেতে বললেন এটার ইঙ্গিতও তিনি বুঝতে পারলেন না। তিনি হেডমাস্টার মশাইয়ের নির্দেশমতো টিফিন করে পরবর্তী ক্লাসের জন্য প্রস্তুত হতেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
রমেশ স্যার শেষ বেরিয়ে যেতেই হেডমাস্টার মশাই চেয়ারে বসলেন।
মন্মথকে বললেন—বস মন্মথ।
মন্মথ চেয়ারে বসে হেডমাস্টার মশাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল তাঁর একান্ত প্রশ্ন প্রত্যাশা করে। সে বুঝতে পেরেছে হেডমাস্টার মশাই একান্তে তার সঙ্গে কথা বলতে চান।
হেডমাস্টার মশাই তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে চাপা গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কোথায় ভর্তি হবে, কি পড়বে কিছু ঠিক করেছ ?
আগুনের তাপে গলা মাখনের মতো, হেডমাস্টার মশায়ের এতক্ষণের একান্ত সস্নেহ ব্যবহারে মন্মথর হৃদয় তরল হয়ে উঠে হেডমাস্টার মশাইয়ের উপর একান্ত নির্ভরতায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। সে একান্ত অসহায়ের মতো তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—আমি কতটুকু জানি যে আমি ঠিক করব স্যার ? বাড়িতে বাবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, তিনি এর কিছুই জানেন না। আর আমি এখানে এসে মাত্র কাকার সঙ্গে দেখা করে এসেছি। তিনি পয়সাওয়ালা বড় মানুষ, কিন্তু পড়াশুনোর কিছু জানেন না। কে আমাকে পরামর্শ দেবে ?
তার শেষের কথাগুলিতে গভীর কারুণ্যের প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। হেডমাস্টার মশাই তার মুখের দিকেই তাকিয়ে সারাক্ষণ তার কথা শুনছিলেন। তিনি হঠাৎ এই সময় একবার গলা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন হয়তো অকারণ আবেগে তাঁর বয়স্ক কণ্ঠনালী পরিপূর্ণ হয়ে এসেছিল, তিনি সেটা পরিষ্কার করে নিলেন। তাঁর চোখের উজ্জ্বল, স্থির দৃষ্টি স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তাতে জল এসেছিল কিনা কে জানে! তিনি ধীরে ধীরে বললেন—আমি তোমার সম্পর্কে পেডলার সাহেবের সঙ্গে কথা বলে রেখেছি। পেডলার সাহেবকে চেনো তো! প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। তোমাদের রেজাল্ট বের হবার পর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে তোমার কথা বলেছি। পেডলার সাহেব নেই এখন এখানে গরমের ছুটিতে তিনি কলকাতার বাইরে আছেন। তিনি কলকাতা ফিরলেই তাঁর কাছে নিয়ে যাব তোমাকে। তিনি তোমার সব কথা শুনে তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার কথাও বলেছেন। তার আগে তুমি বরং ভর্তি হয়ে যাও প্রেসিডেন্সি কলেজে।
বলে তিনি একটু থামলেন। সামনের দেরাজ টেনে তার ভিতর থেকে একটি

খাম বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এটা রাখ। এর মধ্যে একশো টাকা আছে। আমি পেড্‌লার সায়েবের সঙ্গে দেখা করে এসেই তোমার জন্যে টাকাটা ঠিক করে রেখে দিয়েছিলাম। এটা আমি তোমাকে দান করছি না, কারণ তোমার আর দান গ্রহণের প্রয়োজন নেই। এটা ঋণ বলে মনে করো; যখন যেমন সুবিধে হবে তোমার, আমাকে শোধ দিও। তোমার দান গ্রহণের দিন শেষ হয়েছে। আর তোমার কারও কাছ থেকে দান নিতে হবে না। তুমি স্কলারশিপ পাবে। তাতেই ভালো করে চলে যাবে তোমার।

খামটি নিতে মন্মথ একটু ইতস্তত করছিল। তা দেখে হেডমাস্টার মশাই একটু মৃদু ধমকের সুরে বললেন—নাও, ধর। আমার কাছ থেকে নিতে তোমার তো কুণ্ঠার কোনো কারণ নেই। আমি তো তোমাকে অনেক দিয়েছি। ভালবাসা দিয়েছি, শিক্ষা দিয়েছি, জ্ঞান দিতে চেষ্টা করেছি, তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ দেখাতে, তোমার মনকে আলোকিত ও উজ্জ্বল করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

মন্মথর মাথাটি হেঁট হয়ে গেল। আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল সে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শেষে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

হেডমাস্টার মশাই চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর ধীরভাবে বললেন—চোখ মোছ, এখুনি কেউ এসে পড়বে। খামটা যত্ন করে পকেটে রাখ।

মন্মথ অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে চোখ মুছে টাকার খামটি পকেটে রাখলে।

হেডমাস্টার মশাই তারপর প্রশ্ন করলেন—থাকবে কোথায়? বলেই সঙ্গে সঙ্গে বললেন—আর কারও বাড়িতে, কারও আশ্রয়ে থাকার তোমার দরকারও হবে না, থেকোও না। কারণ এবার তুমি স্কুলের ছোট্ট সরোবরের চৌহদ্দি থেকে সমুদ্রে গিয়ে পড়লে। এইবার বুঝতে পারবে, ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে, জ্ঞানের পরিধি কত সীমাহীন, কত গভীর, কত ব্যাপক। আমি তোমার থাকারও ব্যবস্থা করেছি। এবার থেকেই প্রেসিডেন্সি কলেজের হোস্টেলে ছাত্র ভর্তি হবে, তাদের হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তুমি স্কলারশিপের যে টাকা পাবে তাই দিয়েই তোমার সব খরচ একটু টানাটানি করে চলে যাবে। এবার থেকে পড়াশুনোয় পরিপূর্ণ নিবিষ্টতারও প্রয়োজন হবে। পূর্ণ নিবিষ্টতা না এলে জ্ঞানের পথ সহজ হবে না; সুগম হবে না।

একটু চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন—প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলে ধীরে ধীরে নানান বিষয়ে জ্ঞানের সঙ্গেই শুধু পরিচয় হবে না, পণ্ডিত জ্ঞানী মানুষের সঙ্গেও পরিচয় হবে। দেখতে পাবে জ্ঞানের নিরন্তর চর্চায় মানুষ কেমন করে আস্তে আস্তে বদলে যায়, চরিত্র কেমন দিনে দিনে সুন্দর থেকে সুন্দরতর

হয়ে ওঠে; মানুষ কেমন সব লৌকিক জ্ঞান ও বোধ হারিয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান-চর্চার মধ্যে তন্ময় হয়ে যায়, কেমন উদাসীন আত্মভোলা হয়ে যায়। এই পেড্‌লার সাহেবকেই দেখতে পাবে। কি আশ্চর্য সুন্দর মানুষ তিনি! তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমিও যেন জ্ঞান আর বিদ্যার চর্চা করে অমনি বিশুদ্ধ হও!

আবার একটু থেমে গেলেন তিনি। তারপর হেসে বললেন—এই দেখ, একটা দরকারী কথাই বলতে ভুলে গেলাম। এফ. এ.তে কি কি সাবজেক্ট্ নেবে সেগুলো একবার আগে দেখে বুঝে নিও। বরং সত্যর সঙ্গে একবার পরামর্শ করো। ও এসব তোমার চেয়ে অনেক ভালো বোঝে। সত্যর সঙ্গে যোগাযোগ রেখ, বন্ধুত্ব করো, অনেক উপকার হবে, অনেক লাভ হবে জীবনে। সত্য সত্যকারের সৎ ও শক্ত ছেলে। তাছাড়া ওর মধ্যে এমন সুন্দর কিছু আছে, যা তুমি আর কারও মধ্যে আশে-পাশে দেখতে পাবে না। নতুন কালটা বোধহয় ওর মধ্যে, ওরই মতো যারা তাদের মধ্যে, সবচেয়ে সুন্দর চেহারা নিয়ে ফুটতে চাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে আমার।

হেডমাস্টার মশাই উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—এইবার এসো তুমি। অনেক বেলা হয়েছে। তুমি খেয়েছ?

লজ্জিতমুখে একটু হাসল মন্মথ। তাকে ঘাড় নেড়ে স্বীকার করতে হলো সে খায় নি।

হেডমাস্টার মশাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন—এঃ, এ তো বড় অন্যায় হয়ে গেল। তুমি আর দেরি করো না। সোজা বাড়ি যাও।

মন্মথ তাঁকে প্রণাম করতে করতে বললে—বাড়িতেও তো স্যার এর পরেই খেতাম।

প্রণাম সেরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মন্মথ, এমন সময় হেডমাস্টার মশাইয়ের কি মনে পড়ে গেল—ওহে মন্মথ, দাঁড়াও; তোমার জন্যে একখান বই রেখেছি। মন্মথ ফিরতেই তিনি তার হাতে একখানি বই তুলে দিলেন। হাতে নিয়ে মন্মথ দেখলে বইখানি। বইয়ের নাম—Uncle Tom's Cabin, লেখক নয়, লেখিকার নাম Harriet Elizabeth Beecher Stowe.

হেডমাস্টার মশাই বললেন—তুমি বইখানার নাম জান না। সত্য জানে বোধহয়। আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথার ওপর নিগ্রোদের নিয়ে লেখা। কি সুন্দর লেখা দেখবে। যিনি লিখেছেন তাঁর বুকে মানুষের জন্য কত ভালবাসা বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এস। আর কোনো দরকার পড়লে আসতে বিন্দুমাত্র সংকোচ করবে না, বুঝলে!

হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই বারান্দাতে দেখা হয়ে গেল আবার রমেশ স্যারের সঙ্গে। তিনি বোধহয় তারই জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। মুখে তিনি বললেনও সে কথা। বললেন—তোর জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। এই বইখানা নিয়ে যা, তোকে দিলাম। বইখানা বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক Herbert Spencer-এর লেখা, নাম হলো 'Education, Intellectual, Moral, and Physical'. বইখানা তুই ভালো করে পড়, তারপর তোর সঙ্গে আলোচনা করব। দেখবি কত দিক আলোচনা করে উনি প্রমাণ করেছেন বিজ্ঞানই শিক্ষার মূল বাহন হওয়া উচিত। বিজ্ঞানই হলো আসল এবং সঠিক জ্ঞানের উৎস।...আচ্ছা তুই পড় আগে। আবার আসিস, দেখা করিস বুঝলি!

রমেশ স্যারকে ঘাড় নেড়ে আবার আসার সম্মতি জানিয়ে সে হিন্দু স্কুলের বারান্দা থেকে নেমে পড়ল।

বাইরে আকাশে আবার জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্র, মেঘ সরে গিয়েছে। সে হাঁটতে লাগল হন হন করে। সত্যিই অনেক বেলা হয়েছে। কিন্তু খানিকটা গিয়েই থামতে হলো তাকে। তার নাম ধরে কে বেশ জোর গলায় ডাকছে। সে তাকাল পিছন ফিরে। দীর্ঘরাম আসছে ছুটতে ছুটতে। সে এসে দাঁড়াল তার কাছে। হাঁপাচ্চে, কিন্তু মুখে হাসি আর হাতে একটি আম। আমটি সে মন্মথর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—তুমি নিয়ে যাও মন্‌মথো বাবা, তুমি খা লিয়ো!

প্রতিবাদ করলে মন্মথ—আরে আম নিয়ে কি করব? না, না—

কিন্তু তার মুখ দেখে তার আর 'না' বলা হলো না। সে আমটি তার হাত থেকে নিয়ে নিজের পিরাণের পকেটে পুরবার চেষ্টা করতে লাগল।

দীর্ঘরাম বললে—ই ভাল, আচ্ছা আম আছে। বাকী হামার ঘরকা আম তো আউর বহুৎ বঢ়িয়াঁ। তুমকো খিলায়েগা।

হাসি মুখে ঘাড় নেড়ে বিদায় নিলে মন্মথ। যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই মনে হলো—কত মানুষের কাছ থেকে কত কিই যে তার জীবনে এলো দানের চেহারা নিয়ে! এত পাওনাও ছিল তার!

২

দ্বিজু মুন্সীর বাড়ির কাছে যেতেই সে দেখতে পেলে তার নতুন পাতানো মা আর মাতামহ চিন্তান্বিত মুখে খররৌদ্র মাথায় করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দিকে চেয়ে। তাকে দেখেই চারু বাড়ির ভিতর চলে গেল। যাবার সময়

মুখ ফিরিয়ে বলে গেল—আমার পেরে ছেলে হলে আজ তোমাকে মারতাম আমি।
দ্বিজু মুন্সী হাসিমুখে বললে— চারু তোমার ওপর খুব রেগে গিয়েছে নাতি। নিজে তো খায়ই নি, সেই কখন থেকে তোমার রান্নার যোগাড় করে বসে আছে!
মন্মথ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—চলুন, আমি গিয়ে চারু-মাকে বলছি, আমার এতে কষ্ট খুব হয় নি।
—কষ্ট হয় নি? তুমি কি দেবতা নাকি হে? তোমার খিধে পায় না?
হাসিমুখে মন্মথ বললে—ক্ষিধে পায় বৈকি! তবে আজ এখনও পায় নি! আমি তো এমনি বামুনের ছেলে নই, বামুন-পণ্ডিতের ছেলে। অল্প বয়সে আমার মা মারা গিয়েছিলেন! তারপর থেকে ঠাকুরের ভোগ রান্না করা আমার অভ্যেস ছিল। কাজেই না খেয়ে আমার খুব কষ্ট হয় না।
দ্বিজু মুন্সী হেসে বললে—বুঝলাম তুমি জাত-বামুনের ছেলে, কিন্তু তোমার এই কায়েত-মাও সোজা পাত্র নয়! সে খুব রেগে আছে, যাও ভেতরে যাও। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, অনেক খবর আছে। খাওয়াদাওয়া কর, তারপর বলব।
—যাচ্ছি। কিন্তু আমি যে আপনার জন্যে একটা জিনিস এনেছি!
—কি জিনিস ভাই?
পিরাণের পকেট থেকে আমটা বহুকষ্টে বহুযত্নে বের করে তাকে দেখিয়ে বললে—আমাকে একজন খেতে দিয়েছিল, আমি না খেয়ে আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি।
দ্বিজু মুন্সীর ছোট ছোট চোখ দুটি এক চিলতে জলে আকস্মিকভাবে চকচক করে উঠল। সে মন্মথর পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহে বললে—তোমাকে দিয়েছে, তুমি খাবে। আমি কেন খাব ভাই?
মন্মথ বললে—আপনি বেতালপঞ্চবিংশতির সেই গল্প জানেন না? সে গল্পে রাজা রানীকে ফল দিয়ে বলেছিলেন খেতে। কিন্তু রানী না খেয়ে আর একজনকে দিয়ে দিয়েছিলেন। ভালবাসার উপহার, বুঝলেন দাদু, যে পথ দিয়ে আসে আর সে পথ দিয়ে ফিরে যায় না। তবে এটা যেন আর কোথাও উপহার হয়ে চলে না গিয়ে আপনার পেটেই যায়।
অকস্মাৎ সোৎসাহে ঘাড় নেড়ে দ্বিজু মুন্সী বলল, কই দাও, খাব, আমিই খাব। তার হাত থেকে আমটি নিয়ে তাকে সঙ্গে করে বাড়ির ভিতর ঢুকল মুন্সী।
চারু-মায়ের অনেক ক্ষোভ ও রোষের মধ্যে মন্মথর স্নান, রান্না ও আহার সমাপ্ত হলো। অনেক বেলা হয়েছে বলে আলু, আর দু তিন রকম ডাল সিদ্ধ এবং ঘৃত সহকারে আহার শেষ করতে হলো মন্মথকে। আর বেশী কিছু রান্না করতে দিলে

না এই নতুন-পাওয়া ছেলেকে তার চারু-মা। বললে—যেমন বেলা করে এসেছ, যেমন জাত-বামুন বলে দেমাক করছ তেমনি এ বেলা জাত-বামুনের আহার করে থাক। বেশ হয়েছে। কাল রাত্রিতেও ভাত খেতে পাও নি, আজ এ বেলাও শুধু সেদ্ধ-সেদ্ধ ভাত। খুব আচ্ছা হয়েছে!

মেয়ের কথার পিঠে পিঠেই অনেকখানি হা হা করে হেসে দ্বিজু মুন্সী বললে—তা ভালই হয়েছে। রাত্রেতে আজ ভালো করে পারণ হবে। ভালো করে লুচি-মণ্ডা খাবে আজ নাতি নেমন্তন্ন গিয়ে!

আশ্চর্য হয়ে মন্মথ বললে—নেমন্তন্ন? কোথায় নেমন্তন্ন?

আবার আপনার বিচিত্র কায়দায় বার কয়েক ঘাড় নেড়ে মুন্সী বললে, হুঁ হুঁ বাবা, সে একজনের এক জায়গায়—সে সমস্ত জায়গা—সেখানে নেমন্তন্ন আছে। এই খানিক আগে লোক এসেছিল নেমন্তন্ন করতে।

অবাক হলো মন্মথ। কিন্তু তার নিজের অভ্যাস অনুযায়ী আর সে বিষয়ে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলে না। সে চুপ করে গেল। কিন্তু মুন্সীর উৎসাহ তখনও যায় নি। সে বললে—আজ তোমার কোথা থেকে নেমন্তন্ন এসেছে জান নাতি?

মন্মথ চুপ করে রইল।

মুন্সী বললে—তোমাকে নেমন্তন্ন করতে লোক এসেছিল মাধববাবুর, মদন মিত্তির লেনের মাধব বাঁড়ুজ্জে মশায়ের বাড়ি থেকে। যেখানে তুমি ছিলে কিছু দিন!

এবার সত্য সত্যই আশ্চর্য হলো মন্মথ। নিজের বিস্ময়টা মুখে প্রকাশও করলে সে—মাধববাবুর বাড়ি থেকে? কেন দাদু?

—সেই তো কথা! তোমার জন্যে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় একজন ভদ্রলোক এসে প্রথম আমাকে খুঁজছে বললে! তা নিজের নাম বললাম। তখন জিজ্ঞাসা করে, আমার বাড়িতে তুমি আছ কিনা! তুমি আছ বলাতে তোমার খোঁজ করলে। তোমাকে না পেয়ে বললে—সন্ধ্যাবেলা মন্মথবাবুকে আমাদের কর্তামশাই নেমন্তন্ন করেছেন, মন্মথবাবু রাত্রে আমাদের ওখানে খাবেন। আমি সন্ধ্যার সময় বাবুর গাড়ি নিয়ে আসবো।

শুনে অবাক্ হলো মন্মথ। মাধববাবু তাকে নিমন্ত্রণ করেছেন এবং তার জন্য গাড়ি পাঠাবেন! আশ্চর্য নয়তো কি?

কিন্তু সে আর কোনো কথা বললে না ও নিয়ে। শুধু দ্বিজু মুন্সীকে বললে—এবার আমি একটু শুই দাদু। ঘি আর সেদ্ধ দিয়ে খুব বেশী ভাত খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যার মুখে তাকে নিয়ে যেতে সত্য সত্যই মাধববাবুর গাড়ি এসে দাঁড়ালো বড় রাস্তার উপর। সঙ্গে একজন কর্মচারী। সে খুব সমাদর করে তাকে নিয়ে গাড়িতে

তুললে। এক ঘোড়ার চকচকে গাড়ি. ঘোড়াটিও খারাপ কি হাড় জিরজিরে নয়। তবে কলকাতার বড় বড় ঘরের গাড়ির মতোও নয়, কি কোচম্যানসহিসের অঙ্গে তকমা-আঁটা পোশাকও নেই। গাড়িতে উঠবার আগে তাকে শুনিয়েই কর্মচারীটি দ্বিজু মুন্সীকে বললে—আমি বাবুকে বললাম। এইটুকু তো রাস্তা, গাড়ি না হলেও তো চলতো বাবু! যাই হোক করে নিয়ে আসতাম ছেলেটিকে। তা কর্তামশায় অন্য ধরনের মানুষ তো। খুব মিষ্টি করে হেসে বললেন—না হে, তুলসীপাতা বলে যাকে আদর করবে তাকে তুলসীপাতার পুরো সম্মানটা করতে হয়। তা না হলে অঙ্গহানি হবে।…বুঝলেন মুন্সী মশাই, কর্তামশাই আমাদের এমন মানুষ যার কথা শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আমাদের নিমু চাটুজ্জে বলে, কর্তামশাই হচ্ছেন বৈশাখ মাসে মাঠের মাঝখানের বুড়ো বটগাছ, গরমের দুপুরে মিছরির শরবত।… তা আর দেরি করবো না। কর্তামশাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন।

গাড়ি এসে দাঁড়াল মদন মিত্তির লেনে মাধববাবুর বাড়ির সামনে। পাশেই এই বাড়িরই অন্য অংশটা মেস বাড়ি। একটা বাড়িরই দুটো অংশ। কিন্তু দুটো দুই ভিন্ন জগৎ। গাড়িখানা আসতে দেখেই মন্মথর নজরে পড়ল জনকয়েক লোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। মন্মথর মনে এক ধরনের কৌতুক বোধ হলো। এই তো কিছুকাল আগে সে এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল পায়ে হেঁটে, অর্থী হয়ে। যাঁর কাছে অর্থী হয়ে এসেছিল তিনিই আজ তাকে সমাদর করে তাঁর গাড়ি পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। জীবনে কত মজার ব্যাপার, কত বিচিত্র ঘটনাই যে ঘটে!

কর্মচারীটি আগে গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে ধরে মন্মথকে নামিয়ে নিলে। যারা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল তার মধ্যে বিধাতার সেই বিচিত্র জীবটি, নিমু চাটুজ্জেও ছিল। সে-ই কথা বলে উঠল উচ্চকণ্ঠে—গড ইস্ গুড। এস বাবা, এস। তোমার লেগেই আমরা এই দরজার কাছে সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। এস মানিক এস। তুমি যখন মাধব-লজেরই পাশে বাবুর কর্মচারীদের সঙ্গে থাকতে তখন কি চিনতে পেরেছিলাম তোমাকে!

তাকে নিয়ে সকলে তখন বাড়ির ভিতরে ঢুকছে। সকলের আগে আগে চলেছে নিমু চাটুজ্জে। চলেছে নিজের স্বভাবমতো উচ্চকণ্ঠে অনর্গল অর্থহীন কথা বলতে বলতে—তুমি যখন পেথম এসেছিলে তখন কত্তামশায়কে বলেছিলাম কি একটা পুঁচকে ছোঁড়ার সঙ্গে কথা বলছেন কত্তা! তা তুমি যে মানিক তখন কি জানতাম? তা দেখ, রতনেই রতন চেনে! কত্তামশায় তোমাকে ঠিক চিনতে পেরেছিলেন। তিনিই আমাকে ধমক দিয়েছিলেন—এই নিমু, কি যা তা বকছিস? তা আজ বুঝছি, সেদিন যা-তাই বকেছিলাম। তোমাকে মানিক বলে, রতন

বলে চিনতে পারি নি।

এক নাগাড়ে বকে চলেছে, কিন্তু তার হাত আর পা আপনার কাজ করে চলেছে ঠিক-ঠিক। বাইরের ঘরের দরজা খুলে, ফরাসের উপর পরিষ্কার তাকিয়াটা এবং তোশকের খানিকটা হাত দিয়ে ঝেড়ে দিয়ে ধুলোহীন আসনের ধুলো পরিষ্কার করে সমাদর প্রকাশ করে নিসু বললে—বস বাবা, বস। আমি কত্তাকে খবর দি। তিনি তোমার লেগেই বসে আছেন অপিক্ষা করে।

ফরাসের উপর বসে সে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে। এ সেই ঘর যেখানে তার প্রথম মাধববাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। একমনে শ্রীমদ্‌ভাগবতের পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক সময় মাধববাবু তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কত কথা, কত বিচিত্র কল্পনার অর্থহীন কথা হয়েছিল সেদিন দুজনের মধ্যে!

তার সামনে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে সসম্ভ্রমে। তারাও ঘরে আসন গ্রহণ করে নি, দাঁড়িয়েই আছে। এরা বোধহয় সবাই মাধববাবুর কর্মচারী। সে লক্ষ্য করলে কিছু কিছু লোক জানালা দিয়ে তাকে দেখে যাচ্ছে। তাদের চোখের বিচিত্র দৃষ্টি তার সাদা-সচেতন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। এক সঙ্গে যেন কৌতূহল, বিস্ময় ও ঈর্ষা মিশে আছে সে ছবিটিতে। সে চুপচাপ করেই দেখছে সব। মাধব লজের পাশে মাধববাবুর কর্মচারীদের যে মেস সেই মেসের সকলকে সে চেনে। এরা তো তার চেনা মানুষ নয়! এ বাড়িতে সে এক আধবার এসেছে, এক আধটা কথা বলে চলে গিয়েছে দরজা থেকে, ঐ পর্যন্ত, তার বেশী সে চেনে না এ-বাড়িকে।

এই সময় মাধববাবুর খাস চাকর রামধনি ঘরে এসে ঢুকল। সঙ্গে নিসু চাটুজ্জে। নিসু যত প্রগলভ রামধনি তত নীরব ও শান্ত। নিসু হইচই করে বললে—ইখানে আর তোমার বসা চলবেক না। চল ওপরে চল। কত্তাবাবু ওপরে তোমার লেগে বসে রইছেন। চল বাবা।

মন্মথ উঠল নীরবে, রামধনি আর নিসুর সঙ্গে সঙ্গে চকমেলানো বাড়ির বারান্দা ঘুরে সরু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। দোতালায় একটা ঘরের দরজার কাছা-কাছি এসে তাদের দাঁড়াতে বলে রামধনি চলে গেল ঘরের ভিতরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন্মথ শুধু শুনলে—নিয়ে আয়।

রামধনি দরজার কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আহ্বান জানালে—আসুন বাবু!

ওরা ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকলো। মাধববাবু মস্ত বড় ঘরের মধ্যে এক পাশে পাতা বড় খাটের ওদিকে দামী গালিচার উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গড়গড়ায় তামাক

খাচ্ছিলেন। তাকে দেখে হাসিমুখে উঠে বসলেন। এই সুন্দর মানুষটি সম্পর্কে তার স্মৃতির সঙ্গে আবেগ মিশে যে মূর্তিটি তার মনে তৈরি হয়ে আছে তাকেই, আবার সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করলে মন্মথ। সেই সর্বশুক্ল, সুন্দর দীর্ঘ চেহারা, মাথায় এক মাথা পাকা চুল, পাকা গোঁফ, মুখে স্নিগ্ধতা আর প্রসন্নতায় মাখামাখি। তাকে দেখে প্রসন্নতাটি যেন ফুলের মতো প্রস্ফুট হয়ে মুখে হাসির চেহারা নিয়েছে। বড় বড় স্নিগ্ধ দুই চোখে পর্যন্ত যেন হাসির ছোঁয়া লেগেছে। তাকে দেখে সস্নেহে অথচ গভীর মর্যাদার সঙ্গে মৃদুস্বরে বললেন—এস, এস। তারপর কেমন আছ?

সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে সে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলে। এই মাধুর্যময় মহিমাই অনায়াসে তাকে প্রণত করলে যেন। মৃদু সশ্রদ্ধ স্বরে বললে—ভালো আছি। মাধববাবু তার মাথায় নিজের দুই হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন—কল্যাণ হোক। মঙ্গল হোক তোমার।

কিছুকাল সে মাধববাবুর আশ্রয়ে অন্নগ্রহণ করলেও আর দেখা হয় নি মাধববাবুর সঙ্গে। তিনি কয়মাস কোলিয়ারী অঞ্চলে ছিলেন। আর তাছাড়া একই বাড়ির অন্য অংশে মেস হলেও দুটো অংশ সম্পূর্ণ আলাদা।

হঠাৎ এর মাঝখানেই কে কথা বলে উঠল—সাধে বলি গড ইজ গুড। আপুনি যখন উয়োর মাথায় হাত রেখে বলেছেন 'কল্যাণ হোক', 'মঙ্গল হোক' তখন নিঘ্যাত উয়ার ভালো হবে। হবেই হবে। হতেই হবে। কার হাতের ছোঁওয়া লাগল উয়ার মাথায়! দেবাচ্ছিত মানুষ আপনি!

কে আর! সেই অর্বাচীন অশালীন নিমু চাটুজ্জে। প্রণাম সেরে গালিচায় বসতে বসতে মন্মথ দেখতে পেল নিমু চাটুজ্জে বকচে। মৃদু ধমক দিতে হলো মাধববাবুকে—তুমি চুপ কর নিমু! সব জায়গায় সবাইকে কথা বলতে হয় না!

নিমু চাটুজ্জের চুপ করা! চুপ করবার আগেই সে বলে নিলে—আপুনি যখন হুকুম দিছেন তখন নিমু চুপ করবে সি আর কঠিন কথা কি! তবে ছেলেকে একটা কথা বলে যাই। তুমি যে পরীক্ষায় ফাস্টো হয়েছ তা এই লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ, এই আমাদের কত্তাবাবুর কাছে এসেছিলে বলে। বাবু আমাদের 'স্পর্শমণি' যা ছুঁবে তাই সোনা হয়ে যাবেক্। এই দেখ, তোমাকে সেই আশীর্বাদ করেছিলেন, সেই আশীর্বাদ ফলে গেইছে।

নিমু আরও কত কি বলত, আরও কত স্তাবকতা করত তা ভগবান জানেন, কিন্তু মাঝখানেই বিশেষ বিরক্ত হয়ে মাধববাবু বললেন—আঃ নিমু, কেন বকছিস বল দেখি। তোর কত্তা যে কি রকম স্পর্শমণি তা কি তুই দেখতে পাস না? এই

তো আজ বিশ বাইশ বছর তুই আমার কাছে আছিস, এই বিশ বাইশ বছর অন্তত পাঁচশো বার তোর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছি তাতে তোর কি হয়েছে বল তো ? বরং বিশ বাইশ বছর আগে যা ছিলি, বিশ বাইশ বছর আগে তোর যেটুকু ভদ্রতা আর আত্মসম্মান ছিল তা সবই খুইয়েছিস। এই তো তোর কত্তার আশীর্বাদের ফল!

নিমুকে দমানো বড় কঠিন কাজ। সে লজ্জিত হয়ে আসবার ভান করলে নিজের দন্তপঙ্‌ক্তি বের করে। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। কালো রঙ—সুন্দর, সাদা, সুগঠিত দাঁতের সারি বের করে হাসল নিমু। হাসিতে কি আশ্চর্য সুন্দর লাগল তাকে এক মুহূর্তের জন্য। অন্তত মন্মথর লাগল। এ আর এক রূপ নিমুর। হাসি শেষ করে দাঁতের সারি বন্ধ করতেই আবার সেই অশালীন প্রগলভ মানুষটি আত্ম-প্রকাশ করলে, সেই অজানা সুন্দর মানুষটি তার তলায় চাপা পড়ে গেল। লজ্জিতের ভানে নিমু বললে— এই তো, আপনকার মতো দেব তাজানিত পুরুষের ভুল হলো কত্তা মশায়। আমি কি আর ই ছেলের মতো পাথর গো ? আমি তো কয়লা, কালো ধুলা! লোহার ডাণ্ডসে করে একটা বাড়ি মারেন তো কয়লা ভেঙে চুর চুর হয়ে গুঁড়া হয়ে ধুলা হয়ে ছড়িয়ে পড়বেক। আর পাথরে লোহার ডাণ্ডসের বাড়ি মারেন, পাথর পেথমটা আটকাবে, তা বাদে কুচি হয়ে বন্দুকের গুলির পারা ছুটে যাবেক। পাথরে আর কয়লায় যা তফাত এই ছেলেতে আর আমাতে সেই তফাত কত্তা। আপনার আশীর্বাদ যে আমার বেলায় ফলে নাই, সি আপনার দোষ নয়। আমার তা ফলবার কপাল লয়।

মন্মথ দেখলে নিমুর অপরিসীম প্রভাব মাধববাবুর উপর। এই অশালীন সামান্য লোকটি কি দিয়ে যেন মাধববাবুর মতো সুন্দর, অসামান্য মানুষকে বশীভূত করে রেখেছে। মন্মথ অনুমান করলে, কি দিয়ে আর এই বিচিত্র অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে স্তাবকতা করে তাঁর কাছে সে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

মাধববাবু বললেন—তুই তো বিরক্তই করছিস দেখছি। তা একটা কাজ কর। তুই একবার অভিরামকে ডেকে দে!

—মেজ জামাইবাবুকে ?

—কেন, চিনিস না নাকি ? যা ডেকে দে!

মন্মথ দেখলে আবার সেই সুন্দর হাসি একবার এক মুহূর্তের জন্য নিমুর কুৎসিত মুখে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। সে বললে—আপুনি ইবার আমাকে ইখান থেকে তাড়াতে চান, তাই মেজ জামাইবাবুকে ডাকতে বলছেন ?

মন্মথ বুঝলে অভিরামবাবু নামে যিনি এ বাড়ির মেজ জামাইবাবু, তিনি বোধহয়

নিমুর ভয়ের একমাত্র পাত্র।

নিমুর কথা শুনে মৃদু কণ্ঠে হেসে উঠলেন মাধববাবু, হাসতে হাসতে গড়গড়ার নলটা তুলে নিয়ে বললেন—না না, তোকে তাড়াবার জন্যে অভিরামকে ডাকতে বলি নি। দরকার আছে বলেই ডাকতে বলছি। আর তুই নিজেই দেখ, ছেলেটি-কে আমি নেমন্তন্ন করে নিয়ে এলাম আলাপ করব বলে, তা কথা বলতে পারছি তোর জন্যে ?

এবার সত্য সত্যই লজ্জিত হলো নিমু। বললে—দোষ হইছে কত্তা মশায়। তা দেন আমার দু গালে দু চড় লাগায়ে! দোষ হইছে আমার। আমি যেছি!

যেতে যেতে সে আবার ফিরল। বললে—আমি যেছি, তা যাবার আগে শেষ কথাটা বলে যাই। একটো কথা ওই ছেলেকে বললাম, ইবার একটো কথা আপনাকে বলে যাই। আপনাকে আমি 'দেবাচ্ছিত' পুরুষ বলি! কেনে বলি আপনি নিজেই দেখেন। ঝাঁউরা আর ভাল্লুকশুঁড়োর এই কাঠফাটা ভূতুড়ে ডাঙা পড়েছিল, সেখানে একটা ভালো বট গাছ হয় না; সেই ডাঙায় আপনি হাত দিলেন আর তলা থেকে কালো কালো সোনার তাল বেরুতে লাগল। তেমনি দ্যাখেন আপনি, আপনার এমন ভাগ্য এই সোনার তালের মতো ছেলেটা আপনার কোলের কাছে এসে পড়েছে। বটে কিনা আপনি বিচার করে দ্যাখেন।

বলে বিচারীর মতো বেরিয়ে চলে গেল নিমু।

নিমু বেরিয়ে যেতে কথা আরম্ভ করলেন মাধববাবু, বললেন—হতভাগার তিন-কুলে কেউ নেই। মা-মরা ছেলে, অনাথ। আজ বিশ বাইশ বছর আগে আমি ওকে মানভূম থেকে নিয়ে এসেছিলাম। আমাকেই একমাত্র আপনার জন বলে জানে। তা যাক, ওর কথা যাক। আমি ছাড়া ওকে আর কেউ সহ্য করতে পারে না। আমার জন্যেই ওকে কেউ কিছু বলতে পারে না। সেই জন্যেই হত-ভাগাকে আমি আরও বেশী করে সহ্য করি। আহা ভগবানের জীব!

মন্মথর আর কতই বা বয়স, ষোল সতের, বড় জোর আঠারো। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হলেও এ বয়সে বুদ্ধি আর কতটাই বা পরিপক্ক হবে! তা সত্ত্বেও মাধবাবুর কথাগুলি, একান্ত সহজ নম্রভাবে মৃদুকণ্ঠে বলা এই কথাগুলি শুনে তার মনে হলো, এ মানুষটিকে সে যত বড় ভেবেছে মানুষটি তার চেয়েও অনেক অনেক বড়। আর উনি সহজেই খুব বড় বলে একবারও সে কথাটা ওঁর নিজের মনে থাকে না। তাইতেই ওঁকে আরও সুন্দর লাগে।

ওঁর কথাগুলি শুনে মন্মথ কেমন ভাবাতুরের মতো ওঁর মুখের দিকে চেয়েই তাকিয়ে ছিল। ওঁর কথা শেষ হবার পরও তাকে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে

থাকতে দেখে একটু হেসে বললেন—তোমার জন্যে আমি বিশেষ কিছু করতে পারি নি, সেই কথাটা বলে আমার অপরাধ ক্ষালন করবার জন্যেই তোমাকে আমি আনিয়েছি। তোমাকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারলে আজ তোমার কৃতিত্বে অংশ নিতে আমার অহংকারের বাকী থাকত না। তোমাকে আদর করে আমার মেসে এনেছিলাম। ইচ্ছে ছিল, ভালো করে তোমার দেখাশুনা করব। তা তুমিও এলে আর আমাকেও কোলিয়ারী চলে যেতে হলো। তোমার পরীক্ষার সময় যা একবার এসেছিলাম। নিস্থ আমাকে মহা ভাগ্যবান বলে গেল, সে তুমি শুনলে। কিন্তু তোমাকে ভালো করে সাহায্য করে অহংকার করার ভাগ্য আর আমার হলো না। যদি তোমাকে ভালো করে সাহায্য করতাম, করতে পারতাম, তা হলে তো বড় মুখ করে বলতে পারতাম, দেখ ওকে দেখেই আমি চিনেছিলাম, চিনে যতটা পেরেছি সাহায্য করেছি। তা তো আর হলো না। সামান্যই করেছি তোমার জন্যে। তা আমি তোমার খবর মাঝে মধ্যে দ্বিজু মুন্সীর কাছ থেকে নিয়েছি ভাই। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তোমার ফার্স্ট হওয়ার খবরও আমি ওর কাছ থেকেই পেয়েছি। পেয়ে আমার আর আফসোসের বাকী ছিল না। তোমার সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না। কত করতে চেয়েছিলাম আর কতটুকু করেছি।

মন্মথ বললে—যেটুকু করেছেন ওইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। ওইটুকু যদি আপনি না করতেন তা হলে আমার আর পরীক্ষা দেওয়া হতো না।

এ নিয়ে মন্মথর মনে মনে অভিমান ছিল। মাধববাবুর এই মধুর ও আন্তরিক কথার জল সেচনে সে উত্তাপ ও ক্ষোভ মন থেকে ধুয়ে গেল, মন তৃপ্ত ও শান্ত হলো।

—তোমার মুখে প্রথম শ্রীমদ্‌ভাগবৎ পড়া শুনে ইচ্ছা হয়েছিল তোমার মুখে নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ শুনে প্রাণটা জুড়োব। ইচ্ছা ছিল তোমার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করব। তা আর হলো না। ওই তোমার পরীক্ষার আগে যে কদিনে যেটুকু হয়েছিল! তাই সব।

বলে মাধববাবু থামলেন, গড়গড়ার নলটা বার কয়েক টেনে সেটা ফেলে দিলেন। মৃদুস্বরে ডাকলেন—রামধনি!

রামধনি বাইরেই মোতায়েন ছিল, সে ঘরে এসে মনিবের মুখের দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গড়গড়ার মাথা থেকে পুরনো কলকে তুলে নূতন কলকে বসিয়ে দিলে। মাধববাবু আবার গড়গড়ার নলটা তুলে নিলেন।

কয়েক টান টেনে বললেন—এইবার কি করবে? পড়বে তো নিশ্চয়?

—আজ্ঞে!
—কোথায় পড়বে? কোন্ কলেজে? আমি পয়সা রোজগার করেছি অনেক, কিন্তু লেখাপড়া কিছুই করি নি। তবে লেখাপড়া ভালবাসি খুব। আমার গ্রামে হাই ইস্কুলও করেছি একটি।
—আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হব। হিন্দু স্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে আজ কথা হয়েছে আমার। উনি আমার জন্যে প্রেসিডেন্সির প্রিন্সিপ্যাল স্যার আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছেন।
ঘাড় নেড়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে মাধববাবু বললেন—ভালো, খুব ভালো! তা এখন থাকবে কোথায়? দরকার হলে ও মেসবাড়ি ছেড়ে আমার এই বাড়িতে থাকতে পার। আমি আলাদা একখানা নিরিবিলি ঘরের ব্যবস্থা করে দেব।
মন্মথ বিনীতভাবে একটু হাসল। বললে—কি যে বলব আপনাকে! তবে আমার থাকার ব্যবস্থাও হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের হোস্টেল এই বছর থেকেই খুলছে। সেখানে থাকব আমি। হোস্টেলে থাকলে পড়াশুনোটা ঠিক মতো হবে।
—ভালো খুব ভালো। তা হলে বলার কথা আরও একটা আছে। মাসে মাসে আমার কাছে কিছু নিতে সংকোচ করো না। আমার ভাই, অনেক আছে। তুমি কিছু নিলে মনে করব আমার সেই কটা টাকা দেবসেবার সমতুল্য কাজে লাগল!
মন্মথ আবার বিনীতভাবেই বললে, টাকা তো আমার লাগবে না! আমি যা স্কলারশিপ পাব তাতেই আমার চলে যাবে!
মাধববাবু তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, কিন্তু ভাই, তুমি যে আমার কাছ থেকে কিছুই নেবে না, এটাই যে আমার মনে একটু খুঁতখুঁতি থেকে যাবে! তা হলে—
মন্মথ প্রসন্ন মনে অকুণ্ঠভাবে বললে—আমার যদি কোনোদিন দরকার হয় প্রথমেই আপনার কাছে আসব।
বিশেষ উৎসাহিত হয়ে মাধববাবু তার পিঠে হাত রেখে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—এটা শুধু কথার কথা হবে না তো? মনে থাকবে তো ঠিক?
মন্মথ জবাব দেবার আগেই দরজার বাইরে ভারী গলা ঝাড়ার আওয়াজ উঠল। মাধববাবু গলার স্বর একটু তুলে বললেন—কে অভিরাম! এস!
মাধববাবুর মেজ জামাই অভিরামবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। তিনি মাধববাবুর বড় জামাইয়েরই কনিষ্ঠ সহোদর। তাঁরা মাধববাবুর দুই কন্যাকে বিবাহ করেছেন।

ভাই আবার ভায়রা ভাই। অভিরামবাবু কোলিয়ারীতেই থাকেন। কলকাতার বড় একটা আসেন না। তাই তিনি একেবারেই দেখেন নি মন্মথকে।

অভিরামবাবু মাধববাবুর মতো বিশেষ গৌরবর্ণ না হলেও, অত্যন্ত ফর্সা রঙ, মোটাসোটা, শক্তপোক্ত, বেঁটেখাটো চেহারা, গায়ে গিলে-করা পাঞ্জাবি, পরনে কোঁচানো কালো ফুলপাড় ফরাসডাঙার ধুতি, চোখে চশমা। পায়ের চটিজোড়া দরজার বাইরে খুলে ঘরে ঢুকে কোঁচাটি সযত্নে গুটিয়ে নিয়ে পা মুড়ে গালচের ওপর বসলেন। বছর চল্লিশেক বয়স। দেহে চাল-চলনে সর্বাঙ্গে যৌবনের সমৃদ্ধি ঝলমল করছে।

মাধববাবু বললেন—প্রণাম কর ওঁকে। আমার মেজ জামাই। তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ, তার উপর কৃতী মানুষ।

মাধববাবু বলার আগেই অবশ্য মন্মথ প্রণাম করার জন্য হাত বাড়িয়ে ছিল। সে কালটাই তো প্রণম্যজনে অসংশয়ে প্রণাম করার কাল ছিল।

মন্মথ প্রণাম করতেই অভিরামবাবু তাকে বললেন—খুব আনন্দ হলো তোমার পরীক্ষার ফল শুনে। ত. তোমার নামটি কি? তুমি তো আমাদের কর্মচারীদের সঙ্গে ও বাড়ির মেসে ছিলে কমাস। তোমার নাম দু'একবার কর্মচারীদের মুখে শুনেছি। এখন তুমি একবার বল, তোমার মুখে শুনি। তুমি যখন এখানে ছিলে তখন শ্বশুরমশাই কি আমি কি বাড়ির লোক কেউ এখানে আমরা ছিলাম না। থাকলে হয়তো এত সব আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হতো না। কোনো ভাবে জেনে যেতাম।

—শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য।

—ভট্টাচার্য? গোত্র কি?

—চট্টোপাধ্যায়। কাশ্যপ।

—পিতার নাম?

—শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য।

—নিবাস কোথায়?

—গ্রাম গোবিন্দপুর।

—কোন্ জেলা?

—হুগলী।

—হুগলী? বলে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন অভিরামবাবু। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন

—হুগলীর কোথায়?

—হুগলী কি চন্দননগর দু'জায়গা থেকেই যাওয়া যায়। হুগলী থেকে দুক্রোশ,

পশ্চিমে, চন্দননগর থেকে উত্তর-পশ্চিমে আড়াই ক্রোশ।

ভারী কণ্ঠস্বর, কথাবলার ভঙ্গি একান্ত ধীর, প্রত্যেকটি কথা যেন লোহার মুগুরের মতো প্রক্ষিপ্ত হয় তাঁর মুখ থেকে। ভালো কথায়ও কেমন একটা ধমকের সুর লাগে। তিনি সেই ভঙ্গিতেই বললেন—আমার বাড়িও তো হুগলী জেলায়। তবে অবশ্য গঙ্গার ধার বরাবর জেলার পূর্ব দিক ঘেঁষে নয়। আমাদের বাড়ি বর্ধমান জেলার সন্নিকট ধনিয়াখালির কাছে নোয়াপাড়া।

মাধববাবু মুখ খুললেন—সেখানকার বিখ্যাত বনেদী জমিদার বংশে ওঁর জন্ম। নোয়াপাড়ার মুখুজ্জেরা আজ চার পুরুষ খুব নাম করা জমিদার। নাম শুনেছ?

কি নোয়াপাড়া কি নোয়াপাড়ায় মুখুজ্যে কারও নামই শোনে নি মন্মথ তার সতের বছরের জীবনে। তবু সে মুখে পরিচয়ের ঔৎসুক্য একান্তভাবে ফুটিয়ে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাম তো শুনেছি।

মিথ্যা কথাটা বলে তার খারাপও লাগল, আবার এও মনে হলো যে মিথ্যা কথা না বলে সত্যটা বললে ওঁদের অভিমানী চিত্ত আহত হতো; তার চেয়ে এ মিথ্যা বলা মন্দের ভালো হয়েছে।

মাধবাবু বললেন পরিতৃপ্ত হয়ে—হ্যাঁ, ওঁরা ও অঞ্চলে কেন, গোটা জেলাতেই খুব নামকরা বংশের মধ্যে একটি বংশ।

অভিরামবাবুর স্বভাবগম্ভীর মুখে অহংকারের গভীরতর গাম্ভীর্য নেমে এলো। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—বাবা কি করেন?

জেরার মতো এই ক্রমাগত প্রশ্ন মন্মথর ভালো লাগছিল না। তবু সে মাধববাবুর কথা মনে করে বেশ প্রসন্ন মনেই জবাব দিলে, নম্রতার সঙ্গেই বললে—আমার বাবা সামান্য মানুষ! না হলে কি আর আমাকে এর ওর সাহায্য নিয়ে লেখাপড়া করতে হয়। বাবা আমার ভট্‌চাজ পণ্ডিত মানুষ! দেবসেবা, পুজো-অর্চনা, যজমান এই সব নিয়েই থাকেন।

—হুঁ! জমিজমা আছে নিশ্চয়ই!

ধীরে ধীরে বিরক্তি বোধ করছিল মন্মথ। তবু নম্রভাবেই জবাব দিয়ে চলল—কিছু ব্রহ্মত্র আছে, বাড়িতে দেবসেবা আছে। ওতেই চলে যায় কোনো রকমে। তা জমির পরিমাণ কত তা আমি ঠিক বলতে পারবো না। তবে হয়তো বিশ ত্রিশ বিঘে হবে।...জমির সঠিক পরিমাণ জানা সত্ত্বেও অমনিভাবে বলতেই ভালো লাগল মন্মথর!

ভারী গলায় ধীরে ধীরে অভিরামবাবু বললেন—বিশে আর ত্রিশে যে অনেক তফাত হে! নিজের সম্পত্তির পরিমাণ জান না এ কেমন কথা। শেষের কথায়

যেন এক ধরনের অভিযোগের ছোঁয়াচ লাগল।

মাধববাবু হেসে বললেন—ও বালক, কি করে জমির পরিমাণ জানবে অভিরাম। আর ওকে যা দেখলাম, ও ঠিক বৈষয়িক মনের মানুষ নয়। বিষয় সম্পত্তি যারা করে আর যারা করে না তাদের মনের জাত আলাদা আলাদা হে!

অভিরামবাবু আর বিষয়ের প্রশ্ন করলেন না, অন্য প্রশ্ন করলেন।—কয় ভাই তোমরা?

—দুই ভাই। আমার ছোট ভায়ের বয়স এই মাস কয়েক, এখনও অন্নপ্রাশন হয় নি।

একটু চুপ করে থাকলেন অভিরামবাবু। তারপর অন্য একটা প্রশ্ন করলেন—কলেজে ভর্তি হয়েছ?

—এই হব এইবার। প্রেসিডেন্সিতে।

—হুঁ! লেখাপড়া শিখে কি করবে! কি করতে চাও? করবার ইচ্ছেটা কি?

মন্মথ হাসল। মাধববাবু জিজ্ঞাসা করলে, সেই আগের বারের মতোই বলত, ল' পড়ব। কিন্তু অভিরামবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সে বললে—তা কি করে বলব? ইচ্ছে তো অনেক। মনে হয় সব হই। কিন্তু কি হব তা তো জানি না!

অভিরামবাবু কি বলতেন কে জানে এই সময় রামধনি এসে বললে—খাবার জায়গা হয়েছে।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম উঠে দাঁড়ালেন মাধববাবু। বললেন—খাওয়ার পর ওকে আবার পৌঁছে দিতে হবে। চল হে অভিরাম! এস ভাই!

দু তিনখানা ঘর পার হয়ে একখানা ঘরে তাদের নিয়ে ঢুকলেন মাধববাবু। খাবার ঘর। পর পর পাশাপাশি তিনটি খাবার জায়গা করা। গালচের আসনের সামনে থালা, থালার পাশে পাশে চারটে পাঁচটা করে বাটি সাজানো। কিন্তু থালা বাটির রং অমন সাদা কেন? আর কি উজ্জ্বল? তা হলে বাসনগুলো কি সবই রুপোর? তাই হবে! মাধববাবু যে খুব ধনী মানুষ এটা সে বুঝতে পারলে। বুঝতে পারলে যে এখনও পর্যন্ত এমন কিছু সে দেখে নি যাতে মন্মথ বুঝতে পারে যে এরা বড় লোক, খুব বড় লোক; তাই এই বুঝাবার ব্যবস্থা!

রুপোর বাসনের পরই চোখ তুলে চাইতেই এমন একজনের উপর নজর পড়ল যাকে দেখলে এক নজরেই বুঝতে পারা যায় যে তিনি এসবের চেয়েও দামী। তাঁর চোখে চোখ পড়তেই নজর পড়ল তিনি মাথার ঘোমটা সামান্য একটু টেনে বাড়াচ্ছেন। অবশ্য তাতে তাঁর কপালের সামান্য অংশও ঢাকা পড়ল না। ওটা একটা নিয়ম রক্ষার ব্যাপার মাত্র। তিনি তাকেই দেখছিলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

মন্মথও তাঁকে দেখলে। দেখবার মতো চেহারা। সাদাটে ফর্সা রঙ, বড় বড় চোখ, টানা টানা ভুরু, টিকলো নাক, যৌবনে অসাধারণ রূপসী ছিলেন, এখন একটু মোটা হতে আরম্ভ করেছেন। উপর হাতে অনন্ত, নিচে হাতে যতটা সম্ভব ততটা শংখাহীন চুড়িতে ঢাকা, হাতে দুটো তিনটে আংটি, নাকে নাকছাবি, তাতে বোধহয় খুব দামী কোনো পাথর বসানো, হীরেই হবে হয় তো, তার থেকে মুখের নাড়াচাড়া হলেই আলো ছিটকে পড়ছে।

এত সব নিশ্চয়ই মন্মথ প্রথম নজরেই দেখতে পায় নি, আস্তে আস্তে সমস্ত ক্ষণটার মধ্যে দেখেছে। তাঁর চোখে চোখ পড়তেই মন্মথ লক্ষ্য করেছিল তিনি তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন। মাধববাবু একটু হেসে বললেন—আর একবার তোমাকে মাথা নোয়াতে হবে ভাই। ইনি আমার ঘরের গিন্নি, আমার স্ত্রী।

মন্মথ হাসিমুখে সসম্ভ্রমে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলে। তারপর উঠে দাঁড়াল। তাকে আর একবার দেখে নিয়ে তিনি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বললেন —এ তো বেশ ছেলে, খাসা ছেলে? তা কই, সে রকম তো কিছু নেই। এ তো আমাদের ছেলেদের মতো। বেশ ছিমছাম!

মন্মথ দেখলে স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও ভদ্রমহিলার অমন সুন্দর ভ্রূ কেমন কুঁচকে গেল, কেমন খারাপ লাগল দেখতে।

মাধববাবু বললেন—আর চেহারাখানি কেমন সুন্দর তা বল। ওর নাম মন্মথ, তা সাক্ষাৎ মন্মথর মতো রূপ বটে!

মন্মথ বিনীতভাবে মাথা হেঁট করে একটু হাসল এ প্রশংসা শিরোধার্য করে। শুধু ছোট্ট করে বললে—পুরুষ মানুষের রূপের প্রশংসায় কি হবে?

মাধববাবু হা হা করে বললেন—ঠিক বলেছ ভাই, মাধববাবু হাসলেন বটে কিন্তু মন্মথ লক্ষ্য করলে গিন্নী ঠাকরুনের ভ্রূ আবার কুঁচকে গেল, অভিরামবাবু গলায় একটু চাপা শব্দ করলেন।

গিন্নীঠাকরুন খুব সস্নেহে বললেন—বস, আসনে বস, খেতে বস। আর দেরি করো না।

তিনি যথাসম্ভব স্নেহের সুর লাগিয়েই কথা বললেন, কিন্তু মন্মথর মনে হলো স্নেহপ্রকাশ তাঁকে অনেক চেষ্টা করে করতে হয়, কিন্তু হুকুমটা যেন তাঁর সহজে আসে। আর তার পিছনে একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সুর প্রচ্ছন্ন থাকে।

তিনজনেই খেতে বসলেন। তারই মাঝখানে কথা চলতে লাগল। আহার্য গ্রহণ করবার পূর্বে সকলেই গণ্ডুষ করেছেন।

ও ঘরে যেমন অভিরামবাবু প্রশ্ন করছিলেন এ ঘরে তেমনি প্রশ্ন করতে লাগলেন

গিন্নীঠাকরুন। তবে এ প্রশ্নগুলির ধরনধারণ আলাদা। খাবার তদারকি করার ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্ন করে চললেন তিনি। প্রথম প্রশ্ন করলেন—তোমরা কয় ভাই বোন?

—বোন নেই, আমরা দুই ভাই। আমি আর আমার ছোট ভাই, এই মাস কয়েকের।

—মাস কয়েকের ভাই? মাঝখানে বুঝি তোমার মায়ের ছেলেপিলে নষ্ট হয়েছে?

—না! ছেলেটি আমার বৈমাত্রেয় ভাই। আমার বিমাতার ছেলে।

একাধিক খাঁজে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল গিন্নীঠাকরুনের। বললেন—মা নেই?

মন্মথ একটু হেসে বললে—না।

এরপর স্বাভাবিকভাবেই নীরবতা নেমে এলো। সকলেই নীরবে খেয়ে চললেন। কিছুক্ষণ পর গিন্নী আবার প্রশ্ন করলেন—বাড়িতে কাজ করবার লোক, মানে ঝি-চাকর আছে?

মন্মথ বললে—না। তবে বাড়ির পাটকাম করার জন্যে বাগ্দী-ঝি আছে।

আবার নীরবতা। তারপর আবার প্রশ্ন—বাড়িতে ধান সেদ্ধ করতে হয় নাকি?

—তা হয় বই কি! বাড়িতে ঠাকুর আছেন, দেবসেবা আছে, তার চাল আমার মাকেই তৈরি করতে হয়।

এই সময় জল খেতে গিয়ে বিষম খেলেন মাধববাবু। তিনি জলের গ্লাস নামিয়ে কাশতে লাগলেন। সবাই তাঁর কাশির ফলে রাঙা-হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি সুস্থ হয়ে আবার খাবার থালায় হাত দিলেন।

প্রশ্নটায় মন্মথর মনের ভিতরে একটা ক্ষোভ মাথা তুলে উঠল। এ কি ধরনের প্রশ্ন! কিন্তু শেষ প্রশ্নের তখনও বাকী ছিল। গিন্নী প্রশ্ন করলেন—তোমার মাকে গোবর দিতে হয়?

রাগে মন্মথর ভিতরটা অস্থির হয়ে উঠল। সে সামান্য ঘরের ছেলে হলেও সে সর্বত্র সমাদর পেতেই অভ্যস্ত। তার মনে হতে লাগল, কে যেন তার ভিতর থেকে তাকে বলছে, এর জবাব দাও, জবাব দাও, না হলে খুব কষ্ট পাবে। সে জবাব দিলে, বললে, নম্র ভাবেই বললে—তাও দিতে হয় বই কি! গরীবের ঘর তো! বলেই নিজের কথার পিঠেই বললে—আমি গরীবের ছেলে সে তো বুঝতেই পেরেছেন। তবু এত সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন কেন বলুন তো?

গিন্নীঠাকরুন বোধহয় এ ধরনের কথা কখনও শোনেন নি। তিনি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন—তোমাকে আদর করে রুপোর থালায় বাবুর পাশে বসিয়ে খাওয়াচ্ছি বলে কি তুমি ভেবেছ তোমাকে

আমার নাতজামাই করব ?

প্রচণ্ড রাগ মন্মথর মুখে একটা তীক্ষ্ণ হাসি হয়ে চেহারা নিলে, তারপর সেই হাসি তীক্ষ্ণতর কথার তীব্রতর বাণ হয়ে তার মুখ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। সে হাসি-মুখে বললে—আপনি কি ভাবছেন আপনিই জানেন, কিন্তু আপনি আপনার নাতনীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইলেও আমি সে বিয়ে করব না। করতে পারব না। আমি সামান্য গরীব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে, আমি আপনাদের বাড়ির মেয়ে বিয়ে করতে পারি ? সে দুর্বুদ্ধি কেন হবে আমার ?

গিন্নীঠাকরুন বোধহয় আরও কঠিনতর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার পূর্বেই মাধববাবু কঠিন উচ্চ কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন—আঃ গিন্নী !

ব্যাস, এক মুহূর্তে সব নীরব, নির্বাপিত হয়ে গেল।

বিদায় নেবার পূর্বে মাধববাবু দরজার কাছ পর্যন্ত নেমে এলেন। সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনাটার সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না। কেবল একান্তে তাকে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন—কিছু মনে করো না ভাই ! মনে কোনো ক্ষোভ রেখ না। যাও, গাড়িতে গিয়ে ওঠ। আমি জীবনে যদি কোনো পুণ্য অর্জন করে থাকি তা হলে তার বলে বলছি—তুমি কীর্তিমান হবে, বড় হবে।

মন্মথর ইচ্ছা হয়েছিল গাড়িতে না ফিরবার। না ফিরে অপমানের কঠিনতর উত্তর দেবার। কিন্তু শুধু এই মানুষটি আহত হবেন বলেই এ অনুরোধ সে প্রত্যাখ্যান করলে না। তাকে আবার দণ্ডবৎ প্রণাম করে সে গাড়িতে গিয়ে উঠল। যে যৎ-সামান্য অন্ন ও আশ্রয়ের ঋণ তার ওঁর কাছে ছিল তা আজ ওঁর বাড়িতে বোধহয় শেষবার অন্নের অমৃত গ্রহণ করার সঙ্গে অপমানের বিষয়ও গ্রহণ করে শোধ করে এসেছে।

গাড়িতে উঠেই মন্মথর মনটা কেমন হয়ে গেল যেন। এই যে এত আঘাত এবং প্রত্যাঘাতের ঘটনা ঘটে গেল তার জীবনে, সেই কারণে বিপুল ক্ষোভ এবং আনন্দ তার মনের আকাশে জমে ওঠার কথা। কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে গেল নিজের মনের অবস্থা অনুভব করে। সেখানে ক্ষোভ অথবা আনন্দ বা কোনো আবেগের মেঘের বাষ্প মাত্র নেই, মন তার আশ্চর্য রকম নির্মেঘ, নির্মল, প্রশান্ত। তার বদলে একটি বিচিত্র চিন্তা ও অনুভবের আলো যেন মনোলোকের কোন্ দিগন্ত থেকে ক্ষণে ক্ষণে এসে মনের প্রশান্ত পৃষ্ঠপটের উপর পড়ছে। এ চিন্তা ও অনুভবকে সে এর পূর্বে আস্বাদনও করে নি, এবং তার স্বরূপটাকেও সে চিনতে পারছে না। এক অচেনা অস্পষ্ট ভাবনায় ভাবিত, ভাবিত কেন, যেন প্রায় আচ্ছন্ন হয়েই সে বাড়ি ফিরে এলো।

গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলে বাড়ির দরজায় দ্বিজু মুন্সী দাঁড়িয়ে আছে। তারই জন্য দাঁড়িয়ে ছিল বোধহয়। সে কাছে আসতেই সাগ্রহে দ্বিজু মুন্সী জিজ্ঞাসা করলে—কি কেমন খেলে নাতি?

মন্মথর বেশী কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। তবু দ্বিজু মুন্সীর এই সমাদর ও আগ্রহকে ক্ষুণ্ণ করতে পারলে না সে। হাসিমুখেই বললে—ভালো।

—অত বড় লোকের বাড়ি! আর মাধববাবু অমন ভালো লোক, মহৎ লোক! তার বাড়ির খাওয়া শুধু ভালো? এ তুমি কি বলছ ভাই নাতি?

মন্মথকে কথার জালের মধ্যে পড়তে হলো। সে হাসিমুখে বললে—আপনার মাধববাবু সত্যিই ভালো লোক, মহৎ লোক! কিন্তু রুপোর থালা-বাসনে ভালো ভালো খাবার খেতে দিলেই কি ভালো লাগে? যা খেয়েছি, তার চেয়ে আপনার বাড়িতে চারু-মায়ের হাতের খাবার অনেক ভালো, অনেক বেশী মিষ্টি লাগে আমার মুখে।

দ্বিজু মুন্সীর কালের রেখাঙ্কিত প্রৌঢ় মুখের মধ্যে ছোট ছোট নিষ্প্রভ চোখ দুটি জলে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। লণ্ঠনের আলোয় সেটা নজরে পড়ল মন্মথর। মন্মথ জানে, তার মুখ থেকে সম্মান সমাদরের বাক্য শুনলে এই সামান্য, তুচ্ছ অথচ একান্ত সহৃদয় মানুষটার বুকের ভিতরটা উথলে ওঠে। কাঁপা গলায় দ্বিজু মুন্সী বললে—না, না, এ তুমি কি বলছ ভাই নাতি! তুমি বেশী বলছ! মাধববাবু মানুষটাকে তুমি খুব ভালো করে জান না গো, তাই বলতে পারলে কথাটা। ও মানুষকে চেন না তুমি। অমন মানুষ কোটিতে একটা জন্মায় হে।

মন্মথ আর কথা বললে না, এ নিয়ে কথা বাড়াতে আর ভালো লাগল না। সে শুধু একটু হাসল। কারণ সে তো জানে, দ্বিজু মুন্সী মাধববাবুকে দেখেছে পরোক্ষ ভাবে জ্যোতিপ্রসাদবাবুর মামলা-সেরেস্তার মারফত, দেখেছে তাঁর বাইরের চেহারাটা; তাঁর মিষ্টভাষা, ধীর শান্ত নম্র ব্যবহার, শান্ত প্রসন্ন চালচলন থেকে বয়সের অভিজ্ঞতায় যতটা জানবার বুঝবার তা জেনেছে বুঝেছে। কিন্তু সে তাঁর যে অজ্ঞাত, অন্তরঙ্গ মূর্তি বারবার দেখেছে তার সাক্ষাৎ দ্বিজু মুন্সী কখনও পায় নি! তাই কথাটা ঘুরিয়ে সে বললে—দাদু, খাবার কি দামী থালা-বাসন আর দামের গুণে ভালো লাগে? খাবার ভালো লাগে ভালবাসার অমৃতে!

তার সব কথাই শেষ পর্যন্ত যেমন একান্ত আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে দ্বিজু মুন্সীর এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। সে বার বার ঘাড় নেড়ে বললে—এটা তুমি ঠিক বলেছ। খুব পণ্ডিতের মতো বলেছ! তা না হলে হস্তিনাপুরে এসে ভগবান দুর্যো-ধনের বাড়ির রাজভোগ ত্যাগ করে বিদুরের ক্ষুদ খেতে গিয়েছিলেন কেন, বিদুরের

ক্ষুদ তাঁর বেশী মিষ্টি লেগেছিল কেন? এটা তুমি যথার্থ বলেছ। তা ভাই, তোমার চারু-মার সঙ্গে একবার দেখা করো।

মন্মথ উঠে দাঁড়াল, ইচ্ছা করে একবার দুই হাত তুলে আড়মোড়া ছাড়ল, মুখে বললে—ঘুম আসছে। শুতে হবে। আমি সামান্য লোক, আমার কি এত ঝামেলা পোষায়।

দ্বিজু মুন্সী বললে—তা ভাই, তোমার যত ঘুমই আসুক শোবার আগে একবার তোমার চারু-মার সঙ্গে কথা বলে যেও। তা কাল কোথায় যাবে? কাল কিন্তু খাওয়া-দাওয়া করে বেরিও। রান্না করে, খেয়ে, তারপর যেখানে যাবার সেখানে যাবে। চারুও বোধহয় সেই জন্যেই বসে আছে।

—তাই যাব। কাল সত্যদের বাড়ি যাব দাদু। বরং আপনার সঙ্গেই যাব।

আবার পুলকিত হলো দ্বিজু মুন্সী। খুশী হয়ে বলল—সে বেশ ভালোই হবে। সন্ধ্যের সময় যাবে আমার সঙ্গে।

—আপনি বলেছেন নাকি যে আমি কলকাতায় এসেছি, এসে আপনার এখানে রয়েছি।

দ্বিজু মুন্সী বললে—তা বলেছি ভাই!

মন্মথ হেসে বললে—না বললেই ভালো হতো। আমি দুদিন আগে কলকাতায় এসে দুদিন পরে সত্যদের বাড়ি যাচ্ছি সত্যর সঙ্গে দেখা করতে, এটা মনে করে সত্য হয়তো মনে মনে অভিমান করবে।

বার বার ঘাড় নেড়ে মুন্সী বললে—না গো, সত্য তোমায় সে রকম ছেলেই নয়। সত্য কেন, ওদের বাড়ির সকলেরই রীতকরণ ভিন্ন রকম। অত বড়লোক, অত নাম, অত খাতির, কিন্তু বাড়িতে কি কর্তা, কি গিন্নী, কি ছেলেমেয়ে কারও এক-বিন্দু অহংকার নেই। অন্যদের চেয়ে যে তারা বড়, তারা আলাদা কিছু, তা কখনও মনে করে না। কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার যত সুন্দর তত মিষ্টি। আমার সাহেবের মানে জ্যোতিপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অবশ্য একটু আলাদা। আমার সঙ্গে সম্পর্ক তা তোমার বহুকালের। আমার সঙ্গে ব্যবহারের কথা না হয় ছেড়ে দাও। অন্যদের সঙ্গেও ওদের সবারই ব্যবহার তো দেখেছি। এ আর অন্যত্র দেখি নি! এই তো কলকাতায় কত বড় বড় রাজা, জমিদার, বড়লোক রয়েছে, মা বাপের আশীর্বাদে দেখলাম তো অনেককেই, তাদের মুখের কথা এক-বার শোন, শুনলেই মনে হবে, হ্যাঁ বাবা, রাজা বটে, জমিদার বটে। বাবা, এধার আর মাড়াব না; এ কথা আর কানে শুনব না। তবে ব্যতিক্রমও আছে। তা তোমায় যা বলছিলাম। আমার সাহেবকে তোমার আসার কথা বলেছি। তিনি

তোমাকে যেতে বলেছেন সময় করে।
মন্মথ বললে—তা হলে কাল সকালে যখন আপনি সেরেস্তায় যাবেন তখন সত্যকে ডেকে চুপি চুপি বলবেন, আমি বিকেলে যাব ওদের বাড়ি। ও যেন বাড়িতে থাকে। ওর বাবাকে কিছু বলার দরকার নেই। খুব পরিতৃপ্ত হয়ে প্রসন্ন মুখে ঘাড় নাড়লে দ্বিজু মুন্সী।
মন্মথ বাড়ির ভিতরে গেল। তার পিছন পিছন বাড়ির ভিতর যেতে যেতে দ্বিজু আপন মনেই বলতে বলতে গেল—চল, আমিও আফিং খাই গিয়ে। আমার এখনও আফিং খাওয়া হয় নি তোমার জন্যে।
বাড়ির মধ্যে যেতেই চারু বললে—তুমি কেমন ছেলে গো! আজ তিন বেলা এসেছ, একবার ভালো করে খাওয়া হলো না। কাল দিনের বেলা না খেয়ে তোমার কোথাও যাওয়া চলবে না বুঝলে! আমি সব যোগাড় করে রেখেছি, বাবা কেবল সকালবেলা বাজার থেকে একটু ভালো দেখে মাছ কিনে এনে দেবে। তুমি রান্না করে, ভালো করে খেয়ে যেখানে বেরুবার সেখানে বেরিও। আমি তোমার জন্যে বসে থাকতে পারব না, এ বলে দিলাম।
হুকুম জারী করেই চারু সেখান থেকে চলে গেল, দাঁড়াল না।
দ্বিজু মুন্সী বললে—শুনলে তো!
মন্মথ হেসেই বললে—চারু মায়ের হুকুম শুনলাম। সেই হুকুম মতোই কাজ হবে। বলে আপনার ঘরে গিয়ে ঢুকল মন্মথ। এ বেশ এক রকম লাগছে তার। জীবনের এ এক নূতন খেলাঘরে সে ছেলে সেজে ঢুকে পড়েছে। তাকে ছেলে সাজিয়ে বাল-বিধবা কন্যার কোলে তুলে দিয়েছে দ্বিজু মুন্সী আশ্রয় ও অন্নের বিনিময়ে। মনে মনে নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে নিলে মন্মথ। না, শুধু অন্ন আর আশ্রয় নয়, তার সঙ্গে বিপুল সমাদরও আছে। এই তো এক জায়গায় ধনীর বাড়িতে কিছুকাল অন্নদাস হয়ে ছিল সে। সেখানে যেমন উদ্বৃত্ত অন্নের চারটি ছড়িয়ে দিয়ে কাক-কুকুরকে পরিতৃপ্ত করে তেমনিভাবেই তো ছিল সেখানে। সমাদর করেই ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন মাধববাবু। কিন্তু ঐ ডাকা পর্যন্তই। তার বেশী সে আর কিছু পায় নি। কেউ তাকে একদিন ডেকে তার সুখ-সুবিধার কোনো খোঁজ নেয় নি। মেসের অন্য যারা ছিল তারা তাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করত। ভাবত, এ ছেলেটা এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছে। তার সঙ্গে কেউ ভালো করে কথাও বলত না। তবে সে ক্ষোভ আজ মুছে গিয়েছে। মুছিয়ে দিয়েছেন মাধব-বাবু। ওঁকে যারা ভালো করে চেনে তারা বলে সোনার মানুষ। তা সোনার মানুষই বটেন মাধববাবু!

কিন্তু—

গায়ের পিরানটা খুলতে খুলতে মন্মথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বলা ভুল হবে, দীর্ঘনিশ্বাস আপনাআপনি পড়ল। কি বিয়োগান্ত ব্যাপার আজ ঘটে গেল তার জীবনে!

আবার মনের অস্পষ্ট ভাবনাটা ফিরে এলো মনের ভিতর।

যতক্ষণ দ্বিজু মুন্সী আর চারু-মার সঙ্গে কথা বলছিল ততক্ষণ কথাবার্তার আড়ালে চিন্তাটা অস্পষ্টভাবে ক্রিয়া করে যাচ্ছে বলে অনুভব করছিল সে। এখন মনের সামনে এসে দাঁড়াল চিন্তাটি।

ভাবনাটি একটি সিদ্ধান্তের মূর্তিতে মনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মন তাকে বার বার এই কথাই যেন বোঝাচ্ছে যে, আজ সন্ধ্যায় যা ঘটল তাতে মাধববাবুর সঙ্গে তার জীবনের পথ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আর কখনও দুজনের জীবন-পথ এক বিন্দুতে দূরের কথা, এক রেখাতেও মিলিত হবে না। মিলিত হবার দূরতম সম্ভাবনাও আজকের ঘটনা মুছে দিয়ে গেল।

সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বিছানা আর কি, তক্তপোশের উপর একটা পাটি আর একটা বালিশ আর একখানা হাতপাখা। বালিশটায় কেমন একটা আরশুলা-আরশুলা গন্ধ! তার অস্বস্তি করে। অথচ সে জানে বাড়িব তোলা বিছানা থেকে চারু-মা বালিশটা বের করে দিয়েছে। তাকে তার বিছানা খুলতেও দেয় নি। বলেছে, যখন কলেজের বাড়িতে গিয়ে থাকবে তখন খুলো, খুলে শুয়ো। বালিশ-টায় অস্বস্তি হয়, তবু চারু-মা মনে দুঃখ পাবে বলে বিছানা খুলে নিজের বালিশটা বের করতে পারে না।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ, বড্ড গরম। পাটির উপর আশপাশ করতে করতে ঘুমও আসছে না। হাতপাখা চালানোর অভ্যাসও তার নেই। আর ভালোও লাগে না।

কিন্তু এ কি হলো? যা হয়ে গেলো তা না হলেই বোধহয় ভালো ছিল। গিন্নী ঠাকুরুন যখন খুঁচিয়ে মারার মতো প্রশ্নগুলো এক এক করে জিজ্ঞাসা করছিলেন তখন আঘাত পেলেও তা সহ্য করে গেলেই বোধহয় ভালো হতো! কিন্তু সে ভালো হবার নয়। গিন্নীঠাকুরুন যখন একটার পর একটা ঐ সব অশালীন প্রশ্ন করছিলেন তখন আহত হয়ে কে যেন তার মনের মধ্যে যন্ত্রণায় হা-হুতাশ কর-ছিল। সে বার বার যেন তার ভিতর থেকে তাকে হাহাকার করে অনুরোধ কর-ছিল—বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আমাকে এই যন্ত্রণা আর আঘাতের হাত থেকে বাঁচাও। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তাকে বাঁচাবার জন্যই তো মন্মথকে

মনে মনে সোজা শক্ত হতে হয়েছিল। তাকে আড়াল করতে গিয়েই রাগটা হাসি হয়ে, হাসিটা ধারালো কথা হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে। প্রতিপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে আহত হতেই তার ভিতরের সেই জনটি পরম স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলে শান্ত হলো যেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ দিলে—প্রতিপক্ষকে আঘাতটা খুব বেশী লেগেছে, দুটো ভালো কথা বলে ওকেও শান্ত কর, যেমন আমি শান্ত হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গেই কঠিন কথার সঙ্গে নিজের দারিদ্র্যের কথা একান্ত নম্রতার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে প্রতিপক্ষকে শান্ত করতে চেয়েছিল। তার যতটুকু করার সে করেছে, তাতে যা ফল হয়েছে হয়েছে। তার তো আর কিছু করার ছিল না।

কিন্তু ওই আঘাত পাবার সময় যে তার ভিতরে আবির্ভূত হয়েছিল সে কে? সে কোথায় গেল? সে এসেছিল কোথা থেকে?

আর তো তার কোনো হদিস মিলছে না। সে কি সে নিজেই? তাই যদি হয় তবে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? অথচ নিজের সহজ সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে সে হঠাৎ কখনও কখনও অভিভূত হয়েছে—এ তো দেখেছে সে নিজে। আগে যখন তার নিজের মনের মধ্যে সে জেগে উঠত তাকে সে চিনতে পারত না। আজ প্রথম তাকে চিনতে পেরেছে সে। এবং সেই চেনার পথ ধরে নিজের ছোট্ট সতের আঠারো বছরের জীবনের পিছন দিকে হেঁটে ফিরে গিয়ে সে আজ নিঃসংশয়ে দেখতে পাচ্ছে—এই অচেনা অজানা তার জীবনে তার নিশ্চিত হাতের ছাপ চিরকালের জন্য রেখে গিয়েছে। সে তার জীবনকে, তার জীবনকে কেন, পুরোপুরি তাকেই মোচড় দিয়ে যা ছিল তা থেকে অন্যরকম হবার পথ ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। জীবনে প্রত্যেকবার সে-ই তাকে মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

ছেলেবেলায় তাকে চেনার মতো বোধ ছিল না। সে বার বার এসেছে তার জীবনে, আবির্ভূত হয়েছে তারই মধ্য থেকে। কিন্তু তাকে তখন চিনতে পারে নি। আজ সর্বপ্রথম ছেলেবেলার কথাটাই তো মনে পড়ছে! কাকা জটাধর যখন কাকীমা কৃষ্ণভামিনীকে নিয়ে অনেক উপার্জনের উত্তাপ নিয়েও সসংকোচে আবার বড় ভাই গঙ্গাধরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সেদিন বলাবাহুল্য, জটাধরের অনেক উপার্জন গঙ্গাধরের বা গঙ্গাধরের ছেলে মন্মথর মনে বিন্দুমাত্র সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা জাগাতে পারে নি। বরং দেশত্যাগী, কুলত্যাগী, এবং আংশিক-ভাবে ধর্মত্যাগী ও আচারভ্রষ্ট খুড়োকে সেদিন সে ভালো চোখে দেখে নি; দেখেছিল অনেকটা অবহেলার চোখেই। খুড়ো জটাধরের আতিশয্যময় আত্মীয়-তার ভঙ্গি তার বালকের দৃষ্টিতেও খুব শোভন মনে হয় নি। খুড়ো কলকাতায়

যে জীবন অতিবাহন করে তার প্রতিও তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বা লোভ ছিল না। তা সত্ত্বেও সে কয়েকদিন যেতে না যেতে সেই খুড়োকেই কলকাতা যাবার কথা বলেছিল। তাকে কে বলিয়েছিল সেই মারাত্মক কথা? সে জানত যে তার বাবা চায় না যে মন্মথ তাকে ছেড়ে বাইরে যাক; তার বাবা চাইত না যে সে সংস্কৃত ছেড়ে ইংরেজী শিখুক। জানত সে, খুব ভালো করেই জানত। বাবাকে দুঃখ দেবার বিন্দুমাত্র কল্পনাও সে করতে পারত না। তা সত্ত্বেও সে কি করে বলেছিল কথাটা খুড়োকে? কে বলিয়েছিল তাকে?

আজ তো সেদিনের কথাগুলো মনে পড়ছে খুব স্পষ্টভাবে।

সেদিন সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরের বারান্দায় বসে খুড়ো ভাইপোতে কথা হচ্ছিল। কথা হতে হতে এক সময় তের চৌদ্দ বছরের ছেলে মন্মথ চুপ করে গিয়েছিল। তার সব কথা যেন হারিয়ে গিয়েছে।

তারই মধ্যে জটাধর তাকে ডেকেছিল—মন্মথ!

সে কোনো কথা বলে নি; শুধু একটি ছোট্ট 'উ' বলে কথা সেরে তাকিয়েছিল আকাশের দিকে। বোধহয় হারানো কথা খুঁজছিল তারার আলোয়। জটাধর আবার ডেকেছিল তাকে—কি রে, কিছু বলছিস না যে?

—কি বলব কাকা?

—কিছু বল, যা হোক কিছু।

—হাঁ কাকা।

—কি রে?

—যা হোক কিছু বলতে গিয়ে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল—আমাকে তুমি কলকাতা নিয়ে যাবে?

যা বলেছিল তার অর্থ মন্মথ সেদিন বুঝতে পারে নি। কিন্তু তার ধাক্কায় অভিভূত জটাধর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কলকাতা? যাবি তুই? চল দেখে আসবি—সব দেখাব তোকে; কত দেখবার জিনিস আছে—হাবড়ার পুল, ট্যাঁকশাল, লাটসাহেবের বাড়ি, চিড়িয়াখানা, মুজিয়ম, সাহেব মেম, জাহাজ, বড় বড় ঘোড়ার গাড়ি, ট্রাম—

সে ঘাড় নেড়ে বলেছিল—না কাকা।

তার মনোগত বাসনার অর্ধোচ্চারিত প্রথম অংশ থেকে তার বাসনাকে চিনবার ক্ষমতা ছিল না জটাধরের।

তাই তার প্রশ্ন শুনে দ্বিতীয়বার চমকে উঠেছিল জটাধর।—না? এবং আবার প্রশ্ন করেছিল—যাবি বলে না বলছিস কেন?

তার বাসনার নিজের সমস্ত পরিবেশের সঙ্গে বিরোধী বাসনার মূল অংশ উচ্চারণ করেছিল সে—না। মানে, কলকাতার ইস্কুলে আমি পড়ব। ওসব দেখবার জন্তে আমি যাব না।

এইবার মন্মথর বিচিত্র মনোবাসনাকে সহজ মূর্তিতে চিনতে পেরেছিল জটাধর। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে প্রশ্ন করেছিল—পড়বি? কলকাতার ইস্কুলে?

এককথায় তার মনের মধ্যে তার সেই অজানা জন অসংশয়ে শেষ জবাব দিয়েছিল—হ্যাঁ।

এই 'হ্যাঁ'-টা অমন অসংশয়ে কে বলেছিল তার মধ্যে থেকে? তার যা শিক্ষা, তার যা পারিপার্শ্বিক, তার যা যা আবেগের বন্ধন, এই 'হ্যাঁ' বলাটা তার সমস্তটারই বিরোধী। তা হলে অন্ত কেউই তো তার মধ্য থেকে বলেছিল কথাটা। সমস্ত পারিপার্শ্বিককে অস্বীকার করে, সবটা উত্তীর্ণ হয়ে সেই-অজানা তাকে ভিতর থেকে ঠেলে কলকাতার পথ ধরিয়ে দিয়েছিল। তারই ইঙ্গিতে সে এসে পড়েছিল এই কলকাতা শহরে।

অথচ কলকাতা শহরে, তার কোন্ সহায়, কোন্ সম্বল ছিল? কিছুই ছিল না। এমন কি খুড়ো জটাধর, খুড়ী কৃষ্ণভামিনীকেও তো তার সহায় সম্বল বলে বিবেচনা করত না। তা যে সে করত না তার প্রমাণ তো সে কিছুদিন পরেই পেয়েছিল।

সেই আবার একবার।

আবার একবার তার দেখা পেয়েছিল সে। সে দেখা পেয়েছিল যেদিন খুড়ো জটাধরবাবুর নায়েব জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ির দরজায় তাকে ডেকে বলেছিল—রাধাশ্যাম তোমার খুড়ীকে বললে, তোমার ভাশুরপো ব্রাহ্মবাড়ি গিয়ে চা পাউরুটি ডিম খাচ্ছে আর তোমরা লক্ষ্মীপুজো কালীপুজো করছ—ধর্ম হচ্ছে না ছাই হচ্ছে। এই আর কি, গিন্নীমা দপ করে জ্বলে উঠলেন। আমাকে ডেকে বললেন—এখনি যান আপনি। নিয়ে আসুন তাকে। এক্ষুনি—খুব রেগেছেন বাপু। খুব রাগ সে। বুঝেছ! বলেই দিলেন—যদি এক্ষুনি না আসে তবে সে আর যেন না আসে এ বাড়িতে।

কথা শুনে মন্মথর মাথার ভিতরটা যেন একটা অসহনীয় যন্ত্রণায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। কান দুটো লাল এবং গরম হয়ে উঠেছিল। কানের পাশে শিরা দুটো লাফাতে শুরু করেছিল। তার অস্তিত্বের মধ্যে ক্রোধের এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ভিতর থেকে সেই অজানা অপরিচিত ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়েছিল তার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়ে। সে তাকে সেই মুহূর্তে বুঝিয়ে দিয়েছিল—এরপর কাকার

বাড়িতে যাবার তার আর অধিকার নেই।
সে একথা তাকে শোনাতে মন্মথ, যে মন্মথ প্রতিদিনের, সে বিহ্বল হয়ে নিজের ভিতরের এই অজ্ঞাত জনকে প্রশ্ন করেছিল—তাহলে আমি যাব কোথায় ?
সেই অজ্ঞাত তার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় নি। কিন্তু তার বদলে তার মুখ দিয়ে তাকে বলিয়েছিল—আপনি বাড়ি যান নায়েবমশাই। আমি যাব না।
নায়েব একান্ত আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিল—যাবে না ?
—না।
—কোথায় যাবে বলবে তো ? আমি গিয়ে কি বলব ? সামনে রাত্রি—! জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়িতে থাকবে ?
সেই এক প্রশ্ন—কোথায় থাকবে ? কোথায় যাব ? এইবার সেই অজ্ঞাত জন তার মুখ দিয়ে তাকেই তার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল, বলেছিল—আমি এখন রমেশ গোস্বামী স্যারের বাড়ি যাচ্ছি। রাত্রিটা ওঁর বাড়িতে থাকব। তারপর কাল যেখানে হোক, একটা জায়গা দেখে নেব।
নায়েব আরও অবাক হয়ে বলেছিল—সে কি ? রমেশ মাস্টার তো কৃশ্চান !!
অজানা তার মুখ দিয়ে এবার শেষ কথাটা উচ্চারণ করেছিল—আমি জাত মানি না !
—জাত মানো না ?
শেষবারের মতো সেই অপরিচিত তাকে দিয়ে বলিয়েছিল—না।
তার ভিতরের সেই অপরিচিত জন সেই মুহূর্তে যা বলা প্রয়োজন মনে করেছিল তাই বলিয়েছিল তার মুখ দিয়ে। নইলে সে জাত তো কারও চেয়ে কম মানে না।
এই ঘটনাটার কথা যখনই তার পরে মনে হয়েছে, তখনই সে আশ্চর্য হয়েছে। যার কথায় খুড়ীমা রেগে, রাগের মাথায় কথাটা বলেছিল, সেই রাধাশ্যামের উপর তার সাময়িক রাগ হলেও তার সম্পর্কে এমন কথা তো তাকে বলতে বলে নি তার ভিতরের সেই মানুষটি। অথচ কাকীমার কথায় সে তাকে ওই সব বলতে বলেছিল কেন ?
তার ভিতরের সেই জনটি যে কোথায় থাকে তার নিজেরই ভিতরে। মন্মথ তাকে মনের ভিতর খুঁজে দেখেছে, তার খোঁজ মেলে নি ; ডেকে দেখেছে, কোনো ডাকে সে সাড়া দেয় নি ; মন্মথ যখন তার আবির্ভাবের প্রয়োজন বোধ করেছে তখন সে আসে নি। তার প্রয়োজন কখন সেটা সে-ই জানে, সেই মতো সে এসে আবির্ভূত হয়, তাকে যন্ত্রণা থেকে বাঁচায় বিচিত্র পথ দেখিয়ে।

তার ভিতরের সেই জনটি তার বড় আপনার জন, তার একান্ত বন্ধু এটা সে বুঝেছে।
কিন্তু এর পর আরও একজনের সাক্ষাৎ সে পেয়েছে। সে রয়েছে তার জীবনের বাইরে। কিন্তু সে বন্ধু না শত্রু। তার কাজ-কর্মের কি উদ্দেশ্য তা বুঝতে পারে নি, বুঝতে পারে না মন্মথ। সেও এমনি করে অকস্মাৎ বাইরের পৃথিবীতে তার জীবনে বার বার অঘটন ঘটিয়ে যাচ্ছে। অন্তত স্বাভাবিকভাবে, সাধারণভাবে যা ঘটবার তা না ঘটে সে এমন একটা ব্যাপার ঘটিয়ে দেয় যাকে ঘটনা ছাড়া আর কি বলা যায়!
যখন রমেশ স্যারের বাড়ি থেকে পথে বেরিয়ে কলকাতায় আশ্রয়ের জন্যে সে বিভ্রান্ত মনে পথ চলছে তখন সে-ই তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল হরচন্দ্রবাবুর ঘোড়ার গাড়ির সামনে। কি বিচিত্র নিষ্ঠুর কৌতুক তার! তার আশ্রয় জুগিয়ে দেবার জন্য যেন আর অন্য পথ ছিল না। আর কোনো পথ যেন পায় নি সে। তারপর আশ্রয় যদি মিলল তবে কার কি প্রয়োজন ছিল জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়িতে সভায় তাকে হরচন্দ্রের দুই পুত্র আর পুত্রবধূর পাশে বসিয়ে দেবার? তার কি প্রয়োজন ছিল হরচন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র হৃদয়চন্দ্রের স্ত্রী চিন্ময়ীর ঠিক পাশেই বসাবার? তাই যদি বসালে, বেশ করলে! তা হলে আবার নিষ্ঠুর কৌতুক করে হরচন্দ্রবাবুর বাড়িতে এক মারাত্মক উত্তেজনার মুহূর্তে চিন্ময়ীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার কি প্রয়োজন ছিল?
এই জনটি তার জীবনের বাইরে থেকে কি নিষ্ঠুর কৌতুকই যে করে তার সঙ্গে! কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা মন্মথ স্বীকার করবে যে সেও তার বন্ধুজন। তাই যদি না হবে,তা হলে হরচন্দ্রবাবুর বাড়িতে পরম স্নেহে তার আশ্রয় মিলল কি করে? তাই যদি না হবে, তাহলে সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষা ও সংস্কৃতি-অভিমানী হৃদয়চন্দ্র-বাবুর দর্পিতা, কোপনস্বভাবা খেয়ালী স্ত্রীর হাতে অকারণ, প্রচণ্ড অপমানের পর তারই চোখের জলে ক্ষমাপ্রার্থনার দ্বারা সমাদৃত হয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে তার অভিষেকই বা হলো কেন?
সে অস্পষ্টভাবে এই বয়সেই এই দুজনকে বা এই দুই শক্তিকে চিনতে পেরেছে। একজন তার ভিতরে অবস্থান করে তাকে পরিচালিত করে; অন্যজন তার বাইরে এই বিপুল বিস্তৃত সংসারে অবস্থান করে তার জীবনে অঘটন ঘটিয়ে তার জীবনকে নূতন চেহারা দেয়। কিন্তু দুজনেই প্রচ্ছন্ন থাকে, তাদের চিনবার, জানবার, বুঝবার কোনো উপায় নেই। সে তাদের দুজনের হাতের পুতুল মাত্র।

ভাবতে ভাবতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে গরমের মধ্যেই তা আর সে জানে না। কেবল ঘুমোবার আগে একবার পরদিন বিকেলে সত্যদের বাড়ি যাবার কথাটা মনে হয়েছিল। সেই সঙ্গে মনে পড়েছিল সত্যদের বাড়ির আবছা চেহারাটা। কিন্তু সেই প্রাসাদতুল্য বাড়ির আবছা মূর্তির উপর সুন্দর, অতি সুন্দর, একান্ত অভিলষিত, অনতিপক্ক ফলের মতো একখানি মুখ যেন বেশ স্পষ্ট হয়ে বার বার আপন মনে হেসেছিল। সেই সুখস্মৃতি ও সুখস্বপ্নের মধ্য দিয়েই তার জ্যৈষ্ঠ মাসের দুরন্ত গ্রীষ্মের রাত্রি গভীর ও প্রশান্ত নিদ্রার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল।

৩

বাইরের সংসারে তার যে প্রচ্ছন্ন পরিচালকের কথা সে পূর্ব রাত্রিতে ভাবছিল সে যে পরদিন প্রভাতেই তাকে তার আহ্বান পাঠাবে তা কি সে স্বপ্নেও জানত? সে আহ্বান এলো এক স্বল্প-পরিচিত অথচ এক একান্ত আনন্দময় স্মৃতির সঙ্গে জড়িত এক মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকের মুখ দিয়ে।

পরদিন সকালবেলা তার কোনো কাজ নেই। দ্বিজু মুন্সী ও চারু-মার সঙ্গে কথা-মতো আজ তার যত্ন করে রান্নাবান্না করে ভালো করে খাওয়ার দিন। সে স্নান করে নিয়ে উনুনের কাছে রান্নার আয়োজন নিয়ে বসেছে। কথা হয়েছে সমস্ত সংসারের জন্য একটা পদ সে রান্না করে দেবে। ঠিক হয়েছে সে রান্না করবে মুগের ডাল, ঘন করে রান্না করবে, তাতে ডাঁটা আলু আর কাঁঠালের বীচি দিয়ে তাকে স্বাদুতর করা হবে। চারু-মা তার সঙ্গে এই রান্না খেলায় মেতে উঠেছে। সে আধসের খানেক ভাজা মুগের ডাল নামিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে প্রয়োজন মতো কাঁঠাল বীচি, আলু আর ডাঁটা নিয়ে বসেছে কুটবার জন্য। দ্বিজু মুন্সীও এই খেলার আনন্দ উপভোগ করছে, অবশ্য একটু দূর থেকেই। সে সেরেস্তা থেকে এইমাত্র ফিরে এলো। হাসিমুখে বললে—কি নাতি, ডাল চাপিয়েছ নাকি? তাহলে সকাল সকালই তেল মাখি! আবার হাইকোর্টও তো আছে! তা শোন ভাই, তুমি যেমন বলেছিলে, তেমনি চুপি চুপি সত্যকে বলে এসেছি। তুমি বিকেল বেলা এই রোদ পড়তে না পড়তে গিয়ে হাজির হবে। তা বুঝলে, শুনে সত্য কি খুশী! হেসে আমাকে বললে—আসুক একবার দুষ্টুটা। ওকে কি ক'র দেখবেন! আজ ক'দিন কলকাতায় এসেছে, আর তার মধ্যে আমাদের বাড়ি আসার ওর সময় হলো না।

আরও কিছু বলত দ্বিজু মুন্সী, কিন্তু বলা হলো না। বাইরের দরজায় কে কড়া নেড়ে ডাকছে। স্ত্রীলোকের গলা।

কথায় মাঝখানে বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়ে দ্বিজু মুন্সী বললে—কে এলো আবার বিরক্ত করতে! যত সব ঝামেলা!

বাইরের দরজা খুলতেই সে দেখলে—এক অপরিচিত মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক, ঝি হবে কোনো বড়লোকের বাড়ির। আর তার সঙ্গে এক নগ্নদেহ ব্রাহ্মণ। সে দু-জনের কাউকেই চেনে না। সে বিরক্ত ও অবাক হয়ে বললে—কি চাই?

স্ত্রীলোকটি তার বিরক্তি বা বিস্ময় কোনো কিছুতেই অপ্রতিভ হলো না। বেশ ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—এখানে মন্মথবাবু বলে সেই ছেলেটি আছে, যে ফাস্টো না কি হয়েছে!

দ্বিজু মুন্সীর বিস্ময় বাড়ল বই কমল না। সে কিছু বুঝতে না পেরে বললে—কেন? তাতে কি দরকার?

স্ত্রীলোকটি আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হলো। বললে—যাক বাবা, বাঁচলাম! এখানে সে আছে তাহলে? তাকে একবার ডেকে দাও তো বাবা! বল, সুবাসী এসেছে পাথুরেঘাটা থেকে। চপলা পাঠিয়েছে। বল, বললেই সে বুঝতে পারবে।

দ্বিজু মুন্সী এবার বেশ বিরক্ত হয়ে বললে—চপলাই বা কে সুবাসীই বা কে? তাদের সঙ্গে মন্মথর কি দরকার?

বেশ শান্তভাবে সুবাসী বললে—তা দরকারের কথাটা তোমাকে কি বলব বাবা। আর ঐ মন্মথো ছেলেটি সংসারে কতজনকে চেনে তুমি কি তাদের সবাইকে জান? না তোমার জানবার কথা? তা বাবা, কথা বাড়িও না, তাড়াতাড়ি ডেকে দাও ছেলেকে। বড় বিপদে পড়ে এসেছি।

দ্বিজু মুন্সী অত্যন্ত পাকা, পোড় খাওয়া মানুষ। তা সত্ত্বেও এই বিচিত্র অবস্থার সামনে পড়ে সে ঠিক করতে পারছে না সে কি করবে, কি করা উচিত তার। এরা কি মন্মথকে কোনো বিপদে ফেলবার জন্যে এসেছে? তাহলে কি মন্মথকে ডেকে এনে ওদের সামনে হাজির করা ঠিক হবে? এই সাত-পাঁচ ভাবনার মধ্যে সুবাসী নামক স্ত্রীলোকটি বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে—বাবা, ছেলেকে ডেকে দাও। বল বড় বিপদে পড়ে এসেছি। সেই ভোর বেলা থেকে খুঁজতে খুঁজতে এই এত বেলা হলো, তখন ছেলের হদিস পেলাম। যাক, হদিস পেয়েছি এই আমার ভাগ্যি। নইলে আমার কপালে যে কি ছিল তা শুধু কালীঘাটের মা কালীই জানেন?

কি সব বিচিত্র কথা! এর এক বর্ণও বুঝতে পারছে না দ্বিজু মুন্সী। তবে এতক্ষণে

তার বাড়ির সামনে একখানা ভাড়ার ঘোড়ার গাড়ি নজরে পড়ল। ওই গাড়ি করেই তাহলে এসেছে ওরা।

কি করবে ভাবছে দ্বিজু মুন্সী এমন সময় সুবাসীই সোৎসাহে বলে উঠল—ওই তো, ওই তো, ছেলে নিজেই এসে গিয়েছে।

দ্বিজু মুন্সী পিছন ফিরে দেখলে মন্মথ তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের দেখে মন্মথর মুখের চেহারাটা কেমন হয়, সংসারাভিজ্ঞ দ্বিজু মুন্সী তার পুরু চশমার মধ্য দিয়ে সেটা দেখবার চেষ্টা করলে। না, ওদের দেখে ছেলেটার মুখে কোনো ভয়-টয়ের চেহারা ফুটে উঠল না। একটা অর্ধপরিচয়ের অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠেছে ছেলেটার মুখে। কিন্তু দ্বিজু মুন্সীর হঠাৎ যেন খেয়াল হলো, আরে ছেলেটা তো অনেকটা লম্বা। সে নিজে বেঁটে-খাটো লোক হলেও একটা সতেরো বছরের ছেলেকে মুখ উঁচু করে দেখতে হয়, এটা তো সহজ কথা নয়!

ততক্ষণে মন্মথ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তাকে দেখে নিশ্চিন্ত সুবাসী মুখর হয়ে উঠেছে—বাবা আমার, সোনার চাঁদ আমার! তোমাকে দেখে আমার ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুবাসী বললে—কি বাবা, আমাকে চিনতে পারছ না। আমি—

নিজের পরিচয় দেবার আগেই হাসিমুখে মন্মথ বললে—তুমি তো সুবাসী? গঙ্গা-জলের কাছ থেকে এসেছ?

এক মুখ হেসে সুবাসী বললে—এই দেখ! ঠিক চিনতে পেরেছে বাবা আমার! এমন না হলে নেকাপড়ায় এতো ভালো হয়। ছেলের বুদ্ধি কত? পর মুহূর্তেই মুখের হাসি সব পরিতৃপ্তি যেন মাথায় রেখে গম্ভীর মুখে সুবাসী বললে—বাবা, কি বিপদে যে পড়েছি আর কি কষ্ট করে যে তোমাকে পেয়েছি তা কালীঘাটের মা কালী জানেন। বাবারে বাবা!

তার সব প্রগল্‌ভতাকে এড়িয়ে মন্মথ প্রশ্ন করলে—কি হলো? গঙ্গাজল ভালো আছে?

মন্মথর সহজ, শান্ত, সহাস্য ছোট্ট কটি কথায় সুবাসীর যে প্রগল্‌ভতা স্তব্ধ হয়েছিল তা যেন আবার মুখর হয়ে উঠল। সুবাসী তার কথার বন্যার মুখ খুলে দিলে যেন। দুই হাত নেড়ে সে বলতে লাগল—তোমার গঙ্গাজল বাবা, কি বলব, ভালো আছে, আবার ভালো নেই। যার স্বোয়ামী ভালো নয়, ভালো নেই, সে মেয়ের ভালো থাকা আর না থাকা! তোমার গঙ্গাজলের স্বোয়ামী, মানে আমাদের ছোটবাবু আজ পাঁচ দিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ডাক্তার বদ্যিতে

বাড়ি ভর্তি। ঐ সায়েব ডাক্তার যাচ্ছে তো ওই বড় কবরেজ আসছে। ও যাচ্ছে সে আসছে। পাথুরেঘাটার বাড়িতে রয়েছে ছোটবাবু। বাড়িতে কত্তার পরিবার, কত্তার এক বিধবা পিসী অহরহ গাল দিচ্ছে ছোট বৌ আমাদের চপলিকে। বলছে—বামুনের ছেলেকে বিনাদোষে অপমান করে, প্রায় ঘাড় ধরে তাড়ালি বাড়ি থেকে ; ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের জল ফেলিয়েছিস। এখন দেমাকের ফল দেখ। ব্রহ্ম-শাপ এবার হাতে হাতে ফলে গেল। কত্তার পিসী, চপলির দিদি-শাশুড়ী বুড়ী এমনিতে তো নাতবউয়ের ভয়ে চুপ করে থাকে। এখন সুযোগ পেয়েছে, বাড়ি দাপিয়ে ফিরছে আর বলছে—দেখ এখন, হাতে হাতে ফল। তুই ভুলে গেয়েছিস, তোর দাদামশাই ব্রহ্মশাপে তিন দিনের মধ্যে মরেছিল মুখে রক্ত তুলে! এখন দেখ!·· আর ওর সৎ শাশুড়ী, কত্তার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার তার সঙ্গে কুনকুন করছে, সৎছেলের জন্যে ভণ্ডামি করে চোখের জল ফেলছে।

মন্মথ বিভ্রান্ত হয়ে গেল। এ সব শুনে সে কি করবে তা ভেবে কুল পেলে না। এতে যে তার কি করণীয় আছে সে বুঝতে পারছে না। দ্বিজু মুন্সী বিভ্রান্ত হয়েছে ততোধিক। কে গঙ্গাজল, কে চপলি, কে তার স্বামী, কে তার দিদি-শাশুড়ী আর শাশুড়ী, কর্তাই বা কে কিছুই বুঝতে পারছে না সে। কিন্তু সব থেকে ভয়ংকর হয়ে তার মনে ধরা দিলে মৃত্যুশয্যাশায়ী অজ্ঞান একজন আর তার সঙ্গে জড়িত ব্রহ্মশাপের কথা। সে বিহ্বল হয়ে প্রশ্ন করলে—এ সব কি ব্যাপার নাতি?

মন্মথ বললে—বলব, সব বলব আপনাকে। পরে বলব। এখন শুনি ব্যাপারটা কি।

সুবাসী বললে—এখন তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর বলবার সময় নেই ছেলে। তুমি বাবা গাড়িতে ওঠ! চল আমার সঙ্গে।

মন্মথ বিব্রত ও বিভ্রান্ত হয়ে বললে—আমি গিয়ে কি করব?

এবার দৃঢ় প্রত্যয়ের কণ্ঠস্বরে সুবাসী বললে—তুমি গিয়ে অজ্ঞান ছোটবাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে। দিলে ছোটবাবু ভালো হয়ে যাবে।

আরও বিস্মিত হলো মন্মথ। সে অবাক হয়ে বললে—দূর, তাই হয় নাকি! আর আমি তো কোনো শাপ শাপান্ত করি নি সে তো তুমিও জান। আমি গিয়ে কি করব।

না, তোমাকে যেতেই হবে। তুমি গিয়ে আশীর্বাদ করলেই ছোটবাবু ভালো হয়ে যাবে। এ আমার কথা নয়, এ তোমার গঙ্গাজলের কথা। সে এইসব গালমন্দ শুনে যত ভয় পেয়েছে তত 'অরলঝরল' কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতেই সে দিদি-

শাশুড়ী আর সংশাশুড়ীকে বলেছে—আমি যদি সতী হই তো সেই ব্রাহ্মণের ছেলে এসে আমার স্বামীকে আশীর্বাদ করে যাবে।...তা তুমি আর দেরি করো না বাছা, ওঠ গাড়িতে ওঠ।

আবার গাড়িতে ওঠার অনুরোধ শুনে সে কি করবে ঠিক করতে না পেরে দ্বিজু মুন্সীর মুখের দিকে চাইল। দ্বিজু মুন্সী তার কাঁধে হাত দিয়ে একান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলে—তোমার গঙ্গাজল কে নাতি? তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবার জন্যে এসেছে?

মন্মথর তখন সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। সে বললে—আমি পিরানটা গায়ে দিয়ে আসি। সুবাসী, তুমি একটু দাঁড়াও।

দ্বিজু মুন্সীকে বললে—আপনাকে সব বলব এসে। আমার গঙ্গাজল হলো পাথুরে-ঘাটার হরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছোট পুত্রবধূ। হরচন্দ্রবাবুকে তো আপনি চেনেন দাদু, হাইকোর্টের বড় উকিল। আমি চারু-মাকে বলে আসি।

ভিতরে তখন চারুর কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছে যে মন্মথকে কারা নিতে এসেছে গাড়ি নিয়ে, মন্মথ যাচ্ছে তাদের সঙ্গে। শুনে সে যাকে বলে ক্রুদ্ধা ফণিনীর মতো ফোঁস করে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে যেতে দেবে না মন্মথকে না খাওয়া-দাওয়া করে। বাড়ির ভিতরে পিরান-গায়ে দেবার জন্য ঢুকতেই চারু ফোঁস করে উঠল—তুমি না কি আবার কোথা চললে গাড়ি চেপে? তার মানে তুমি রান্না করবে না, খাবেও না এ বেলা?

চারুর চোখে রাতের আগুনের ছটার উপরে তখন অভিমানের জলের একটা চিলতে এসে জমেছে, সেটা মন্মথ দেখতে পেলে। সে অপ্রতিভ হাসিমুখে নিয়ে প্রায় ছুটে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে নিজের দুখানা হাত দিয়ে তার হাত দুখানা চেপে ধরে বললে—মা, একজনের বড় বিপদ। সে আমাকে বড় ভালবাসে। বড্ড নির্ভর করে ডেকেছে। এই বিপদে আমার যাওয়া নিয়ে রাগ করো না মা। তুমি আমার মা, তুমি রাগ করলে সেই রাগ অকল্যাণ হয়ে তাকে লাগবে। আমি ফিরে এসে সব বলব তোমাকে। খাব, খেতে খেতে সব বলব।

আজ আর মন্মথর মুখ দিয়ে চারু-মা নামটা বের হলো না। মায়ের আগের 'চারুটা' কখন খসে পড়ে গিয়েছে। খেলাঘরের মা-ছেলের সম্পর্ক সত্যিকারের মাতা-পুত্রের সম্পর্কে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তার কথা শুনতে শুনতে, সস্নেহে সমাদর গ্রহণ করতে করতে চারুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সে চোখের জল মুছে বললে—যাও তা হলে, কি বলব। সাবধানে যেও, তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

সে ততক্ষণে কাপড়টি যত্ন করে পরে, পিরান গায়ে দিয়ে তৈরি হয়ে নিয়েছে।

গাড়িতে সুবাসীর সামনা-সামনি সিটে বসলে সুবাসী তার কথার বন্তার মুখ খুললে—বাবা, বাঁচলাম এবার! তোমাকে যখন পেয়েছি তখন মনে হচ্ছে সব ভালো হবে, ছোটবাবু বেঁচে উঠবে, আমার চপলির মুখ আর সিঁথির সিঁদুর দুই থাকবে। অত বড়লোকের বাড়, কিন্তু কি ছোটলোকের কাণ্ড চলছে সেখানে কি বলব তোমাকে বাবা। একদিকে এই শূর-বীর জোয়ান মদ্দ ছোট ছেলে অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে মরণ রোগে শুঁষছে, আর একদিকে দিদিশাশুড়ী আর শাশুড়ী অনবরত শাপশাপান্ত করছে। আর কত্তা মাঝখানে বোবা হয়ে আছে, দু চোখে দেখছে সব, দু কানে শুনছে সব, মুখে কথা নেই। তোমার গঙ্গাজলকে তো তুমি ভালো করেই জান! কি রাগী, কি খেয়ালী আর কি অভিমানী মেয়ে! সব শুনছে দু কানে, রাগে দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারছে না। অজ্ঞান স্বামীর মাথার কাছে বসে আছে সারা দিনরাত, অনবরত কাঁদছে। শেষ পর্যন্ত রেগে তো ওই কথা বলে ফেললে! তারপর আমাকে ডেকে চুপি চুপি বললে—যেমন করে হোক তুই গঙ্গাজলকে খুঁজে বের করে আন কলকাতা শহর থেকে। যদি শহরে না পাস, যদি সে কলকাতায় না এসে থাকে, তা হলে পিসীমার কাছে গিয়ে বলবি—যে লোককে গঙ্গাজলের দেশে পাঠিয়েছিলে, পরীক্ষার খবরের চিঠি দিয়ে, তাকেই গোবিন্দপুর পাঠাও গঙ্গাজলকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবার জন্যে। তা আমার চপলা-মার ভাগ্যি ভালো, খানিক খুঁজতেই পেয়ে গেলাম তোমাকে।

মন্মথ একান্ত কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করলে—কি করে খুঁজে বের করলে আমাকে?

সুবাসী বললে—আমাকে চপলার জন্যে এমনি সব বিদঘুটে কাজ মধ্যে মধ্যে করতে হয়তো! তাই আমার অভ্যেস আছে। আমি গাড়ি নিয়ে পাথুরেঘাটা থেকে সোজা চলে গেলাম কালীঘাটে।

আরও কৌতূহলী হয়ে মন্মথ প্রশ্ন করলে—তারপর?

—তার আগে আমি খুঁজে খুঁজে বের করলাম আমাদের পাণ্ডা ঠাকুরের ছেলেকে। তোমার পরীক্ষের আগে তোমার গঙ্গাজল আমাকে নিয়ে মায়ের কাছে পুজো দিতে গিয়েছিল তা তো তুমি জান! পুজো করিয়ে যার হাত দিয়ে মায়ের 'পুষ্পো' তুমি যেখানে থাকতে সেখানে পাঠিয়েছিলাম সে আমাদের পাণ্ডা ঠাকুরের ওই ছেলে; এই তো আমার পাশে বসে আছে। ওকে ধরে নিয়ে এলাম—। বললাম —এস, আমাকে সেই বাড়ি দেখিয়ে দাও। ওকে নিয়ে তো সেখানে হাজির হলাম। তা দেখলাম সেও তোমার বড়লোকের বাড়ি, অনেক লোকজন। একে

ওকে তোমার নাম করে শুধোই, কেউ কোনো পাত্তা দেয় না। শেষে খুব কালো বদখদ চেহারার এক বামুন নিজে থেকে গায়ে পড়ে কেমন এক রকমের ভেকা ভেকা কথায় শুধোলে—কাকে খুঁজছ, কাকে ?…ওমা, তার কথা শুনে আর হেসে বাঁচি না। তা তোমার নাম করতে সে বললে—ও, সেই ছেলেকে খুঁজছ ? তা বাবা সে তো সামান্য ছেল্যা নয়। সে—আহা কি যেন কথাটি বললে গো, আহা হা—সে বাবা খরিস (গোখরো) সাপের ঢেঁকা (বাচ্চা)! তার বিষও আছে, ফণাও আছে। তবে ফণা আর বিষ এই দুয়ে মিলে দেখতে বড় খাসা। · তা যাক সেই নিয়ে গেল একজন লোকের কাছে, পাশের বাড়িতে। সেই নাকি তোমাকে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। তারই কাছে তোমার ঠিকানা পেলাম। পেয়ে এই তো আসছি।

এক মনে সব শুনে মনে মনে মন্মথ তারিফ করলে সুবাসীকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে—ছোটবাবুর মানে গঙ্গাজলের স্বামীর কি হয়েছে কি ?

আবার উৎসাহিত সুবাসী মুখ খুললে—সে আর বল না বাবা, সে এক মহাভারত। বড়লোকের বাড়ির কেলেঙ্কারীর কথা, সে শুনে আর কাজ নেই তোমার।

সুবাসীর কথা শুনে মন্মথ চুপ করে গেল, আর কোনো প্রশ্ন করলে না। অথচ সুবাসী কেলেঙ্কারীর কথা বলে উল্লেখ করায় তার আরও বেশী করে জানতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু তার সম্ভ্রমবোধ ও ভদ্রতার লজ্জায় সে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলে না।

সে চুপ করে রইল বটে, কিন্তু তাতে কেলেঙ্কারীর কথাটা জানতে কোনো বাধা হলো না। উৎসাহিত সুবাসী বড়লোকের বাড়ির কেলেঙ্কারীর কথা তার অতি প্রিয় চপলার গঙ্গাজলকে না জানিয়ে কি করে পারে! সেইজন্য সে হাত নেড়ে, গলা নামিয়ে বললে—তোমাকে গোপনে বলি বাবা, সে বড় কেলেঙ্কারীর কথা। সেই সেবারে যখন ছোটবাবু আর কর্তার এক পিসীর দেওরঝিকে নিয়ে কেলেঙ্কারী হয়, তখন তুমি পাথুরেঘাটার বাড়িতে তো ছিলে গো। কত্তার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার যাতে আঠারো-বছুরি বিধবা মেয়েটার ওপর কত্তার নজর না পড়ে তারই জন্যে কত্তার চোখের সামনে থেকে তাকে সরিয়ে দেবার মতলবে মেয়েটাকে ছোটবাবুর চোখের সামনে ধরে দিলে। ব্যস, যা হবার তাই হলো। ছোটবাবু মেয়েটাকে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে টালায় একটা বাগানবাড়িতে রাখলে, একখানা কাঁসার বগি থালা ভর্তি করে সোনার গহনা দিলে সেই মেয়েকে। তা আমাদের চপলি তো সোজা মেয়ে নয়, সে তার পিসীকে নিয়ে ব্যাপারটার যা ফয়শালা করলে তাতে সবারই কান কাটা গেল। কত্তাকে ছোট

ছেলের বউকে পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দিতে হলো খেসারত বলে, ছোটবাবুকে চোখে চোখে আটকে রাখলে চপলি। আর সেই বজ্জাত, নষ্ট দুষ্ট মেয়েটাকে চপলির পিসী সোনাগাছি-রামবাগানে চালান করে দিলে। চপলির বাবার বড্ড খাতির ওই অঞ্চলে। মেয়েটাকে এমন করে চালান করলে যে যেন ছোটবাবু তার আর কোনো হদিস না পায়।

এতটা কথা এক সঙ্গে বলে একটা আক্ষেপসূচক পিচ কাটল সুবাসী। মন্মথ ধীরে ধীরে এক বিচিত্র কৌতূহলে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিল। এসব কথা তার অভিজ্ঞতা কেন, তার শ্রুতির মধ্যেও নেই। শুনতে তার এক ধরনের লজ্জাও লাগছিল, আবার তার চেয়ে বেশী কৌতূহল হচ্ছিল। বার বার মনে হচ্ছিল, জীবনে এত বৈচিত্র্য, এত তীব্রতা এত জ্বালাকর ও উত্তেজক আনন্দ আছে! সে কিন্তু সুবাসীর চোখে চোখ না রাখতে পেরে চোখ নামিয়ে নিয়ে কথা শুনছিল। সুবাসী কিন্তু অকুণ্ঠ, সে পিচ কেটে বললে—তা আমাদের চপলির কপাল। আর কপালই বা কি করে বলব বাবা! আসল দোষ হলো ওর মুখ আর মেজাজ! মেয়ের এমন মেজাজ, এমন দজ্জাল স্বভাব, এমন কটকটে মুখ যে স্বোয়ামী ঘরে এলেও কি শান্তি পায়? লোকে তো পরিবারের কাছে আসে জুড়োবার জন্যে, না কি গো? কিন্তু ওর কাছে এলে স্বোয়ামী জুড়োবে কি, কথার আর মেজাজের আগুনে বেশী করে পোড়ে। তাই স্বোয়ামীও বাইরে ছুটে পালাবার তাল খোঁজে।

ব'লে আবার একটু থামল সুবাসী। গলা আরও নামিয়ে চুপি চুপি বললে—আর বাবা, বার-ফটকা পুরুষের স্বভাবও তেমনি। যে গরু ময়লা খায় সে ময়লা খাবেই। তার ডাবায় সোনার দব্যি দাও, সে ছোঁবে কি ছোঁবে না, কিন্তু ময়লা খেতে ছুটবেই। আমাদের ছোটবাবুরও তাই। আর কি বলব বাবা, তুমি ছোট ছেলে। সেই কথায় আছে না, 'যার সঙ্গে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম' সেই বিত্তান্ত। ছোটবাবুও বাহাদুর ছেলে। যে মেয়েকে টালার বাগানবাড়ি থেকে চপলির বাবা আর পিসী মিলে সোনাগাছি-রামবাগানে নাপাত্তা করে চালান করে দিলে, তাকেই কিনা ঠিক খুঁজে খুঁজে বার করেছে ছোটবাবু! তারপর সেই সেইখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। সেইখানেই হয়েছে ব্যাপারটা।

—কি হয়েছিল? মন্মথ জিজ্ঞাসা করলে কৌতূহল যথাসম্ভব চেপে রেখে। এই সমস্ত বর্ণনার অন্তরালে একজন পুরুষের নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে অসামাজিক ঘনিষ্ঠতার মধ্যে কামের যে গোপন অথচ তীব্র সম্পর্কের আভাস রয়েছে তার অভিঘাতে মন্মথর এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তরুণ চিত্ত চঞ্চল ও উগ্র হয়ে উঠেছে। সে উগ্র চাঞ্চল্যকে চেপে রেখেই সে প্রশ্ন করলে।

সুবাসী বললে—এ সব কাজের এমনি 'পরিণাম'ই হয় বাবা। ছোটবাবু আবার লুকিয়ে লুকিয়ে সেখানে যাওয়া আসা শুরু করেছিল। সে মেয়ে, শুনেছ ত বাবা, সাপের মতো মেয়ে। টালার বাগানবাড়িতে ছোটবাবু যখন সেই মেয়েকে এক-থালা গয়না দেয় তখন মানদা তাকে সে সব নিতে বারণ করাতে মানদাকে কি 'পেহার' করেছিল, মানদার, নাক মুখ সব আঁচড়িয়ে ছিঁড়ে দিয়েছিল। তারপর মানদাকে দেখিয়ে ছোটবাবুকে বুকে জড়িয়ে ধরে সারারাত শুয়েছিল। ও সেই মেয়ে! তার যে এত হেনস্থা তার জন্য দায়ী তো ছোটবাবু! সেই ছোটবাবুকে এইবার বাগে পেয়ে মেয়েটা শোধ তুললে। দু তিন দিন যেতে না যেতে একদিন মদের সঙ্গে বোধহয় কিছু বিষ-টিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। ছোটবাবু তো প্রতিদিনই বেহুঁশ মাতাল হয়ে ফেরে। সেদিনও মাতাল হয়ে এসে গাড়িতে উঠল। বাড়ি এসে অজ্ঞান! আজ পাঁচ দিন হলো। ওদিকে অবিশ্যি থানা-পুলিশ চলছে। কিন্তু থানা-পুলিশ করে কি হবে যদি ছোটবাবু মরে যায়! তাই এখন ওবাড়ির সবারই ধারণা হয়েছে—তুমি একবার ওদের বাড়ি গিয়ে ছোটবাবুকে আশীর্বাদ করলে ছোটবাবু হয়তো বেঁচে উঠবে!

সুবাসীর কথা শুনতে শুনতে তার মনের উগ্রতা ও চাঞ্চল্য ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে মনে মনে সে বিব্রত বোধ করতে আরম্ভ করলে। তার আশীর্বাদের ওপর নির্ভর করে আছে সারা বাড়িটা, নির্ভর করে আছে তার গঙ্গাজল। আহা, তার যদি এমনি কোনো অলৌকিক ক্ষমতা থাকত তাহলে গঙ্গাজলের বাড়ি পৌঁছেই সে হাসিমুখে গঙ্গাজলকে বলত—আর কোনো ভয় নেই, আমি গোবিন্দ আর লক্ষ্মী-জনার্দনের আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি। এখুনি তোমার স্বামীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেব, তোমার স্বামীর জ্ঞান ফিরে আসবে, চোখ মেলে চাইবে। চল, তার আগে আমাকে তোমাদের ঠাকুরঘরে নিয়ে চল, আমার হাতে খানিকটা গঙ্গাজল দেবে।

সে মনে মনে নীরবে গোবিন্দের এবং লক্ষ্মীজনার্দনের মূর্তি চিন্তা করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে গোবিন্দ আর লক্ষ্মীজনার্দনের অস্পষ্ট ও আবছা মূর্তির পাশে ফুটে উঠল বাবার ছবি। বাবা যেন চুপ করে মন্দিরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছেন।

সমস্ত গাড়ির ভিতরটা নীরব। কেবল পাথর বসানো রাস্তার উপর দিয়ে বিকট শব্দ করে ঘোড়ার গাড়িখানা চলছে, তারই শব্দ কানে এসে হাজারো ভাঙা ভাঙা অর্থহীন ধ্বনি হয়ে বাজছে।

হরচন্দ্রবাবুর বাড়ির দরজায় তারা নামল গাড়ি থেকে।

নেমেই মন্মথ যা দেখতে পেলে তাতে চমকে ওঠার মতো অবস্থা হলো তার।

বাড়ির সামনে দু তিনখানা চমৎকার ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে। কত সব নাম ওদের! ব্রুহাম, ল্যাণ্ডো, কত কি! মন্মথ শুনেছে বটে, কিন্তু মনে থাকে না, মনে রাখতে পারে না। দুখানা গাড়িতে লিভারীপরা সহিস কোচোয়ান! কাদের গাড়িরে বাবা! মন্মথ তাকাচ্ছিল অবাক হয়ে।
সুবাসী তার মনের কথা বুঝে বললে—সায়েব ডাক্তার আসার কথা ছিল, এসেছে বোধহয়! বাবা, লাল লাল বড় বড় মুখ, সাঁতরাগাছির ওলের মতো; দানোর মতো বড়সড় চেহারা, ভারী গলায় গ্যাট্-ম্যাট্ করে কথা বলে, শুনলে কিছু বুঝতে পারা যায় না, কিন্তুক না বুঝেই বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে ওঠে। তারাই এসেছে মনে লাগছে।
তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সে বললে মন্মথকে—একটু দাঁড়াও এইখানে, কেমন? রুগীর বাড়ি, তোমাকে কোথা বসাব, কি করব সব জেনে আসি।
এতক্ষণে সুবাসীর নজর পড়ল কালীঘাটের পাণ্ডার ছেলেটির দিকে। তার সঙ্গে সারা রাস্তা তাদের একটিও কথা বলার দরকার হয় নি, সেও বলে নি, চুপ করেই ছিল। তার দিকে ফিরে সুবাসী বললে—ঠাকুর, তুমি বরং এখন যাও। তুমি আজ খুব 'রোপকার' করেছ চপলা মায়ের। সব একটু থাক-ধার পড়ুক, তখন আবার চপলিকে নিয়ে মায়ের পুজো দিতে যাব, তখন তোমাকে খুশী করে আসব। তুমি খুশী না হলে তো মা খুশী হন না গো! সে তো তুমি জানই!
ছেলেটি একটু হেসে, একটু ইতস্তত করে যাবার জন্য পা বাড়ালে।
সুবাসী তাকে বললে—দাঁড়াও, দাঁড়াও। 'বাম্ভন' এত কাজ করে এতটা পথ আবার শুকনো মুখে খালি হাতে ফিরে যাবে, সে ভালো হবে না। এই নাও, বরং এই আট গণ্ডা পয়সা নিয়ে যাও।
বলে নরুন পাড়, ধবধবে কাপড়ের খুঁট খুলে একটি আধুলি সে ছেলেটির হাতে তুলে দিলে। ছেলেটি চলে গেল। সুবাসীও দ্রুত পায়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকল।
মন্মথ দাঁড়িয়ে রইল গেটের কাছে। সামনে অনেকখানি খালি জায়গা। কোনো সময় বোধহয় বাগান করার চেষ্টা হয়েছিল। তার অবশেষ চিহ্ন কিছু রয়েছে। দু চারটে বড় বড় ফুলের গাছ রয়েছে এখানে ওখানে। সব মিলে জায়গাটা অত্যন্ত শ্রীহীন। এই শ্রীহীনতা তার মনে বেশী করে বাজল জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ির সামনের কথাটা ভেবে। সেখানে সামনে বাগান আছে, বাগানে সুন্দর সুসজ্জিত গাছ আছে, সে গাছে সারা বছর রকমারি ফুল ফোটে। যে ঋতুর যে ফুল। বিকেলে প্রতিদিন বাগানে ভারে-ভর্তি জল পড়ে, গাছপালা যথাসময়ে ছাঁটা হয়। এই তো এখন জ্যৈষ্ঠ মাস, বেল ফুলে বোধহয় ওখানে বাগান এখন ভরে

আছে। সেই ফুল প্রতি ঘরে পুষ্পপাত্রে রাখা হয়, মেয়েরা মালা গেঁথে খোঁপায় পরে।

ভারী গলার আওয়াজ শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। দুজন সায়েবের সঙ্গে স্বয়ং কর্তা হরচন্দ্রবাবু বেরিয়ে আসছেন কথা বলতে বলতে। তাকে লক্ষ্য না করেই তিনি সায়েবদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। মন্মথ দেখে আশ্বস্ত হলো যে আসন্নমৃত্যু যুবক সন্তানের মৃত্যুর আশঙ্কায় বৃদ্ধ পিতার মুখে যে শঙ্কা ও ত্রাসের ছায়া পড়ে তার চিহ্ন নেই হরচন্দ্রবাবুর মুখে। সায়েব দুজন তাঁদের নিজের নিজের গাড়িতে উঠলেন, হরচন্দ্রবাবু প্রায় এক মুঠো করে কাঁচা টাকা তাঁদের প্রতিজনের হাতে দিয়ে, সকৃতজ্ঞভাবে শেক্‌হ্যাণ্ড করে তাঁদের বিদায় দিলেন হাসিমুখে। গাড়ি দুখানা বেরিয়ে গেলে তিনি আবার হাসিমুখে বাড়ির ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

ঢুকতেই তাঁর নজর পড়ল মন্মথর দিকে। প্রবীণ, কৃতী, অর্থশালী, প্রতিষ্ঠাবান স্বভাবগম্ভীর মানুষ হরচন্দ্রবাবু। তবু তিনি মন্মথকে দেখে খুশীতে উচ্চকিত হয়ে উঠলেন—আরে তুমি, মন্মথ! এস, এস, এস! এদিকে আমাদের গোটা পরিবার তোমার জন্যে পাগলের মতো হয়ে আছে, আর তুমি নিজে থেকে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে আছ? এস বাবা, এস! তুমি খবর পেলে কি করে?

তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে মন্মথ সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে বললে—ছোটবাবু কেমন আছেন?

হরচন্দ্রবাবুর মুখের প্রসন্নতার উপরে যেন চিন্তান্বিত উদ্বেগের ছায়া পড়ল। তিনি বললেন—আজ পাঁচদিন অজ্ঞান হয়ে আছে। সায়েব ডাক্তার তো প্রতিদিনই আসছেন। ওঁরা তো বলছেন কোনো ভয় নেই! আজ আবার বলে গেলেন, আগের থেকে অনেক ভালো আছে। কিন্তু আমি তো ভালো-মন্দ কিছু বুঝছি না বাপু! যে অজ্ঞানকে সেই অজ্ঞান তো হয়েই রয়েছে সমানে! তবে মনে হয়, এবার ভালোর দিকেই যাবে। লক্ষণ তো ভালোই মনে হচ্ছে, এই তো তোমাকে খোঁজাখুঁজি হচ্ছিল। বাড়িতে মেয়েরা তো তোমাকে বাড়িতে একবার এই সময়ে পাবার জন্যে প্রায় পাগল! কথাটা আমার কানেও এসেছে। তা তুমিও এসে গিয়েছ ভাগ্যগুণে। চল, ভিতরে চল।

মন্মথ একটু ইতস্তত করলে। যার আহ্বানে সে এসেছে সেই সুবাসীর কথা হরচন্দ্রবাবুকে বলে তার জন্য অপেক্ষা করবে কিনা তাই ভাবছিল মন্মথ। কিন্তু সুবাসী এখনও আসছে না, আর তা ছাড়া এখন সুবাসীর জন্য অপেক্ষা করতে গেলে হরচন্দ্রবাবুকে তার জন্য পাঁচটা কৈফিয়ত দিতে হবে। তার চেয়ে বিদ্যাসাগর মশায়ের সুবোধ বালক গোপালের মতো হরচন্দ্রবাবুর সঙ্গে যাওয়াই সব

দিক থেকে ভালো!

হরচন্দ্রবাবুর পিছনে পিছনে বাড়িতে ঢুকেই থমকে দাঁড়াতে হলো দুজনকেই। দুজনেরই নজরে পড়ল বাড়ির লোকজন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে চলাফেরা করছে, সে চলাফেরা প্রায় ছুটোছুটির পর্যায়েই পড়ে। সবাই যেন ছুটে উপরে যাচ্ছে। দুজনেই কেমন এক আকস্মিক ভয়ে ভীত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। পর মুহূর্তেই সেই আকস্মিক ভয় হরচন্দ্রবাবুর ক্রুদ্ধ চিৎকারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলে—কি হয়েছে কি। এত ছুটোছুটি কিসের?

কয়েকজন ততক্ষণে সামনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে চলে গিয়েছে। সকলের শেষে যে যাচ্ছিল সে থমকে দাঁড়াল। সে উকিল-সেরেস্তার চাকর যুগল। তাকে কর্তার ডাকে ফিরে দাঁড়াতে হলো। হরচন্দ্রবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন—কি হয়েছে কি যে অমন ছুটে তোরা সব উপরে যাচ্ছিস?

কি হতে পারে তা অনুমান করতে পারেন হরচন্দ্র, এমন কি মন্মথও পারছে তা অনুমান করতে। সে অনুমান ভয়ানক। কিন্তু তা ঘটলে তার সঙ্গে আরও যা ঘটবার কথা তার তো কোনো চিহ্ন নেই। তা হলে তো বুক-ফাটা আর্ত হাহা-কারে এতক্ষণ এই প্রাসাদতুল্য বাড়িখানা হাজার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলত। তা হলে? তা হলে কি হলো?

কর্তার প্রশ্নের উত্তরে যুগল ভয়ে ভয়ে বললে—আজ্ঞে, সব ফিসফাস করছে যে ছোটবাবুর না কি জ্ঞান ফিরে এসেছে।

পুত্রের মৃত্যুসংবাদে এই মুহূর্তে যতটা না বিস্মিত হতেন হরচন্দ্র এই সংবাদে তিনি তার চেয়ে বেশী বিস্মিত হলেন। আর তাঁর আনন্দের পরিমাপ করবে কে? তিনি কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন—কখন জ্ঞান হলো? ডাক্তার তো বেরিয়ে গেল এইমাত্র। কই চল দেখি!

তিনি মন্মথর উপস্থিতির কথাটা এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন। এক পা এগিয়ে গিয়েই কথাটা মনে পড়ল তাঁর। তিনি ফিরেই তাকে সাপটে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। হা হা করে কেঁদে বললেন—আমার বাড়িতে তোমার পায়ের ধুলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ছেলে সুস্থ হয়ে উঠল বাবা!

তাঁর আলিঙ্গনের মধ্যে মন্মথ বিব্রত হয়ে পড়ল। সে মৃদুস্বরে বললে—আগে উপরে চলুন, ছোটবাবুকে দেখুন, তারপর—

তাকে উন্মুক্ত করে দিয়ে তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও এক সঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি টপকে উপরে উঠতে লাগলেন। তাকেও হাঁক দিয়ে বললেন—তুমিও এস মন্মথ, আমার সঙ্গে।

এ বাড়িতে বেশ কিছু কাল ছিল মন্মথ। কিন্তু উপরে কখনও আসে নি সে। আসার প্রয়োজনও ঘটে নি, অধিকারও পায় নি। উপরের বারান্দায় গিয়ে পৌছু-তেই সে বুঝতে পারলে, ছোটবাবুর ঘর কোন্‌টা। ছোটবাবুর ঘরের দরজার মুখে ভিড় জমে আছে।

মন্মথর হাতখানা হরচন্দ্রবাবু সজোরে, যেন একান্ত আশ্রয় হিসেবেই চেপে ধরে-ছেন। তিনি তাকে নিয়ে দরজার কাছে পৌছেই গম্ভীর গলায় বললেন—এখানে ভিড় করো না। সরে যাও সব। আমাদের যেতে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে দরজার মুখ থেকে ও ঘরের ভিতর থেকে ভীড় পাতলা হয়ে গেল। হর-চন্দ্রবাবু মন্মথকে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। মন্মথ দেখলে ঘরের ভিতর কয়েক-জন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের নানান বয়েস ; কেউ সধবা কেউ বিধবা। একজন বয়স্কা বিধবার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি তার বড় বিচিত্র লাগল। একান্ত নিরুৎ-সুক ভঙ্গিতে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন। প্রণাম নেবার সময় গ্রাম্য বিধবারা যেমনভাবে পা দুটি একত্রিত করে দাঁড়ান সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। থান কাপড়খানি গোটা গায়ে টেনে টুনে জড়ানো, কাপড়খানির ভিতরে একটা হাত ঢুকিয়ে সেই কাপড়-ঢাকা হাতে ঠোঁট চেপে রেখেছেন।

তাঁরই দিকে তাকিয়ে হরচন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি হলো পিসীমা ?

তিনি ঘরে ঢুকে সঠিক ব্যাপারটা বুঝতেও পারছেন না। তাঁর ছোট পুত্রবধূ খাটের উপর স্বামীর মাথার কাছে সাশ্রুনেত্রে বসে রয়েছে স্বামীর মুখের দিকে উন্মুখ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। তার হাতে জলের গ্লাস ও ঝিনুক, ঝিনুকটি বোধহয় জলে ভর্তি। অবস্থাটা মানুষের একান্ত শেষ অবস্থার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তা যা শুনে ছুটে তিনি উপরে উঠে এলেন তার সঙ্গে গরমিল দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন পিসীমা বলে সম্বোধিত মহিলাটিকে।

মহিলাটি ঠোঁটের উপরের কাপড়ের ঢাকা সরিয়ে একান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন —কি জানি বাবা, আমিও তোমার মতো খবর পেয়ে মরি কি বাঁচি করে ছুটে এলাম। শুনলাম জ্ঞান হয়েছে ছোট খোকার। তা কই, কিছু বুঝতে তো পারছি না! হাঁ চাঁ তো কই কিছু দেখি না।

চপলা ঝিনুকটি জলের গ্লাসের ভিতর ফেলে দিয়ে হাত খালি করে সেই হাত দিয়ে মাথার ঘোমটাটি টেনে বাড়িয়ে নিলে। তারপর আবার জলভর্তি ঝিনুক গ্লাসের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে স্বামীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। তার আগে শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললে—আপনি খাটে উঠে বসুন বাবা। মন্মথকে বসান আপনার পাশে। ওর দয়াতেই বোধহয় আপনার ছেলের জ্ঞান ফিরে এসেছে।

মন্মথ অবাক হয়ে গেল এই অল্পবয়সী বধূটির কথা বলার ধরন দেখে। বিশ বছর তার বয়স, সে এই বাড়ির বউ। কিন্তু কি সাম্রাজ্ঞীর মতো তার কথা বলার ভঙ্গী! যেন বাড়ির কর্ত্রী। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ মনে একটা কথা লাগল খট করে। চপলা কিন্তু তাকে গঙ্গাজল বলে উল্লেখ করলে না, করলে মন্মথ বলে।

স্বামীর মুখের উপর ঝুঁকে চপলা তখন ডাকছে—শুনছ, জল খাও।

একবার দুবার ডাকতেই মুদিতচক্ষু রোগী চোখ খুলল না বটে কিন্তু হাঁ করলে, চপলা ঝিনুকে করে সামান্য জল ঢেলে দিলে তার মুখে, তা সে গিলে আবার মুখ বন্ধ করলে।

হরচন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—জল গিলেছে!

চপলা জলের গ্লাসের ভিতর ঝিনুকটি রেখে গ্লাসটি পাশের টেবিলের উপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বললে—হ্যাঁ। আগে চোখ খুলেছিল, একবার জলও খেয়েছে। আপনি বাবা, আর একবার ডাক্তার ডাকতে পাঠান আর ঘরের ভেতর যারা রয়েছে তাদের চলে যেতে বলুন। রোগীর ঘরে ভিড় বাড়িয়ে তো দরকার নেই!

হরচন্দ্রবাবু সঙ্গে সঙ্গে খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন, বললেন—যাই আমি সরকারকে পাঠাই বড় ডাক্তারের কাছে।

তারপর ঘরের সকলের দিকে ফিরে বললেন—ছোট বউ, তুমি বরং চেয়ারখানায় বস। পিসীমা, আপনি থাকবেন থাকুন। আর সব যাক বরং ঘর থেকে। সত্যিই তো, রোগীর ঘরে ভিড় বাড়িয়ে দরকার কি? সঙ্গে সঙ্গে সকলেই নিঃশব্দে চলে গেল ঘর থেকে। ছোট বউ মাথার ঘোমটাটি বাড়িয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। তিনি পিসীমার দিকে ফিরে বললেন—আপনি বরং ওই চেয়ারে বসুন পিসীমা।

পিসীমা একটা সখেদ নিশ্বাস ফেলে তাকে বললেন—না মা, তুমি বস, তোমাকে বসতে বলেছে। আমি বসে কি করব? আর ঐ চেয়ারে সাহেব এসে বসেছে, ওতে গঙ্গাজল না দিলে বসব কি করে? তা যাক মা, আমার বসারই বা দরকার কি? ছোট খোকার জ্ঞান হয়েছে এই আমার ভাগ্যি! আমি বরং যাই, লক্ষ্মার কাজ আমার হাতে। এখনও আহ্নিক বাকী।

হরচন্দ্রবাবু বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পিছনে পিছনে পিসীমাও আপন মনেই মৃদু স্বরে নিজের আহত অভিমানকে প্রকাশ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে চপলা, হরচন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আর মন্মথ। সবাই অপরিচিত, পরিবেশ অপরিচিত, মন্মথ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সে খাট থেকে উঠে নামবার উদ্যোগ করতেই চপলা মৃদু অথচ অস্বাভাবিক শক্ত গলায় বললে—তুমি নেমো না খাট থেকে। তুমি বরং এইখানে ওঁর মাথার কাছে এসে বস। ওঁর

মাথায় তুমি হাত বুলিয়ে দাও। তুমি হাত বুলিয়ে দিলে সেটা ওঁর আশীর্বাদের মতো হবে।

কথাগুলো এত কড়া করে বলার অর্থ সে বুঝতে পারছে। সুবাসীর মুখে শুনে এর পটভূমিকা তার জানা হয়ে গিয়েছে। সে নিঃশব্দে স্থান পরিবর্তন করে ছোটবাবুর মাথার কাছে এসে বসল। চপলা ততক্ষণে স্বামীর পায়ের কাছে বসে তার এক-খানা পা নিজের কোলে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে।

পরক্ষণেই মন্মথ নেমে পড়ল খাট থেকে।

স্বামীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে চোখ তুলে মন্মথর মুখের দিকে একটু চেয়ে রইল নিঃশব্দে। তারপর মন্মথকে জিজ্ঞাসা করলে মৃদুস্বরে—কি হলো ?

তাকে প্রশ্ন করা আর তার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকার মাঝখানে যে সামান্য একটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল তার মধ্যে যেন কিসের একটা ইঙ্গিত ছিল। অন্তত তাই মনে হলো মন্মথর। সে সসম্ভ্রমে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—আমায় একটু গঙ্গাজল দেবেন ?

—গঙ্গাজল ? গঙ্গাজল কি হবে ? মৃদু স্বরে বলে আবার তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করে রইল চপলা।

এই বিচিত্র মেয়েটির মনের গতিবিধি কিছুই বুঝতে পারছে না মন্মথ। তবে এটা সে বুঝেছে এই মেয়ে মারাত্মক খেয়ালী, অসম্ভব কোপনস্বভাব আর তেমনি উদার হৃদয়। এ মেয়ে পরিবেশের ধার ধারে না, কোনো কিছুর পরোয়া করে না। এ মেয়ে রাগ হলে চড় চাপড় লাগিয়ে দিতে পারে এবং মন বললে কারও পায়ে ধরে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারে। আর এ সবই সে প্রকাশ্যে করতে পারে। তন্ত্রের যে সব আশ্চর্য শক্তিমতী দেবীর কথা ও গল্প সে শুনেছে তার বাবার কাছ থেকে এ তাদেরই কারও মতো। তাই তার সহজ বুদ্ধিতে মনে হলো, এ মেয়ে যখন তাকে চেনার নামমাত্র করছে না তখন তারই বা চেনার ইঙ্গিত দিয়ে দরকার কি ? সে সসম্ভ্রমে মৃদুস্বরে বললে—ছোটবাবুকে আশীর্বাদ করবার আগে হাতটা গঙ্গাজলে ধুয়ে নিতাম।

এক অতি গভীর অর্থপূর্ণ অথচ অবোধ্য এক দ্বিপদী শ্লোকের মতো এক জোড়া বড় বড় চোখের স্থির দৃষ্টি এতক্ষণে সহজ হয়ে এলো। সে বললে—ওই দেখ, ওই কোণে টেবিলের ওপরে গঙ্গাজলের পাত্র রয়েছে, ওর থেকে জল নিয়ে হাত ধুয়ে নাও।

বলে সে বিষণ্ণভাবে একটু হাসল।

মন্মথ গঙ্গাজলে দুই হাত ধুয়ে নিয়ে, গোবিন্দ ও লক্ষ্মীজনার্দনকে স্মরণ করে খাটের উপর উঠে বসে নিজের একখানি হাত ছোটবাবুর মাথার উপর রাখলে আলগেছে। তার সংকোচ ও অস্বস্তি লাগছিল কেমন। সেবা সে কখনও কারও জ্ঞানত নেয় নি, বাবা ও বিগ্রহ ছাড়া কারও সেবাও কখনও করে নি। আস্তে আস্তে আলগোছে সে ছোটবাবুর মাথায় হাত বুলোতে লাগল। হাত বুলোতে বুলোতেই কেমন এক আশ্চর্য অনুকম্পায় তার সমস্ত মন যেন ভরে উঠল। আহা, ছোটবাবু ভালো হয়ে উঠুক। কেমন জোয়ান, উল্লাসময় জবরদস্ত মানুষ ছোটবাবু, আর কত অসহায়ের মতো বিছানায় পড়ে আছে! আহা তার নিজের যদি কোনো সুকৃতি থাকে, রাধাগোবিন্দ আর লক্ষ্মীজনার্দনকে সে যে সেবা করে এসেছে, সেই সেবার যদি কোনো মূল্য থাকে, কোনো পুণ্য থাকে তবে সেই মূল্যে, সেই পুণ্যে ছোটবাবু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুক।

পরম যত্নে ছোটবাবুর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে এই সামান্য কাজটুকুর মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে গেল। এই মানুষটিকে সে অনেকবার দেখেছে। কি তার জাঁকজমক, কি তার সাজসজ্জা, কি তার দম্ভ অহংকার! অহংকৃত, আত্মপর স্বভাবের মানুষ, কথায় কথায় বাড়ির কর্মচারী, ঝি-চাকর, চাপরাসি-দারোয়ান, সহিস-কোচোয়ানদের ধমক-ধামক করত। তার গলা থেকে উচ্চকণ্ঠে ছাড়া কথা বের হয় না, ধমক না দিয়ে, শাসন না করে সে কথা বলতে জানে না। বাড়ির আত্মীয়-স্বজন, পোষ্য সকলে তার ভয়ে অস্থির। সে তো নিজেই বার বার তা আস্বাদন করেছে! যতদিন সে এ বাড়িতে ছিল ততদিন সবাই তাকে বলত—বাবা, বাবুদের, বিশেষ ছোটবাবুর সামনে যেন পড়ে যেও না, অকারণে ধমক খাবে। সে তাই ছোটবাবুকে এড়িয়েই চলত। জ্যোতিপ্রসাদ-বাবুর বাড়ির সভায় সাধারণ বেশভূষায় সজ্জিত তার পাশে বসে, তাকে সঠিক না চিনেও ছোটবাবুর সে কি অস্বস্তি আর ঘৃণা। বার বার আড়চোখে তার দিকে তাকিয়েছে আর চোখের দৃষ্টি থেকে, ঠোঁটের প্রান্ত থেকে ঘৃণা আর বিরক্তি উপচে উপচে পড়ছে। সেই মানুষ আজ কি অসহায়ের মতো বিছানায় পড়ে আছে।

শুয়ে থাকার সমস্তটার মধ্যেই কোথাও যেন এক বিন্দু জোর নেই। সমস্ত শরীর এলিয়ে পড়ে আছে বিছানায়। মুখখানি এই ক'দিনের অজ্ঞানতা-জনিত দৈহিক যন্ত্রণায় অনেকখানি শুকিয়ে গিয়েছে। মুদিত চোখের কোল বসে গিয়ে যেন সেখানে এক পোঁচ কালি পড়েছে। গলার শিরা দুটি অতি মৃদু মৃদু কাঁপছে। তার হাতের নিচে রগের শিরা দুটির সকাতর কম্পনে স্পন্দিত। জীবনেরও

স্পন্দন অতি ক্ষীণ। মাথার চুলগুলির সেই সুপরিচিত বিন্যাস ও পারিপাট্য কোথায় গিয়েছে। চুলে তেল পড়ে নি ক'দিন। তারই মধ্যে সে পরম যত্নে হাত বুলিয়ে চলল। মাথা থেকে সে হাত নামিয়ে আনলে কপালে। কপালে উত্তাপ স্বাভাবিক। কপালে আলতো করে হাত বুলোতে বুলোতে তার চিত্ত যেন দ্রব হয়ে উঠল।

আবার সেই রকম হয়ে এলো তার মনের ভিতরটা; গতকাল কাকার ছেলেকে কোলে নিয়ে বুকের ভিতরটা মমতা আর আনন্দে যেমন কান্নার মতো উথলে উঠেছিল, আবার সেই রকম মমতা, এক অকারণ আনন্দের সঙ্গে, সহানুভূতির সঙ্গে মাখামাখি হয়ে তার বুকের ভিতরটা ভর্তি করে ফেললে। সেটা উথলে এত বেশী হয়েছে যে সে আবেগ যেন তার দেহ উপচে গলা আর চোখ দিয়ে ঠেলে কান্না হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সে অনেক চেষ্টায় কোনোক্রমে সে আবেগকে চেপে রাখলে।

ছোটবাবু এই সময় একবার পাশ ফিরল। মুখ দিয়ে একটি মৃদু শব্দ দীর্ঘায়িত হয়ে অস্ফুট বেরিয়ে এলো। সে ধ্বনি স্বস্তির না যন্ত্রণার বলা কঠিন। সঙ্গে সঙ্গে মন্মথ জলের গ্লাসটি তুলে নিয়ে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। মৃদুস্বরে বললে—জল খাবেন? জল খান।

সঙ্গে সঙ্গে হাঁ করলে ছোটবাবু। তার হাত থেকে এক ঝিনুক জল খেয়ে একবার চোখ মেলে তাকাল। সে জলের গ্লাসটি রেখে দিয়ে আবার মাথায় হাত রাখলে। সঙ্গে সঙ্গে ছোটবাবু নিজের একখানি হাত মন্মথর হাতের উপর রেখে যেন পরম নিশ্চিন্ত একটি নিশ্বাস ফেললে—আঃ।

সঙ্গে সঙ্গে মন্মথর সঙ্গে চপলা ও চেয়ারে-বসা চপলার শাশুড়ীর আনন্দিত দৃষ্টির বিনিময় হলো। মন্মথ মৃদু স্বরে চপলাকে বললে—আপনি এখানে এসে বসুন।

—না, তুমি থাক। তুমি থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকব। চপলা মৃদু অথচ স্থির স্বরে জবাব দিলে।

তারপর মন্মথর দিকে তাকিয়ে বললে—মন্মথ, তুমি আজই এদিকে কি করে এসে পড়লে?

তাকে কোনো উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই নিজের প্রশ্নের পিঠে পিঠে বললে—পরীক্ষার খবর বের হবার পর শ্বশুরঠাকুর মশাইকে প্রণাম করতে এসেছিলে বুঝি?

চপলার এই প্রশ্নের উত্তর চপলার প্রসারিত স্থির দৃষ্টির মধ্যেই এবার সহজেই খুঁজে পেলে মন্মথ। বললে—হ্যাঁ! ওঁকে প্রণামই করতে এসেছিলাম।

আবার একটি ছোট্ট প্রশ্ন করলে চপলা—তুমি উপরে এলে কার সঙ্গে? শ্বশুর ঠাকুরের সঙ্গে?

মন্মথ ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

আবার আর একটি প্রশ্ন, বোধহয় শেষতম প্রশ্ন, উচ্চারিত হলো—তুমি কেন এসেছ উনি জানেন তো? বলেছ ওঁকে?

মন্মথ এতক্ষণে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে চপলা কি শুনতে চাচ্ছে, জানতে চাচ্ছে তার কাছ থেকে। সে বললে—না, কিচ্ছুই বলা হয় নি ওঁকে। এখানে এসেই তো ছোটবাবুর অসুখের মধ্যে পড়ে গেলাম। বলবার সুযোগ তো পাই নি!

চপলা তার মুখের উপর যে স্থির দৃষ্টি রেখে এতক্ষণ কথা বলছিল সেটি এবার সহজ হয়ে এলো।

ওদিকে তখন ছোটবাবু হৃদয়চন্দ্র পুরো চোখ মেলে তাকিয়েছে। খুঁজছে কাউকে। একবার তাকাল মন্মথর মুখের দিকে। দেখতে পেয়ে চপলা তাড়াতাড়ি স্বামীর মাথার কাছে খাটের অপর পাশটায় এসে বসল। স্বামীর মুখের উপর ঝুঁকে বললে—এই যে আমি!

মন্মথর হাতটা ছেড়ে দিয়ে হৃদয়চন্দ্র তার সেই হাতখানি দিয়ে চপলার বাহুমূল চেপে ধরলে। চপলা ছাড়িয়ে নিতেও পারলে না, অথচ একান্ত লজ্জায় লজ্জিত হয়ে পড়ল। কেবল লজ্জা এড়াবার জন্য অন্য হাত দিয়ে মাথার ঘোমটাটা আরও একটু বাড়িয়ে নিলে। নিশ্চিন্ত মুখখানি তার লজ্জারক্ত হয়ে উঠেছে শাশুড়ীর সামনে। সে মৃদুস্বরে শাশুড়ীকে বললে—আপনি যান মা। ছেলে তো আপনার ভালো আছেন।

শাশুড়ী বোধহয় মনে মনে উঠতে চাইলেও উঠতে পারছিলেন না। তার কারণ শুধু সপত্নী-পুত্রের শয্যাপার্শ্ব থেকে উঠে যাবার অসৌজন্য নয়, তার অন্য একটি কারণও ছিল। কারণ মন্মথ।

আজ থেকে আশি বিরাশি বছর আগে ষোল-সতেরো-আঠারো বছর বয়সের ছেলেকে ছেলে বলে মনে করা হতো না, তাকে পরিপূর্ণ পুরুষ বলেই ধরে নেওয়া হতো। সেই দৃষ্টিতে অচেতন রোগীর ঘরে যুবতী পুত্রবধূ ও একজন অপরিচিত পুরুষকে রেখে শাশুড়ী উঠে যাবেন কি করে? চপলা অত্যন্ত সহজে সেটা বুঝতে পেরেই বললে—আর মন্মথর কথা আপনি ধরবেন না। ও বয়সে আমার চেয়ে ছোট। আজ আমারই ভাগ্যগুণে ও এখানে এসে পড়েছে। ও আজ থেকে আমার গঙ্গাজল।

তারপরই গম্ভীর মুখে মন্মথকে সে যেন আদেশই করলে—গঙ্গাজলের পাত্রটা

আন তো!
পঞ্চপাত্র থেকে গঙ্গাজল খানিকটা হাতে নিয়ে সে মন্মথকে বললে—হাত পাতো। নাও।…সে গঙ্গাজলের অঞ্জলিটি মন্মথর হাতে ঢেলে দিলে।
তারপর বললে—এবার আমাকে দাও।…বলে সে হাত পাতলে।
আবার গঙ্গাজল বিনিময় হলো। এরই মধ্যে কিছু জল ফোঁটায় ফোঁটায় হৃদয়চন্দ্রের দেহের উপর পড়ল। তাতে সংকুচিত হচ্ছিল মন্মথ। কিন্তু চপলা অসংকোচ দৃঢ় কণ্ঠে বলে—পড়ুক, জল যদি ওঁর গায়ে লাগে লাগুক, এ জল ওঁর গায়ে লাগলে ওঁর ভালোই হবে।
চপলার শাশুড়ী বিস্মিত হয়ে এই আশ্চর্য অনুষ্ঠান দেখলেন। এই ছেলেখেলার মতো অনুষ্ঠানে এমন এক মহিমা ছিল যা চপলার শাশুড়ীর মনকেও গভীরভাবে স্পর্শ করলে।
চপলা বললে—আপনি এইবার যান মা! আমার গঙ্গাজল আমার কাছে থাকুক।
সুবাসী বোধহয় সমস্তক্ষণ দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। চপলার শাশুড়ী ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র সুবাসী ঘরে এসে ঢুকল।
চপলা বললে—গঙ্গাজলের বোধহয় খাওয়া হয় নি। ওর খাবার জায়গা কর। ওই ঘরে!
সুবাসী প্রশ্নের পুনরুক্তি করে জিজ্ঞাসা করলে—ওই ঘরে? তোমার পুজোর ঘরে?
—হ্যাঁ। ওই ঘরে। ক'বার বলব? যা!
সুবাসী দ্রুত হালকা পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
কিছুক্ষণের মধ্যেই পাথুরেঘাটার হরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্মীয়স্বজন, পোষ্য-পরিজন, চাকর-বাকর পরিপূর্ণ বাড়িতে প্রচারিত হয়ে গেল—এই বাড়ির একদা-আশ্রিত ব্রাহ্মণকুমার মন্মথকে অপমান করে হৃদয়চন্দ্রের চপলা যে ব্রহ্ম-শাপকে আবাহন করে নিয়ে এসেছিল, আজ সতী চপলার ভাগ্যগুণে ও সতীত্ব মহিমায় সেই ব্রাহ্মণকুমার নিজে থেকে এসে আশীর্বাদ করে হৃদয়চন্দ্রের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে তাদের অভিশাপ মুক্ত করেছে। প্রাণ ফিরে পেলে হৃদয়চন্দ্র, প্রতিষ্ঠিত হলো চপলার সতী-মহিমা!
কিন্তু সমগ্র ব্যাপারের মধ্যে একটি কথা অকথিত গোপন কৌতুক হয়ে গোপনেই রয়ে গেল। গোপন রয়ে গেল জগন্নাথঘাটে গঙ্গাজল স্পর্শ করে দু'জনের বিচিত্র সম্পর্ক স্থাপন!
কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা বাড়ির লোক এসে হৃদয়চন্দ্রের শয়নকক্ষের দরজায়, একবার করে উঁকি দিয়ে দেখে গেল আশ্চর্য সতী চপলাকে, দেখে গেল আশ্চর্য

ব্রাহ্মণকুমার মন্মথকে। এ এমন এক সতী, যার আহ্বানে মৃতপ্রায় স্বামীকে বাঁচাতে ভগবান নির্দিষ্টজনকে পাঠিয়ে দেন। আর এ এমন এক ব্রাহ্মণকুমার যাকে সামান্য কটুবাক্য বললে তা অভিশাপ হয়ে ফিরে আসে, সর্বনাশ সাধন করে; আবার সে একবার প্রসন্ন হয়ে এসে দাঁড়ালেই অভিশপ্ত মৃতপ্রায় জন প্রাণ ফিরে পায়।

এই রকম বিশ্বাস ছিল সেদিনের? এই কথা বিশ্বাস করে প্রবীণ হরচন্দ্রও পুত্রের ঘরে এসে সজলচক্ষে মন্মথকে আশীর্বাদ করে গেলেন।

বিশ্বাস করলেন না কেবল হরচন্দ্রের পিসীমা। তাঁর কামড়-চাপা দুটি ঠোঁট একবার ঈষৎ নড়ে উঠল। যেন আপন মনে বললেন—যত্ত সব আদিখ্যেতা।

তবে চপলার ভয়ে সাক্ষাতে বলার সাহস তাঁর ছিল না।

সুবাসী সেই ঘরেই মন্মথর খাবার জায়গা করে দিলে।

মন্মথর তরুণ বয়স, দেহের স্নায়ু-শিরা-উপশিরাগ্রন্থি সব তরুণ অম্লান, তীক্ষ্ণ মেধা তার, চিত্ত আবেগ ও অনুভূতিপ্রবণ। সব কিছু একত্রিত করে তার তরুণ দেহ-মন উন্মুখ হয়ে প্রতি মুহূর্তে তার পারিপার্শ্বের সংসার থেকে অহরহ আনন্দরস পান করে চলেছে। পান করে চলেছে নিজের অজ্ঞাতেই। সেই আনন্দ তীব্রতর হয়ে উঠলে কখনও কখনও তার চিত্ত তাকে নিজের অগোচরে প্রকাশ করে, উদ্গীরণ করে কৃতার্থ হয়। আজ হৃদয়চন্দ্রের সেবা করতে করতে সেই আনন্দে তার প্রাণ যেন উন্মথিত হয়ে উঠল। তারই সঙ্গে ঘটনাচক্রে এমন একটি অতি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান আয়োজন না করেও আপনি আপনি অনুষ্ঠিত হয়ে এমন গাম্ভীর্য ও মহিমার সৃষ্টি করলে যে সেও সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে গেল। গলা মুহূর্তে মুহূর্তে বন্ধ হয়ে আসছে, চোখে জলের একটি আবরণ পড়ে সব ঝাপসা লাগছে। সব কিছুকে গোপন করে সে পরম যত্নে সেবা করে চলেছে হৃদয়চন্দ্রের। প্রাণের অন্তস্তল থেকে একটি প্রার্থনা কেবল ধ্বনিত হয়ে চলেছে—গোবিন্দ আর লক্ষ্মীজনার্দনকে সেবার কোনো পুণ্য যদি তার থাকে সেই পুণ্যে হৃদয়চন্দ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুক। গোবিন্দ জানেন, লক্ষ্মীজনার্দন জানেন, সে তো চপলাকে, কি তার স্বামীকে কোনো অভিশাপ দেওয়া দূরের কথা, তাদের সামান্য ক্ষতির কামনাও করে নি। গোবিন্দ-রূপী ভগবান জানেন সে চিন্তাও তার মনে আসে নি। তবু যদি নিজের অগোচরে তার মন তাই চেয়ে থাকে, তবে তা কেটে যাক; হৃদয়চন্দ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হোক। আহা, কি প্রচণ্ড দাপট ও অহংকারের মানুষ! আপনার সব অহংকার ও কলরব নিয়ে ও আবার পরমানন্দে বাঁচুক।

সে সমস্তক্ষণ পরম যত্নে হৃদয়চন্দ্রের সেবা করে গেল আর চোখের সামনে দু ঘরের

মাঝে খোলা দরজা দিয়ে দেখলে তার খাবার আয়োজন। সুবাসী ঘরে ঢুকল গালচের আসন আর সরপোষ ঢাকা রুপোর গ্লাসে জল নিয়ে। সঙ্গে আর একজন চাকর ঢুকল জলের ঘটি নিয়ে। সে জল ছিটিয়ে জায়গাটা মুছে দিয়ে চলে গেল। সুবাসী আসন পেতে জলের গ্লাস বসিয়ে দিলে। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল চপলার পরবর্তী আদেশের প্রত্যাশায়।

চপলা তাকে বললে—যাও, তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস।

সুবাসীকে হুকুম দিলে—যা, গঙ্গাজলকে স্নানের ঘরে নিয়ে যা।

মন্মথ বললে—আর একটু বসি, ভাত দিক তারপর যাব। কিন্তু তুমি খাবে না?

কথাটা শুনে চপলার সমস্ত মুখ চাপা কৌতুকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে কেমন এক অপরূপ সুন্দর মূর্তি নিলে। হাসি যেন তার চোখ থেকে, ভুরু থেকে ঠোঁটের দুই প্রান্ত থেকে, ঝরে পড়বার জন্য উপচে উঠল। সে বললে—কি, তোমার সঙ্গে বসে? এই এক ঘরে?

অপ্রস্তুত হয়ে মন্মথ বললে—না, না, আমি তা বলি নি। বলছি বেলা হয়েছে তো।

আবার চপলার মুখের সব কৌতুক শীত সন্ধ্যার মুহূর্ত-গোধূলির মতো মিলিয়ে গেল। সে শান্ত মুখে বললে—তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি আজ অতিথি, নারায়ণের তুল্য, তুমি আগে খাও।

ইতিমধ্যে হৃদয়চন্দ্রের সহজ অবস্থা এসে গিয়েছে। সে তাদের সব কথাগুলিই শুনেছিল নিচে এবং বোধহয় অনুধাবনও করতে পেরেছিল। সে চপলার দিকে ফিরে ক্লান্ত কণ্ঠে বললে—তুমি এখনও খাও নি? যাও খেয়ে এসো!

—খাব। একটু পরে।

হৃদয়চন্দ্র বললে—কিন্তু এ কে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে?

—ও আমার গঙ্গাজল। ওকে তো তুমি চেন। মন্মথ, আমাদের বাড়িতে থাকত। ও এণ্ট্রান্সে ফার্স্ট হয়ে আজ শ্বশুরঠাকুরকে প্রণাম করতে এসেছিল। ওরই আশীর্বাদে তুমি বেঁচে উঠেছ।

হৃদয়চন্দ্র নিজের একখানি হাত দিয়ে আবার নিজের মাথার উপর সেবারত মন্মথর হাতখানি ধরলে। একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে—আঃ, ও বড় সুন্দর হাত বুলিয়ে দেয়। আর হাতখানা কি কোমল, কি ধীর!

ঠাকুর এই সময় ভাতের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকল; সঙ্গে পাখা হাতে বাড়ির গৃহিণী, হরচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

চপলা কণ্ঠস্বরকে মৃদুতর করে, মাথার উঠে-যাওয়া ঘোমটা একটু টেনে নামিয়ে

জাগ্রত স্বামীর সান্নিধ্য থেকে একটু সরে গিয়ে শাশুড়ীকে সম্ভ্রম প্রকাশ করে বললে—খাবার দিয়েছে, ওঠ এবার।
হাত মুখ ধুয়ে খাবারের থালা-বাটির সামনে দাঁড়িয়ে সে বিব্রত হয়ে পড়ল। সে আসনে বসতে বসতে বললে—বাবাঃ, এতো খাবো কি করে? এ যে এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন! বইয়েই পড়েছি, চোখে দেখি নি কখনও।
পাখা হাতে বাড়ির কর্ত্রী এবং চপলা দুজনেই এই অকপট উক্তির অন্তরালে তাঁদের প্রাচুর্যের যে প্রশংসা আছে তাকে আস্বাদ করে পরিতৃপ্ত হলেন। তাঁদের দুজনের মুখেই অল্প হাসি ফুটে উঠল। গৃহিণী তার সামনে আসন গ্রহণ করে হাসিমুখে আদেশের স্বরেই বললেন—খুব পারবে! বসে পড়! অল্পবয়সী জোয়ান ছেলে, তোমার আবার খেতে ভয় কি? সেই কথায় বলে না—'ছেলের পেট না হাঁসের পেট!' বসতে হলো তাকে আসনে। ভালো করে খেতেও হলো। সমস্তক্ষণ চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী তাকে পাখার বাতাস করলেন। অনেক বলেও মন্মথ তাকে নিবৃত্ত করতে পারলে না। তার খাওয়াটা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল যখন বালিশে ভর দিয়ে হৃদয়চন্দ্রও তার খাওয়া দেখতে লাগল এবং দুটো একটা কথা বলতে লাগল সেই প্রসঙ্গে।
প্রথমে চপলা একটু অনুযোগ করেছিল—তুমি আবার রোগা শরীরে উঠে বসলে কেন?
শুকনো মুখে অতি হৃদ্য হাসি হেসে হৃদয়চন্দ্র বলেছিল—খিদে পেয়েছে। অনেকদিন বোধহয় কিছুই খাই নি। তাই পেটে খিদে নিয়ে ভালো করে ভালো জিনিস খাওয়া দেখতে ভালোই লাগছে।
গোটা ঘরের মধ্যে সমস্বরে একটি নিম্নকণ্ঠ হাসির ঢেউ রোগের শেষ চিহ্নটিকে শীতের শেষে পত্রোদ্গমের প্রথম লগ্নে বসন্ত বাতাসের মুখে শেষ ঝরা পাতাটির মতো উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন গৃহের কর্ত্রী! তিনি সস্নেহ তিরস্কারের স্বরে পুত্রবধূকে বললেন—তুমি কেমন মেয়ে মা! আজ পাঁচ ছ'দিন কিছু খায় নি হৃদয় ওকে কিছু খেতে দাও!
চপলা একটু হেসে বলল—আপনার ছেলের যখন জ্ঞান হয়েছে তখন আর আপনার ছেলেকে না খাইয়ে মারব না! খেতে দোব! এখুনি তো ডাক্তার আসবে। ডাক্তার দেখে যা খেতে দিতে বলবে তাই দোব!
খাওয়া শেষ হলে চপলা মন্মথকে বললে—গঙ্গাজল, তুমি এইবার কিছুক্ষণ আমার ডাকাবুকো স্বামীকে আগলাও, আমি দুটো খেয়ে আসি। কথাটা বলে সে নেমে দাঁড়াল খাট থেকে। খুব খানিকটা হাসল। এই কারণে যে শাশুড়ী মন্মথর খাওয়া

শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

চপলা খেতে চলে গেলে মন্মথ খাটে এসে হৃদয়চন্দ্রের মাথার কাছে বসল আবার। বললে—পায়ে হাত বুলিয়ে দেব!

তার একখানি হাত আলতোভাবে নিজের দুই হাতের মুঠিতে ধরে চোখ বন্ধ করে হৃদয়চন্দ্র আবার বালিশে মাথা দিয়ে এলিয়ে পড়ল, বললে—না ভাই, আর হাত বুলোতে হবে না। আর তো ঘুম আসবে না। ঘুমের আর দরকার নেই। অনেক ঘুমিয়েছি এই ক' দিনে।

তার হাতে চাপ দিয়ে হৃদয়চন্দ্র বললে—তোমার হাতখানি বড় নরম, বড় ঠাণ্ডা।

মন্মথ আস্তে আস্তে বললে—এক্ষুনি ভাত খেয়ে হাত ধুয়ে এসেছি তো, তাই ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

চোখ বন্ধ করেই হাসল হৃদয়চন্দ্র, বললে—তোমার মনটিও তো দেখছি বড় নরম, বড় ঠাণ্ডা। আমাদের মতো নয়।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল। কিন্তু অলসভাবে নিজের দুখানা হাতের মধ্যে তার হাতখানি নিয়ে খেলা করতে লাগল।

মন্মথ তাকিয়ে ছিল হৃদয়চন্দ্রের মুখের দিকে। সেই দর্পিত, উচ্চকণ্ঠ মানুষটির মধ্য থেকে আর একটি অসহায়, মধুর, আতুর মানুষ হৃদয়ের সব আর্তি নিয়ে, শামুক যেমন সুযোগ ও নির্জনতা বুঝে নিজের খোলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে, তেমনিভাবে বেরিয়ে আসছে। এ মানুষ তার, তার কেন বিশ্ব সংসারের অপরিচিত। হৃদয়চন্দ্র হয়তো নিজেই নিজের পরিচয় জানে না! হয়তো একটু ভালো হয়ে উঠলেই এই মধুর অসহায় মানুষটা আবার নিজের গোপন খোলের ভিতর ঢুকে পড়বে। আর কেউ তাকে দেখতে পাবে না। হৃদয়চন্দ্র নিজেও তাকে জানবে না, ভুলে যাবে। মানুষ বোধহয় এই রকমই।

এই সময় আঁচলে হাত মুছতে মুছতে চপলা ঘরে এসে ঢুকল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বললে—ওকি, আবার চোখ বন্ধ করলে কেন?

চোখ বন্ধ অবস্থাতেই একটু হাসল হৃদয়চন্দ্র; বললে—ভাবছিলাম তোমার গঙ্গাজল আমার কে হয়?

চপলার মুখ চাপা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললে—ও আর কারও গঙ্গাজল হতে পারবে না। ও শুধু আমারই গঙ্গাজল! ও তোমার মন্মথ! শুধু মন্মথ! তুমি ওর দাদা, কাকা, জামাইবাবু যা খুশী হতে পার!

প্রসঙ্গটা বাড়তে পারত কিন্তু বাড়ল না। কারণ এই মুহূর্তে মন্মথর একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেল। দোতলার ঘরের বড় বড় জানলার অবকাশে দৃষ্টি গিয়ে

পড়েছে পাথুরেঘাটার বড় বড় বাড়িগুলোর মাথায় জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন শেষের রৌদ্র তার তীব্র শ্বেতাভার রঙ বদলাচ্ছে যেন। তার মনে পড়ে গেল তাকে সত্যদের বাড়ি যেতে হবে। সে বললে—আমি এইবার যাব গঙ্গাজল!

চপলা একান্তভাবে বিস্মিত হলো। খানিকটা আহতও হলো যেন। সবিস্ময়ে বললে

—যাবে? কোথায় যাবে?

—এক জায়গায় যাব বলে কথা দিয়ে রেখেছি!

তির্যকভাবে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—কোথায়?

—প্রথমে বাড়ি ফিরব। সেখান থেকে যাব এক বন্ধুর বাড়ি।

—বন্ধুর বাড়ি? বন্ধু কোথায় থাকে তার তো নাম আছে? সে কোথায়, কোন্ চুলোয়?

তার কথা বলার ভঙ্গিতে একটু হাসল, আবার একটু অপ্রস্তুতও হলো মন্মথ, বললে—আমহার্স্ট স্ট্রীটে।

—বাঃ খাসা গঙ্গাজল তুমি। খাওয়া-দাওয়া হলো আর বললে—এইবার যাব। গেলেই হলো যেন। এখন তোমার যাওয়া হবে না। একেই বলে 'বামুন বাদল বান', দখ্‌নে পেলেই যান।' গেলেই হলো আর কি!

তারপর ধমক দিয়ে বললে—এখনি ডাক্তার আসবে। ডাক্তার দেখে যাক, তারপর যাবে।

একটু পরেই হরচন্দ্র ডাক্তার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। রোগী দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে, সকলকে নিশ্চিন্ত করে ঔষধ-পথ্যের নির্দেশ দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন। বলে গেলেন—এখন কয়েকদিন অল্প স্বল্প করে তরল পানীয় গ্রহণ করতে এবং সুস্থ হওয়ার পর অন্তত ছ'মাস মদ্য পান না করতে।

ডাক্তার চলে গেলেন, রোগও চলে গেল। ডাবের জল এলো হৃদয়চন্দ্রের জন্য। হৃদয়চন্দ্র পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খানিকটা খেতেই তার খাওয়া বন্ধ করলে চপলা। ধমক দিয়েই বন্ধ করলে—এক সঙ্গে বেশী খেতে হবে না। আবার একটু পরে খাবে।

স্ত্রীর ধমক শুনে হৃদয়চন্দ্র হাসল। আজ স্ত্রীর ধমক তার কাছে ডাবের জলের মতোই স্বাদু ও শীতল লাগছে।

শ্বেত পাথরের গ্লাসে এক গ্লাস ডাবের জল মন্মথর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সেই একই ধমকের সুরে চপলা বললে—খাও।

খেতে হলো মন্মথকে। তারপর চপলা জিজ্ঞাসা করলো—বাড়ি ফিরে সেখান থেকে কোথায় কোন্ বন্ধুর বাড়ি যাবে বলছিলে তুমি? কেমন বন্ধু?

—আমরা একসঙ্গে পড়ি। আমি ফার্স্ট হয়েছি আর সে থার্ড হয়েছে।

—নাম কি তার?

—সত্য। সত্যপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আরম্ভ হয়ে গেল সত্যদের গল্প। ওরই মাঝখানে হৃদয়চন্দ্র বললে—মানে উকিল জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ি? যেখানে তুমি আর আমরা একসঙ্গে সভায় বসেছিলাম।

—হ্যাঁ।

গল্প জমে উঠল। এবার চপলা একটি একটি প্রশ্ন করে কত খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করলে। সব খুঁটিনাটির জবাবও সে দিতে পারলে না। সে তো ওদের বাড়ির সব জানেও না ভালো করে। সে বললেও সে কথা। তবু চপলার প্রশ্নের অন্ত নাই। সেই প্রশ্নমালার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সত্য, সত্যর বাবা জ্যোতিপ্রসাদবাবু, সত্যর মা, সত্যর দিদি সন্ধ্যা, সত্যর ছোট বোন, সত্যর খুড়তুতো বোন মালতী—সবারই কথা একে একে এসে পড়ল। এই সব কথার মধ্যে কখন যে তার নিজেরই অজ্ঞাতসারে ওদের বাড়ির সকলের কথা, এমনকি সত্যর কথাও ছাড়িয়ে মালতীর কথা বড় হয়েছে, বেশী হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারে নি মন্মথ। শেষ পর্যন্ত চপলার পৌনঃপুনিক প্রশ্নের গুণে মালতীর কথাই সব ছেয়ে ফেললে। শেষে সে যখন ছাড়া পেলে তখন চপলা বললে—যাও, এবার তোমার মালতীর কাছে যাও।

কথাটা শুনে চমকিত হয়ে গভীর লজ্জায়, সংকোচে ও যেন খানিকটা ভয়ে চকিত হয়ে উঠল মন্মথ। সব কথাটাকে উড়িয়ে দেবার জন্যই সে বললে—যাঃ, কি সব বলছ?

মাথাটা নেড়ে চপলা বললে—যা বলেছি, ঠিক বলেছি। যাও এইবার। তবে দশহরার দিন নেমন্তন্ন থাকল, মনে থাকে যেন!

সুবাসীকে ডেকে চপলা সম্রাজ্ঞীর মতো হুকুম দিলে—যা, গঙ্গাজলকে নিচে পৌঁছে দিয়ে আয়।

৪

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে গেল মন্মথ। বাইরে বোধহয় তখন সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কিছু বুঝবার উপায় নাই। কারণ আকাশ তখন কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছে। কালো মেঘের স্তরের

উপর কালো মেঘ জমছে আরও ঘন হয়ে। বাড়ির ভিতর মেঘের ছায়ায় অন্ধ-কার

মূল বাড়ির দরজায় সুবাসী তাকে ছেড়ে দিলে। বললে—দশহরার দিন এসো যেন। নইলে আমাকে আবার খুঁজতে যেতে হবে। এইবার যাও। তাড়াতাড়ি যাও, বৃষ্টি আসবে। খানিক আগেই খুব খানিকটা ঝড়ো বাতাস বয়ে গিয়েছে।

ঝড়ো বাতাস বয়ে গিয়েছে? আশ্চর্য তো! গল্পের মধ্যে সেটা খেয়ালও করতে পারে নি সে। সত্যই তো, গল্প করতে করতে কতক্ষণ কেটেছে, কেমনভাবে কেটেছে কোনো খেয়ালই তার ছিল না। তা না হলে তার এত দেরি হয়? সত্য-দের বাড়ি যাবার কথা তো কোন্ বিকেলে! আর এ তো সন্ধ্যা হয়ে এলো।

সে তাড়াতাড়ি যাবার জন্য পা বাড়ালে দরজা থেকে। কিন্তু আবার দাঁড়াতে হলো তাকে। কে যেন ডাকছে, তাকেই ডাকছে—ও ছেলে শুনছ?

দরজা থেকে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপর বাড়ির গেট। সেই ফাঁকা জায়গা থেকে কে তাকে ডাকছে।

সে বললে—আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ, তোমাকে। তুমি ছাড়া আর কে আছে এখানে। শোন। মূর্তি দাঁড়িয়েই রইল, সে এগিয়ে গেল।

হরচন্দ্রবাবুর পিসীমা, সেই মুখে কাপড় চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একটা বুড়ো মুচকুন্দ গাছের পাশে কাপড়ে মোড়া, ঝুলে-কালো, পাকা বাঁশের লাঠির মতো! তিনি চাপা গলায় তাকে বললেন—হ্যাঁ ছেলে, তুমি তো জোয়ান হয়েছ, জ্ঞান-বুদ্ধিও হয়েছে তোমার, শুনি লেখাপড়াতেও তুমি খুব ভালো, তার ওপর ব্রাহ্মণের ছেলে তুমি কিন্তু এ তোমার কি রীতকরণ।

মন্মথ বিভ্রান্ত হয়ে গেল তাঁর কথা শুনে। সে বিহ্বলভাবে বললে—কি করলাম আমি?

পিসীমা আবার তারই প্রশ্ন পুনরুক্তি করলেন নিরুত্তাপ কণ্ঠে—কি করলে? কি করলে বুঝতে পারলে না? কচি খোকা তুমি?

তাকে উত্তর দেবার জন্য একটু সময় দিতেই পিসীমা যেন একটু সময় নিলেন। তিনি জানতেন মন্মথ কোনো জবাব দিতে পারবে না। সংসারে এক একটা মানুষের এমন অভ্রান্ত তৃতীয় নয়ন থাকে, যা দিয়ে এক নজরেই একটা মানুষকে তারা মোটামুটি ঠিক চিনতে পারে। অন্তত এই পিসীমা এক নজরেই তাকে ঠিক চিনে নিয়েছিলেন। এই সুকুমার, পরম সমাদৃত, বুদ্ধিমান ছেলেটি তার সব বুদ্ধি নিয়েও তাঁর অকল্পিত কঠিন আঘাতের জবাব দিতে পারবে না। জবাব দিতে

পারলেও না মন্মথ। সে হতভম্ব হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পিসীমার যেন দয়া হলো। তিনি উপদেশের ছলে বললেন—বড় হয়েছ জোয়ান বয়স তোমার, তোমার একমুখ মোচ-দাড়ি হয়েছে। তুমি কি বলে একা ওই যুবতী মেয়ের সঙ্গে এতক্ষণ ফষ্টিনষ্টি, হাসিঠাট্টা করছ? মন্মথর মাথা তখন হেঁট হয়ে গিয়েছে। সে নীরব।

অন্ধকারের মধ্যে বাঘ যেমন করে পরাভূত হরিণের হাড়মাংস চিবিয়ে খায় তেমনি পরিতৃপ্তির সঙ্গে তার এই স্তম্ভিত নীরবতা বোধহয় আস্বাদন করলেন পিসীমা। তারপর তাকে ছেড়ে দিলেন, বললেন—যাও, এ বাড়িতে আর এসো না কোনো দিন!

পরাভূত, বিপর্যস্ত মন্মথ মাথা হেঁট করে অন্ধকারের মধ্যে গেট পার হয়ে এসে পথের ধারে দাঁড়াল।

তারপর কেমনভাবে এসে কখন জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ির বারান্দায় পৌছলে তা খেয়াল ছিল না মন্মথর। খেয়াল হলো জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ির অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল তাও তার খেয়াল ছিল না। খেয়াল হলো ক্লক ঘড়ির ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনে। টং টং করে সাতটা বাজল। এই সময়ে কে ডাকলে—কে দাঁড়িয়ে।

লোকটি এগিয়ে এলো। মন্মথ দেখলে জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ির একজন চাকর। সে তাকে দেখে অবাক হয়ে বললে—আরে মন্মথবাবু! এ যে একেবারে ভিজে গিয়েছেন! খোকাবাবু বলছিলেন যে আপনি আসবেন বিকেলে! আপনি ঘরে এসে বসুন। আমি খোকাবাবুকে ডেকে দি জল-ঝড়ে বারান্দার আলো নিভে গিয়েছে। ঘরে ঢুকে গদি আঁটা চেয়ারেও সে বসতে পারলে না। বসলে তার ভিজে জামা-কাপড়ে গদি ভিজে যাবে। তাই সে দাঁড়িয়েই রইল একটা চেয়ারের হাতল ধরে। ঘরের মাঝখানে মস্ত বড়, চকচকে মেহগিনি কাঠের টেবিল, তার চারপাশে গদি-আঁটা সব চেয়ার সাজানো। টেবিলের উপর অতি পরিচ্ছন্ন বড় আলো। এছাড়া দু'দিকে দেওয়ালে দুটো দেয়ালগিরি রয়েছে। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মনটা অসাড়, চিন্তাশক্তিহীন। বাইরের পৃথিবীর সব আবেদন হারিয়ে গিয়েছে তার কাছে। কেবল একটা অনুভব তার মনে ধরা পড়ছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ার শব্দ থেকে বুঝতে পারছে যে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে আর সেই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই সে ওখানে এসে পৌছেছে।

সে দাঁড়িয়েই ছিল চুপ করে। কিছুই ভাবছিল না, সব ভাবনা যেন মুখখোলা চৌবাচ্চার জলের মতো এক নিঃসীম অসহায় রন্ধ্রপথে হারিয়ে গিয়েছে। হঠাৎ

সে চমকে উঠল। কে তাকে আস্তে আস্তে একখানা হাত দিয়ে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে পরম সমাদরের সঙ্গে! সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগল—কে? কে মালতী?
মালতীর কথা মনে হতেই সমস্ত দেহ কেঁপে উঠল তার, সে কাঁপতে লাগল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মন তার তাকে ধিক্কার দিলে। ছি, ছি, ছি, এ কি ভাবছে সে! কি অন্যায় ভাবনা! নিজের অতি-লুব্ধ মনকে শাসন করলে সে।
সে চমকে উঠেই ফিরে তাকালে। তাকিয়েই সে অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে বললে—সত্য?
সত্য হেসে বললে—হ্যাঁ আমি! তুই কি ভেবেছিলি আমাদের পালোয়ান রাম-দীন তোকে জড়িয়ে ধরেছে?
এতক্ষণে মন্মথর মনে হলো, হ্যাঁ, সত্যিই তো সত্য ছাড়া এমন করে আর কেউ জড়িয়ে ধরত না। আর রাধাশ্যাম হলে দাপাদাপি করে ছুটে এসে ঝাপটে ধরত প্রচণ্ড উল্লাসে। সেটা দেখতে ভালো লাগছে কি মন্দ লাগছে সে খেয়ালই তার থাকত না। কিন্তু সত্যরা একটু অন্যরকম। ওদের আনন্দ আছে, উল্লাস নাই। সমস্ত আনন্দই ওরা অত্যন্ত সংযত ও শালীনভাবে প্রকাশ করে।
পরক্ষণেই কিন্তু সত্য বললে—কিন্তু এ কি রে, তুই তো কাঁপছিস! বৃষ্টিতে একে-বারে ভিজে গিয়েছিস! দাঁড়া, তোর জন্যে আমার এক সেট পাঞ্জাবি পায়জামা নিয়ে আসি!
মন্মথ তারস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল—না, না, ওসব কিছুই লাগবে না। আজ আসব বলেছিলাম তাই এলাম। তবে আসতে দেরি হয়ে গেল!
সত্য একটু হেসে মন্মথকে বললে—তুই একটা পাগল মনু! দাঁড়া, আমি আসছি! বলে সত্য ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।
মন্মথ একটু নড়াচড়া করবার চেষ্টা করলে। ভাবলে চেয়ারে বসলে হয়। কিন্তু চেয়ারে বসা কেন, যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল সে অবস্থা থেকে একটু নড়তে-চড়তে পারলে না। যেমন চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল দরজার দিকে পিছন ফিরে। সত্য যে এলো এবং গেল ঘর থেকে সেটা যেন তার মনে কোনো ছাপই ফেললে না। কেবল বাইরের বৃষ্টির একটানা শব্দ তার কানে এবং মনে এই অতি বৃহৎ ও অতি বিচিত্র পৃথিবীর অস্তিত্বের একমাত্র ধ্বনির মতো তাকে সঙ্গ দিয়ে চলল।
আবার চমকে উঠল সে। কে আলতো করে তার কাঁধে হাত দিয়েছে! সে চমকে ফিরে তাকালে।

মালতী দাঁড়িয়ে আছে। সেই শুভ্রবসনা, সেই শ্বেতাঙ্গ অপরূপ মূর্তি, বড় বড় চোখের গম্ভীর, নিঃশব্দ দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সে এক মুহূর্ত তার সেই বহুভাবময় অথচ স্পষ্টপ্রকাশহীন মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপরই চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো চোখের জলে। তারপর দুই চোখ থেকে জল পড়তে লাগল গাল বেয়ে গড়িয়ে, তারপর টপটপ করে।

মালতী যেন একটু অবাক হলো। যে হাতখানি সে মন্মথর কাঁধ থেকে নামিয়ে নিয়েছিল, সেই হাতখানিই আবার সে একান্ত স্নেহে তার কাঁধের সেই জায়গাতেই স্থাপন করলে। তারপর মৃদুস্বরে বললে—কি হলো?

মন্মথর মনে হলো যেন তার প্রশ্নের পিছনে বিস্ময় প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সে মুখে কিছু বলতে পারলে না, শুধু সজোরে মাথা নাড়লে, বোধহয় জানালে, কিছু হয় নি।

মালতী বললে, অত্যন্ত মৃদুস্বরেই বললে—চোখ মোছ, সত্য আসছে।

সে মন্মথর কাঁধ থেকে নিজের হাতখানি নামিয়ে নিলে। মন্মথ ভিজে কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে নিজের চোখ মুখ মুছে নিলে। মালতী তেমনি মৃদুস্বরে বললে—পরে সব শুনব।

ঘরের বাইরে বারান্দায় পায়ের শব্দ উঠছে। পরক্ষণেই সত্য একবোঝা ধোবার বাড়ির পাটকরা জামা-পায়জামা নিয়ে ঘরে ঢুকল। বোঝাটি টেবিলের উপরে রেখে সে বললে—নে, জামা-কাপড় বদলে ফেল!

মালতীর দিকে ফিরে বললে—চল মালি, আমরা যাই। এক্ষুনি আসছি আবার।

তারা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দুজনে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার সাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকল। সত্যর হাতে আয়না-চিরুনি।

ঘরে ঢুকেই সত্য সবিস্ময় উৎসাহে বলে উঠল—আরে বাঃ, কি সুন্দর! কি চমৎকার দেখাচ্ছে তোকে! এ যে একেবারে এক হারুণ-অল-রসিদ!

বলেই সে মালতীর দিকে তাকাল সমর্থনের জন্য। বললে—বল, আমি ঠিক বলেছি কি না!

মালতীর মুখে হাসি নেই, হাসি কদাচিৎ আসে। সে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছে মন্মথর দিকে। তার বড় বড় চোখের স্থির দৃষ্টি ও প্রায়-ভাবলেশহীন মুখের ভিতর থেকে যেমন অধিকাংশ সময়েই মালতীর মনোভাব বিন্দুমাত্র বোঝা যায় না, এখনও তেমনি কিছুই বুঝতে পারলে না মন্মথ। তবু মন্মথর মনে হলো যেন ওই বড় বড় চোখের প্রসারিত, শান্ত, গম্ভীর দৃষ্টির অন্তরালে এক সপ্রশংস বিস্ময় লুকিয়ে রেখেছে। কথাটা মনে হতেই তার কেমন যেন কৌতুকবোধ হলো। সে নিজে বোধহয় মালতীর কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তের মতো এই মুহূর্তেও প্রশংসা

চাইছে, তাই সেই প্রশংসাকেই দেখেছে তার দৃষ্টিতে।

মালতীর গম্ভীর মুখে সত্যর কথা শুনেও কোনো ভাবান্তর হলো না। সত্য মুখ ভার করে বললে—মলি যেন কেমন! ওকে পয়সা দিলে তবে ও হাসে।

এইবার একটু হাসল মালতী। তার পিঠে সস্নেহে একটি মৃদু চড় মেরে বললে—কবে তুই আমাকে পয়সা দিয়ে হাসিয়েছিস রে? এই দেখ হাসছি, এইবার পয়সা দে!

—দোব, ওপরে চল। তোর বেণী ধরে টেনে পয়সা শোধ দোব। বলে সত্য তার ব্যায়াম-পরিপুষ্ট একখানা হাত তার বেণীর দিকে প্রসারিত করে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে সব স্ত্রীলোকের চিত্তের অন্তস্তলে যে চিরকালের প্রসাধন বিলাসিনী, কৌতুকময়ী বালিকা মঞ্জুমুখে বসে থাকে সে ছুটে বেরিয়ে এলো। মৃদু আত চিৎকার করে সে সকাতরে ও সভয়ে বললে—ভালো হবে না সত্য। আমার খোঁপার মালা খারাপ হয়ে যাবে। হাত দিসনে আমার বেণীতে।

সে ছিটকে সত্যর কাছ থেকে সরে গিয়ে দাঁড়াল নিরাপদ ব্যবধানে।

সঙ্গে সঙ্গে সত্য তার ডান হাতখানা অভয়মুদ্রায় প্রসারিত করে বললে—যাঃ, তুই সামান্য স্ত্রীলোক, তোকে ক্ষমা করলাম। শাস্ত্রীমশায়ের অনুশাসন মনে পড়ে গেল।

বলেই সে গম্ভীরভাবে যেন একটি নাটকের অংশ আবৃত্তি করে গেল—সর্বদা স্ত্রীলোককে সম্মান করবে। স্ত্রীলোক, তা তিনি জ্যেষ্ঠই হোন, কি কনিষ্ঠই হোন, সর্বদাই পুরুষের সম্মানের পাত্র। যেখানে স্ত্রীলোক অসম্মানিত সেখানে ঈশ্বর রুষ্ট হন, সেখানে তাঁর কল্যাণময় স্পর্শ লাগে না।

তার বলার ভঙ্গিতে হাসতে লাগল মন্মথ মালতী দুজনেই। মালতী মালার কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মন্মথর দৃষ্টি মালতীর মাথার পিছনদিকটায় বার বার গিয়ে পড়তে চাচ্ছে। কিন্তু মালতী এই দিকেই মুখ ফিরিয়ে আছে বলে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না সে। তবু যতটুকু দেখতে পেয়েছে তাতে বুঝতে পেরেছে একটি বেলফুলের মালা তার ঈষৎ-রুক্ষ, পরিপুষ্ট কালো বেণীর গায়ে গায়ে সাদা রেখায় বেড়ে বেড়ে জড়িয়ে আছে।

মালতী আবার গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। সে মুখখানি একটু বাঁকিয়ে, সুন্দর চোখ-দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করে বললে—সত্য, তুই কেন ওকে হারুণ-অল-রসিদ বললি? তুই বুঝি এখন 'অ্যারেবিয়ান নাইট্‌স্' পড়ছিস?

সত্য হেসে বললে—তুই দেখেছিস বুঝি? তুইও তাহলে বার্টনের বইগুলোয় একবার হাত বুলিয়েছিস? পড়তেও বোধহয় চেষ্টা করেছিলি, বুঝতে পারিস নি।

আর ওকে হারুণ-অল-রসিদ কেন বললাম তাও বুঝতে পারিস নি।
বলে সকৌতুকে একটু হেসে নিয়ে বললে—তোর আর দোষ কি? বুদ্ধি কম।
মন্মথ তার বুদ্ধিমত্তা এবং ছাত্র হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না। আরব্যোপন্যাসের কথা সে শুনেছে, পড়ে নি। আর বার্টন এবং অ্যারেবিয়ান নাইট্‌স দুই-ই তার অজানা। আর ও উপমার প্রয়োগটা সে ধরতেই পারে নি।
সত্য মালতীকে বললে—তুই মন্মথর দিকে চেয়ে দেখ মলি, ওর গায়ে আমার এই পাজামা আর পাঞ্জাবির ওপরে একটা জরির কাজ-করা কালো কি লাল মখমলের ছোট কুর্তা চাপিয়ে দিলেই হারুণ-অল-রসিদের মতো লাগবে না? মন্মথ যে দেখতে এত সুন্দর তা কি এর আগে জানতিস? ওর ওই টুলো পণ্ডিতমার্কা ধুতি আর পিরানে, তা ও যত কায়দা করেই পরুক, ওর এই চেহারা খুলত?
মালতী আবার পুরো গম্ভীর হয়ে গেল। কোনো জবাব দিলে না। কিন্তু তার রূপের এত প্রশংসা সত্ত্বেও তার টুলো পণ্ডিতের পোশাকের প্রতি কটাক্ষে মন্মথর মনে একটু খোঁচা লাগল বইকি। সে হাসতে হাসতেই বললে—সত্য, এটা তোর ভাই বলা ঠিক হলো না। এটা চোখের আর অভ্যাসের ব্যাপার। তুই সত্যিকারের টুলো পণ্ডিতের চেহারা কি পোশাক কোনোটাই দেখিস নি। আমি দেখেছি। তাতে তাঁকে অত্যন্ত রূপবান মনে হয়েছে আমার। সে এমন পোশাক আর এমন রূপ যে তুইও দেখলে তারিফ করতিস।
নিজের স্বভাবমতো বড় বড় চোখ প্রসারিত করে মালতী তার কথাগুলো শুনলে গম্ভীরভাবে। মন্মথর মনে হলো, মালতী যেন তার কথাই সমর্থন করছে মনে মনে।
মন্মথর তখন মনে পড়ছিল প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত, শুভ্র গরদে মণ্ডিত, পরিপুষ্ট শিখা সমন্বিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামরাম স্মৃতিতীর্থকে। তাঁর মধ্যে মহিমার এমন একটি প্রকাশ সে দেখতে পেয়েছিল যা আর কোথাও তো আজ পর্যন্ত দেখে নি। অবশ্য তার নিজের দেখার যে সীমা, তার স্বল্পতা সম্পর্কেও সে সচেতন। নূতন কালের দু'-চারজন মহিমান্বিত মানুষের নাম সে শুনেছে; এখানে ওখানে নানান ধরনের কথাবার্তার, আলাপ-আলোচনার মধ্যে সে বুঝেছে, নূতন কালেও নব-মহিমামণ্ডিত জীবনের প্রকাশে ছেদ পড়ে নি; জীবন আপনার মহিমাকে নূতন কালেও নূতন মূর্তিতে একাধিক মানুষের মধ্যে প্রকাশ করেছে। সে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা শুনেছে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম তো সর্বজনবিদিত। এঁদের কাউকেই সে দেখে নি। কিন্তু এঁরা যে মহিমান্বিত মানুষ তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

অন্তত তার নেই।

তা সত্ত্বেও তার রামরাম স্মৃতিতীর্থের কথা মনে পড়ল। কি ছিল তাঁর মধ্যে? বুড়ো মানুষ, জরা ও বার্ধক্যের স্পষ্ট চিহ্ন তাঁর সর্বদেহে। কেবল বিশেষ বলতে সেদিন একটি গরদের কাপড় পরে এসেছিলেন। তা ছাড়া বাকীটা সবই তো সাধারণ টুলো পণ্ডিতের মতো। তার থেকে বেশী কিছু তো বাহ্যত ছিল না তাঁর মধ্যে। তবু তাঁকে তার সেদিন শুধু অসামান্যই মনে হয় নি, এক বিশেষ মহিমায় মণ্ডিত বলে অভ্রান্তভাবে মনে হয়েছিল। সেটির নিশ্চিত উৎস কোথায় তা সে তখন তখনই সঠিক বুঝতে পারে নি। পরে মধ্যে মধ্যে অভিজ্ঞতাটুকু নিজের মনে মনে আলোচনা করে নিজের মতো বুঝেছে। জীবনে তিনি এমন এক সহজ প্রত্যয়ের মধ্যে পৌঁছেছেন যার ফলে সকল প্রশ্নের গ্রন্থিমোচন এবং সকল সংশয়ের ছেদন ঘটেছে। তার ফলে বৃদ্ধ সদাসর্বদা এমন এক প্রসন্ন সরসতার মধ্যে বিরাজ করেন যা স্বল্পবুদ্ধি মানুষও তাঁর কাছে গেলে অনুভব করতে পারে।

তিনি প্রথমবার তাঁদের বাড়ি আসার পক্ষকালের মধ্যেই আবার একবার তাদের গ্রামের ভিতর দিয়ে গোরুর গাড়িতে যাচ্ছিলেন অন্যত্র। বোধহয় তাকে একবার দেখার কথাই তাঁর মনে ছিল। সেদিন মন্মথ তাঁর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু দূর গিয়েছিল। তাকে সঙ্গে সঙ্গে আসতে দেখে বৃদ্ধ স্বভাবতই খুব খুশী হয়েছিলেন। হাসিমুখে বলেছিলেন—কি ভাই, সঙ্গে সঙ্গে আসছ যে।

সে হেসে বলেছিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কেন?

সে লজ্জিত হয়েও হাসিমুখে বলেছিল—আপনার সঙ্গে যেতে ভালো লাগছে, তাই যাচ্ছি।

বৃদ্ধ অকপট আনন্দে বলেছিলেন—ভালো লাগছে তাই আসছ? ভালো, খুব ভালো। তা এই বৃদ্ধের সান্নিধ্যে কোন্ মধুর সন্ধান পেলে ভাই?

মন্মথ মনে মনে নিজেও তো তাই সন্ধান করছিল। সে অন্যমনস্কের মতো হেসে বলেছিল—তা তো জানি না। তবে খুব ভালো লেগেছে এইটুকু বলতে পারি।

বৃদ্ধ গাড়ির টাপরের পিছনের দিকে সরে তার নিকটতর সান্নিধ্যে আসবার চেষ্টা করেছিলেন। এবার একটু গম্ভীরভাবে বলেছিলেন—কেন ভালো লাগল ভালো করে ভেবে দেখবার চেষ্টা কর তো!

মন্মথকে বেশী ভাবতে হয় নি। তার বুদ্ধি নয়, তার মনই তাকে সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা এগিয়ে দিয়েছিল। সে বলেছিল—আপনি তো বৃদ্ধ হয়েছেন, যে কোনো দিনই তো আপনার মৃত্যু হতে পারে। এ বোধ সাধারণ মানুষের মনে না থাকতে পারে,

আপনার নিশ্চয়ই আছে। তাই যখন মানুষ বার্ধক্য ও জরায় পীড়িত, মৃত্যুভয়ে কাতর হয়, তখন এমন আনন্দের মধ্যে আছেন কি করে?

বৃদ্ধের মুখের সব প্রসন্নতা অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল, মুখখানি যেন থমথম করে উঠেছিল অপরিসীম গাম্ভীর্যে, ছোট ছোট চোখের প্রসন্ন কোমল উজ্জ্বল দৃষ্টির সব কোমলতা ঘুচে গিয়ে চোখদুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। মন্মথ একটু ভয় পেয়েছিল সে দৃষ্টি দেখে। তার মনে হয়েছিল—সে কি নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাচালতা প্রকাশ করে নিজের অজ্ঞাতসারে বৃদ্ধকে আঘাত করেছে? সে একটু সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল।

বৃদ্ধ অকস্মাৎ গাড়ির পাশে চলমান তার ডান হাতখানি আবেগের সঙ্গে চেপে ধরেছিলেন। গাঢ় গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন—আমি অতি প্রাচীন হয়েছি, কিন্তু এমন প্রশ্ন কখনও আমাকে কেউ করে নি। তুমি একান্ত তরুণ, তবু তুমি করতে পেরেছ। তাই এর উত্তর আমি তোমাকে দেব। দিলে তুমি হয়তো উপলব্ধি করতেও পারবে। সঙ্গে সঙ্গেই পারবে না; যদি আমার উত্তর মনে থাকে তাহলে ধীরে ধীরে, দিনে, দিনে, একটু একটু করে বুঝতে পারবে।

বলতে বলতে বৃদ্ধ গাড়ির পিছনের দিকে একেবারে প্রান্তদেশে সরে এসেছিলেন তার নিকটতম সান্নিধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বৃদ্ধ তখন গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কিরে দাঁড়িয়ে গেলি কেন?

গাড়োয়ান সশ্রদ্ধভাবে বলেছিল—আজ্ঞে কত্তা, গাড়ি 'ওলাট' হয়ে গেলেন। আপনি গাড়িতে একা সোয়ার। পিছু বাগে অত সরে গেলে গাড়ি যাবেন ক্যামনে?

এক মুহূর্তে বৃদ্ধের সকল সরসতা ফিরে এসেছিল। তিনি হা হা করে হেসে বলেছিলেন—ঠিক তো, পিছনে সরে এলে গাড়ি 'ওলাট' হবেন, আর 'ওলাট' হলে গাড়ি যাবেন ক্যামনে। ঠিকই তো। বুঝলে ভাই, জীবনে অন্যমনস্কতার কি ভ্রান্তির মুহূর্তমাত্র অবকাশ নাই! এক মুহূর্তের অন্যমনস্কতা কি ভ্রান্তি ঘটলে জীবনে ছন্দপতন হবে, জীবনের রথ থমকে যাবে। তা ভাই, তুমি এক কাজ কর, উঠে এস গাড়িতে, এসে আমার পাশে বস।

মন্মথ একটু ইতস্তত করেছিল।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করেছিলেন—কি হলো? এস।

মন্মথ বলেছিল—কাপড়-চোপড় শুদ্ধ নয়, আপনার পাশে গিয়ে বসব?

আবার হেসে বৃদ্ধ বলেছিলেন—ভাই, তুমি তো আমার পৌত্র। আমার বাড়িতে তো পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী সকলে আছে। আমি তো সংসারী মানুষ।

আমার বুকেও ভালবাসা আছে, তাদের বুকে করেও আদর করে থাকি। তা তারা তো আমার দেহ ময়লা কি নোংরা করে দিতে সংকোচ করে না, সেক্ষেত্রে আমি তাদের আমার বুক থেকে ফেলে দিই ?

বলে তার সব সংকোচ ঝেড়ে ফেলে তাকে বললেন—এস, উঠে এস গাড়িতে। সে গাড়িতে উঠতেই তাকে সস্নেহ উত্তাপের সঙ্গে বললেন—কাছে এস। কানে যে ভালো করে শুনতে পাই না ভাই।

গাড়ির মাঝখানে খড়-বিছানো গদির উপর কম্বলে বেশ আরাম করে বসে স্মৃতি-তীর্থ গাড়োয়ানকে বললেন—এইবার চল রে বাবা। তবে আস্তে আস্তে চল।

তারপর বললেন—ভাই, তুমি যা প্রশ্ন করলে তার একমাত্র উত্তর হলো—সর্ব-যজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। এটি সূত্রের মত; এখন এই সূত্রের একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। দেখ ভাই, যে শিক্ষা পেয়েছি, যে পরিবারে জন্মেছি তাতে শিখেছি—জীবনে একান্ত সংগোপনে, রাত্রির অন্ধকারে পুরুষ ও নারীর সন্তান-কামনা থেকে মৃত্যুর সময় শ্মশান পর্যন্ত মানুষের জীবন সর্বযজ্ঞেশ্বর হরির যজ্ঞস্থলী। মানুষের জীবনে সমস্ত কর্মই পরমেশ্বরের যজ্ঞস্বরূপ, আর সমস্ত কর্ম, সমস্ত অনুষ্ঠান, সমস্ত যজ্ঞের মধ্যস্থলে যজ্ঞের অধীশ্বর হয়ে রাজরাজেশ্বরের মতো শ্রীহরি বিরাজ করছেন। এই দেখ না, প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের মুহূত থেকে শয্যাগ্রহণ ও নিদ্রার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দিন-রাত্রির অষ্টপ্রহর সমস্ত কর্ম ও অনুষ্ঠানের মধ্যে যজ্ঞাধিপতি হয়ে শ্রীহরিই বিরাজ করছেন। তাই যখন সব কর্মই যজ্ঞস্বরূপ, সব কর্মও তাঁর, সব কর্মফলও তাঁর। এই বোধটুকুকেই যথাসাধ্য নিজের জীবনে চর্চা ও অভ্যাস করবার চেষ্টা করেছি। যখন কোনো কর্মই আমার নয়, কোনো কর্মফলই আমার নয়, তখন আমি অকারণ ভারগ্রস্ত হই কেন ? কথাটা শুনতে সহজ, কিন্তু একে চিন্তায় কর্মে ও চরিত্রে রূপ দেওয়া কঠিন। একটা উপমা দিয়ে বলি।

স্মৃতিতীর্থ মশায়ের মধ্যে যেন কোথায় একটি উচ্ছ্বসিত বালক লুকিয়ে ছিল। সে যেন বেরিয়ে এলো এই মুহূর্তে! তার আরও কাছে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ। তার একখানা হাত নিজের হাত দিয়ে চেপে ধরে কথা বলতে লাগলেন। তিনি মন্মথর এত কাছে এসেছেন যে মন্মথ তাঁর প্রায়-দন্তহীন মুখের ভিতরের সুগন্ধি মসলা-যুক্ত পানের মৃদু সুবাস পর্যন্ত পাচ্ছে। এক একজন বৃদ্ধের মুখে এমন দুর্গন্ধ থাকে যে, সমস্ত মাধুর্য সত্ত্বেও তাঁদের কাছে বসা যায় না। এ বৃদ্ধটি কিন্তু সেদিক দিয়েও দোষমুক্ত, বড় পরিচ্ছন্ন।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন—খুব সোজা ও সরল উপমা। এই এখন জ্যৈষ্ঠ মাস তো। এখন আম পাকবার সময়। তোমাদের হয়তো গ্রামে কি গ্রামের আশেপাশে

আমের বাগান আছে। তোমাদের এ অঞ্চলে তো ভালো পেয়ারাফুলি আম হয় গো। তা তোমার পিতা গঙ্গাধর তোমাকে বললেন—ওরে মন্মথ, যা তো, বাগানের আমগুলো পাড়িয়ে নিয়ে আয়। সঙ্গে লোক নিয়ে চলে যা। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তুমি পিতার আদেশে দুজন লোক, বস্তা, 'লগি' আর সব আনুষঙ্গিক জিনিস নিয়ে বাগানে চলে গেলে। লোকদের দিয়ে আম পাড়ালে, বস্তায় পুরলে, তারপর বাড়ি এনে হাজির করে বাবার সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে—এই নাও তোমার আম। ব্যস, তোমার কাজ চুকে গেল। এইবার আম নিয়ে যা করবার বাবা করুন। তোমাকে হাতে তুলে দুটো আম দিলেন, খেয়ে তুমি পরিতৃপ্ত। তুমি আম খেয়ে বেড়াতে চলে গেলে মনের আনন্দে। কেমন তো ? আচ্ছা। আবার অন্য পক্ষে দেখ, একে যদি তুমি পুরোপুরি তোমার নিজের কাজ, নিজের দায় বলে গ্রহণ করতে তা হলে কত কি করতে হতো তোমাকে। রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটত আমগুলো ঠিক রাখা হলো কি না ভেবে, পাড়ার দুষ্ট ছেলেতে জানলার ফাঁক দিয়ে চুরি করছে কি না ভেবে। তোমাকে ভাবতে হতো কাকে ক'টা করে আম দিতে হবে। ভাবনার ভার চেপে থাকত মনের ওপর। আর এখন ? পিতার আদেশ পালন করেই তোমার ছুটি, আর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই তোমার। বুঝেছ ?

একটি সরস আবিষ্টতার মধ্য থেকেই স্মিতমুখে মন্মথ শুধু ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

বৃদ্ধের কথার তখনও শেষ নেই। তিনি একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—ভাই, কথাটা বড় সোজা করে বললাম। কারণ চিন্তার স্তরে আজ বিষয়টা অনেক সোজা হয়ে এসেছে। কিন্তু জীবনে প্রতিমুহূর্তে যজ্ঞেশ্বর হরির আসন পেতে রেখে শুধু তাঁকেই করজোড়ে প্রদক্ষিণ করে ফেরার কাজ তো সহজ নয়। সজ্ঞানে সে কাজ আরম্ভ করেছি দিনারম্ভের প্রারম্ভে। কিন্তু অকস্মাৎ এক এক সময় সচেতন হয়ে মনে হয়েছে—একি, এ আমি কোথায় ? আমি তো সেই যজ্ঞস্থলী থেকে, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞশালা থেকে কোথায় কতদূর সরে এসে অন্য কোনো চিন্তাকে কত গভীর অনুরাগে নববধূর মতো বরণ করে নিয়ে, তার হস্ত ধারণ করে, বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছি মোহগ্রস্তের মতো। চেতন হবার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভাই, সে-ই কি সহজে ছাড়ে ? সে যেন আমাকে জোর করে ধরে রাখতে চাইছে। আসল কথা কি জান ? জোরটা তার নয় আসলে। আমার নিজেরই আসক্তিজনিত দুর্বলতাতেই তার শক্তি, তার জোর, তার বসতি ! ভাই ভাই, আরও গুহ্য কথাটা কি জান ? মূল

কথাটা হলো, ঈশ্বরের দয়া। ঈশ্বরের দয়া না হলে এসবের কিছুই মোচন বা অপনোদন হবে না।

বলে বৃদ্ধ একটু চুপ করলেন। চুপ করে থেকে আবার আরম্ভ করলেন—তা হলে দাঁড়াল এই যে ঈশ্বরের দয়া না হলে কিছুই হবে না। তা ঈশ্বর কখন দয়া করবেন কে জানে। দয়া আদৌ করবেন কি না তাই বা কে জানে! তা হলে আমি করব কি? আমার কি করণীয় কিছুই নেই?

প্রশ্ন উত্থাপন করে প্রশ্নের উত্তরও তিনি নিজেই দিলেন, বললেন—করণীয় অবশ্যই আছে। সেই জন্যই অষ্টপ্রহর তাঁর দয়া প্রার্থনা করে যেতে হবে। শুধু চিন্তা, মনন, ধ্যান করলেই হবে না। কায়েন মনসা বাচা সর্বাঙ্গীণভাবে তা করতে হবে। দেহ দিয়ে অর্থাৎ কিনা কর্ম দিয়ে, মন দিয়ে অর্থাৎ কিনা চিন্তা দিয়ে, এবং বাক্য দিয়ে সেই দয়া অবিরত, অবিরাম যুক্তকরে প্রার্থনা করতে হবে।

তাঁর বক্তব্য শেষ হলো।

একটু চুপ করে থেকে বৃদ্ধ এবার বললেন—সারা জীবন এই কায়েন মনসা বাচা তাঁর দয়া ও ক্ষমা পাবার জন্য যতটুকু পেরেছি ততটুকু যুক্তকরে বলেছি আমাকে দয়া কর, ক্ষমা কর প্রভু। কিন্তু কতটুকু পেরেছি তা জানি না ভাই! আমি সামান্য মানুষ ভাই, বহুছিদ্র তরণীর মতো। বার বার অনুভব করবার চেষ্টা করি, এই বহুছিদ্র তরণীতে তিনি কাণ্ডারীরূপে বসে এই অনন্ত কালসমুদ্র পার করছেন। এখন সেই তরণীর গতির পরিমাণ, তার দিক্‌নির্ণয় সব তার হাতে। তিনিই জানেন এই তরণী তিনি কূলে ভেড়াবেন না মাঝসমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়ে তিনি অন্তর্ধান করবেন। সবই তাঁর ইচ্ছা ভাই। তাই হাত জোড় করে ভগবানকে মনে মনে বলি—হে হৃষিকেশ, ধর্ম জানি, কিন্তু তাতে প্রবৃত্তি নেই, অধর্মও জানি, কিন্তু তাতেও নিবৃত্তি নেই। তুমি হৃদয়ে আছ, যেমন করাও তেমনি করব।

বলে তিনি একটি নিশ্বাস ফেলে নতমস্তকে নীরব হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুটি চোখও যেন মুদ্রিত হয়ে গেল। মন্মথর মনে হলো তিনি যেন তাঁর জীবন-তরণীর নাবিককে এই মুহূর্তে একবার স্মরণ করে নিলেন। তাঁর কথার অন্তরালে যেন একটি সকরুণ নম্রতা স্তম্ভিত রোদনের মতো প্রবাহিত হয়ে চলেছে বলেও মনে হলো মন্মথর। স্বল্প কয়েক মুহূর্ত নীরবে নতমস্তকে চোখ বন্ধ করে থেকে আবার একটি নিশ্বাস ফেলে মাথা তুললেন। মন্মথর দিকে চেয়ে যেন আবার স্থান, কাল ও অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে একটু সকরুণ হেসে তিনি বললেন—শীতের শেষে, বসন্তারম্ভে গাছের জীর্ণ পাতা খসে পড়ে আর ভাবি, আর কতদিন! আর তো আমার অতি স্বল্পকালই অবশিষ্ট আছে। তা বিধাতার কৌতুক দেখ, তিনি হাত-

মধ্যেই আমার বিশ্বসংসারের শব্দগ্রহণের শক্তিকে স্তিমিত করে দিয়েছেন। জিহ্বার স্বাদও প্রায় বিগত! এখন অপেক্ষা করে আছি, কবে এই দেহটা তিনি জড়পিণ্ডে পরিণত করে পিণ্ডবৎ গ্রহণ করবেন। যেদিন, যখন, যে মুহূর্তে গ্রহণ করেন কিছুতেই আমার আপত্তি নেই। কেবল একটি প্রার্থনা, তিনি আমাকে গ্রহণ করবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যেন তাঁকে স্মরণ করে দুই হাত যুক্ত করতে পারি —আর কিছু চাই না!

বৃদ্ধ আবার একটু থামলেন, তারপর আবার বলতে লাগলেন—জান, এ জীবনে তিনি আমাকে যা দিয়েছেন তার জন্য প্রতিদিন তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। বলি, প্রভু, তোমার কত করুণা যে তুমি আমাকে এমন গৃহে এমন বংশে জন্ম দিয়েছিলে যেখানে আমার মনকে তোমার অভিমুখী করবার জন্য আমাকে পৃথক্‌ভাবে সন্ধান করতে হয় নি। আমি যে বংশে জন্মেছিলাম সেখানে নিজের মনকে তোমার অভিমুখে স্থাপন করবার তপস্যা বর্তমান ছিল। আমি জন্মসূত্রেই সে তপস্যাকে লাভ করেছিলাম।

মন্মথ বুঝতে পারলে বৃদ্ধের বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে। তার বৃদ্ধের কাছ থেকে সরে, গাড়ি থেকে নেমে যাবার সময় এসেছে। বিচ্ছেদের মুহূর্ত সমাসন্ন। বৃদ্ধের জন্য তার কেমন মন-কেমন করতে লাগল। মনে হতে লাগল, এই বৃদ্ধের সঙ্গে তার হয়তো আর কখনও দেখা হবে না। তার এই মুহূর্তে আরও একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল! সে সসম্ভ্রমে বললে—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব দাদু?

তার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে তাকে উৎসাহ দিয়ে বৃদ্ধ বললেন—কর, কর। ভাই, তোমাকে যদি ছাত্র হিসেবে পেতাম তো আবার গিয়ে টোলে পণ্ডিতের আসনে বসে তোমাকে পড়াতাম। তোমাকে অন্য কিছু না পড়িয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবদ্ পড়াতাম। বল কি জানতে চাও!

তার মনে পড়েছিল সত্যর সঙ্গে তার অবিরাম এক বিশেষ বিষয় নিয়ে তর্কের কথা। ঈশ্বরের আকার নিয়ে। সত্য নিরাকারের পক্ষে আর সে সাকারের পক্ষে মীমাংসাহীন তর্ক করে এসেছে এবং করেও অবিরাম। তাই সেই প্রশ্নই সে উত্থাপন করলে।—বললে—আচ্ছা, ঈশ্বর সাকার-না নিরাকার?

তার প্রশ্ন শুনে আবার হা হা করে হাসলেন বৃদ্ধ। সমঝদার রসিকের মতো তিনি বারকয়েক ঘাড় নাড়লেন। তারপর বললেন—এ কালের উপযুক্ত প্রশ্ন। চির-কালের মূল জিজ্ঞাসাই হলো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। তা জিজ্ঞাসা তো কালে কালে নব নব মূর্তি নিয়ে প্রকাশিত হয়। এ কালের জিজ্ঞাসা তোমার এই প্রশ্নের মূর্তিতে প্রকটিত। তা এর উত্তর তো তোমাদের এ কালে এক সাধু খুব সুন্দর করে

দিয়েছেন। তোমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বরে তিনি ছিলেন, সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছেন। তিনি যত সহজ তত সুন্দর করে বলেছিলেন উপমা দিয়ে। অকূল সমুদ্রের অগাধ জল সেও জল, পাত্রে ধরা জল সেও জল, আবার জমাটবাঁধা বরফ সেও জল! সব জলই এক। অকূল সমুদ্রে জলের আকার নাই। আর পাত্রে ধরে রাখলেই জল পাত্রের আকার ধারণ করে আবার বরফে রূপান্তরিত হয়ে সে একটা স্পষ্ট মূর্তি ধারণ করে। এর চেয়ে সহজ করে তো ভাই, আর বলা যায় না। তাই ঈশ্বর সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন। যে যেমন চায়। যে যেমন-ভাবে ভজনা করে সে তেমনিভাবে পায়। এ সম্পর্কে তোমাদের দক্ষিণেশ্বরের ওই সাধু তো বড় চমৎকার কথা বলেছেন গো। যে ছেলের যেমন পছন্দ মা তাকে তেমনি করে খেতে দেন। তাই যে ঈশ্বরকে যেমন করে পেতে চায় তেমনিভাবেই পেতে পারে।

তারপর তাকে প্রশ্ন করলেন—তুমি বাড়িতে কোনোদিনই নারায়ণ সেবা করেছ? হাসিমুখে মন্মথ বললে—বাবার শরীর খারাপটারাপ থাকলে করেছি, এখনও করি।

—বেশ কথা। তা নারায়ণের মাথায় তুলসী কি ফুল চাপাবার সময় কি বল? ওঁ বহুরূপায় পরমাত্মনে স্বাহা। তিনি পরমাত্মা কিন্তু তিনি বহুরূপ, অনন্তরূপ। জ্ঞানী যখন বুঝতে পারে, যখন সম্পূর্ণ জ্ঞানের উদয় হয় তখন জ্ঞানীর চোখে ধরা পড়ে অনন্তরূপ সত্ত্বেও তাঁর কোনো রূপ নাই। সাধকের, তপস্বীর হিতার্থে ও প্রয়োজনে অবয়বহীন শরহীন ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করে নিতে হয়। এই দেখ, আমার যখন দেহান্ত হবে, যখন আমাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে চিতাগ্নিতে সমর্পণ করবে, তখন তো আমি আর রামরাম স্মৃতিতীর্থ থাকব না, আমি তখন একটা মৃতদেহ। তা এই রামরাম স্মৃতিতীর্থ আখ্যাত এই যে আমি, সেই আমি বাড়িতে হাঁটু পর্যন্ত খাটো ধুতি পরে নগ্নদেহে চলাফেরা করি। আজ একখানা গরদ পরে এসেছি। তার ওপর আবার আমার নাতনী আসবার সময় এই গরদের পাটকরা চাদরখানা কাঁধে চাপিয়ে দিলে। তা আমার তো ক্ষণে ক্ষণে আজ রূপের বদল হলো। কিন্তু আমি তো সেই আমিই আছি।

বলেই বৃদ্ধ থেমে গেলেন। চকিত হয়ে বললেন— ভাই, তুমি আমার সঙ্গে অনেক দূর এসে গিয়েছ। এইবার ফের। নইলে হয়তো আবার আমাকেই গাড়ি ফিরিয়ে তোমাকে পৌঁছুতে যেতে হবে। না হলে মনে শান্তি পাব না!

পরম তৃপ্তি ও মন-কেমন-করা এক ভাব নিয়ে মন্মথ গাড়ি থেকে নেমে এসে পথে দাঁড়িয়েছিল গাড়ির দিকে চেয়ে। বৃদ্ধও তাকে যতক্ষণ দেখা যায় গাড়ি থেকে

দেখেছিলেন।

হঠাৎ সত্য তাকে ঠেলে দিয়ে বললে—এই, অমন করে তাকিয়ে কি ভাবছিস রে মনু ?

সচকিত হয়ে আবার বর্তমান অবস্থায় ফিরে এসেছিল মন্মথ। একটা নিশ্বাস ফেলে বলেছিল—নাঃ, কিছু না।

সত্য বললে—চল, ওপরে চল। আমরা সবাই সেই বিকেল থেকে তোর জন্যে আসর পেতে বসে আছি।

মালতী মৃদুস্বরে যোগ দিলে—হ্যাঁ, ওপরে যাওয়াই ভালো। সন্ধ্যাদি বসে আছে ওপরে। ওকে একা বেশীক্ষণ বসে থাকতে হলে, ও রাগ করে উঠে যাবে। আর ওর রাগ বড় কঠিন। ভাঙানো যায় না কিছুতে। তারপর শেষ পর্যন্ত কাঁদতে আরম্ভ করবে।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে কথা হচ্ছিল। প্রথমে সত্য, তারপর মালতী, তার পিছন পিছন উঠছিল মন্মথ। মন্মথ চুপ করেই আছে। তার মনে তখনও সেই বৃদ্ধের গরুর গাড়ির পিছন থেকে উৎসুক দৃষ্টির ছবি ঘুরে ফিরছিল, তাতেই মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে ছিল। হঠাৎ একটা বিচিত্র চিন্তা মাথার ভিতর দিয়ে একটা তীরের মতো পার হয়ে গেল ওরই মধ্যে। কত অল্প সময়ের মধ্যে মন কত বেশী, কত বিচিত্র কথা চিন্তা করতে পারে, কত দীর্ঘ স্মৃতি স্মরণ করতে পারে।

সেই আবিষ্টতার মধ্যেই কানে এলো, সত্য বলছে—সন্ধ্যাদির রাগের কথা তো বললি মলি, কিন্তু তোর অনুরাগের কথা তো বললি না। এখানে অনুরাগ মানে হলো খেয়াল। তোর খেয়ালী জেদ কেমন তার কথাটা বল, স্বীকার কর মনুর সামনে।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই মালতী সত্যর পিঠে একটা মৃদু আঘাত করলে। মৃদু প্রতিবাদ করে বললে—আমার আবার খেয়াল কিসের, জেদই বা কিসের! তুই যখন তখন গান গাইতে বললে কি যখন তখন গাওয়া যায়? 'মুড' না থাকলে গান হয়?

তার মৃদু প্রতিবাদের মধ্যেই যেন অভিযোগটিকে স্বীকার করে নিলে মালতী। তার স্বভাব-মৃদু কণ্ঠস্বর এখন মৃদুতর। মন্মথ কেমন যেন অনুভব করতে পারছে যে মালতী তার ঠিক সামনেই তাকে পিছনে রেখে সিঁড়িতে উঠতে অস্বস্তি বোধ করছে। এই বোধটা মনে আসতেই সে নিজের আবিষ্ট অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে সামনেই মালতীর দিকে চাইলে। হাতে করে দোলালে একটি সপুষ্প

রজনীগন্ধার ডাঁটি যেমন সুন্দর ছন্দিত মূর্তি নেয়, এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মালতীর দেহটি তেমনি এক অপরূপ সৌন্দর্যে ছন্দিত হয়ে উঠছে। মন্মথ যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে মালতী নিজেকে যথাসম্ভব সম্বৃত ও সংকুচিত করে, তাকে পিছনে রেখে সিঁড়ি উঠছে। কিন্তু তার সমস্ত সংকোচ ও চেষ্টা সত্ত্বেও তার তনু-যষ্টির ছন্দিত শোভায় বিহ্বল হয়ে গেল মন্মথ। এমন করে, এমন চোখে কখনও কোনো স্ত্রীলোককে দেখে নি মন্মথ। মালতীর বুটিতোলা সাদা ঢাকাই শাড়িতে অতি সজ্ঞান যত্নে ও চেষ্টায় বেষ্টিত পৃষ্ঠদেশের এক প্রান্তে ফ্রিল-দেওয়া, সাদা ব্লাউজে কনুই পর্যন্ত হাতখানি আবৃত, তার অনাবৃত বাকী অংশে শুধু সোনার বালা পরা নরম হাতখানি আলতোভাবে সে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সিঁড়ির কাঠের রেলিংয়ের উপর দিয়ে। মন্মথ একবার তার বেলফুলের মালা-জড়ানো বেণীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে তার বালাপরা হাতখানির দিকেই চেয়ে রইল। মালতীর বেণীর মালা থেকে বেলফুলের গন্ধ, তার সঙ্গে আরও একটা কিসের অতি মৃদু, অতি অস্পষ্ট সুবাস নাকে এসে লাগছে। আলতো হাতখানি আর এই গন্ধ দুইয়ে মিলে তাকে এমন কোনো এক অতি সুন্দর অভিজ্ঞতার সন্ধান দিলে যা তার জীবনে একান্ত নূতন ও অভিনব। আজ পর্যন্ত সে যা যা দেখেছে, যা যা অনুভব করেছে, যা যা আস্বাদ করেছে তার কোনো কিছুর সঙ্গে এ অভিজ্ঞতার মিল নেই। এ যেন এক নূতন জগতের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে অভিজ্ঞতা অনেক বেশী মধুর, একান্ত তীব্র অথচ বড় গোপন ও গূঢ়সঞ্চারী। একটা স্বপ্নের মধ্যে, এক কুহকের মধ্য দিয়ে সে চলেছে যেন।

কিন্তু চলা শেষ হয়ে গেল। সিঁড়ির মাথায় উঠে এসেছে তারা।

সিঁড়ির মাথাতে উঠতেই মালতী দ্রুতপায়ে সরে গেল তাদের মধ্য থেকে। সে তার স্বভাবমৃদু স্বরকে একটু উঁচু করে ডাকতে ডাকতে চলে গেল—সন্ধ্যাদি, সন্ধ্যাদি!

মন্মথর মনে হলো, মালতী তাদের মাঝখানে থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যে আড়ষ্টতা অনুভব করছিল তার থেকে পরিত্রাণ পেলে যেন।

সন্ধ্যা হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। সে সত্য ও মালতী দুজনের থেকেই বয়সে বড়, অথচ তাদের দুজনের থেকেই সে যেন জীবন সম্পর্কে কম অভিজ্ঞ, কম পরিপক। তাই তার কথাবার্তা অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠ, চলাফেরা অনেক বেশী দ্রুত, স্বভাবে আবেগের প্রকাশও কিছু উচ্ছ্বসিত। সোজা কথায় সে অনেক বেশী সাদা-মাটা মানুষ। জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ির সংযত ও সুসংস্কৃত পরিমণ্ডলে তাই সন্ধ্যার চরিত্রের সামগ্রিক সুর যেন মিল করে বাঁধা সঙ্গতের মধ্যে উঁচু সুরে

বাজে। সন্ধ্যা ছুটে এসে মন্মথর হাত চেপে ধরলে। সোচ্ছ্বাসে বললে—মনু এসেছিস ভাই! তোর জন্যে সেই কোন্ বিকেল থেকে বসে আছি!

সকলে মিলে পরমানন্দে দোতলায় সজ্জিত প্রশস্ত বসার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আলো, হাসি, ঘরের অলংকৃত সজ্জা সব কিছু মিলে মন্মথকে আবার বর্ত্তমান মুহূর্তটির মাঝখানে রাজার মতো স্থাপন করলে। ত্রিবেণীর পণ্ডিত বৃদ্ধ রামরাম স্মৃতিতীর্থের উৎসুক দৃষ্টির মমতাময় বিষণ্ণতা তখন মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আজ বিকেলেই পাথুরেঘাটায় হরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির গৃহাঙ্গনে এক নিষ্ঠুর বৃদ্ধা কি তাকে কটূক্তি করে হীন অপমান করেছিল এই কিছুক্ষণ আগে? না, বোধহয়! তাও ভুলে গিয়েছে সে। তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, মনের স্থিরতা ও বুদ্ধিদীপ্ত ঔজ্জ্বল্য আবার ফিরে এসেছে। তার সতেরো বছরের জীবনে আবার সব আনন্দ ও উদ্দীপনা স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। সে এতক্ষণে বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে আবার সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠল। হাসিমুখে বললে—ওঃ, বাইরে তো খুব বৃষ্টি হচ্ছে!

সত্য বললে—তুই এতক্ষণে বুঝলি সেটা? এত ভিজেও তোর খেয়াল হয় নি। একেই বলে পণ্ডিত!

তার কথার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠল। এমন কি মালতীও। এমন কি সে নিজেও।

সে অপ্রতিভ হয়ে বললে—না, না, আমি বলছিলাম, এখনও বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে।

তার উত্তরে হাসি বাড়ল বই কমল না। হাসি যেখানে অকারণ, হাসিই যেখানে মূল কথা, সেখানে অকারণ হাসি উঠতে বাধা কি?

সন্ধ্যা হাসিমুখে বললে—কি খাবি ভাই মনু বল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাসলে যেমন আয়নার ছবিটাও হাসে তেমনি সন্ধ্যার মুখের হাসির ছটা বাজল মন্মথর মুখে! সে পরিতৃপ্ত হাসি হেসে বললে—তুমি যা খাওয়াবে তাই খাব!

সন্ধ্যা বললে—ভেবেছিলাম জষ্ঠিমাস, গরমের দিন, তোকে খুব ভাল কুলপী বরফ, মালাই বরফ খাওয়াব।

সঙ্গে সঙ্গে সত্য চোখ বড় বড় করে বললে—ও বাবা, কুলপী মালাই! মা খেতে দেবে? বকবে না? বলবে না—কলেরার জার্ম আছে ওতে? সন্ধ্যা বললে—কাল যখন আমি দ্বিজু জেঠামশায়ের কাছে শুনলাম আজ মনু আসবে তখনই মাকে বলে রেখেছিলাম। মা ভালো জায়গায় বরাত দিয়ে রেখেছিল। ওই যে নরোত্তম

আসে না বরফ বিক্রি করতে, ওকেই বলে রাখা হয়েছিল। সে তো আর এলো না বৃষ্টির জন্যে ; তা অন্য ব্যবস্থা করে রেখেছি।

সত্য বললে—দিদির ওই এক কথা। খাওয়া আর খাওয়ানো ছাড়া অন্য কিছু জানে না।

সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা বললে—তোদের বুঝি খেতে ভালো লাগে না? আমি ব্যবস্থা করি আর খাও তোমরা, বেশী বেশী খাও।

এই মুহূর্তে মালতীর দিকে চোখ পড়তে বললে—অবিশ্যি মালু বেশী খেতে চায় না।

প্রত্যাঘাত করে সন্ধ্যা কথা শেষ করলে, বললে—আমি তোমাদের মতো কবিতা আর গান খেয়ে থাকতে পারি না!

তার কথায় হাসতে লাগল সবাই। সন্ধ্যা উঠে গেল এই অবসরে। বললে—তোর জন্যে খাবার যোগাড় করে রেখেছি ভাই। ওই আর যারা আছে তারা তোকে গান আর কবিতা খাওয়াক, আমি তোর জন্যে সবাই যা খায় সেই সাধারণ খাবার নিয়ে আসি।

এতক্ষণে সারা ঘরটার চেহারা নজরে পড়ল মন্মথর। জ্যোতিপ্রসাদবাবুর উপরের এই বসবার ঘরে এর আগে সে কখনও আসে নি। প্রথম নজরেই মনে হলো, ঘর-খানা কত বড়, ঘরের আসবাবপত্র কত দামী, আর ঘরের সজ্জা, তাও কত অভি-নব! মাধববাবুও ধনী লোক, তাঁর শোবার ঘরও সে দেখেছে। কলকাতার আর পাঁচটা ভালো বাড়ির মতো। তা সত্ত্বেও সেখানে আলো কম, জানলা ছোট, ঘরের ভিতর আসবাবপত্র দামী হলেও আসবাবে ঠাসাঠাসি। মাধববাবুর শোবার ঘরের কথা মনে পড়ল তার। শোবার ঘরের দেয়ালগুলো শুধুমাত্র সাদা চুনকাম করা, দেওয়ালে কালীঘাটের মা কালীর আর লক্ষ্মীর ছাপা ছবির পাশে টাঙানো আছে মহারানী ভিক্টোরিয়ার আর তাঁর স্বামীর ছবি। মাধববাবু রায়সাহেব হয়েছিলেন। তাঁর বাঁধানো সনদখানিও সেই সঙ্গে টাঙানো। ঘরের কোনো কিছুই বড়লোকের বাড়ির জিনিস বলে বিশেষভাবে চোখে লাগে নি। কেবল ঘরে একটা ক্লক ঘড়ি তার চোখে সুন্দর লেগেছিল, সেটায় পাখির ডাকে সময় সাড়া দেয়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তাদের বাড়ির সঙ্গে এই বাড়ির কোনো তুলনাই চলে না। তার সঙ্গে এর কোনো মিল কেন, কোনো গরমিল পর্যন্ত নেই। এ এক রকম, সে আর এক রকম। ঐশ্বর্যের কোনো চিহ্ন, কোনো স্পর্শগন্ধ সেখানে নেই। সতেরো বছর তার বয়স, কিন্তু এই সতেরো বছরের মধ্যে তারা যে দরিদ্র, তাদের কোনো ঐশ্বর্য নেই, এ কথাও তার কখনও মনে হয় নি। কলকাতায় পড়তে এসেও এখানকার

বড় বড় বাড়ি, এখানকার কত ঐশ্বর্য দেখে ফিরে গিয়েও সে কথা মনে হয় নি। গোবর দিয়ে নিকোনো উঠোনের এপাশে ওপাশে মাটির দাওয়া-উঁচু খড়ের ঘর, মাটির দেয়াল, মাটির মেঝে। সম্বলের মধ্যে কিছু কাঁসা-পেতলের বাসন আর খান দুয়েক আমকাঠের চৌকি আর কাঠের পিঁড়ি। কিন্তু সেই নিরাভরণ গৃহকেও কত পরিপূর্ণ, কত উজ্জ্বল মনে হয়েছে। মনে কখনও হয় নি, এটা হলে কি ওটা হলে ভালো হতো। সব সময় মনে হয়েছে আর কিছু লাগবে না। উঠোনের কোলে কোলে শাকের ক্ষেত, তার গায়ে গায়ে সন্ধ্যামণি, গাঁদা, নয়নতারা আর লঙ্কার গাছ। উঠোনে তারই পাশে কাঁসা-পেতলের এঁটো বাসনগুলো বিকেলের রোদের আলোয় সোনার সামগ্রীর মতো ঝকমক করত। সে ঐশ্বর্য, সে শোভা তার মন এখনও পরিপূর্ণ করে রেখেছে। আচ্ছা, জ্যোতিপ্রসাদবাবু কি মাধববাবুর থেকে ধনী লোক? বোধহয় নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ঘরখানা যেন ঐশ্বর্যে আর সৌন্দর্যে ঝলমল করছে বলে মনে হচ্ছে তার। ঘরের দেওয়ালগুলো নরম রঙে রাঙানো, তবে রঙ অনেকটা আকাশের রঙের মতো। মস্ত ঘরখানায় মাত্র খান-চারেক ছবি; এ দেওয়ালে দুখানা, ও দেওয়ালে দুখানা। এ ছবিগুলো কি সুন্দর। আর মাধববাবুর বাড়ির ছবির মতো ছাপা ছবি নয়। অন্যরকম। যেন কেউ এঁকে দিয়েছে, আঁকা ছবি। ছবির মানুষগুলোকে দেখে মনে হয় যেন তারা সব এদেশেরই মানুষ, তাদের সাজসজ্জা সবই এদেশের। কিন্তু সে তাদের কাউকে চিনতে পারছে না। মনে হচ্ছে এরা যেন কত দূর কত যুগের ওপার থেকে এই কালে এখানে এসে ছবির মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। কারা এরা কে জানে! চেনা চেনা অথচ সে কাউকে চিনতে পারছে না। তবু মন বার বার বলছে—কি সুন্দর, আহা কি সুন্দর! সাদা মার্বেলের মসৃণ মেঝের উপর ঘরের মাঝখানে গালিচা পাতা। তার উপর হার্মোনিয়াম, সেতার আর তবলা রয়েছে। গালিচার দু'দিকে একটু দূরে খাটের মতো পাতা, অথচ ঠিক যেন খাট নয়। খাট, কিন্তু উপরের ছত্রিগুলো নেই; তার মানে সেগুলো বসার জায়গা, শোবার নয়। খাটের কোলে কোলে শুধু তাকিয়া। সবটা সাদা ধবধব করছে। দেওয়ালের কোল ঘেঁষে ছোট ছোট চারটি সুন্দর চৌকি চার কোণে, রেশমের ছোট ছোট রঙিন আসন পাতা। ঘরের মাঝখানে পিছন দিকে বড় মার্বেলটপ টেবিল। তার উপরে কাজকরা চক-চকে ধাতুপাত্রে একরাশ বেলফুল রাখা। তারই গন্ধে ভরে আছে ঘরখানা। দুখানা খাটের পাশেও দু'দিকে দুখানা করে চারখানা টেবিল। এ ঘরেও তো কত জিনিস, তবু মনে হচ্ছে জিনিস এমন কিছু বেশী নেই, আর সব জিনিস যেন স্বস্থানেই আছে। টেবিলের ওপর একটি, ঘরের দু'দিকে আরও

ছুটি আলো। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, কত ঐশ্বর্য, কত সুন্দর!
সন্ধ্যা এসে ঢুকল, পিছনে ট্রেতে খাবার নিয়ে বেয়ারা। তারা সকলে বসে ছিল গালিচার উপরে। তাদের কোলে কোলে খাবার নামিয়ে দিলে সন্ধ্যা। সত্যকে খাবার দিতে দিতে বললে—খাও, গানের সঙ্গে মিশিয়ে খাও।
চিঁড়েভাজা, বাদামভাজা আর অমলেট সব ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে পরিবেশন করা হয়েছে। সব কিছুতেই নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে খাবারগুলিকে স্বাদুতর করা হয়েছে। খাবারের প্লেট নিজের কাছে টেনে নিতে নিতে মন্মথ বললে—এটা কি সন্ধ্যাদি?
সত্য হেসে উঠল। বললে—মরেছে, পণ্ডিত ডিমের অমলেট চিনতে পারছে না!
মন্মথও হাসল। সে সন্ধ্যার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আমি তো ডিম খাই না সন্ধ্যাদি।
সত্যর হাসি থমকে গেল। সবাই থমকে গেল। আবার সেই 'আমি খাই না'।
সন্ধ্যা অপ্রস্তুত হয়ে বললে—তা হলে কিছুই খাবি না? ডিমের ছোঁয়া তো!
অত্যন্ত সহজ হাসি হেসে মন্মথ বললে—না, আর সবই খাব, শুধু ওই কি বলছ অমলেট, ওইটা খাব না। এত সব ভালো খাবার কি না খেয়ে থাকতে পারি? আর ছোঁয়াছুঁয়ি আমি মানি না।
এক মুহূর্তে সব গুমোট কেটে গেল। উৎসব নেমে এলো।
সন্ধ্যা বললে—তোকে নতুন গান শোনাবার জন্যে সত্যর কি উৎসাহ, কি আগ্রহ! আজ সারাদিন তোকে গান শোনাবার আয়োজন করেছে। তা আমি ওকে বলেছিলাম—মনুর কি এসব গান ভালো লাগবে? তা জানিস, সত্য কি বললে? বললে তুই মনুকে ঠিক চিনিস না দিদি! আগে গান শোনা, তারপর দেখবি!
সত্য বললে—দিদি, তুই ভাই কম চালাক ন'স! আমাদের গান মনুর যেমনই লাগুক মনুকে ভালো বলতেই হবে। আমার কথাটা আগে থেকে ওকে বলে তুই পাকা কাজ করে রাখলি।
ওদিকে ওদের কাছ থেকে সরে গিয়ে মালতী জানলার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের ফুলের মালা-জড়ানো বেণীটা আলতোভাবে ধরে বাইরের ধারাবর্ষণের দিকে চেয়ে আছে। মন্মথ একবার তাকিয়ে দেখলে তাকে। মালতী গুনগুন করে অতি মৃদু সুরে একটি কি গাইছে যেন।
সত্য চেঁচিয়ে উঠল—হয়েছে। এই মলি, আয়, ওইটে দিয়েই আরম্ভ কর। আয় 'সখি, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায়' দিয়ে আসর আরম্ভ করি।
মালতী ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার গানের

গুঞ্জন বন্ধ হয়ে গেল। মুখে সেই অস্পষ্ট হাসি নিয়েই সে এসে ওদের পাশে বসল।

সত্য বললে—ধর, তা হলে ওই গানখানাই ধর। হার্মোনিয়াম নে।

মালতী কথাও বললে না, হার্মোনিয়ামের কাছে এগিয়েও গেল না। মুখে তার হাসিটি কিন্তু লেগেই রইল।

সন্ধ্যা একবার মালতীর মুখের দিকে একটু চেয়ে নিয়ে বললে—বুঝতে পারছিস না, ও গান ও গাইবে না!

সত্য বললে—তবে, কি গাইবি ধর!

মালতী কিছু বোধহয় বলতে যাচ্ছিল, তার আগে সন্ধ্যা বললে—জানিস সত্য আজ সন্ধ্যার আগে এরফানের বিবি এসেছিল মায়ের কাছে। খুব কাঁদছিল।

সত্য অত্যন্ত জিজ্ঞাসু হয়ে বললে—কেন রে? কাঁদছিল কেন?

মন্মথ জিজ্ঞাসা করলে—এরফান কে?

—আমাদের বাড়িতে সহিস ছিল। তারপর আমাদের বাড়ির কাজ ছেড়ে বাগবাজারের মিত্তিরবাবুদের বাড়ি সহিসের কাজ করছিল। এরফান ঘোড়া চিনত খুব ভালো। ক'দিন আগে মিত্তিরবাবুদের ল্যাণ্ডোগাড়ির জন্যে একটা নতুন ওয়েলার ঘোড়া ওই বাবুদের সঙ্গে গিয়ে পছন্দ করে কিনে এনেছিল। কিনে আনার পরদিনই ঘোড়াটাকে দলাইমলাই করবার সময় ঘোড়াটা পিছনের পা দিয়ে ওকে একটা চাট মেরেছিল। চাটটা লেগেছিল ওর চোখে আর কপালে। তাতেই অজ্ঞান হয়ে এরফান মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে মারা গিয়েছে। তা এরফানের বিবি ওর ছেলের হাত ধরে মিত্তিরবাবুদের কাছে গিয়েছিল সাহায্য চাইতে। তারা ওকে তাড়িয়ে দিয়ে বলেছে—ও ঘোড়াকে আমাদের বিক্রি করে দিতে হয়েছে। ওরই পছন্দর দোষে আমাদের বিক্রি করতে গিয়ে চারশো টাকা লোকসান হয়ে গিয়েছে। আর ও ইচ্ছে করেই বেশী কমিশন খেয়ে ওই বদ ঘোড়া আমাদের ঘাড়ে চাপিয়েছিল। আমরা তোমাকে আর কিছু দিতে পারব না, দোবও না।

তরুণ বয়স সকলের, জীবনের প্রারম্ভে আনন্দের ও আশার সিংহদ্বারে ওরা সবে পা দিয়েছে। জীবনের অতি প্রশস্ত ও বিচিত্র পুরীর অপর ও শেষ প্রান্তে নিষ্ক্রমণের যে দ্বার মৃত্যুর নামে চিহ্নিত তার সঙ্গে ওদের কোন্ সম্পর্ক? তার সন্ধানে বা বার্তায় ওদের কোন্ প্রয়োজন? তবু জীবনের প্রথম সিংহদ্বারে প্রবেশের মুহূর্তেই জীবনের নিষ্ক্রমণের শেষ দ্বারটির কল্পনা মানুষের মনে তার একটা অস্পষ্ট

আভাস আনে। ক্ষণেকের জন্য সেই দূরগত অচিন্ত্য সন্ধ্যায় ভয়াল রক্তমেঘের অস্পষ্ট ছায়া পড়ে প্রভাতের প্রসন্ন আলোর উপর। তার কথা মনে হলে মানুষ বিপুল উল্লাসের মধ্যেও একবার ক্ষণেক স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হয়। সেই স্তব্ধতা যেন প্রসারিত হলো এক মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তেই সত্য বললে—তারপর ?

সন্ধ্যা বললে—তারপর ওর কথা শুনে মা বাবাকে ডেকে আনলেন। সব শুনে বাবার মুখখানা জানিস, কেমন হয়ে গেল। কি এক রকম! মাও ভয় পেয়ে গেলেন। এরফানের স্ত্রী ওঁর মুখ দেখে বললে—বাবু, আপনি রাগ হবেন না। আমি চলে যাচ্ছি। তা বাবা শুধু বললেন—দাঁড়াও। দশটা টাকা এনে ওর হাতে দিলেন। দিতেই মেয়েটা আরও কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বললে—বাবু, আমি বাবুদের বলেছিলাম, একটা লোক আপনাদের নোকরি করত, সে এইভাবে মরে গেল, তাতে আপনাদের দুখ্ হয় না? তা আমাকে বাবু বললে—অত দামী ওয়েলার ঘোড়াটাই লোকসান করে দিতে হলো তাতেই দুখ্ করলাম না, আর একটা সহিস মলো, তার জন্যে দুখ্ করতে হবে! বাবা সব চুপ করে শুনে বললেন—কাল সকালে এস, এর ব্যবস্থা করব।

সংবাদ পরিবেশন শেষ করে সন্ধ্যা নিজের টীকা দিয়ে সংবাদটিকে সম্পূর্ণ করলে, বললে—মানুষ যে কেন এমন হয়!

সত্যকেও যেন এই মৃত্যু-সংবাদের তুহিনস্পর্শ ছোঁয়া দিয়ে গেল, সে দার্শনিকভাবে বললে—কোন্ মানুষের মৃত্যু কেমনভাবে হবে তা বোধহয় কেউ বলতে পারে না!

মালতী কোনো কথা বলে নি, সে চুপ করেই ছিল।

মন্মথ সত্যর কথার জের টেনে বললে—না, তা কেউই কখনও পারে না। রাজা দশরথের বাবা অজের স্ত্রী ইন্দুমতীর মৃত্যু কেমন করে হয়েছিল জানিস? রাজা অজ আর রানী ইন্দুমতী এক উদ্যান-বাটিকায় অবসর যাপন করছিলেন রাজ-কর্মের পর। ঠিক সেই সময় আকাশপথে দেবর্ষি নারদ যাচ্ছিলেন দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে মহাদেব মন্দিরে মহাদেবকে বীণা শুনিয়ে পূজা নিবেদন করতে। তাঁর বীণার গায়ে স্বর্গীয় পুষ্প নন্দনের পারিজাতের এক ছড়া মালা জড়ানো ছিল। তিনি যখন সেই উদ্যান-বাটিকার উপর দিয়ে যাচ্ছেন তখন সেই মালা তাঁর বীণা থেকে খসে পড়ল। খসে পড়ল হাস্যময়ী, লীলারতা ইন্দুমতীর গায়ে। কালিদাসের রঘুবংশে আছে—

অভিভূয় বিভূতিমার্তবীং
মধুগন্ধাতিশয়েন বীরুধাম্।

নৃপতেরমরস্রগাপ সা
দয়িতোরুস্তনকোটি-সুস্থিতিম্ ॥

শ্লোকটি আবৃত্তি করে সে বললে—অর্থাৎ কিনা সেই স্বর্গীয় কুসুম-মালিকার মকরন্দ ও সৌরভের প্রাচুর্যে উপবনস্থিত তরুলতাদের ঋতুকালজাত বিভবও অভিভূত হলো এবং সেই দিব্যমালা বায়ুভরে গিয়ে নরপতির প্রিয়তমা ইন্দুমতীর বুকে পতিত হয়ে নিবৃত্তিপ্রাপ্ত হলো।

মন্মথ সমস্ত শ্লোকটিরই আক্ষরিক অনুবাদ করে দিলে। কেবল 'বুকে' শব্দটি ব্যবহার করে 'বিশাল স্তনাগ্রভাগ' শব্দটিকে এড়িয়ে গেল।

মন্মথকে যেন ওই আবৃত্তির রস আচ্ছন্ন করেছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে পরের শ্লোকটিও আবৃত্তি করলে—

ক্ষণমাত্র-সখীং সুজাতয়োঃ
স্তনয়োস্তামবলোক্য বিহ্বলা।
নিমিমীল নরোত্তম-প্রিয়া
হৃতচন্দ্রা তমসেব কৌমুদী ॥

নরোত্তম-প্রিয়া ইন্দুমতী নিজের সুঠাম দেহের উপর পতিত সেই দিব্য-মালিকা দর্শন করেই নিমেষ-মধ্যে একেবারে অসাড় ও বিমূঢ় হয়ে হয়ে পড়লেন এবং শশাঙ্ক রাহুগ্রস্ত হলে চন্দ্রিকা যেমন কোথায় অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ ক্ষণমধ্যেই যেন কোথায় মিলিয়ে গেলেন, শুধু তাঁর গতপ্রাণ কলেবরমাত্র পড়ে রইল। এখানেও সে 'স্বকীয় সুন্দর স্তন' বাদ দিয়ে 'সুঠাম দেহ' বলে এড়িয়ে গেল।

শ্লোকদুটির আবৃত্তি ও তাদের অর্থ শুনে সত্য, মালতী, এমন কি সহজ সরল সন্ধ্যা পর্যন্ত মন্মথর মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে রইল। মালতীর মুখখানি বড উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, চোখদুটি চকচক করছে। মন্মথ যে কি করলে তাও ওরা যেন আভাসে বুঝতে পেরেছে। শ্লোকের আবৃত্তির মধ্যে একাধিকবার উচ্চারিত সেই বিশেষ শব্দটি অনুবাদের মধ্যে না পেয়ে। তাতে শ্লোকদুটির সৌন্দর্য আস্বাদ করতে বরং সুবিধাই হয়েছে ওদের। আর এই এড়িয়ে-যাওয়া অর্ধ-গোপনতায় শ্লোকদুটির সৌন্দর্য বাড়ল বই কমল না।

সত্য মুগ্ধভাবে বললে—কি সুন্দর!

মালতীর দিকে তাকিয়ে সে আবার বললে—সুন্দর নয় রে মলি?

মালতীর বড় বড় চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ঠোঁটের অস্পষ্ট হাসি সামান্য স্ফুট হলো। কিন্তু কোনো কথা সে বললে না।

জীবনের আনন্দ আবার রসের মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে ততক্ষণে। মৃত্যু-চিন্তার

হিম আভাস আনন্দরসের বসন্ত সমাগমে পরাভূত হয়ে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে।

মন্মথই বললে—কই, গান শোনাব বলছিলি, শোনাবি না ?

সত্য সোৎসাহে বললে—নিশ্চয়।

বলেই নিজেই হার্মোনিয়ামের সামনে বসে সুর তুললে।

সুরের সোনার পাতের কোলে কোলে কথার মণি-চুনী-পান্না বসতে লাগল—এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।

এক চরণ গেয়ে সে বললে—ধর দিদি, মলি ধর।

সতর্ক-বুদ্ধি, সরস-চিত্ত মেধাবী ছেলে মন্মথ, গানের প্রথম কলি শুনেই চমকে উঠল। এ কেমন কথা, কেমন সুর। কেমন তা সে ব্যাখ্যা করে বলতে পারে না, সে শক্তি ও শিক্ষা তার নেই। কিন্তু এ যে আলাদা জিনিস, সম্পূর্ণভাবে আলাদা তা সে বুঝতে পেরেছে। কি সোজা কথা, কেমন সুর! একান্ত অভিনব। সে স্তব্ধ ও একাগ্র হয়ে শুনতে লাগল।

ওরা তিনজনে একসঙ্গে গাইছে—

> এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম,
> প্রেম মেলে না।
> শুধু সুখ চলে যায়।
> এমনি মায়ার ছলনা।

কি আশ্চর্য কথা! কি সুন্দর সুর!

কথা আর সুরে মিলে যেন ঘরের মধ্যে আনন্দ ও সৌন্দর্যের একটি স্বর্গলোক রচনা করেছে। কথাগুলি খেদের, একান্ত দুঃখের ; কিন্তু মনের মধ্যে এমন আকুলতা কোনো খেদজনিত দুঃখের নয় ; আনন্দের, গভীর আনন্দের থেকে তার জন্ম।

মন্মথ নিবিষ্টচিত্তে গায়ক-গায়িকাদের মুখের দিকে তাকিয়ে গান শুনছে। ওদের মধ্যে মালতীই যেন অগ্রনায়িকা। সেই যেন এই সমবেত কণ্ঠের সংগীতে অধি-নায়িকার আসনে স্থিত। তারই গলা সবচেয়ে উপরে খেলা করছে। তার কোলে কোলে সত্যর ভারী গলা। তার পিছনে মৃদুস্বরে সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর।

মালতীকে দেখে তার আশ্চর্য লাগল। এ আর এক মালতী। একে তো সে কোনো দিন দেখে নি।

গাইতে গাইতে মালতী হঠাৎ সত্যর হাত থেকে নিঃশব্দে হার্মোনিয়ামটা নিজের কোলের কাছে টেনে নিলে। তার মুখ-চোখের চেহারা সম্পূর্ণ বদল হয়ে গিয়েছে। শুধু মুখ-চোখ কেন, পুরো-মানুষটাই একেবারে বদলে গিয়েছে যেন। মালতী

এমনিতে অত্যন্ত কম কথা বলে, অন্যের কথায় তার মনের প্রতিক্রিয়া তার বাক্যে কেন, তার মুখের চেহারাতেও তা বুঝা যায় না। সেই মালতীর বড় বড় চোখের শান্ত দৃষ্টি প্রদীপ্ত ও আনন্দোজ্জ্বল হয়ে দীপশিখার মতো জ্বলছে। মুখ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও প্রবলভাবে ভাবময় হয়ে উঠেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে মুখের চেহারা বদল হচ্ছে। অকারণ হাসিতে দুই ঠোঁট মধ্যে মধ্যে বিচিত্রভাবে বিস্ফারিত হচ্ছে। সে হাসির কোনো লৌকিক কারণ নেই। আবার সেই হাসি ক্ষণপরে মিলিয়ে গিয়ে যেন কত গভীর বেদনায় ও আক্ষেপে আকুঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে অতি চারু সৌন্দর্যে দুই টানা ভ্রূ চঞ্চল হতে হতে একান্ত ইঙ্গিতবহ হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে উড়ন্ত পাখির দুই পাখার মতো। দুই চোখের তারা চোখের বিস্তৃত, নীলাভ শ্বেতচ্ছদের উপর দুটো দ্রুত-সঞ্চরমাণ কালো ভ্রমরের মতো চলে বেড়াচ্ছে। গান যেন তার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক মূর্তি দিয়ে ভিন্নতর লোকে উত্তরিত করেছে। গান আর মালতী দুই যেন মেশামেশি হয়ে আর এক রকম হয়ে গিয়েছে। সীতা কি অগ্নিপরীক্ষার সময় হোমাগ্নির স্পর্শে এমনি মূর্তি ধারণ করেছিলেন ?

মন্মথ স্থাণু হয়ে গিয়েছে এই অভিনব অভিজ্ঞতার সামগ্রিক স্পর্শে। সে কিছু ভাবছে না, শুধু অনুভব করছে, আস্বাদ করছে। জীবনে গান শুনে যে এত আনন্দ পাওয়া যায় তা সে এই প্রথম উপলব্ধি করলে।

গান শেষ হলো। তার পরও সবাই চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। মন্মথ বেশ কিছুক্ষণ পর একটা আটকে রাখা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, নিজের গাল থেকে হাতটা সরিয়ে, নড়ে চড়ে বসল নিজের আবিষ্ট অবস্থা থেকে মুক্ত হতে।

সত্যই প্রথম কথা বললে। হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে—কিরে, কেমন লাগল ?

মন্মথ আবার একটি নিশ্বাস ফেলে অতি মৃদু স্বরে বললে—ভালো, খুব ভালো। আবার একটু চুপ করে থেকে বললে—এ গান কার তৈরি রে ?

সত্য হাসল। সগর্বে বললে—এ আবার কার তৈরি! এ আমাদের রবীন্দ্রবাবুর রচনা করা গান। রবীন্দ্রবাবু মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই তো কয়েকদিন পরেই আমরা এই গানের পালায় নামব।

মন্মথ আশ্চর্য হয়ে গেল! গানের পালা। সে কবির পালায় গানের কথা, রামায়ণ গানের কথা জানে, কিন্তু এ তো আলাদা ব্যাপার। এ কি রকম ভাবে হবে, কি হবে ? সে বললে—গানের পালা ? সে কি রকম ?

সত্য সগর্বে বলল—এ গানের পালা রবীন্দ্রবাবু এই কিছুদিন হলো তৈরি করেছেন। এইবার এর অভিনয় হবে। নাম 'মায়ার খেলা'। আমরাও নামব ওতে।

মলি, আমি দিদিও নামবে।

মন্মথর মুখে এক আশ্চর্যতর বিস্ময় ফুটে উঠল—তোরাও নামবি?

সত্য বললে—হ্যাঁ। জোড়াসাঁকোতে হবে, তুই যাবি দেখতে? তাহলে তোকেও নেমন্তন্ন করার ব্যবস্থা করব।

—দেখতে পেলে যাব না? নিশ্চয় যাব।

সত্য আরও কি বলত কে জানে, এই সময় সন্ধ্যা বললে—মলি, ভাই, এইবার তুই 'সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে'-খানা ধর না!

মালতীর আবার সেই আগের শান্ত গম্ভীর মূর্তি, বড় বড় শান্ত চোখ মেলে সে চেয়েই রইল, সন্ধ্যার কথার জবাব দিলে না।

সন্ধ্যা মুখ ভারী করে বললে—তোর সব ভালো, কিন্তু ওই এক দোষ! নিজের ইচ্ছে হলে গাইবি, কিন্তু অন্য লোক মাথা কুটে হাজারবার বললেও গাইবি না।

মালতী একটু সলজ্জ হাসি হেসে হার্মোনিয়ামটা টেনে নিল। তার বসার সে কি সলজ্জ, সুকুমার, সুললিত ভঙ্গি। তার মাথাটি কেমন যেন এক লজ্জায় নুইয়ে পড়ল। প্রথমে হার্মোনিয়ামে সুর উঠল, তারপর গান। সে গাইতে লাগল:

> সখী, প্রতিদিন হয়ে এসে ফিরে যায় কে।
> তা'রে আমার মাথার একটি কুসুম দে॥
> যদি সুধায় কে দিল, কোন্ ফুল-কাননে,
> তোর শপথ; আমার নামটি বলিস নে॥
> সখী, সে আসি ধূলায় বসে যে-তরুর তলে
> সেথা আনন বিছায়ে রাখিস বকুল-দলে।
> সে-যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে,
> যেন কী বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে॥

এ কি গান। এ কি সুর। এ কার গোপন হৃদয়ের অতি সংগোপন কথা। এ কি, এ যে তারই কথা! যে কথা কোনো দিন সে ভাবে নি, অথচ যে কথা তারই মনের মধ্যে তার অজানা হয়ে লুকিয়ে ছিল তার খবর যে রচনা করেছে সে কথা সে কেমন করে জানল? তার নিজেরই কাছে নিজেরই এই অজানা কথা কি মালতীও তার কথা বলে বুঝতে পেরেছে? তাই কিছুক্ষণ আগে এই গানখানা গুনগুন করছিল? এ কি মালতীরও নিজের মনের কথা? না, এ শুধু গান, কথার পর শুধু কথা দিয়েই সাজানো, সুরের সুতোর গাঁথা? কেউ কবে কারও জন্য এমনি অনুভব করেছিল তারই বেদনা হয়তো এতে ধরা আছে? এ তাদের কিছু নয়? কে জানে!

সে ভাবছে আর গালের উপর নিজের একখানি হাত রেখে গান শুনছে। এক-দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মালতীর দিকে। এ যেন আর এক মালতী। আগের গান-খানা গাইবার সময় এক আশ্চর্য স্ফূর্তিতে তার মুখ প্রদীপ্ত, চোখের দুই তারা চঞ্চল, দুই ভ্রূ উড়ে-যাওয়া পাখির ডানার মতো চঞ্চল হয়ে তার প্রাণের এক আশ্চর্য, অকুণ্ঠ মূর্তি প্রকাশিত হয়েছিল, এ তো সে মালতী নয়। এ যেন কত লজ্জায় কুণ্ঠিত। মাথাটি নুইয়ে পড়েছে, চোখের লজ্জিত দৃষ্টি হার্মোনিয়ামের রীডের উপর স্থির-নিবদ্ধ, মুখে যেন ক্ষণে ক্ষণে লজ্জার আরক্ত আভা তার মর্মর-শুভ্র সাদা রঙের উপর ছায়া ফেলে যাচ্ছে। আবার গান আর মালতী যেন এক হয়ে গিয়েছে।

মন্মথ অনুভব করতে লাগল তার বুকের ভিতর দিয়ে একটা কি যেন ঠেলে উঠে গলায় এসে আটকে আছে। সেটা যে কি তা বুঝতে পারছে মন্মথ। কান্না! এই আশ্চর্য কান্নার সঙ্গে তার সদ্য পরিচয় হয়েছে। কলকাতায় এসে এই সামান্য ক'দিনের মধ্যে সে তো বেশ কয়েকবার বিভিন্ন কারণে একে আস্বাদ করেছে। এ যেন ঠিক সত্যর চেয়েও অন্তরঙ্গ, যার সান্নিধ্য সত্যর সঙ্গের চেয়েও স্বাদু। এই নতুন সুহৃৎ তার একান্ত বাঞ্ছিত। কিন্তু সব সময়ে, সকলের সামনে তার সঙ্গ-লাভ অসম্ভব। যখন কেউ কাছে থাকে না, যখন সে একলা থাকে, তখন কোনো কোনো সময় সে অতর্কিতে এসে যেন তার দু হাত দিয়ে একান্ত প্রসন্ন বন্ধুর মতো তার গলা জড়িয়ে ধরে। এখন আবার মনে হচ্ছে সে তেমনি অতর্কিতে যেন একমুখ হাসি নিয়ে তার পিছন থেকে নিজের দুখানি হাত দিয়ে আবার তার গলা জড়িয়ে ধরতে চাচ্ছে। কান্না আসছে তার।

কিন্তু ছি ছি! এখন এখানে কি সে কাঁদতে পারে? ছি, ছি, সে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। শুধু লজ্জার নয়, ভয়ের ব্যাপার। কে কি ভাববে। না, না, সে হয় না। সে বেশ কষ্ট করে গলায় আটকানো আবেগের পিণ্ডটা নিজের বুকের ভয় আর লজ্জা দিয়ে আটকে রেখে দিলে। যেমন বসে গান শুনছিল তেমনিভাবেই শুনতে লাগল।

বাকী দুজন শ্রোতা সন্ধ্যা আর সত্যর দিকে সে একবার তাকাল। ওরাও নিস্তব্ধ হয়ে একমনে শুনছে। সত্যর মুখে একটি বিমুগ্ধ হাসি। মন্মথর বুকটা একেবারে নিমেষে চমকে উঠল। সত্য কি মালতীর কুণ্ঠা ও লজ্জাকে তার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে একটা অর্থ করে অমনি হাসি হাসছে? যে ভয় দিয়ে কান্নার আবেগটাকে সে রোধ করেছিল সেই ভয়ের পরিমাণ যেন দ্বিগুণিত হয়ে গেল তার মনের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে কান্নার আবেগটা মনের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল আবার।

তার দলে কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব মনের মধ্যে রয়েই গেল। গানের শেষ দিকটা আর সে ভালো করে আস্বাদ করতে পারলে না।

গান শেষ হলো। গান শেষ হতেই মালতী হার্মোনিয়াম ছেড়ে উঠে পড়ল এক মুহূর্তে।

সন্ধ্যা হাসিমুখে বললে—সুন্দর, খুব সুন্দর। মলি এ গানটা তোর মুখে আগেও শুনেছি, কিন্তু এমনটি কোনো দিন শুনি নি।

সত্য সোৎসাহে বললে—মলি আমাদের সত্যিকারের আর্টিস্ট। একেবারে ফার্স্ট ক্লাস আর্টিস্ট।

হঠাৎ তার দিকে ফিরে সত্য বললে—তোর কেমন লাগল রে মনু ?

এতক্ষণে নিজের আড়ষ্ট অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে গলা ঝেড়ে নিয়ে সে বললে—ভালো !

সত্য তার পিঠে ছোট্ট চাপড় মেরে বললে—বলিস কি, শুধু ভালো ? তোকে বলতে পারি, কলকাতা শহরে রবীন্দ্রবাবুর এই গান ওর চেয়ে কেউ ভালো করে গাইতে পারবে না !

মন্মথ কি জবাব দেবে, সে শুধু একটু হাসল।

এই সময়ে জ্যোতিপ্রসাদবাবু আর সত্যর মা তিন বছরের মেয়ে উষার হাত ধরে ঘরে এসে ঢুকলেন। যতক্ষণ ছেলেমেয়েরা লঘুভাবের গান গাইছিল ততক্ষণ ওঁরা ইচ্ছা করেই এখানে আসেন নি।

মালতী তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে জ্যোতিপ্রসাদবাবু সস্নেহে বললেন—আমাকে একটা গান শোনাবি না মলি ?

সত্য ও সন্ধ্যা মালতীর মুখের দিকে চেয়ে একটু শব্দ করেই হেসে উঠল। ওরা কেন হাসল মন্মথ বুঝতে পারলে না। ওদের মুখের দিক থেকে সত্যর বাবা ও মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েও দেখলে তাঁদের মুখেও অস্পষ্ট হাসির আভাস।

সত্যর মা সস্নেহ মৃদুতার সঙ্গে বললেন—সত্যকে গাইতে দে। তুই সঙ্গে ধর।

এবার ব্যাপারটা একটু আভাসে বুঝতে পারলে মন্মথ। বুঝল যে মালতীর যখন গাইতে ইচ্ছা থাকে না তখন তাকে গাওয়ানো খুব কঠিন। আর গান গাওয়া সম্পর্কে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সকলেই সম্মান করে চলেন।

সত্যর অমিত উৎসাহ। সে সঙ্গে সঙ্গে মালতীর পাশে বসে পড়ল। মালতীকে বললে—ধর মলি !

—কি গাইবি ? মালতীর মৃদু প্রশ্ন।

সত্য কপট ক্রোধে ভ্রূ কুঁচকে বললে—সে তো তুমি বলবে। আমার নিজের

পছন্দে গাইলে তা কি তোমার পছন্দ হবে। অতএব তুমিই ধর।

ততক্ষণে মালতীর পরিপুষ্ট প্রস্ফুট রজনীগন্ধার মতো আঙুলগুলি দ্রুত সঞ্চারে হার্মোনিয়ামের রীডের উপর চলাফেরা করে নূতন সুর সৃষ্টি করেছে। মন্মথ অনুভব করলে এ সুর আর এক রকম।

সত্য ধরলে :

যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে,
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ॥

এবার গানের ধরন যে অন্যরকম তা বেশ বুঝতে পারলে মন্মথ। গাওয়ার ধরনের রকমও আলাদা। আসলে গাইছে সত্য, তার সঙ্গে গাইছে মালতী। মন্মথর মনে হলো একটা পুরু, ভারী রুপোর পাতের গায়ে কে যেন একটি সরু সোনার তার বসিয়ে চলেছে। গানের প্রথম দু কলি একাধিক বার গাইলে দুজনে। মন্মথর মনে হলো এ এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার। সে নিজেদের প্রচলিত পূজা-পদ্ধতি ও সংস্কৃত মন্ত্র মোটামুটি করেই জানে এবং তার অনেকটাই বুঝতে পারে। সমস্ত পূজা, প্রার্থনা ও মন্ত্রের অন্তরালে যে বক্তব্য, যে ভাষা তার প্রতিদিনের ভাষা নয় সেই সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত ও নিবেদিত হয়, সেই বক্তব্য তার প্রতিদিনের নিজের ভাষায় উচ্চারিত হচ্ছে। অথচ তার গাম্ভীর্য ও আন্তরিকতা এক বিন্দু কম নয়। তা যে নয় তা তো সে আশেপাশের শ্রোতাদের দেখেই বুঝতে পারছে। সত্যর বাবা, মা, এমন কি তিন বছরের মেয়ে ঊষা পর্যন্ত হাত জোড় করে চৌকির উপর বসে গান শুনছেন। ওদিকে সত্যও বসেছে আসনপিঁড়ি হয়ে, সন্ধ্যাও তাই। সত্য মুখে গান গাইছে, কিন্তু হাত তার বদ্ধাঞ্জলি। কেবল মন্মথই হাত বদ্ধাঞ্জলি করে বসতে পারলে না। ইচ্ছা সত্ত্বেও কে জানে কেন, সে হাত বদ্ধাঞ্জলি করতে পারলে না। তার মনে হলো, এ প্রার্থনায় এক সে ছাড়া সবাই যেন অংশগ্রহণ করেছে।

পরের চরণ উচ্চারিত হলো এবার—যদি কোনো দিন এ বীণার তারে—

কিন্তু সেইখানেই গানের মধ্যে মগ্ন পরিবেশটির মগ্নতায় মৃদু আঘাত লাগল। এক মালতী ছাড়া সকলের দৃষ্টি সিঁড়ির মুখের দরজার উপর গিয়ে পড়েছে। জ্যোতিপ্রসাদবাবু চোখ তুলে তাকিয়ে মৃদুস্বরে ডাকলেন—কি বলছেন সরকার মশাই ?

নিত্যানন্দ সরকার অ্যাডভোকেট সায়েব জ্যোতিপ্রসাদবাবুর ফার্স্ট ক্লার্ক। জ্যোতিপ্রসাদ তাঁকে সরকার মশাই বলেই ডাকেন।

তিনি দরজার কাছ থেকে বললেন—একটু কথা ছিল। ভেতরে যাব ?

সমাদরের সঙ্গেই তাঁকে ডাকলেন জ্যোতিপ্রসাদ—আসুন, আসুন। এ কি বলতে হয়? আসুন।
তিনি বুঝেছেন নিশ্চয় কোনো খুব জরুরী কথা আছে, তা না হলে সরকার মশায়ের মতো অমন বিবেচক মানুষ তাঁর গান শোনায় বাধা দিতেন না। সরকার মশাই এই পরিবারের সংগীতপ্রীতি পুরোপুরি জানেন ও চেনেন। কত সময় কত বড় বড় মক্কেলকে 'সায়েব এখন গান শুনছেন' বলে বসিয়ে রেখেছেন।
সরকার মশাই ঘরের ভিতর এসে তাঁকে আস্তে আস্তে কি বললেন। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে, প্রায় লাফিয়ে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললেন—কই, কোথায়?
—নিচের বসার ঘরে বসিয়েছি।
—কিন্তু কখন এসেছেন বুঝতে পারলাম না তো!
—ঘরের গানের শব্দে বোধহয় ঘোড়ার গাড়ির শব্দ ঘরে আসে নি।
জ্যোতিপ্রসাদ ততক্ষণে সরকার মশাইকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নামতে আরম্ভ করেছেন।
ঘরের সকলেই বিস্মিত, মন্মথর বিস্ময়ের পরিমাণ আরও বেশী। জ্যোতিপ্রসাদ-বাবুর মতো মানুষ যে কারণে এইভাবে ব্যস্তসমস্ত হয়ে নেমে যান সে তো বড় সহজ ও সাধারণ ব্যাপার নয়।
গান তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সত্য জিজ্ঞাসা করলে—কি হলো মা? এখন কে এসেছেন?
সত্যর মাও স্বামীর সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি একটু হেসে বললেন—কে এসেছেন এখুনি দেখতে পাবে!
সত্য ও সন্ধ্যা একান্ত আগ্রহে আবার প্রশ্ন করলে—বল না মা!
সত্যর মা হাসিমুখে বললেন—আনন্দমোহনবাবু আর শাস্ত্রী মশাই।
সত্যর চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। সে বললে—আনন্দমোহন বসু আর শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই? আরে বাবা!
মন্মথ কলকাতায় লেখাপড়া শিখে বড় হচ্ছে, সে জানে এঁদের নাম, এরা মস্ত লোক বড় মানুষ তাও জানে। কিন্তু কেন বড়, কতখানি বড় তা খুব একটা জানে না। জানার কৌতূহলও প্রবল নয়। জানার মধ্যে এইটুকু জানে যে এঁরা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মাথার মানুষ। কিন্তু ততক্ষণে এই একান্ত পরিশীলিত, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর পরিবারটির আগ্রহ ও শ্রদ্ধা তার মধ্যে অনিবার্যভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। সেও ঘরের অন্য সকলের দৃষ্টিকে অনুসরণ না করে তাকিয়ে আছে সিঁড়ির মুখের দরজার দিকে।

সিঁড়িতে তখন পায়ের শব্দ উঠছে। অনেকগুলি পায়ের শব্দ দরজার মুখে শোনা যেতেই ঘরের সবাই, সেই সঙ্গে সেও উঠে দাঁড়াল উন্মুখ হয়ে। জ্যোতিপ্রসাদবাবু আগে আগে, তাঁর পিছনে ওঁরা দুজন দরজার মুখে পায়ের জুতো চটি খুলে ঘরে ঢুকলেন। মন্মথ একান্ত আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগল। ওই শ্যামবর্ণ, শীর্ণ, মাথায় সাধারণ আকারের মানুষটি, উনিই তো শিবনাথ শাস্ত্রী, যাঁর উপদেশের কথা এই কিছুক্ষণ আগেও সত্য একবার রহস্য করে উচ্চারণ করেছে। এর আগেও ওঁকে দেখেছে সে। সেই আগের মতোই গায়ে একটি কোট, তার উপর উড়ুনি। অতি সাধারণ বেশবাস। মুখে দাড়ি-গোঁফ। কিন্তু অপর জন বড় সুন্দর দেখতে। ফরসা রঙ, খুব বড় না হলেও, বড় বড় টানা চোখ, চমৎকার নাকটি, ভরাট মুখ, মুখে অবশ্য দাড়ি-গোঁফ রয়েছে শাস্ত্রী মশাইয়ের মতোই। উনি সুন্দর, কিন্তু ঠিক একমাত্র সেই কারণেই ওঁকে সুন্দর মনে হচ্ছে না। ওঁর সমস্ত চালচলনের মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে ওঁকে বড় ধীর, বড় শান্ত মনে হচ্ছে। সৌম্য বললেই ঠিক যেন মানায় ওঁকে।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু ততক্ষণে ওঁদের দুজনকে সসম্ভ্রমে ও পরম সমাদরে গদি-পাতা চৌকির উপর বসিয়েছেন। সত্যর মা সসম্ভ্রমে নমস্কার করলেন; সত্য, সন্ধ্যা, মালতী, এমন কি তিন বছরের উষা পর্যন্ত ওঁদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম সেরেছে। মন্মথ একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল। তার ঠিক প্রণাম করতে ইচ্ছা করছিল কিনা সে ঠিক জানে না, তবে তার সংস্কারে বাধছিল। শাস্ত্রী মশাই, সে শুনেছে সত্যর কাছে, ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। তাঁকে প্রণাম সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই। কিন্তু আনন্দমোহন বসু? বসু মানে কায়স্থ। ব্রাহ্মণসন্তান সে, তার কি কায়স্থকে প্রণাম করা উচিত হবে? তবু প্রণাম না করে চুপ করে একপাশে সরে বসে থাকতেও তার কেমন অস্বস্তি লাগছিল। সে ওদের প্রণাম শেষ হবার পর ওঁদের কাছে গিয়ে দুজনকেই পায়ে হাত না দিয়ে, শুধু মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। ওরা দুজনে যেমন অন্য সকলের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন তাকেও সেইভাবে আশীর্বাদ করলেন। মন্মথ সে কালের প্রথানুযায়ী সত্যর বাবা ও মাকে ওই সঙ্গে প্রণাম করতে ভুল করলে না।

মন্মথ লক্ষ্য করলে আনন্দমোহন বারকয়েক আশীর্বাদ করবার জন্য হাত উঠানো ছাড়া আর নড়েন নি। ধীর, শান্ত হয়ে স্থিরভাবে বসে আছেন। কোনো কিছুই যেন ভালো করে দেখছেন না। চোখের স্থির দৃষ্টি কেমন স্বপ্নালু, দুই চোখের উপরের অংশ যেন মুদ্রিত হয়ে আসতে চাইছে মাঝে মাঝে। কেমন এক আবিষ্টতায় যেন তিনি খানিকটা আচ্ছন্ন। অথচ শাস্ত্রী মশাই তাঁর থেকে ভিন্ন প্রকৃতির,

এদিক দিয়ে তিনি যেন অপরজন থেকে অন্য প্রান্তে। অত্যন্ত সতর্ক, তীক্ষ্ণ সহাস্য দৃষ্টিতে সব দেখছেন। সে দূর থেকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করতেই আশীর্বাদ করে প্রশ্ন করলেন—এটি কে বাঁড়ুজ্জে মশাই? একটু ক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন—তোমাকে আমি আগে দেখি নি?

জ্যোতিপ্রসাদ তার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—হ্যাঁ, আগে দেখেছেন। এটি আমাদের সত্যর বন্ধু, সতীর্থ। নাম মন্মথনাথ ভট্‌চাজ। এবার এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে।

শাস্ত্রী মশাইয়ের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি উজ্জ্বলতর হলো, দাড়ির মধ্য দিয়ে একটু হেসে, দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন অকপট আনন্দে—এইবার মনে পড়ছে। বাঃ, বাঃ। খুব ভালো।

তারপর ডান হাতখানি বরাভয়ের মতো একটু তুলে একান্ত প্রসন্নতার সঙ্গে বললেন—কল্যাণ হোক। তোমাকে দিয়ে পরমেশ্বর মানুষের অশেষ কল্যাণ করুন।

মন্মথর ভারী ভালো লাগল। একান্ত অপরিচিত হয়েও তার কৃতিত্বে তাঁর এই অকপট ও অকৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ তার মনকে যেন অভিভূত করলে।

আনন্দমোহনের আবিষ্টতা কেটে গিয়ে তিনি একবার স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। তাঁর মুখ থেকে প্রশংসাসূচক একটি কথা শুধু বেরিয়ে এলো—বাঃ। খুব ভালো।

মন্মথ লক্ষ্য করলে সেই একটি কথা বলতে গিয়ে তাঁর মুখখানি যেন কেমন সকরুণ ও নম্র হয়ে এলো। তারপর অতি মৃদু স্বরে বললেন—ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন।...এই সামান্য কথা কটি বলতে গিয়ে তাঁর চোখ যেন সজল হয়ে এলো। পরক্ষণেই তিনি নিজের হাত দুটি আলতোভাবে জোড় করে আবার নিজের মধ্যে যেন মগ্ন হয়ে গেলেন।

শাস্ত্রী মশাই সত্য, সন্ধ্যা ও মালতীর দিকে তাকিয়ে সস্নেহ কৌতুকের সুরে বললেন—আমাদের কি কোনো অপরাধ হয়েছে তোমাদের এখানে এসে?

ওরা সবাই, এমন কি জ্যোতিপ্রসাদ ও সত্যর মা পর্যন্ত একটু আশ্চর্য ও বিব্রত হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। তাঁদের অবস্থা দেখে, তা বেশ উপভোগ করেই, দাড়িতে বারকয়েক হাত বুলিয়ে তিনি বললেন—তা না হলে আমরা আসতে না আসতেই তোমরা গান বন্ধ করে দিলে কেন? তোমাদের কি ধারণা, আমরা গান ভালবাসি না, আমরা অসুর?

জ্যোতিপ্রসাদবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে হেসে বললেন—মলি মা, ধর তাহলে। শাস্ত্রী

মশাইকে শুনিয়ে দাও।

আনন্দমোহন তেমনি চুপ করে বসে আছেন।

সত্য গিয়ে হার্মোনিয়ামে বসল মালতীকে পাশে নিয়ে। গান আরম্ভ হলো। সেই আগের গানখানিই।

যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে,
ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু॥
যদি কোনো দিন এ বীণার তারে
তব প্রিয় নাম নাহি ঝংকারে
দয়া করে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে,
ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু॥
যদি কোনো দিন তোমার আহ্বানে
সুপ্তি আমার চেতনা না মানে,
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে,
ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু॥
যদি কোনো দিন তোমার আসনে
আর কাহারেও বসাই যতনে,
চিরদিবসের হে রাজা আমার,
ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু॥

এবার প্রথম থেকেই গানটি অন্য চেহারা নিলে। এবার প্রথম থেকেই সত্যর মোটা, ভারী গলাকে পিছনে রেখে মালতীর সুমিষ্ট, সুতীক্ষ্ণ স্বর তার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য ও শক্তি নিয়ে যেন জাগ্রত হয়ে উঠল। গাইতে গাইতে একসময় নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে হার্মোনিয়ামের উপর থেকে সত্যর হাত দুখানি সরিয়ে দিতেই সত্য সরে গিয়ে তার বসার জায়গা করে দিলে।

কি আশ্চর্য গান। কি আশ্চর্য পরিবেশ।

ভারী গলার কোলে কোলে কোমল সুতীক্ষ্ণ সুরটি, ফোয়ারার সুতীব্র ধারা যেমন ঊর্ধ্বমুখে উৎসারিত হয়ে উঠে, আর উঠতে না পেরে, আবার নিম্নাভিমুখী হয়ে মাটিতেই ছড়িয়ে পড়ে, তেমনিভাবেই একটি অকপট অশ্রুরোদন প্রার্থনার মতো আর্তস্বরে ঊর্ধ্বলোকে উঠে আবার মাটিতেই আছাড় খেয়ে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। যেন মাটির বুকে ধুলোয় মাখামাখি হয়ে ধূলিধূসরিত হওয়াতেই তার চরম সার্থকতা। গানের প্রতিটি স্তবকের শেষে 'ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু' অংশটি বার বার

ফিরে ফিরে এসে, অন্তরের নিরন্তর প্রার্থনাটি যেন আশ্চর্যভাবে প্রস্ফুট করে তুলেছে।

ঘরখানি আশ্চর্য রকম নিস্তব্ধ। বয়স্ক সকলেরই চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মন্মথ বিস্মিত হয়ে দেখলে ঘরের মধ্যে বয়স্করা কেমন যেন নিজের অজ্ঞাতে করজোড়ে মুদিত চোখে নীরব ও স্থির। সন্ধ্যা এবং সত্যও হাত জোড় করে রয়েছে। এমন কি উষা পর্যন্ত! সেও কখন নিজের অজান্তে হাত জোড় করে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে সে জানে না। সব চেয়ে আশ্চর্য লাগছে তার আনন্দমোহনবাবুকে। তিনি এমনই স্থির হয়ে আত্মগতের মতো বসেছিলেন প্রথম থেকেই। তিনি এমন যেন নিস্পন্দ, ধ্যানস্থ হয়ে গিয়েছেন। তাঁর মুদিত চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে এসে, শিবের জটায় হারিয়ে যাওয়া গঙ্গাধারার মতো, তাঁর দাড়ির অরণ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। শাস্ত্রী মশাইয়ের মুখখানি উপর দিকে উঠে গিয়েছে। সকালের আলোর স্পর্শে ফুল যেমন করে আকাশের দিকে মুখ তুলে ফুটে ওঠে তেমনি চেহারা হয়েছে তাঁর শ্যাম শীর্ণ মুখখানির। একটি অতি অস্ফুট হাসি যেন তাঁর মুখে স্থির বিদ্যুতের মতো খেলা করছে বলে তার মনে হলো। মন্মথর মনে হলো যেন মূর্তিমতী প্রার্থনা এই ঘরখানিতে নম্র ও নত হয়ে এখানকার ভূমি স্পর্শ করে রয়েছে।

গান শেষ হলো একসময়। তার পরও কিছুক্ষণ ঘরখানির মধ্যে অখণ্ড নীরবতা। প্রথমেই জ্যোতিপ্রসাদবাবু চোখ খুললেন, তারপর তাঁর স্ত্রী। তারপর শাস্ত্রী মশাই। চোখ খুলে তিনি দুই চোখের কোল ও গাল মুছে ফেললেন গায়ের উড়ুনির প্রান্ত দিয়ে। মন্মথ আশ্চর্য হলো। উঁনিও কাঁদছিলেন তাহলে? অথচ মুখখানি দেখে মনে হচ্ছিল যেন উনি কেমন একরকমভাবে হাসছিলেন। শাস্ত্রী মশাই এইবার তাকালেন ঘরের চারিদিকে, তাকালেন আনন্দমোহনের দিকে। আনন্দমোহন তখনও মুদিতচোখে প্রায় নিস্পন্দ। শাস্ত্রী মশাই ধীরে ধীরে তাঁর পিঠে নিজের একখানি হাত রাখলেন। তার ফলে কিছুক্ষণ পর একটি শিহরিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ মেললেন আনন্দমোহন। একবার বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সমস্ত ঘরখানির দিকে তাকিয়ে আবার সমস্ত পরিবেশ সম্পর্কে যেন সচেতন হয়ে চোখের গালের জল মুছে ফেললেন জামার পকেট থেকে রুমাল বের করে। মন্মথ দেখলে তখনও কিন্তু ওঁর বড় বড় চোখের পাতায় জল লেগে রয়েছে।

সত্যর মা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি প্রায় যেন হাত জোড় করেই বললেন —কিছু খান! কি খাবেন?

অমন মানুষটি যেন এক মুহূর্তে স্ত্রীলোকের মতো লজ্জিত হয়ে উঠলেন। তিনি শশব্যস্ত হয়ে বললেন—কি খাব? না, না, কিছু লাগবে না! কিছু লাগবে না।

মৃদু স্বরে একান্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে জ্যোতিপ্রসাদ বললেন—তা কি হয়? দয়া করে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, কিছু না খেলে আমাদের সকলের মনে বড় দুঃখ হবে।

তাতে যেন আনন্দমোহন আরও বিব্রত হয়ে পড়লেন। কোনো কথা বলতে না পেরে তিনি যেন একটু অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর অস্থিরতা এক মুহূর্তে দূর করে দিলেন শাস্ত্রী মশাই। হাসিমুখে সত্যর মায়ের দিকে চেয়ে বললেন—তোমার যা খুশি খেতে দাও মা, আমরা খাব। খুব খুশী হয়ে খাব।

জ্যোতিপ্রসাদ, আনন্দমোহন, শিবনাথ শাস্ত্রী সকলেই প্রায় একবয়সী, সকলেই বোধহয় সদ্য চল্লিশ পার হয়েছেন; সকলেরই বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শাস্ত্রীমশাই জ্যোতিপ্রসাদের স্ত্রী, সত্যর মাকে 'মা' বলে এমন সহজ ও সুন্দরভাবে সম্বোধন করলেন যে তা মোটেই অশোভন মনে হলো না। এমন কি মন্মথ তাঁদের সমাজের লোক না হওয়া সত্ত্বেও, তারও মনে হলো না। সত্যর মা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন।

শাস্ত্রী মশাই সত্যর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—এ গান তুমি শিখলে কোথায়?

সত্য ও মালতী দুজনেই শাস্ত্রী মশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে রইল। শাস্ত্রী মশাই জানেন না! উনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এত ভক্তি করেন, তাঁর নাম করতে হলে সর্বদা 'ভক্তিভাজন' বলে উল্লেখ করেন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর এত পরিচয় সত্ত্বেও তিনি জানেন না। আর না জানলেই বা কি, এই গানকে চিনতে কার অসুবিধা। এ আর কে তৈরি করতে পারে একজন ছাড়া!

সত্য বললে—এ রবিবাবুর গান। আমরা তো ওখানে যাই, শিখেছি ওখানেই।

শাস্ত্রী মশাই হেসে ঘাড় নেড়ে জানালেন তিনি বুঝেছেন।

আনন্দমোহন এবার নিজে থেকে কথা বললেন—রবীন্দ্রবাবুর ভিতরে মহাকবি এবং মহাভক্তের বীজ আছে, সে ভবিষ্যতে পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হবে। আশ্চর্য শক্তি। উনি প্রতিভাধরের চেয়ে বেশী, ঈশ্বরের করুণাপ্রাপ্ত পুরুষ।

শাস্ত্রী মশাই বললেন—আনন্দমোহনবাবু, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, প্রয়োজনের কথাটা আলোচনা করে নিন।

তারপর জ্যোতিপ্রসাদের দিকে চেয়ে বললেন—আপনার কাছে একটু প্রয়োজনে এসেছিলাম বাঁড়ুজ্জ্যে মশাই।

জ্যোতিপ্রসাদ সশ্রদ্ধভাবে বললেন—বলুন।

আনন্দমোহন বললেন—সুরেন্দ্রও আসব বলেছিলেন। তা বৃষ্টির জন্যে আর তাঁকে

আনা গেল না।

জ্যোতিপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন—সুরেন্দ্রবাবু ? মানে আমাদের সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্যে মশাই ?

শাস্ত্রী মশাই বললেন—হ্যাঁ। তা কাজটা হচ্ছে সিটি কলেজের একটা ট্রাস্ট ডীড করে দিতে হবে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ট্রাস্টী হবেন।

জ্যোতিপ্রসাদ বললেন—এর জন্যে আপনারা এত কষ্ট করে এলেন কেন ? আমাকে খবর দিলে আমি নিজেই যেতাম। আপনাদের সময়ের মূল্য কত।

তারপর ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে বললেন—তোমরা বরং ভেতরে যাও, আমরা কাজের কথা বলি।

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দমোহন একটি হাত তুলে বললেন—না, ওরাও থাকুক। ওদের সঙ্গ আমাদের খুব ভালো লাগছে!

জ্যোতিপ্রসাদ হেসে ছেলেমেয়েদের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন—বস তোমরা!

শাস্ত্রী মশাই তাঁর উড়ুনির নিচে কোটের পকেট থেকে লম্বা দু' ভাঁজ করা ফুল-স্ক্যাপের এক নথি বের করে দিলেন জ্যোতিপ্রসাদের হাতে।

নথিটি হাতে নিয়ে জ্যোতিপ্রসাদ খুব সঙ্কোচের সঙ্গে হেসে শাস্ত্রী মশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন—উনি নিজে এত বড় ব্যারিস্টার, উনি থাকতে এ ডীড ড্রাফ্ট করব আমি ?

আনন্দমোহন একটু বিব্রত হলেন মনে হলো। তিনি একটু নড়ে চড়ে বসে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই তাঁকে বাধা দিয়ে শাস্ত্রী মশাই বললেন—আপনার কাছে এই কাজের জন্য আসতে ওঁর কি সঙ্কোচ! তা আমিই ওঁকে জোর করে নিয়ে এলাম। ওঁর সময় কোথায় মন দিয়ে প্র্যাকটিস করবার ? ওঁর সমগ্র জীবন তো মানুষের কাজের জন্যই নিযুক্ত। নিজের মক্কেল যিনি ফিরিয়ে দেন, ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন, তিনি এই কাজ করবেন কখন ?

জ্যোতিপ্রসাদ গভীর আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললেন—এ আমার সৌভাগ্য। এ আমি তাড়াতাড়িই করে দেব। আপনারা এর জন্যে বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না।

আনন্দমোহন নড়ে চড়ে একবার দাড়িতে হাত বুলিয়ে আবার স্থির হয়ে বসলেন। শাস্ত্রী মশাই বললেন—আপনি সমস্ত ব্যাপারটার ব্যাকগ্রাউণ্ড জানেন নিশ্চয়ই। তবু বলি একবার! এই তো বছর কয়েক আগে, তা বোধহয় বছর দশেক হবে, উনি, সুরেনবাবু, আরও জনকয়েক বন্ধুবান্ধব মিলে সিটি স্কুল স্থাপন করলেন।

ওঁর হাত আর মন যাতে লাগে তা তো সোনা হয়ে যায়। সিটি স্কুল ওঁর পরিচালনার গুণে কলেজ হলো, শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলেজ। ওঁর ইচ্ছা ছিল, পুনার ফার্গুসন কলেজের ভ্রাতৃমণ্ডলীর মতো একটি ত্যাগশীল ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠন করে, তার হাতে কলেজের পরিচালনার ভার দেন। তা বুঝতেই পারেন, সব ইচ্ছাকে তো কর্মে রূপান্তরিত করা যায় না। ঈশ্বরের অভিপ্রায় তো আমরা ঠিক সব সময় অনুধাবন করতে পারি না। ওঁর এ ইচ্ছাও তাই কর্মে রূপান্তর করা গেল না, অনেক চেষ্টা করেও পারা গেল না। বন্ধুজনেই প্রতিকূলতা করলেন। তাই এখন ওঁরা স্থির করছেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের হাতে কলেজের পরিচালনার ভার থাকুক।

আরও সামান্য কথাবার্তার মধ্যেই কিছু ফল, মিষ্টি ও শরবত নিয়ে আবার ঘরে ফিরলেন সত্যর মা। ওঁরা সামান্যই কিছু গ্রহণ করলেন। তারপর পরিপাটি করে হাত ধুয়ে, দাড়ি মুছে ধীরেসুস্থে সত্যকে কাছে ডাকলেন আনন্দমোহন। এর জন্য ওরা কেউ প্রস্তুত ছিল না।

সত্য কাছে এসে দাঁড়াতেই তার একখানি হাত ধরে তিনি ধীর স্বরে বললেন—তুমি তো সত্যপ্রসাদ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ !

—তুমি তো এবার থার্ড হয়েছ ?

—আজ্ঞে !

—এফ. এ.-তে কি কি নেবে ঠিক করেছ ?

—এখনও কিছু ঠিক করি নি।

অকস্মাৎ আনন্দমোহন মন্মথর দিকে তাকালেন। তাকেও ডাকলেন হাত ইশারা করে।

মন্মথ আশ্চর্য হয়ে গেল। সে শশব্যস্ত হয়ে কাছে যেতেই তার পিঠের উপর অন্য হাতখানি রাখলেন আনন্দমোহন। তার দিকে তাকিয়ে বললেন—মন্মথনাথ, তুমি ফার্স্ট হয়েছ। তোমার দায়-দায়িত্ব অনেক বেশী। আজীবন এই আসন বজায় রাখার তপস্যা তোমার ! জীবনে যত অগ্রসর হবে তত দেখতে পাবে যত অধিকার তত দায়-দায়িত্ব। পরমেশ্বর তোমাদের দুজনকেই জীবনারম্ভের মুখেই অনেক সম্মান দিয়ে তোমাদের আশীর্বাদ করেছেন। জেনে রেখো, এই আশীর্বাদের দায়িত্ব অনেক। তাঁর এই আশীর্বাদ তাঁরই কর্ম কর্তব্যস্বরূপ সম্পাদন করে তোমাদের পরিশোধ করতে হবে।

এই আশ্চর্য মানুষটির আশ্চর্য কথাগুলি দুটি তরুণের প্রাণে অগ্নিপ্রবাহের মতো

তরঙ্গিত হয়ে উঠল। ওদের দুজনেরই চোখের দৃষ্টি প্রদীপশিখার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখ একান্ত গম্ভীর, অথচ অস্ফুট হাসি খেলা করছে দুজনেরই মুখে। মন্মথ অনুভব করছে যেন সে নিজের জীবনের শেষ প্রান্ত অবধি দেখতে পাচ্ছে। সমস্ত পরীক্ষায় এমনি ফল করে, এই মানুষটির মতো নিজের সমস্ত জীবনটি পরমেশ্বরের কর্মে উৎসর্গ করে তার জীবন সমাপ্ত হচ্ছে।

সমস্ত ঘরখানি আশ্চর্য রকম স্তব্ধ, অথচ একটি অপরূপ আনন্দে যেন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সবাই নিস্তব্ধ নীরব, অথচ সকলেরই মুখেস্মিত হাসি। শাস্ত্রী মশাই নিজের দাড়িটি মুচড়ে নিয়ে একবার গলা ঝাড়লেন। তারপর বললেন—তোমরা যাঁর সঙ্গে কথা বলছ, তিনি কেমন ছাত্র ছিলেন জান?

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দমোহন নিজের আবিষ্ট অবস্থার মধ্যেই কেমন বিব্রত হয়ে উঠলেন। মৃদু স্বরে, যেন একটু বিরক্ত হয়েই উচ্চারণ করলেন—আহা, শাস্ত্রী মশাই, ওসব কথা থাক না!

শাস্ত্রী মশাই মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—না, ওদের জানা দরকার। জানলে ওদের মহৎ উপকার হবে। যদি জানে ভালো, না জানলে আমি জানিয়ে দিই ওদের। ওঁর বয়স যখন ন' বছরের বেশী নয়, তখন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চার টাকা করে বৃত্তি পেলেন। অথচ এই সময়ে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়; পরীক্ষার আগে তিন মাস তিনি বইতে হাত দিতে পারেন নি। তারপর তোমরা যেখানে ভর্তি হবে, সেই প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। তারপর এফ. এ., বি. এ. এম. এ—সব পরীক্ষায় একেবারে ফার্স্ট। যত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি আর পুরস্কার সব পেয়েছেন উনি। তারপর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। এই কাজ করতে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেলেন। সেই টাকা বৃথা অপব্যয় না করে তিনি ইংল্যাণ্ড গেলেন। সেখানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করে সেখানকার সর্বোচ্চ সম্মান যা, তার নাম 'র‍্যাংলার', সেই 'র‍্যাংলার' হলেন। তারপর ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরলেন।

যতক্ষণ শাস্ত্রী মশাই আনন্দমোহনের ছাত্রজীবনের কৃতিত্ব বর্ণনা করছিলেন ততক্ষণ আনন্দমোহন অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়ে কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিলেন বলে মনে হলো মন্মথর। শাস্ত্রী মশাই থামতেই তিনি যেন সহজ হলেন। মন্মথ বুঝতে পারলে একেবারে কাছে বসে নিজের প্রশংসা শুনতে আনন্দমোহনের ভালো লাগছিল না।

কিন্তু শাস্ত্রী মশাই একটু হেসে বললেন—বুঝলে, আনন্দমোহনের কাছে এ সব কথা অর্থহীন। তবুও, ওঁর ছাত্রজীবনের কৃতিত্বের কথা না বললে বাকী কথা-

গুলির অর্থ স্পষ্ট হয় না। উনি ছাত্র হিসেবে এত উজ্জ্বল, এত মেধাবী এ সব কথা ঠিক কথা। কিন্তু এইটিই ওঁর জীবনের আসল পরিচয় নয়। আসল পরিচয় ওঁর মানুষ হিসেবে। আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে, যখন উনি একান্ত তরুণ, তখনই ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে উনি যুক্ত হয়েছেন। এই থেকেই ওঁর চিত্তের ধর্মভাব তোমরা অনুমান করতে পারবে। উনি সেই তরুণ বয়স থেকেই নিজের মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করতে পেরেছেন। শুধুমাত্র পড়াশুনো নিয়েই উনি নিজের জীবন অতিবাহন করেন নি। ওঁর আসল সন্ধান ও তৃষ্ণা ভিন্ন। সেই সন্ধান, সেই তৃষ্ণার জন্যেই উনি ইংল্যাণ্ডে থাকতে ভলান্টিয়ার দলের সভ্য হয়ে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেছেন। ভারতহিতৈষী ফসেট প্রভৃতি মানুষের সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির আলোচনা করেছেন, সুরাপান নিবারণের জন্য যুদ্ধ করেছেন। সমস্ত রকমে মানব-চরিত্রের উন্নতির কাজে নিজেকে সর্বদা যুক্ত রেখে নিজের মনকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণের তপস্যা করেছেন। এই হলো ওঁর আসল পরিচয়।

এই সময় আনন্দমোহন অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ালেন। শাস্ত্রী মশাইয়ের দিকে ফিরে বললেন—চলুন শাস্ত্রী মশাই!

তিনি উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সকলে উঠে দাঁড়ালেন।

আনন্দমোহন জ্যোতিপ্রসাদের দিকে ফিরে বললেন—তাহলে আমি ট্রাস্ট ডীডের ড্রাফ্‌টা কবে পাব?

জ্যোতিপ্রসাদ হেসে বললেন—কবে চাই আপনার, হুকুম করুন!

আনন্দমোহন সবিনয়ে বললেন—হুকুম বললেন কেন? আপনাকে কি আদেশ করতে পারি?

জ্যোতিপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বললেন—আপনি আদেশ করতে পারেন বইকি! এ তো ঈশ্বরের কর্ম। আপনার কবে চাই?

—এ ধরুন সাত দিন। আসছে সপ্তাহে ঠিক এই দিন, এই সময়ে আসব আবার।

জ্যোতিপ্রসাদ একান্ত বিনম্রভাবে বললেন—আপনার আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি নিজেই গিয়ে আপনাকে দিয়ে আসতে পারতাম। তবে আমার সৌভাগ্য, আপনি আর শাস্ত্রী মশাই আবার আমার বাড়িতে পদার্পণ করবেন, এ সৌভাগ্য কি আমি নষ্ট করতে পারি? আমি আপনার নির্দিষ্ট সময়ে প্রস্তুত হয়ে সপরিবারে অপেক্ষা করব।

তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে নামতে লাগলেন। বাড়ির সকলেই তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেলেন। এমন কি মন্মথও পর্যন্ত গেল সকলের পিছনে সত্যর সঙ্গে। ওঁদের গাড়িতে তুলে দেবার সময় আবার একদফা প্রণাম নিয়ে ওঁরা গাড়িতে উঠলেন।

গাড়িতে উঠে আবার নেমে এলেন আনন্দমোহন। ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে জ্যোতিপ্রসাদকে বললেন—যে গান গাইলে, আপনার ভাইঝি তো? সে কই?

সকলের মধ্যে মালতী দাঁড়িয়েছিল। জ্যোতিপ্রসাদ বললেন—এই যে মালতী!

আনন্দমোহন তাকে বললেন—তোমার কাছে আমার অপরাধ হয়ে যাচ্ছিল মা!

তার মাথায় নিজের দুখানি হাত স্থাপন করে তার মাথাটি যেন আশীর্বাদ সম্পূর্ণ আবৃত করে দিলেন আনন্দমোহন। বললেন—তোমার কণ্ঠে, তোমার হৃদয়ে পরমেশ্বরের চিরস্থির আসন পাতা হোক!

বলে আর কোনো কথার অপেক্ষা না করে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সকলের আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে দিয়ে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ, বর্ষার সজল মেঘের ধারা-বর্ষণের মতো আশীর্বাদ বর্ষণ করে বেরিয়ে গেল।

ততক্ষণে বর্ষণ থেমে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে আবার তারা ফুটে উঠেছে।

উপরে উঠে গিয়েও বেশ কিছুক্ষণ কেউ ভালো করে কথা বলতে পারলে না। প্রত্যেকেই যেন এমন কিছু পেয়েছে যার দ্বারা প্রতিটি জন যেন কিছুক্ষণ আবেগে ও অনুভবে বৃহৎ ও স্ফীত হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যাই প্রথম কথা বললে—বাবাঃ, কী মানুষ! কী সুন্দর!

জ্যোতিপ্রসাদ উঠলেন। বলে গেলেন—তোমরা বস। আমি যাই কাজে বসি।

বেশ খানিকটা সময় গেল ওদের সহজ হতে। সত্য বললে—মনু, তুই ভাই আজ এত দেরি করে এলি যে কলেজে ভর্তির আর কোনো কথা হলো না। কাল সকালে আয়, সব কথাবার্তা বলে ঠিক করা যাবে। কি কি সাবজেক্ট্ নেব, তাও ভাবতে হবে।

মন্মথ বিশেষ কথা বলছিল না, সে চুপ করেই ছিল। সে কেবল বললে, অঙ্ক আমাকে নিতেই হবে।

সত্য হাসল, কিন্তু কোনো কথা বললে না। সে বুঝেছে আনন্দমোহনের পথের অনুগমন করতে চায় মন্মথ। অবশ্য মন্মথ অঙ্কে খুবই ভালো।

ওদিকে মালতী হঠাৎ সন্ধ্যাকে বললে—দিদিভাই, আমার বেণীর মালাটা জড়িয়ে গিয়েছে, চুলের ভেতর কিরকম সুড়সুড় করছে, একটু খুলে দে না ভাই।

সন্ধ্যা মালতীর মালাটা খুলে দিতে লাগল। মন্মথ লক্ষ্য করলে মালতী কি অপরূপ সুন্দর ভঙ্গিতে ঘাড়টি বাঁকিয়ে মাথাটি নামিয়ে সন্ধ্যার হাতে সমর্পণ করেছে। তারই মধ্যে একবার দুজনের চোখে চোখ পড়ল। কিন্তু মালতীর চোখে সেই গম্ভীর, শান্ত দৃষ্টি। সে দৃষ্টি যে সচরাচর কি বলে মন্মথ তার কিছুই বুঝতে পারে

না।

সন্ধ্যার হাতে থেকে ছাড়া পেয়ে মালতী হঠাৎ গিয়ে আবার হার্মোনিয়ামের সামনে বসল। আপন মনে সুর তুলতে লাগল সে মৃদু হাতে।

সেই দিকে তাকিয়ে মন্মথ উঠে দাঁড়াল। সত্যকে হেসে বললে—আজ আসি রে সত্য। অনেক রাত হলো। বাড়িতে সবাই ভাববে।

সত্য লঘু স্বরে বললে—বাড়িতে? কোন্ বাড়িতে?

মন্মথ গভীর গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে—না রে, তুই জানিস না। মুন্সীমশাইয়ের বাড়িতে ওর মেয়ে চারু-মা সত্যই খুব ভাববে!

সত্যও বললে—চল তোকে এগিয়ে দি নিচে পর্যন্ত। কাল সকালে আয় তাহলে। ন'টা নাগাদ।

দুজনে যাবার জন্যে পা বাড়ালে। হঠাৎ পিছন থেকে মালতী ডাকলে এই সত্য, চট্ করে এখানে আয়। এই সুরটা একটু শুনে যা!

সত্য বললে—আমি মন্মথকে নিচে পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। তুই একটু দাঁড়া।

মন্মথ বলে যে কেউ ঘরে আছে, তাকে নিচে পৌঁছে দেবার প্রয়োজন আছে কিনা এ সম্পর্কে যেন কিছুই জানে না মালতী। সে তবু ডাকলে—আয় না, এক্ষুনি।

সত্য বড় বিব্রত হলো।

মন্মথ বললে—তুই যা ওর কাছে। না হলে—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সত্য বললে—না হলে ও যা মেজাজী, আর দু'দিন হয়তো ও আর হার্মোনিয়াম ছোঁবেই না।

মন্মথ একাই নেমে এলো। নেমে আসতে আসতে মনটা একটু খারাপই লাগল। মালতী তাকে ভ্রূক্ষেপই করলে না। শুধু তাই নয়, সত্যকেও আটকে দিলে। যেন ওর কোনো মূল্যই নেই।

সে সিঁড়ির থেকে নেমে বাইরে পা দিলে। পা দিয়েই কিন্তু তাকে থমকে দাঁড়াতে হলো।

কি হলো? মাথায় বুকে যেন কিসের মৃদু স্পর্শ লাগল। কি? সে খুঁজতে লাগল। পিছনে সিঁড়ির মৃদু আলোয় দেখতে পেলে সামনে পায়ের কাছে একটি মালা পড়ে রয়েছে। সে মালাটি হাতে করে তুলে নিলে। বেলফুলের মালা, টাটকা অথচ যেন ব্যবহারে একটু ম্লান হয়েছে। হাতের উপর মালাটি প্রসারিত করে সে দেখতে লাগল। এই মালাটিই তার মাথায় আর বুকে পড়েছিল। এক মুহূর্তে চকিত হয়ে সে মালাটিকে পরম যত্নে হাতের মুঠোয় আলতোভাবে মুড়ে নিলে। মালাটিকে চিনতে পেরেছে সে।

সে একবার উপরের দিকে সিঁড়ির উপরের ঘরখানার দিকে তাকালে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলে না। কাউকে দেখতে না পেয়েও সে বুঝতে পারলে নারদের বীণায় জড়ানো নন্দনের পারিজাতের মালা যেমন একদিন খসে পড়েছিল ইন্দুমতীর স্তনাগ্রচূড়ায়, আজ আবার তেমনি তার হাতের মুঠোয় আলতো করে পরমাদরে ধরা এই বেলফুলের মালাটি তার বড় জানা কিন্তু বড় অচেনা জনের হাত থেকে তার মাথায় বর্ষিত হয়েছে। সেই পুরাণের কালে নন্দন-মালিকার স্পর্শে ইন্দুমতীর মৃত্যু হয়েছিল। আর আজ এই মালার স্পর্শে মন্মথর অন্তরে যে কিশোর ছিল তার সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটে আর এক নূতন মন্মথ আবির্ভূত হলো, যার দৃষ্টির ও চেতনার সম্মুখে এই সৃষ্টি তার পরম মোহিনী মূর্তিতে মুখে রহস্যময় আহ্বানের হাসি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তারই অঙ্গাবরণের অন্তরালে কাম অপেক্ষা করে রয়েছে তার অতি তীব্র, অতি গভীর ও অতি স্বাদু আস্বাদের আমন্ত্রণ নিয়ে। সে আবার একবার হাতের মালাটি প্রসারিত করে দেখে সেটির উপর মুখ নামালে। তার স্পর্শে ও গন্ধে তার অস্তিত্ব এক মুহূর্তের জন্য অভিভূত হয়ে গেল।

পর মুহূর্তে সমগ্র পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে সে একবার চারিপাশে তাকালে, একবার তাকালে মাথার উপরের আকাশের দিকে। অনন্তব্যাপ্ত আকাশ তারায় তারায় খচিত। মাথার উপরের আকাশ যেন কৃষ্ণকায় অনন্তচক্ষু হাস্যময় সুহৃদের মতো তার মাথার উপরে নেমে এসে তাকে স্পর্শ করতে চাচ্ছে। সেও অন্তরে অন্তরে স্ফীত, অতিস্ফীত হয়ে মাথার উপরের আকাশকে এই ছুঁয়েই ফেললে বুঝি!

সে জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ির বাগানের পথ ধরে, চিরপ্রসন্না, চিরশ্যামা, আনন্দময়ী পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে হেঁটে চলল।

কিন্তু গেটের বাইরে এসেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। বুকের ভিতরে স্ফীত, আনন্দ-বিস্ফারিত অন্তর আচমকা ভয়ে চমকে উঠল।

কে? কে দাঁড়িয়ে ওখানে? মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ ঢাকা ও কে? ভয়ে তার গলা থেকে বিকৃত স্বর বেরিয়ে এলো—কে?

সর্বাঙ্গ-ঢাকা মূর্তির পাশ থেকে একটি আট দশ বছরের ছেলে সাড়া দিলে—হামি বাবু।

খানিকটা সামলে নিয়ে আশ্বস্ত হয়ে মন্মথ প্রশ্ন করলে—কে তুমি?

—হামি এরফানের ছেলে।

এরফান ? এরফান কে ? একটু ভাবতেই মনে পড়ল মন্মথর। এরফান সহিস, ঘোড়ার পায়ের আঘাতে কাল মারা গিয়েছে। তার কথা শুনেও হাজার আনন্দের কথা আর বড় বড় উজ্জ্বল মানুষের স্মৃতির আড়ালে সে সামান্য, অনুজ্জ্বল ছোট্ট কথাটি হারিয়ে গিয়েছিল।

মন্মথ প্রশ্ন করলে- দাঁড়িয়ে কেন ?

সকরুণভাবে ছেলেটি বললে— মাইজী খানেকো লিয়ে কুছ রোটি মিঠাই দেগা। উসি লিয়ে হামারা মাকা সাথ হিঁয়া ঠহর্তা।

—আচ্ছা, বস। যথাসম্ভব মিষ্টভাবে কথা বলে সে পা বাড়ালে। সে একবার আপনার পিরানের পকেটে হাত দিলে। পকেটে কিছুই নেই। সেও তো দরিদ্র। তবু আজ যদি তার কাছে কিছু থাকত তাহলে সে ছেলেটাকে তার সবটাই দিয়ে দিত।

চলতে চলতে সে বিস্মিত হয়ে অনুভব করলে সে আবার সাধারণ সামান্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। আর মনে হচ্ছে না যে আকাশ বন্ধুর মতো তাকে ছুঁতে নেমে এসেছে। কেন ? কেন ? কেন সে আবার সামান্য হয়ে গেল ? ভয়ে ? ওই বোরকা পরা নিস্তব্ধ নির্বাক মেয়েটিকে দেখে কি সে মৃত্যুর স্পর্শ অনুভব করেছিল ? মৃত্যু কি জীবনের সব কিছু উত্তাপে অমনি হিমানি স্পর্শ দিয়ে তাকে হিমশীতল করে দেয় ? জীবনের কি মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণের পথ নেই ? সে কি আলোকোজ্জ্বল জীবনের সমারোহের প্রান্তে অন্ধকারের মধ্যে একা অমনি করে নির্বাক ও স্থির হয়ে সব দৃষ্টির অলক্ষ্যে হাত পেতে অপেক্ষা করে থাকে ?

পথে একা চলতে চলতে সে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেললে, একবার চারিপাশে তাকিয়ে দেখলে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বড় নির্জন, নিঃসঙ্গ ও একাকী মনে হতে লাগল।

৫

প্রেসিডেন্সি কলেজ।

এ তো শুধু রাস্তার ফুটপাথের ওপারের বাড়ি থেকে এপারের বাড়িতে আসা নয়, এ যেন পুকুরের চার পাড়-ঘেরা সংকীর্ণ পরিধির গণ্ডী পার হয়ে কোন্ এক বিচিত্র জাদুমন্ত্রে একটি ছোট্ট চারা পোনা মাছ সমুদ্রে এসে পড়ল।

এইটুকু বলেও মন্মথর মনের ভাবটা ঠিক যেন বুঝানো গেল না। এ যেন এই

জন্মেই একটা জন্মান্তর ঘটে গেল। এমন একটা আশ্চর্য বিশাল লোকে যে এত সহজে কেউ লোকান্তরিত হতে পারে এ বোধ এই কলেজে না এলে তার হতো না। সে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের ছেলে, আজ থেকে প্রায় আশি-নব্বুই বছর আগের মানুষ, সে এ নূতন অভিজ্ঞতায় নিজের মনের মতো উপমা খুঁজে নিয়েছিল। উপনয়নের পর উপবীত ধারণ করে সে যেমন দ্বিজ হয়েছিল, দ্বিতীয় জন্ম লাভ করেছিল, এখানে এই প্রেসিডেন্সি কলেজের অঙ্গনের ও বিদ্যামন্দিরের মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়ে সে তেমনি আবার একবার দ্বিজ হলো। কথাটা সে অবশ্য কাউকে বলে নি; এমন কি সত্যকেও না। সত্যর সঙ্গে তার মনোধর্মের ঠিক কোথায় তফাত আছে তা সঠিক না জানলেও, না বুঝলেও, এটা সে ঠিকই বোঝে যে তফাত একটা আছে। সত্য যা যা ভাবে, যা যা বলে তার অনেকখানিই তার ভালো লাগে, ক্ষেত্রবিশেষে তাকে দ্বিজের ভাবনা বলেই মনে হয়, কিন্তু তাকে নিজের মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে না। তাই সে কথাটা সত্যকে বলে নি। এই কলেজে এসে সত্যও খুব খুশী ও পরিতৃপ্ত। কিন্তু নিজের সব খুশী সব পরিতৃপ্তিকে সত্য বেশ সহজভাবেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু তার চিত্ত, তার চরিত্র যেন এখানে এসে অনেকটা বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছে। এটা সে নিজে নিজেই বেশ বুঝতে পারে।

কিন্তু তার একান্ত জিজ্ঞাসু, কৌতূহলী, অতি স্বল্প অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিত্তটির এই মানস-বিস্তার না হয়ে কি উপায় ছিল? নিজের ছোট্ট পল্লীগ্রামটিতে সামান্য সংস্কৃত-শিক্ষার পটভূমিতে তার চিত্তের বেদীটি রচিত হয়েছিল। আর তো কোনো সত্যকারের শিক্ষা তার ছিল না। এখানে হিন্দু স্কুলে চার বছর পড়ে আর সামান্য এটা ওটার মতো কিছু কিছু যুক্ত হয়েছিল তার সঙ্গে। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকে সে বুঝতে পারলে অন্তত আভাস পেলে, জ্ঞান কাকে বলে আর সে জ্ঞানের পরিধি ও বিস্তার কতখানি।

এখানে বেশ কিছুকাল বিচরণ করার পর যখন এখানকার পরিবেশ তার কাছে সহজ হয়ে এলো তখন ধীরে ধীরে সে এই বিস্তৃত পরিধির কিছুটা আভাস পেয়েছিল। মানুষ নিজের পিছনের অন্ধকারাবৃত কালে যতদূর পর্যন্ত নাগাল পেয়েছে তখন থেকে যাঁরা যাঁরা মানুষের জন্য, নিজের জন্য, সমগ্র মানব-সভ্যতার জন্য নিজের নিজের মতো এক এক পথে গভীরভাবে ভেবেছেন তাঁদের সকলের ধ্যান ও ভাবনা এখানে পরম সমাদরে ও গভীর শ্রদ্ধায় রক্ষিত হয়ে রয়েছে। লাইব্রেরীর থাকে থাকে তাঁরা জীবনের যেটুকু শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেই ধ্যান ও ভাবনার সঞ্চয় নিয়ে গ্রন্থবদ্ধ হয়ে মানবজাতির পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অতন্ত্র ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা

করছেন।

এখানে কত উদারতা। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে জাতি, বর্ণ, ধর্ম বিচার নেই এটাও সে ধীরে ধীরে শুধু অনুভব নয়, উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে। অথচ গ্রামে থাকতে তার মনোধর্ম অন্যরকম ছিল। নিজের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা ও ক্লেশ হলেও সে আজ নিজের সঙ্কীর্ণতাকে, অন্তত নিজের কাছে, স্বীকার করতে পারে। গ্রামে যখন মাইনর স্কুলে আর বাবার কাছে পড়ত তখন থেকে ম্লেচ্ছ বিদ্যা, ম্লেচ্ছ ভাষার সম্পর্কে নিজেরই অজ্ঞাতে কোথায় একটি বিরাগ পোষণ করে রেখেছিল। ব্রাহ্মদের সম্পর্কেও তাই সেটা অনেকটা গেলেও সবটা এখনও যায় নি। কিন্তু কলেজে লাইব্রেরীর গ্রন্থরাশির পাশে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চিত্ত ধীরে ধীরে নম্র ও উদার হয়ে এসেছে। বুঝেছে, জ্ঞান কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সাধনা একা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ নামক এক বর্ণের একমাত্র চর্চার বস্তু নয়। বুঝেছে, পৃথিবীর সর্বত্র সর্বকালে মানুষ জ্ঞানের চর্চা করেছে ও করে চলেছে, সত্য অনুসন্ধান পৃথিবীর সব ভূখণ্ডেরই মানুষ নিজের নিজের অন্তরের আর্তিতে করেছে ও করবে।

আর একটা জিনিস তাকে নিজের কাছে স্বীকার করতে হয়েছে। ইউরোপ নামক পৃথিবীর পশ্চিম খণ্ডের মানুষের প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা ও অন্বেষা। জ্ঞানের কত নব নব পথে তাঁদের কত জন যাত্রা করেছেন। তার ইয়ত্তা নেই জ্ঞান-তৃষ্ণায় তাঁদের অসহ ক্লেশ স্বীকার, ক্ষেত্র বিশেষে জীবনে সন্ন্যাসীর মতো সর্বস্ব ত্যাগ, চারিত্রিক নিষ্ঠা, তপশ্চর্যা তুলনাহীন। ভারতবর্ষ নামক দেশের সাধু-সন্ন্যাসীদের তপস্যার সঙ্গেই তা একমাত্র তুলনীয়।

সব বুঝে তার চিত্ত ও চরিত্র ধীরে ধীরে নম্র ও উদার হয়ে এসেছে দিনে দিনে। লাইব্রেরীতে তার থাকতে বড় ভালো লাগে। তাই সময়ে অসময়ে এসে লাইব্রেরীর মধ্যে কিছুক্ষণ করে কাটিয়ে যায় সে। লাইব্রেরীয়ান ভদ্রলোকও তাই তাকে বড় ভালবাসেন। সে একে চিহ্নিত ছাত্র, তার উপর লাইব্রেরী সম্পর্কে তার এই আসক্তি দেখে লাইব্রেরীয়ান সে এলেই তাকে স্মিতহাস্যে আপ্যায়িত করে বসতে বলেন। বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কি শ্রীমান, কি বই চাই ?

বিশেষ বইয়ের প্রয়োজন থাকলে তার উল্লেখ করে সে; উল্লেখমাত্রেই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সে বই এসে পৌঁছে যায় বেয়ারাদের হাত দিয়ে। তাদের সঙ্গেও মন্মথর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। তাদের চোখে চোখ পড়লেই সে তাদের সহজ মিষ্টি হাসি হেসে আপ্যায়িত করে। তার এই মিষ্টি হাসিতে, সহজ মধুর ব্যবহারে তারা যত প্রীত তত পরিতৃপ্ত। তার কারণ সে সেরা ছাত্র হয়েও এমন

সহজ ও ভদ্র ব্যবহার করে, করতে পারে। অথচ এই কলেজেই বহু বহু ধনীর সন্তান তাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে তাতে তাদের পরিতৃপ্তির কারণ ঘটে না। তাদের কর্কশ, ক্ষেত্রবিশেষে উদ্ধত ব্যবহারে তাদের অন্তর পীড়িত করে, কিন্তু মুখে তারা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে সাহস করে না। কারণ ভয় এবং লোভ। ভয়, তারা ধনীর সন্তান, কখন কোন্ কারণে শহরের কোন্ প্রান্তে তাদের শাস্তির ও প্রহারের ব্যবস্থা করবে তা কে বলতে পারে! আর লোভ, তাদের হাত দিয়ে তারা আশাতীত বকশিস পায়! কিন্তু মন্মথ তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

বই পেলে বই হাতে নিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় না। দাঁড়িয়ে সে তাদের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলে তবে যায়। বইয়ের প্রয়োজন না থাকলে সে সসম্ভ্রমে হেসে লাইব্রেরীয়ানকে বলে—না, কিছু লাগবে না। এই তো কাল বই নিয়ে গিয়েছি। এত তাড়াতাড়ি কি পড়তে পারি? আর বেশী তাড়াতাড়ি পড়লে তো বদহজম হবে। লাইব্রেরীয়ান হেসে জবাব দিতেন—হ্যাঁ, তা ঠিক! ঠিকই বলেছ। আগ্রহের আতিশয্যে বেশী আহার করলে বদহজম হবেই।

সত্য পাশে থাকলে সে সঙ্গে সঙ্গে ফুট কেটে দিত, বলত—হাঁা, ওর স্বভাব লোভী ছেলের মতো। একটু একটু করে ভেঙে ভেঙে, তারিয়ে খায়।

মন্মথ বলত—তাতে তো বেশ ভালো করে হজম হবারই কথা!

তার কথার মধ্যে এমন একটি শিষ্টতা ও নম্রতার আস্বাদ পেতেন লাইব্রেরীয়ান ভদ্রলোক যে তাকে তিনি শুধু ভালইবাসতেন না তার সান্নিধ্যে এক ধরনের শান্ত পরিতৃপ্তি আস্বাদ করতেন। বইয়ের দরকার না থাকলেও যে মানুষ বইয়ের কাছে বসতে চায় তাকে তো ভালো লাগবারই কথা।

সময় সময় মন্মথকে জিজ্ঞাসা করলে সে শুধু হাসিমুখে ঘাড় নাড়ত, যার অর্থ কিছু চায় না অথচ যে এমনি আসে তাকে সমাদর না করে পথ আছে!

সত্য ঠাট্টা করে তাকে বলত—তোর বই পড়েও আশ মেটে না, তাই বইয়ের গায়ে গা দিয়ে বসতে আসিস! যদি শুধু গায়ে গা দিয়েই মুফতে কিছু জ্ঞান পাওয়া যায়! না কি রে?

সচরাচর মন্মথ হাসত তার কথা শুনে। একদিন সে আবেগের আতিশয্যে অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছিল সত্যকে। প্রথম যৌবনের অনাহত আবেগ সে দিন আর বাধা মানে নি। বলেছিল—তুই ঠিক ধরেছিস সত্য, আমি এখানে এসে বসি বইয়ের কাছাকাছি থাকবার জন্যেই। কত হাজার হাজার উৎকৃষ্ট মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ তাঁরা এখানে মশালের মতো জেলে ধরে রেখে সকলকে নিঃশব্দে ডাকছেন—এস, আমাদের কাছে এস; আমরা তো তোমাদের জন্যেই এতকাল

ধরে অপেক্ষা করে আছি। আমাদের হাতের এই মশাল থেকে আগুন নিয়ে নিজের মনের মশাল ধরিয়ে নাও, নিজের ভিতরটা খোঁজ, বাইরেটা খোঁজ; তোমার চারপাশ আলোকিত হোক, তুমি ভিতরে বাইরে আলোকিত হও। জ্ঞানের আগুনে তুমি পুড়ে পুড়ে নিখাদ হও, উজ্জ্বল হও। তোমার সম্মুখে সত্য উদ্ভাসিত হোক।

সত্য অর্ধকৌতুকে, অর্ধবিস্ময়ে হাস্যোদ্ভাসিত মুখে তার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল—আরে তুই তো খাসা বলতে পারিস! এটা তো জানা ছিল না! কিন্তু তুই ওই যে বললি—তোমার সম্মুখে সত্য উদ্ভাসিত হোক, তা ওর মধ্যে 'সম্মুখে'র বদলে 'সামনে' বললে কি চণ্ডী অশুদ্ধ হতো?

মন্মথ বললে—'সামনে' কথাটা বড় হালকা, 'সম্মুখে'ই ওখানে বেশী মানানসই বুঝলি!

সত্য হেসে বলেছিল—না রে, ভাষা যত সহজ হয়, যত মুখের কথা হয় ততই ভালো, ততই মনে গিয়ে লাগে।

তারপরই হেসে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলেছিল—তা আজ একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম বুঝলি!

—কি রে?

—তুই তাহলে আমাকে কোনোদিন ছাড়বি না এটা বুঝলাম। তোর সঙ্গে আমার কোনোদিন বিচ্ছেদ হবে না।

—মানে? না বুঝতে পেরে মন্মথ বললে।

—বোকা, মানেটা বুঝলি না! তুই তো আমাকেই খুঁজছিস, সারাজীবন খুঁজবি—এই তোর প্রতিজ্ঞা!

মন্মথ এবার হাসল অনেকখানি, হেসে তার কাঁধে হাত রেখে বললে—হ্যাঁ রে, তোকেই খুঁজছি, তোকেই যেন সারাজীবন খুঁজতে পারি!

তার বলার মধ্যে হাসির সঙ্গে এমন কিছু মিশে গেল বলার সময়, যাতে কথাটা যেন এক আশ্চর্য, অতি কোমল, সকরুণ প্রার্থনার অকপট সুর ধ্বনিত করে তুললে। সত্যর মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে মুখখানি কেমন হয়ে গেল যেন।

মন্মথ সেটা লক্ষ্য করে নি। আগের কথার সূত্র ধরেই সে বললে—সত্য অনুসন্ধান করতে করতে মানুষগুলো কেমন হয়ে যায় দেখছিস? এই দেখ চোখের সামনে পার্সিভ্যাল সায়েব, পেডলার সাহেব, বিপিনবাবু (বিপিনবিহারী গুপ্ত), জগদীশবাবুকে। একবার দেখ আমাদের কেমিস্ট্রির প্রফুল্লবাবুকে। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষ কেন, অন্য সব লেখাপড়া শেখা মানুষের সঙ্গেও তাঁদের কত গর-

মিল, কত তফাত! জ্ঞানের চর্চা করতে করতে মানুষগুলো বদলে যাচ্ছে, বদলে গিয়েছে। কেমন জানিস? শঙ্করাচার্যের একটি শ্লোকে আছে—ভ্রামরী কীটের মতো, মানে—না থাক, সোজা বাংলায় বলি। কাচপোকায় আরশুলা ধরে দেখেছিস? কাচপোকা নিজের দুটো শুঁড় দিয়ে আরশুলার মুখটা আটকে চুপ করে অপেক্ষা করে। অপেক্ষাই করে আধ ঘণ্টা, একঘণ্টা! ধীরে ধীরে আরশুলাটা কাচপোকার মতো নীল রঙ হয়ে যায়। তেমনি যাঁরা সদাসর্বদা ব্রহ্মের চিন্তা করেন তাঁরাও শেষ পর্যন্ত ব্রহ্ম হয়ে যান। এঁরাও জ্ঞানের চর্চা করতে করতে বিশুদ্ধ জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছেন।

সত্য তার কথাটার খুব তারিফ করেছিল।

সেদিন সত্যই আগে থেকে লাইব্রেরীর কাউণ্টারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সে যেতেই হাসল সত্য, বললে—আয়। আজ তোর আগেই আমি এসেছি।

—কি বই চাই?

ঘাড় নেড়ে সত্য বললে—আর বলিস না ভাই! কাল রাত্রিরে বাবার সামনে মলি আমার কাছে Uncle Tom's Cabin খানা চাইলে। বাবা সঙ্গে সঙ্গে মলিকে বললেন—তুমি বইটা পড় নি না? বইটা তো পড়া উচিত ছিল তোমার! তারপর আমাকে বললেন—সত্য, বইখানা এনে দাও মলিকে। এখুনি এনে দাও। বাবার হুকুমে আলমারি খুঁজতে গেলাম, কিন্তু বইখানা পেলাম না। খালিহাতে ফিরে আসতে হলো। বাবা মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু বুঝলাম খুব রাগ করেছেন। আমি বাঁচার রাস্তা খুঁজতে গিয়ে বললাম—কাল আমাদের কলেজ লাইব্রেরী থেকে বইখানা এনে দেব মলিকে। যাক, তখনকার মতো বাঁচলাম।

তার কথায় বাধা পড়ল। লাইব্রেরীর লোক এসে বললে—বই নেই। দু' কপি ছিল, দু' কপিই 'ইস্যু' হয়ে গিয়েছে।

সত্য বিব্রত হয়ে পড়ল সত্য সত্যই। বিব্রত হাসি হেসে বললে—এবার সত্যি সত্যি বিপদে পড়লাম। বাবাকে তো জানি। সন্ধ্যেবেলা এসে ঠিক জিজ্ঞেস করবে—মলিকে বই দিয়েছ তো এনে? এখন যে কি করি!

মন্মথ একটু মুচকে হাসল। যে ধরনের রসিকতা সে করে না, করতে পারেও না এবং জানেও না, সেই ধরনের রসিকতা যেন আপনাআপনি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। সে বললে—দেখ সত্য, তুই তো তোদের পরমব্রহ্ম ছাড়া আমাদের চিন্তামণিকে বিশ্বাস করিস না! তা চিন্তামণিই ব্যবস্থা করে রেখেছেন রে! তোকে দেব Uncle Tom's Cabin.

সত্য অবাক হয়ে গেল। বললে—তুই কোথায় পাবি? তুই বুঝি কলেজ লাই-

ব্রেরী থেকে নিয়েছিস 'ইস্যু' করে?

– না, আমার কাছে। আমি বিকেলে নিয়ে যাব তোদের বাড়ি। আমি যাবার আগে খোঁজ পড়লে বলিস, বই আসছে, সন্ধ্যের আগেই আসছে। সত্য হঠাৎ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে ফেললে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—এই ক'মাস কলেজে এসে তুই অনেক বদলে গিয়েছিস রে মন্মথ!

মন্মথ হেসে বললে—কি রকম!

—কি রকম? বলা শক্ত। তবে তোর গাঁয়ের গ্রামের ছাপটা চলে গিয়ে তুই শহুরে হয়ে উঠেছিস। ভালো করে বললে বলতে হয় তুই যদি একটা দামী পাথর হোস, তা হলে সেই পাথরের গায়ের ময়লা কেটে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিস!

—না কি। বলেই মন্মথ মৃদু স্বরে বললে—

মণি লও, মাণিক লও, হার লও যে
কেশের কবি বেশ।
নারী যদি না গড়িত বিধি, কোথা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।

সত্য হেসে বললে—তাই তো বলছি, তোর খুব মুখ ফুটেছে! তুই যে এত ছড়া জানিস তা কি জানতাম?

—ছড়া নয় রে! বৈষ্ণব মহাজনদের পদ!

—তা হবে। অত রস-টস ভালো লাগে না, যদিও লাইন দুটো শুনতে বেশ। আমি তো ওসব পড়ি নি।

মন্মথ হেসে বললে—আমি কিছু কিছু পড়েছি। আমাদের দেশে বাড়িতে বাবার কাছে কিছু কিছু বই আছে। আমি এগুলো জানি. কিন্তু তোদের মতো তো ইংরিজী জানি না। তোরা ইংরিজী পড়েছিস. আমি দিশী এই সব কিছু কিছু পড়েছি, পড়তে ভালোও লেগেছে।

সত্য একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললে—তুই তো জানিস, আমাদের বাড়িতে এই সব বইও নেই, আর ওসব পড়াও সকলে পছন্দ করে না। আর এ কালের ভালো বই দেশবিদেশে কোথায় কি বেরুচ্ছে বাবা মোটামুটি খবর রাখেন, নিজে পড়েন, কেনেন, আমাদের পড়তে উৎসাহ দেন। তোর ভেতরে বাংলাদেশের গাঁয়ের ছোঁয়াচটা এখনও আছে।

মন্মথ একটু হেসে বললে—আমিও আস্তে আস্তে তোদেরই মতো হয়ে যাব শেষ পর্যন্ত।

কথা শেষ করেও সে আবার একটু হাসল। সে হাসি সুখের কি দুঃখের তা ঠিক বুঝতে পারলে না সত্য। সে চুপ করেই থাকল।

এই সময় মন্মথর চাওয়া বই এসে হাজির হলো। মোটা বই। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কমপ্লিট ওয়ার্কস।

বইখানা নেড়েচেড়ে সত্য হেসে বললে—তোর সঙ্গে পারা যাবে না। ক্লাসে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা পড়ানো শুরু হতে না হতে তুই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পুরো কবিতা নিয়ে পড়েছিস?

পরম আদরে বইখানা তুলে নিতে নিতে মন্মথ একটু হাসল।

সত্য বললে—তুই আর তোর সেই খেলাঘরের মায়ের কাছে যাস না? মানে আমাদের দ্বিজু জ্যাঠামশায়ের বাড়ি?

—যাই না আবার! এই রবিবারে যাব। দুপুরে সেখানে আমার খাবার নেমন্তন্ন। আমি গিয়ে রান্না করব, করে নিজে খাব, মাকে আর মুন্সীদাদুকে খাওয়াব।

এবার অকৃপণ ও অকপট হাসিতে আশপাশটা চকিত করে তুলল দুজনে। তারা ভুলেই গিয়েছিল যেখানে দাঁড়িয়ে তারা কথা বলছিল সেটা প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরী, যেখানে জোরে কথা বলা নিষেধ।

দ্বিজু মুন্সীর বাড়ি থেকে যেদিন সে প্রেসিডেন্সি কলেজের নূতন তৈরি হোস্টেলে এসেছিল সেদিন কি কান্নাই কেঁদেছিল চারু-মা। মাত্র কয়েকটা দিনই তো সে ছিল দ্বিজু মুন্সীর বাড়িতে। তারই মধ্যে কি এক প্রগাঢ় মমতায় তার চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের বড় এই মেয়েটি যে তাকে বেঁধেছিল সেটা সে সঠিক বুঝতে পেরেছিল ওদের বাড়ি থেকে চলে আসবার সময়। ওদের বাড়িতে থাকবার সময় চারু-মায়ের সমস্ত আকুলতা ও আবেগকে সহজ দৃষ্টিতে বুঝেও হালকা করে গ্রহণ করবার চেষ্টা করত মনে মনে। সাধারণ জীবনে এই মেয়েটি হয়তো তার বড় দিদি হতে পারত। কিন্তু সে যে কেমন করে তার মায়ের আসনে নিজেকে বসিয়ে নিয়েছিল তা অনুমান করা তার পক্ষে অসম্ভব। তবে মেয়েরা সব পারে, ভাল-বাসতে পারলে মেয়েরা এমনি করেই ভালবাসে। এই তো তার সৎমা তাকে কেমন সুন্দর সাজিয়ে বাবা দিব্যি চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে।

যেদিন সকালে সে আসে সেদিন সকাল থেকেই চারু-মা থমথমে মুখে ঘুরছিল ফিরছিল, কথা বলে নি একবারও। তার জিনিসপত্র গোছগাছ করে চলেছে সে। আগের দিন রাত্রিতে কথা হয়েছে সকালেই রওনা হবে সে। কিন্তু সকাল-

বেলাতেই বাদ সাধলে চারু-মা। চারু-মায়ের দূত হয়ে দ্বিজু মুন্সী এসে বললে—তোমার তো এখন যাওয়া হচ্ছে না ভাই। তোমার মায়ের হুকুম, এবেলা না খেয়ে তোমার যাওয়া হবে না। খেয়ে দেয়ে বিকেলে যাবে।
বিব্রত এবং খানিকটা বিরক্ত হয়েই মন্মথ বললে—সে কি করে হবে? আপনি তো পাঁজি দেখে বললেন—বিকেলে বারবেলা পড়বে, যাওয়া হবে না।
দ্বিজু মুন্সী বিব্রত হয়ে বললে—কি করি ভাই, তোমার মা, আমারও তো তেমনি মা! মায়ের হুকুম খেয়ে যেতে হবে। আমি সেজন্যে ইতিমধ্যে বাজারও করে এনেছি। নাও, মাছের ঝোল ভাত তৈরি করে ফেল। আমিও ব্রাহ্মণের প্রসাদ পাই। আর খাওয়া-দাওয়ার পর বারবেলা পড়বার আগেই আমি তোমাকে ঠিক পৌঁছে দেব।
তাই হলো শেষ পর্যন্ত। খেলাঘরের মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করা গেল না। তার আদেশ অনুসারেই খাওয়া-দাওয়া করে বেলা বারোটা নাগাদ ঘোড়ার গাড়িতে দ্বিজু মুন্সী মন্মথকে নিয়ে রওনা হলো। জলে-ভেজা, ফোলা ফোলা চোখ নিয়ে চারু এসে দাঁড়াল ঘোড়ার গাড়ির কাছে। বিছানা, বাক্স, বইয়ের পেটরা গাড়িতে চাপানোর পর মন্মথ চারুকে বললে—মা, আসি!
আজ আর মন্মথ সঙ্কোচ করলে না। বাইশ তেইশ বছরের যুবতী মেয়ে চারুর থান কাপড়ে অর্ধ-আবৃত, অর্ধ-অনাবৃত পিঠে অসঙ্কোচে হাত দিয়ে, পরম সমাদরে সে বললে—এই তো খানিকটা দূরে মাধববাবুর বাজারের কাছে যাচ্ছি। এর জন্যে এত ভাবছ কেন? আমি প্রতি রবিবার এসে তোমার কাছে খেয়ে যাব। কিছু ভেবো না!
চারু মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কেঁদে তার সমাদরের উত্তর দিলে।
গাড়িতে উঠেও হাত নেড়ে মন্মথ চেঁচিয়ে বললে—আসছি মা!
গাড়িতে বসে তার মন কেমন এক আশ্চর্য আতুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মনটা যেন হায় হায় করতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন পৃথিবীর সব চেয়ে ভাল-বাসার জায়গা ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে। এমন ভালবাসা সে কোথাও কখনও পায় নি। মনে হতে লাগল, এখানে থেকে গেলেই ভালো হতো, ঠিক হতো। এই মুহূর্তে ছোট্ট বিশ্বসংসারের সব ভালবাসার মানুষগুলি তার ছোট হয়ে গিয়েছে, রঙ-চটা পুতুলের মতো মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে চারু-মার মতো এ জীবনে তাকে কেউ কখনও ভালবাসে নি।
হঠাৎ দ্বিজু মুন্সী বললে—একি, তুমিও যে কাঁদছ ভাই!
শোনার সঙ্গে সঙ্গে হুহু করে কেঁদে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকলে মন্মথ। তার কান্নায়

কৃতকৃতার্থ, পরিতৃপ্ত দ্বিজু মুন্সী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—চোখ মোছ ভাই, এই তো এখুনি পৌঁছে যাব।

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে চোখের জল মুছে নিয়েছিল মন্মথ ; সতর্ক হয়ে চোখের জল মুছে সহজ হবার চেষ্টা করেছিল। অল্পক্ষণ পরেই গাড়িখানা যখন হিন্দু হোস্টেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল তখন তার মুখে আবার হাসি ফুটে উঠেছিল।

তারপর হোস্টেলে নিরিবিলি আশ্রয় পেয়ে জীবনের অপরিমেয় বিচিত্র নবীন আস্বাদ ও আনন্দের মধ্যে সে ভুলেও গেল এই চোখের জলের কথা। জীবনের বহু বিচিত্র আনন্দের উত্তাপে উত্তপ্ত জীবনের মধ্য থেকে সে চোখের জলের সকরুণ সজলতা কবে কখন যে বাষ্প হয়ে উড়ে কোথায় অন্তর্ধান করল তার সংবাদও তার অগোচর রয়ে গেল। এই অভিজ্ঞতার যদি কোনো কিছু তার ভিতর থেকেই গেল, তবে তা রয়ে গেল অন্তঃসলিলা হয়ে।

সে কলেজে এবং হোস্টেলে ঢুকে প্রথমেই একটা নতুন জিনিস আস্বাদ করলে। তাতে সে যত কৌতুক তত পরিতৃপ্তি অনুভব করলে। সে দু'একদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলে হিন্দু স্কুলের কয়েকজন সহপাঠী, যারা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছে, তারা ছাড়া, বাকী সব অপরিচিত সপাঠীরাই তার দিকে বিচিত্র এক সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকায়। ক্লাসের মধ্যে অন্য দিকে না তাকিয়েও সে বুঝতে পারে আশেপাশে ফিসফিস করে যে কথার আলোচনা চলেছে তা তারই কথা। সে যে বহু জনের কেন, প্রায় সকলেরই লক্ষ্যস্থল এটা সে দু'একদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছে।

সে বুঝেছে এটা তার ছাত্রহিসেবে কৃতিত্বের জন্য, তার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়ার জন্য। প্রথম প্রথম এটা বেশ কিছুদিন ভালো লাগলেও পরে এটা তার বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল।

কলেজে দ্বিতীয় দিনেই তার আর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো।

দ্বিতীয় দিনে ক্লাস আরম্ভ হবার একটু আগে লম্বা-চওড়া চেহারার মস্ত একজন মানুষ দামী কাপড়-চোপড় পরে, সেন্টের সুবাস ছড়িয়ে মুখে একমুখ হাসি নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। বললে—কি রে চিনতে পারিস? না পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে ভুলে গিয়েছিস?

তাকে এক ঝলক ভালো করে দেখে মন্মথর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে আনন্দের সঙ্গে বললে, আরে বিভূতি!

—হ্যাঁ আমি। বি. বি. এস। বিভূতিভূষণ সিনহা এস্কোয়ার। এবার চিনতে পেরেছিস তা হলে?

একটু হেসে, তাকে আর একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মন্মথ বললে—না চিনতে পারলেও দোষের কিছু হতো না। চেহারাখানা তোর যা শালপ্রাংশু মহাভুজ করেছিস! চেহারা চিনতে ভুল হলেও তোকে চিনছি তোর চিমটি-কাটা কথায়। এমন কথা আমাদের বিভূতি ছাড়া আর কার মুখ দিয়ে বেরুবে!

নিজের চেহারার উপযুক্ত মাপের অট্টহাস্য করে উঠল বিভূতি। তার কথার মধ্যে 'আমাদের বিভূতি' বলে উল্লেখে বিশেষ আপ্যায়িত হয়েছে সে। সে হেসে বললে—তা তুইও তো বেশ বড়সড় হয়েছিস! বিয়ে করেছিস?

মন্মথর ঠোঁটের একটা প্রান্ত হাসিতে একটু বক্র হয়ে উঠল। সে বললে—তোর ওই এক কথা! জীবনে কি আর কিছু জানার, ভালো লাগার পেলি না বিভূতি?

ফিসফিস করে বিভূতি বললে—না রে, আর কিছু পেলাম না। দেখলাম তো অনেক কিছু, দেখছিও অনেক কিছু। কিন্তু তোর জন্ম, মৃত্যু আর মৈথুন ছাড়া আর বিশেষ উল্লেখ করবার মতো কোনো কিছু পেলাম কই?

এবার স্পষ্ট ব্যঙ্গ করে মন্মথ বললে—তা ভালোই জেনেছিস! ভগবান যাকে যেমন জানান আর কি! তা জেনেছিস তো তিনটের মধ্যে দুটো জন্ম আর মৈথুন। তৃতীয়টাও কি জানা হয়েছে না জানতে বাকী আছে? যদি জানা হয়ে গিয়ে থাকে তবে আমার আর বলবার কিছু নেই। আর যদি জানা না হয়ে থাকে তবে সেইটা জানবার আর বুঝবার চেষ্টা কর। অনেক কিছু জানার সন্ধান ওরই মধ্য দিয়ে পাবি।

বিভূতি তার দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর বললে—এই অল্পদিনের মধ্যেই তো বেশ বিজ্ঞের মতো, মাতব্বরের মতো কথা বলতে শিখেছিস দেখছি।

মন্মথ ধারালো হাসি হেসে বললে—তোর কি ধারণা মাতব্বরের মতো কথা বলার অধিকার একা তোকেই ভগবান দিয়ে পাঠিয়েছেন? লম্বশাটপটাবৃত হয়ে তুইই চিরকাল বলে যাবি আর লোকে শুনবে?

বিভূতি হাল ছেড়ে দিলে, বললে—ক্ষ্যামা দে বাবা! তুই আবার দেবতার বাচ্চা, দেবভাষায় তোর সাংঘাতিক দখল!

মন্মথ হাসল, বললে—বেশ ক্ষ্যামা দিলাম। এবার তোর কথা বল। ঝগড়া করে কি লাভ? আছিস কেমন?

আবার হা হা করে হেসে উঠল বিভূতি। নিজের বুকে চাপড় মেরে বললে—বি. বি. সিনহা এস্কোয়ারকে খারাপ যে রাখে তার নাম কি রে? বি. বি. খারাপ

থাকে না। বি. বি. এখন দুই ছেলের বাপ, মস্ত সম্পত্তির মালিক। তার ওপর বড়লোক মাসীর সম্পত্তি পেয়েছি। আমাকে পায় কে রে? এই দেখ, তোদের দাড়িওয়ালা হেডমাস্টার ব্যাটা আমাকে হিন্দু ইস্কুল থেকে তাড়ালে। ভাবলে আমার লেখাপড়ার বারোটা বাজিয়ে দেবে। আরে বাবা, যে বি. বি. এস লাট-সায়েবের কাউন্সিলের মেম্বার হবার জন্যে জন্মেছে তাকে আটকায় কে? আটকাতে পারলে দাড়িওয়ালা?

মন্মথ তার কথার মাঝখানে থামিয়ে দিলে তাকে। বিরক্তির সঙ্গে বললে—থাক বিভূতি, নিন্দেবান্দা রাখ, বরং আত্মগৌরব কর, বল কি করে এণ্ট্রান্স পাস করলি!

খোঁচাটা গায়ে মাখল না বিভূতি। সগভীর আত্মশ্লাঘায় ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, বি. বি. এস হ্যাজ্ লঙ্ হ্যাণ্ডস্, টু লঙ্ হ্যাণ্ডস্! সে বলছি না। সে সিক্রেট ব্যাপার। তবে ভালো করে পাস যে করেছি সেটা 'জেনুয়িন' ব্যাপার। তাতে ফাঁকি নেই!

মন্মথ হাসল। হেসে চুপ করেই রইল।

বিভূতি বললে—কি, বিশ্বাস হলো না? আমি কি ধাপ্পা দিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে ভর্তি হয়েছি? তোকে সার্টিফিকেট দেখাব। আর মন্মথ, তুই হেডমাস্টারের নিন্দেবান্দা করতে বারণ করছিলি! আমিও দুটো লেটার নিয়ে পাস করেছি রে। আমাকে যদি হিন্দু স্কুল থেকে না তাড়াত তা হলে আমিও তোর আর সত্যের মতো প্রথম দশজনের মধ্যেই থাকতাম।

মন্মথ চুপ করে রইল। বিভূতির অভিযোগটাকে সে ঠিক উড়িয়ে দিতে পারলে না। তবু হেডমাস্টার মশাইয়ের কাজটা যে অন্যায় হয়েছিল সেটাও মেনে নিয়ে চুপ করে থাকতে তার মন চাইল না। একটু চুপ করে থেকে সে বললে—তুই যা বলছিস সেটার মধ্যে হয়তো সত্যি খানিকটা আছে। হিন্দু স্কুলে পড়লে হয়তো তুইও প্রথম দশজনের মধ্যে থাকতিস। তবে আরও একটা ব্যাপারও তো হতে পারত! কিছু মনে করিস না, আবার এমনও তো হতে পারত যে আমরা তিন-জনের মধ্যে একজনও কিছু করতে পারতাম না!

তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বিভূতি। তার পর বললে—তুই তো খাসা কথা বলতে শিখেছিস রে! খারাপ কথা কত সুন্দর করে কত অবলীলাক্রমে বলে ফেললি! যা বললি না অথচ বললি তার মানে তো হলো এই যে মন্মথ সত্য এক একটি ভালো আলু আর বিভূতি পচা আলু। পচা আলুর সঙ্গে ভালো আলু থাকলে ভালো আলুতেও পচ ধরে। এই তো।

মন্মথ হাসল। সস্নেহে বিভূতির পিঠের উপর হাত রেখে সে বললে—আজ কত-দিন পরে দেখা হলো, আর ঝগড়া করে কাজ নেই। ঝগড়া করবার জন্যে তো গোটা জীবনটাই থাকল। তুই এখানকার বড়লোকের বাড়ির ছেলে, আর আমিও কলকাতা থেকে পালাচ্ছি না। দরকার হলে পরে ঝগড়া করা যাবে। তারপর তোর খবর বল।

বিভূতি বিগলিত হয়ে গেল যেন। বললে—কি খবর চাস বল! তোর তো আবার যা তা খবরে হবে না। অথচ আমার কাছে তো খবর মাত্র একটাই। মেয়েমানুষ!

মন্মথ হেসে প্রসন্নভাবে বললে—ও ব্যাপারে আমার আর কিছু জানার নেই রে!

বিভূতি একান্ত কৌতূহলের সঙ্গে বললে—না কি, সব জেনে গিয়েছিস? কি করে জানলি? কে শেখালে, জানালে তোকে?

মন্মথ তার দিকে একটু তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—কেন তুই! সেই কত-দিন আগে একদিনেই তো সব জানিয়ে দিয়েছিলি ছবি দেখিয়ে! সেই একদিনেই তা আমি সব জেনে গিয়েছি! আর তো জানবার কিছু নেই!

বিভূতি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কেমন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে—এটা তোর পুরোপুরি ভুল কথা রে মনু! মেয়েমানুষ আমি অনেক অনেক দেখেছি, দেখছি। অনেক দেখেও কিছুই বুঝতে পারি নি! যত দেখছি তত মনে হচ্ছে মেয়েদের আমি বুঝি না, একেবারে কিছুই বুঝি না!

তার কথা শুনে অনেকখানি হাসল মন্মথ। অত্যন্ত হৃদ্য হালকা হাসি। হাসি থামিয়ে বললে—বেশ ভালো, তুই তোর অনন্ত অনুসন্ধান চালিয়ে যা।

বিভূতি একটা নিশ্বাস ফেললে। তার মধ্য দিয়ে যা প্রকাশিত হলো তা আর যাই হোক হালকা কিছু নয়। মন্মথ তবু হালকাভাবেই হেসে বললে—কি হলো, অমন করে নিশ্বাস ফেললি কেন? কোথায় আটকাল, কোথায় লাগল?

বিভূতি এবার একটু ম্লান হাসি হেসে বললে—তুই যেন কেমন করে প্রায় ঠিক কথাটাই বলে ফেলেছিস। আটকাচ্ছে আমার এক জায়গাতে! কোথায় জানিস? নিজের ভেতরে!

মন্মথ তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে কোনো কথা না বলে, শুধু তার কথা শুন-বার জন্যে।

বিভূতি তার চোখের উপর চোখ রেখে বললে—জানিস মনু, আমার পয়সা আছে, স্বাস্থ্য আছে, সবচেয়ে বড় কথা আমীরি মেজাজ আছে। আমি কোনো মেয়েকে চাইলে আমায় আটকায় কে? কিন্তু এতদিন যা করে এসেছি করেছি,

এখন আটকাচ্ছে আমার ভেতর থেকে।

মন্মথ এবার সহানুভূতির সঙ্গে মৃদুস্বরে বললে—কেন রে? তার মনের মধ্যে এরই মধ্যে বিভূতির জন্ম একধরনের মমতা মুখের উপর ভাসা মাখনের মতো আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। তার সঙ্গে কৌতূহল ও মুখ ঠেলে উঁকি মারতে আরম্ভ করেছে বিভূতি কি আশ্চর্য কথা বলে তা শুনবার জন্ম।

বিভূতি বললে—জানিস, আমার স্ত্রী যত সুন্দরী তত ঠাণ্ডা। আমার এই সব ফুর্তিটুর্তি দেখে আড়ালে কাঁদে, মুখে একটাও কথা বলে না। তা আমি ওসব কান্নাফান্নার ধার ধারি না। যা করি বেশ করি। এখন গণ্ডগোল লেগেছে অন্য জায়গায়। আমার এক ছেলে আর এক মেয়ে, মেয়েই বড়। মেয়েটার বছর দুয়েক বয়স হলো। ছেলেটা মাস কয়েকের। একদিন ওই রকম ফুর্তি করে বাড়ি আসতেই একটা গোলমাল হয়ে গেল। ঘরে ঢুকছি, দেখছি আমার দু' বছরের মেয়েটা ছুটে আসছে আমাকে দেখে আমার কোলে উঠতে। আমিও হাত বাড়িয়েছি ওকে নিতে। এমন সময় আমার স্ত্রী সে প্রায় ছোঁ মেরে মেয়েটাকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। আমার রাগ হলো খুব। ভাবলাম আচ্ছা করে গাল দিই, চাই কি, মন চাইলে দু'এক ঘা লাগিয়েও দেব। কিন্তু পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলাম, আমার স্ত্রী আমার মেয়েকে আস্তে আস্তে বলছে—ছি, তুমি বড় হয়েছ, এখন কি বাবা বাইরে থেকে এলে অমনিভাবে ছুটে গিয়ে কোলে উঠতে হয়! বাবার জামা-কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে না! আর তা ছাড়া তুমি না মেয়েছেলে? শেষ কথাটা শুনে বুকের ভেতর কেমন একটা ধাক্কা লাগল! আমার মেয়ে, আমার দু'বছরের মেয়ে, সে মেয়েছেলে? নিজেকে বড় অশুচি মনে হতে লাগল। জামা-কাপড় ছেড়ে, হাত মুখ ধুয়ে মেয়েকে কোলে নিলাম। অন্যদিন হাজারটা কথা বলি, গল্প করি, সেদিন কোনো কথাই বলতে পারলাম না। মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে শুয়ে রইলাম। জানিস, চোখ দিয়ে শালা, কেবল জল আসতে লাগল! তারপর ক'দিন আর বাড়ি থেকে বেরুলাম না। কিন্তু কি জানিস, যে গরু একবার ময়লা খেয়েছে সে ময়লা খাবেই, না খেয়ে থাকতে পারবে না। আমিও ক'দিন বাড়িতে ভালো ছেলের মতো থেকে আবার একদিন বেরুলাম। সেদিন বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢুকবার সময় খুব ভয় ভয় করতে লাগল, মনে হতে লাগল যদি ঘরে ঢুকবার সময় আমার দু'বছরের মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। নিজেকে অত্যন্ত নোংরা, ধরা-পড়া চোরের মতো মনে হতে লাগলো।

হঠাৎ বলতে বলতে থেমে গেল বিভূতি। একটু চুপ করে থেকে খানিকটা হাস-

বার চেষ্টা করে বললে—বুঝলি, সেই থেকে এক মহা ঝামেলায় পড়ে গিয়েছি। শালা, ভাবছি আমি কি শেষ পর্যন্ত রামপ্রসাদ হয়ে যাব। এতদিন অল্পবয়সী যত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছি সবারই মুখে নিজের বৌয়ের ছবি দেখেছি! এইবার মেয়ের মুখ মনে করে, সব মেয়ের মুখে যদি নিজের মেয়েকে দেখতে হয়, তা হলে তো শালা, আমার জিন্দগী কাবার।

বিভূতি আবার হাসবার চেষ্টা করে ব্যাপারটা হালকা করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু সে ভালো করে হাসতেও পারলে না, ভারী কথাটা হালকাও হলো না। কিন্তু তারই মধ্যে কখন বিভূতি এবং মন্মথ নিজেদের অজ্ঞাতে পরস্পরের হাত জড়িয়ে ধরেছে তা দুজনের কেউই খেয়াল করে নি। খেয়াল হলো ঘণ্টার শব্দ শুনে।

কলেজের ঘড়িতে এগারটার ঘণ্টা বাজছে। এখন ইংরিজীর ক্লাস। মন্মথর কাছে কেন, ক্লাসের প্রায় সব ছেলের কাছেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্লাস। পার্সিভ্যাল সাহেব পড়াতে আসবেন। এইচ. এম. পার্সিভ্যাল। দি গ্রেট পার্সিভ্যাল।

ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা শশব্যস্ত হয়ে নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়ল। যারা বাইরে ছিল তারাও এসে আসন নিলে। দু'এক মিনিটের মধ্যে সমস্ত ক্লাস ভরতি ও নিশ্চুপ হয়ে গেল। এই স্তব্ধ ও পাবপূর্ণ বৃহৎ ঘরের মধ্যে একটি আশ্চর্য ও মহৎ প্রত্যাশা একটি অদৃশ্য পুষ্পকোরকের মতো ফুটে উঠতে লাগল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই প্রত্যাশার বিগ্রহমূর্তিস্বরূপ দি গ্রেট পার্সিভ্যাল ক্লাসরুমের ভিতর ঢুকলেন তাড়াতাড়ি। হাতে বই আর হাজিরা খাতা। তিনি যেন ঘরে ঢুকলেন অনেক আনন্দ, অনেক পবিত্রতা ও অনেক গাম্ভীর্য নিয়ে। তিনি ঘরে ঢুকতেই নিঃশব্দে সমস্ত ক্লাসের ছাত্ররা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কোথাও একবিন্দু শব্দ নেই, কেবল ছেলেদের ওঠা বসার জন্য কাপড়ের খসখস শব্দ হলো কিছুটা। তারপর ছাত্ররা আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সব নীরব, সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। এই এতগুলি কিশোর ও যুবক, মূল জীবনের প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য কিছু আস্বাদ করার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

রোল কল হলো। পার্সিভ্যাল সাহেব মুখ খুললেন। ইংরেজী ভাষাতেই বক্তৃতা। বললেন—সেদিন বলে রেখেছিলাম আজ আমি তোমাদের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'দি ড্যাফোডিল্‌স্' পড়াব।

মন্মথর মুখে একটু স্মিত হাসি ফুটে উঠল। সে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা তৈরি করে নিয়ে এই মহৎ অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনতে এসেছে। কাজেই অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনে উপভোগ করতে তার বিশেষ অসুবিধা হবে না। এ ঘণ্টায় সে নোট নেবে না, তাঁর বক্তৃতা সে শুধু মন দিয়ে শুনবে, উপভোগ

করবে। অন্য ছেলেরা অবশ্য নোট নেবার জন্য খাতা খুলে বসেছে হাতে পেন্সিল নিয়ে, সে দেখতে পাচ্ছে তার একটু দূরেই সত্য রয়েছে। সত্যও অবশ্য খাতা খোলে নি। এসব বিষয়ে তার মোটামুটি জ্ঞানগম্যি আছে।

পার্সিভ্যাল সাহেব আগের দিন ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু কথা বলে রেখেছিলেন। তিনি একজন মহৎ কবি, প্রকৃতির কবি, নিজের কালে এক নূতন কাব্য-আন্দোলনের প্রবর্তক ও তার শ্রেষ্ঠ পুরুষ। সেদিন একটা আশ্চর্য কথা বলেছিলেন পার্সিভ্যাল সাহেব। অন্তত মন্মথর কাছে খুব আশ্চর্য লেগেছিল। বলেছিলেন, ইতিহাসের কত বিচিত্র কৌতুক আছে! ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়ে এক নবীন চিন্তা, রীতি ও রাজনীতির প্রবর্তন করেছিল। ইংল্যাণ্ডেও তেমনি ওই একই সময়ে, কয়েক বৎসরের মধ্যে, ১৭৯৮ সালে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও কোলরিজ নামে দুই কবির যুগ্ম কাব্যসৃষ্টি ধারণ করে নামহীন ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'লিরিক্যাল ব্যালাড্স্'। এই সামান্য ক্ষীণ কলেবর গ্রন্থের মধ্যে যুগান্তকারী চিন্তা ও কল্পনার বীজ নিহিত ছিল। একই সময়ে পাশাপাশি দুটি দেশে নবীন চিন্তা ও নবীন রীতি এসে উপস্থিত হয়েছিল। এ সেই নবীন, যে কালে কাল নব নব মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে প্রাচীন জরাজীর্ণকে আপনার কোমল-কঠিন হাত দিয়ে অবলীলাক্রমে অপসারিত করে এবং নূতনকে প্রতিষ্ঠা করে; ফ্রান্সে যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অনেক কোলাহল ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে, ইংল্যাণ্ডে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল অতি নিঃশব্দে, সকলের অগোচরে, অতি গোপনে। ফ্রান্সে রাজনীতির মাধ্যমে, ইংল্যাণ্ডে কাব্যরীতির মধ্য দিয়ে।

আজ তিনি বলতে আরম্ভ করলেন লেক ডিস্ট্রিক্ট-এর কথা। তিনি আসবার আগেই বেয়ারা এসে দেওয়ালে ইংল্যাণ্ডের একখানি বড় ম্যাপ টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তিনি সেই ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন পেন্সিল হাতে নিয়ে। ইংল্যাণ্ডের উত্তরাংশে স্কটল্যাণ্ড। স্কটল্যাণ্ডের নিম্নভাগে যেখানে ম্যাপে লাল রঙে রঞ্জিত মৃত্তিকার মধ্যে মাঝে মাঝে কোমল নীলের ছোঁয়া-লাগা অংশ তারই উপর পেন্সিল দিয়ে হ্রদগুলির অস্তিত্ব দেখিয়ে দিলেন অধ্যাপক।

তিনি বলে চললেন—এই হলো 'লেক ডিস্ট্রিক্ট' 'লেক অঞ্চল'। এইখানেই কবির বাসভূমি। অবশ্য ১৭৯৮ সালে যখন প্রথম কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও কোলরিজের যুগল সম্মিলনে 'লিরিক্যাল ব্যালাড্স্' প্রকাশিত হয় তখনই এই নামকরণ হয় নি। ১৮১৭ সালে, যখন এই আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠে একটি বিশেষ ও স্পষ্ট মূর্তি নিয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবল শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে

তখন প্রধানত এই কবিদের চিন্তা ও মতের পরিপোষক 'এডিনবরা রিভিউ' পত্রিকার মাধ্যমে এই কবিরা লেক অঞ্চলের কবি বলে খ্যাত হয়ে উঠলেন। এই কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান হলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরিজ। এবং প্রধানতম জন হলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ।

এর পর অধ্যাপক বর্ণনা দিলেন লেক অঞ্চলের। বললেন—উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই কলকাতা শহরে বসে তোমাদের পক্ষে লেক অঞ্চলকে কল্পনা করা অত্যন্ত কঠিন। শিল্প বিপ্লবের সন্তান এই কলকাতা মহানগরী। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে কালের কবি সে কালে তখনও শিল্প বিপ্লব আরম্ভ হয় নি। তোমরা যারা বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চল থেকে এসেছ, পশ্চিম কি পূর্ব, বাংলার যে অংশেই হোক না কেন, তোমরাও লেক অঞ্চল কল্পনা করতে পারবে না। পর্বত আর অরণ্য বড় বড় হ্রদগুলিকে প্রকৃতির বুকের ভালবাসার অমৃত-পাত্রের মতো সংগোপনে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে অনন্তকাল তাকিয়ে আছে। প্রায়-জনহীন অঞ্চল। যে ক'টি মানুষ আছে তারাও মুখ্যতঃ ওই নির্জন আরণ্য প্রকৃতির অংশ। আমাদের কবিও প্রধানত সেই দৃষ্টিতেই মানুষ ও মানবিক অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করেছেন। মানুষ-নিরপেক্ষ যে প্রকৃতি, সৃষ্টিতে মানব-সভ্যতার বহু পূর্ব থেকে অতি প্রাচীন হয়েও চির নবীন মূর্তি নিয়ে নিঃশব্দে হয়তো সৃষ্টিতে মানুষের আত্মপ্রকাশের জন্যই অপেক্ষা করছিল, সেই প্রকৃতির ও সেই সৌন্দর্যের কথাও বলেছেন। আমাদের কবির যদি কোনো উপাস্য দেবতা থাকে তবে তার অস্তিত্ব গির্জায় কি মন্দিরে নয়, তার অস্তিত্ব মানব অস্তিত্ব নিরপেক্ষ অতি প্রাচীন অথচ চির নবীন প্রকৃতির মধ্যে। তার পূজা প্রচলিত পূজা-নিবেদন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে নয়, তার পূজা প্রকৃতির নিঃশব্দ বৃহৎ ক্রোড়ে অবস্থান করে তার অনন্ত সৌন্দর্য, অপার জ্ঞান ও অতলান্ত শিক্ষাকে আস্বাদের মধ্য দিয়ে। আজ যে কবিতাটি পড়ছি এটির মধ্যেও সেই কথাই প্রকাশিত হবে।

সমস্ত ঘরখানি নিস্তব্ধ। কোথাও একবিন্দু শব্দ নেই। সুমহৎ, রসিক অধ্যাপক ধীরে ধীরে আপনার ছাত্রদের চিত্তকে এক মহৎ সৃষ্টির আশ্চর্য রস আস্বাদনের জন্য প্রস্তুত ও উন্মুখ করে তুলেছেন। অধ্যাপকের সামনে সারি সারি তরুণ উজ্জ্বল মুখ; তাদের অকর্ষিত উর্বর চিত্ত জ্ঞানের প্রথম কর্ষণে উদ্ভিদ ঐশ্বর্য দান করতে পারে তার প্রথম আস্বাদ, প্রথম বর্ষণের মতো অধ্যাপক তাদের কাছে আজ বহন করে এনেছেন। প্রকৃতি কাকে বলে তার নূতন ব্যাখ্যা শুনে ছাত্রদের চিত্ত উদ্বোধিত হয়েছে। বক্তৃতা শুনতে শুনতে মন্মথর বুকের ভিতরে একটা আশ্চর্য

আনন্দ একতাল কান্নার মতো পাকিয়ে উঠে তার গলার কাছে একবার ঠেলে উঠেছিল। সে কোনোমতে ঢোক গিলে নিজেকে সংযত ও শাসন করে স্ববশে রাখলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুই চোখ চিনচিন করে জ্বালা করে উঠল তার। তার চোখে জল এসেছে এটা সে বুঝতে পারলে। একটা পাকা ফল পরিপূর্ণ পক্কতার মুহূর্তে যেমন ফেটে গিয়ে রসক্ষরণ করে তেমনিভাবে তার রসপরিপূর্ণ চিত্ত তার চোখে জলের সরসতা না পাঠিয়ে পারে নি। তার চিত্ত যেন অকারণে অনেক স্ফীত, অনেক বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে! পৃথিবীতে কত ঐশ্বর্য, কত আনন্দ এই সংবাদের অভিজ্ঞতামাত্রেই নিজেকে অনেক বৃহৎ, অনেক বেশী ঐশ্বর্যবান মনে হচ্ছে তার। এই আনন্দমগ্নতার মধ্যেই সে শুনতে পেলে অধ্যাপক বলছেন—সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠা খোল!

অধ্যাপক কবিতাটি আবৃত্তি করছেন :

> I wander'd lonely as a cloud
> That floats on high o'er vales and hills,
> When all at once I saw a crowd,
> A host, of golden daffodils ;
> Beside the lake, beneath the trees,
> Fluttering and dancing in the breeze
> ... ...
> For oft, when on my couch I lie
> In vacant or in pensive mood,
> They flash upon that inward eye
> Which is the bliss of solitude ;
> And then my heart with pleasure fills,
> And dances with the daffodils,

ছাত্ররা উন্মুখ হয়ে সে আবৃত্তি শুনলে। পুরাকালে তপোবনের আশ্রমে প্রাচীন বনস্পতির ছায়ায় বোধহয় এমনিভাবেই আশ্রম-বালকদের সম্মুখে বেদমন্ত্র ধ্বনিত হতো। কাব্যমাধুর্যে, ভাবগৌরবে, আবৃত্তির গুণে এবং তার সঙ্গে উন্মুখ, শ্রদ্ধাশীল মনের সংযোগে কবিতাটি ঘরের মধ্যে সুধারসের মতো বর্ষিত হলো। ছাত্রদের সুবিধার জন্য অধ্যাপক আরও একবার ধীরে ধীরে কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। তারপর আরম্ভ করলেন ব্যাখ্যা। পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা। প্রথম স্তবকের

তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে তুটি শব্দ নিয়ে বিশেষভাবে পড়লেন তিনি। বললেন—লক্ষ্য করে দেখ, প্রথম দর্শনেই কবি বলেছেন ফুলগুলি দেখে crowd, জনতা। যার অর্থ শৃঙ্খলাহীন ভিড়, ফুলের ভিড়। পরমুহূর্তেই তাঁর দৃষ্টি তাঁকে চিনিয়ে দিলে—না, না, শৃঙ্খলাহীন তো নয়, এদের মধ্যে অর্থাৎ এদের সজ্জার মধ্যে দিব্যি শৃঙ্খলা রয়েছে। তাই পরমুহূর্তে নিজের দৃষ্টি ও চিন্তাকে সংশোধন করে নিয়ে বললেন host, এর পর প্রতিটি চরণ ধরে ধরে, প্রতিটি বিশেষ শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ করে তিনি কবিতাটি বুঝিয়ে শেষ বক্তব্যে এসে পৌছুলেন। বললেন—এখানে মানুষ নেই। আছে আকাশ, মেঘ, অরণ্যশোভা, হ্রদের নীল, জলরাশি, আর তার কোলে সমস্ত সৌন্দর্যলোকের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে সূর্যা-লোকে আলোকিত, সজ্জিত ড্যাফোডিল ফুলের রাশি, হলদে পোখরাজের মতো তারা উজ্জ্বল। শুধু উজ্জ্বল নয়, প্রাণবান, প্রাণের আনন্দে বাতাসের ঢেউয়ে মাথা দুলিয়ে হাসছে, খেলা করছে। এই সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করলেন এই কবি, যিনি পাহাড়ের গায়ে আলগ্ন উদাসীন মেঘের মতো, ওই আকাশের মেঘের মতো নির্মল উদাসীন চিত্ত নিয়ে সেখানে পরিভ্রমণ করেছিলেন। এই সৌন্দর্য দেখে তিনি ফিরে এলেন।

এই সময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। ঘণ্টার শব্দ উঠতেই অধ্যাপক থেমে গেলেন। তিনি পাথরের মূর্তির মতো নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মন্মথ একবার মর্মরমূর্তির মতো স্তব্ধ অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকাল। তখনও ঘণ্টা ঢং ঢং করে বেজে চলেছে। বোধহয় বারোটা বাজছে। আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসের খররৌদ্র আকাশের নিচে কোন্ অলক্ষ্য স্থল থেকে ঘণ্টার শব্দগুলি পৃথক পৃথক হয়ে যেন স্বর্ণগোলকের মতো আকাশ থেকে খসে পড়েছে পৃথিবীর উপর। আরও একটা চেনা জানা উপমা মনে এলো তার। শব্দগুলি ফোঁটা ফোঁটা মধুর মতো টপটপ করে কোন্ এক পরি-পূর্ণ আনন্দের অদৃশ্য মৌচাক থেকে উপচে উপচে পড়ছে যেন।

ঘণ্টার শব্দ শেষ হলো। অধ্যাপক যেখানে আপনার বক্তব্যে থেমেছিলেন ঠিক সেইখানেই আবার ধরলেন। বলে চললেন—ফিরে এলেন মনে অপার আনন্দ আর এই সৌন্দর্যের স্মৃতি নিয়ে। তারপর কতদিন কত উদাসীন অবসরে, বিষণ্ণ মুহূর্তে এই সৌন্দর্যের স্মৃতি অকস্মাৎ মনে ভেসে উঠেছে আর তিনি সেই আনন্দকে ফিরে পেয়েছেন।

তিনি এবার তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, বললেন—এই কবিতার সৌন্দর্যের আস্বাদ ও ফলশ্রুতি দুই আছে। সৌন্দর্য দর্শন আছে এবং সেই সঙ্গে তার স্থায়ী ফল

আছে। তোমাদের দেশের সংস্কৃতিতে আনন্দের কথা বার বার উল্লেখ করা হয়। আনন্দকে সমস্ত পার্থিব অভিজ্ঞতা ও সঞ্চয়ের মধ্যে সর্বোত্তম বলা হয়। এই কবিতায় যে আনন্দের উল্লেখ রয়েছে এও সেই আনন্দের সহোদর ও সমজাতীয় আনন্দ। আমি কামনা করি, এ আনন্দ যেন তোমরাও এই কবির মতো তোমাদের জীবনে আস্বাদ করতে পার।

পার্সিভ্যাল সাহেব বই বন্ধ করে, বই খাতা হাতে নিয়ে ছাত্রদের দিকে শেষবার স্মিতমুখে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দীর্ঘস্থায়ী এক আনন্দময় রসের ধ্যান সেদিনের মতো সেইখানে সমাপ্ত হলো।

বিকেলে সত্যর সঙ্গে মন্মথ সত্যদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলো। সঙ্গে Uncle Tom's Cabin খানি সে নিতে ভোলে নি। সত্যও ভুলতে দেয় নি। ক্লাস শেষ হতেই সত্য মন্মথকে সঙ্গে নিয়ে হোস্টেলে গিয়ে তাকে বইখানি সঙ্গে নেবার কথা একাধিকবার মনে করিয়ে দিয়েছিল। উত্তরে মন্মথর সত্যকে অনেক কথা বলতে ইচ্ছা হয়েছিল, ঠোঁটের ডগায় কথা এসেও গিয়েছিল; কিন্তু সে বলে নি কিছুই। শুধু একটু সামান্য হাসি হেসে বলেছিল—আমি ভুলে যাব এটা তুই মনে করছিস কেন? তার হাসির মধ্যে যে লজ্জাটুকু প্রচ্ছন্ন ছিল তাকেও সে সত্যর কাছে প্রকাশ করতে চায় নি।

সত্য সে সব লক্ষ্য করে নি, অথবা লক্ষ্য করলেও সেদিকে যায় নি। সে হইচই করে বলেছিল—আমি মনে করছি কেন? আমি যদি বই নিয়ে যেতে 'মিস' করি তা হলে দু'তরফা শাস্তি আমার ভাগ্যে নৃত্য করবে, ওই তোর ড্যাফোডিল ফুলের মতো। একদিকে বাবার ভারী মুখ অন্যদিকে শ্রীমতী মালতীর অভিমানক্ষুব্ধ মুখ। একজন ভারী ভারী কথা আরও ভারী করে বলবেন, অন্যজন সাত দিন কথা বলবেন না, চোখে চোখ পড়লেই তাঁর নয়ন ছলছল করবে।

বলে সে মন্মথর হাত ধরে টান দিয়ে তাকে নিয়ে চলতে চলতে বললে—অতএব হে মন্মথনাথ নামক বালক, আর বিলম্ব ক'রে না দ্রুত পদসঞ্চারে চল আমাদের গরীবখানার দিকে।

মন্মথ হাসল। একান্ত পরিতৃপ্তির হাসি। সত্যটা এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে! সংস্কৃত, বাংলা, প্রাচীন রীতি, উর্দু, হিন্দী সব মিশিয়ে এত বিচিত্র রস-পরিপূর্ণ তার ভাষা, তার মন এত দ্রুত জিনিস ছুঁয়ে যায় যে মন্মথ তাকে শুধু তারিফই করতে পারে, তাকে আয়ত্ত করা তার সাধ্যাতীত! সে কথা বলতে গেলে তা কেমন সংস্কৃত সংস্কৃত গন্ধ ছাড়ে, একপেশে হয়ে দাঁড়ায়, বড্ড ভারী গম্ভীর লাগে। এই হালকা হালকা সহজ রসিকতার সুরটা সে দিতে পারে না

কিছুতেই। সে একান্ত পরিতৃপ্ত হয়ে সত্যর পিঠে পরম প্রীতির সঙ্গে হাত দিয়ে বললে—চল, আর মেলা বাজে বকতে হবে না।

সত্যদের বাড়ির গেটে ঢুকতেই সত্য তার পিঠে একটা হাত রেখে অন্য হাতের তর্জনী তুলে সামনে দেখিয়ে বললে—দেখেছিস ?

মন্মথ তার উদ্যত তর্জনী অনুসরণ করেও কিছু দেখতে পায় নি। সে প্রশ্ন করলে—কি ?

—তুই চোখ থাকতেও চক্ষুহীন। ছাদের কার্নিসে ঝুঁকে শ্রীমতী মালতী দাঁড়িয়ে আছেন আমার প্রত্যাশায় ?

মন্মথ বিস্মিত হয়ে গেল। অকুণ্ঠ বিস্ময় ফুটে উঠল তার প্রশ্নে ও কণ্ঠস্বরে—কেন রে ?

সত্য সস্নেহে বললে—আমাদের মলিকে তুই জানিস না। ওর মধ্যে একটা পাগল আছে, সত্যিকারের একজন আর্টিস্ট আছে। ও গয়না চায় না, কাপড় চায় না, ভালো খেতে চায় না। ও চায় ভালো বই পড়তে। আর সব চেয়ে বেশী করে চায় গানের মধ্যে ডুবে থাকতে। আমি ওকে বলে গিয়েছিলাম—লাইব্রেরী থেকে Uncle Tom's Cabin নিয়ে আসব। ও তারই উৎকণ্ঠায় ছাদের কার্নিস ধরে দাঁড়িয়ে আছে কখন আমি বই নিয়ে আসব! ও এক অদ্ভুত প্রাণী!

মন্মথ সত্যই অবাক হলো। এমন ধরনের মানুষের কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। এই সত্যকারের মালতী! আশ্চর্য তো! সে এবার ছাদের কার্নিসের মাথার উপর দিয়ে দৃষ্টি ক্ষেপণ করে মালতীকে খুঁজলে। কিন্তু দেখতে পেলে না। বললে—কই, ছাদে নেই তো ?

সত্য হেসে বললে—তুই সঙ্গে আছিস, তাতে যে ওর ছেলেমানুষি ধরা পড়ে গেল! আর থাকে চোখের সামনে।

দোতলার বসার ঘরে বসে জল খাবার পর তবে দেখা মিলল মালতীর। ওরা যে এসেছে এটা সম্পর্কে সে যেন অবহিতই নয়, সে সংবাদ যেন সে জানেই না এমন-ভাবে সে ঘরে ঢুকল। একবার এক মুহূর্তের জন্য মন্মথর মুখের উপর আপনার বড় বড় চোখের গম্ভীর দৃষ্টি ফেলে আবার সরিয়ে নিলে।

সত্য বললে—বই চাই না ?

সমান্য একটু হাসল মালতী। মালতীর হাসি দুর্লভ ব্যাপার। হেসে বললে—কি বই ?

—ওঃ, কি বই ? ঠিক আছে, নিয়ে তোর কাজ নেই।

তারপর মন্মথর দিকে তাকিয়ে বললে—ঠিক আছে ভাই তোর বই তুই নিয়ে

যা। ওর তো লাগবে না।

এবার প্রস্ফুটভাবে একটু হেসে মালতী মন্মথর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে। মুখে কোনো কথা বললে না।

মালতী তার কাছে কিছু নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছে এটা তার কাছে একটা অভাবিত সৌভাগ্যের মতো মনে হলো। সে কেমন হয়ে গেল যেন। মালতীর কাছ থেকে খানিকটা দূরেই সে দাঁড়িয়ে ছিল। সে মালতীর কাছে এলো না। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেইখান থেকেই ঝুঁকে নত হয়ে সে বইখানি পরম আগ্রহে মালতীর হাতে তুলে দিলে। তার এই সশ্রদ্ধ আগ্রহ মালতী সত্য দুজনেই স্পষ্ট অনুভব করতে পারলে। সে নিজেও অনুভব থেকে বাদ গেল না।

সত্য একটু ঠাট্টা করলে, বললে—আরে বাস্ রে, তোর বইখানা দেওয়া দেখে মনে হলো যেন শাস্ত্রীমশাই পরমব্রহ্মকে পূজা নিবেদন করছেন।

মন্মথ বিব্রত হয়ে পড়ল। মালতী সত্যর কথা অবশ্যই শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু সে সেটা না শোনার ভান করে বইয়ের প্রথম পাতাটি উল্টে দেখতে লাগল। উল্টে একবার দেখে নিয়ে সমস্ত বইটির পাতাগুলি একবার আঙুল দিয়ে উল্টে দেখে নিলে। তারপর বইখানি বন্ধ করে আঁচলের আড়ালে গোপন করলে।

সঙ্গে সঙ্গে সত্য হাত বাড়ালে—দেখি রে মলি, বইখানা দেখি একবার। মালতী আশ্চর্য। বইখানা তাকে দেখতে না দেবার জন্যই সে লঘু দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মালতীর চলে যাওয়া দেখে হাসতে লাগল সত্য। বললে—মলি আমাদের অদ্ভুত। তারপর মন্মথকে জিজ্ঞাসা করলে—বইখানা তুই কোথায় পেলি রে? কিনেছিস? মন্মথ বললে—না রে ভাই, কিনব কেন? ও বইয়ের নামই তো জানতাম না। তোদের মুখে তোদের বাড়িতেই আমি এক আধবার শুনেছি। আর আমি কিনবার টাকাই না পাব কোথায়? ভর্তি হবার আগে হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে যেদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম সেদিন উনি আমায় দিয়েছিলেন।

সত্য বললে—হেডমাস্টার মশাইয়ের এটা অভ্যেস আছে। আমাকেও দু'একখানা বই দিয়েছেন। এই কিছুদিন আগে আমাদের বাড়ি এসে আমাকে দুখানা বই দিয়ে গেলেন। কোনান ডয়েলের 'মেময়ার্স অব শার্লক হোম্‌স্' আর অস্কার ওয়াইল্ড-এর 'হ্যাপি প্রিন্স অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ'।

প্রেসিডেন্সির সেরা ছাত্র মন্মথ। কিন্তু সে এসব নাম এখনও শোনে নি। সে মনে কেমন একধরনের পরাজয় অনুভব করে চুপ করে রইল। কিন্তু বই দুখানার উল্লেখেই সত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললে—Uncle Tom's Cabin ভালো

গ্রেট বই। কিন্তু এ বই দুখানা পড়তে অনেক বেশী ভালো।

মন্মথর মন সত্যর পিছন পিছন যেতে নারাজ হয়েও ভালো বই পড়ার লোভে বললে—আমাকে বই দুখানা দিবি?

বিদেশী সাহিত্যের রস মন্মথ সত্ত বুঝতে আরম্ভ করেছে।

সত্য বললে—তুই কোনান ডয়েলের 'মেময়ার্স অব শার্লক হোম্‌স্'-খানা নিয়ে যা! অস্কার ওয়াইল্ড তোকে পরে দেব। অস্কার ওয়াইল্ড আস্তে আস্তে পড়তে হবে। আর শার্লক হোম্‌স্ পাবামাত্র গিলে খেয়ে ফেলবি। ইংরিজীও খুব সোজা।

মন্মথ জিজ্ঞাসা করলে—শার্লক হোম্‌স্-এ কি আছে রে?

সত্য মুচকে হেসে বললে—ডিটেকটিভ গল্প!

হতাশ হলো মন্মথ। মুখে বললেও সে কথা—ডিটেকটিভ গল্প?

সত্য সগর্বে বললে—ডিটেকটিভ গল্প বলে নাক কুঁচকোতে হবে না। পড়ে দেখ। পড়ে বলবি এমন জিনিস কখনও চেখেছিস কিনা! মলিও পড়েছে বইখানা। ওকে ডেকে জিজ্ঞেস কর।

ঠিক এই সময় বেয়ারা এক প্লেট জলখাবার ও জলের গ্লাস নিয়ে নিচে নামছিল। সত্যর নজর পড়তেই জিজ্ঞাসা করলে—কে এসেছেন গো নিচে?

মন্মথ লক্ষ্য করলে এরা চাকর-বাকরদের সঙ্গে কি সুন্দর ও মিষ্টি করে কথা বলে।

বেয়ারাটি হেসে জবাব দিলে—আপনার ইস্কুলের হেডমাস্টারবাবু এসেছেন।

সত্য ও মন্মথ পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল কথাটা শুনে। সত্য বললে—চল মন্নু, হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগে একবার ঘরের চারদিকে দরজার ওপ্রান্তে চেয়ে দেখল মন্মথ। কাউকে খুঁজল। নাঃ, তার কোনো সাড়া নেই। সে মুখ ফিরিয়ে সত্যকে জিজ্ঞাসা করলে—হেডমাস্টার মশাই কেন এসেছেন রে?

সত্য বললে—এখন হেডমাস্টার মশাই তো মাঝে মাঝে আসেন আমাদের এখানে। আগেও অবশ্য আসতেন। উনি বাবার বন্ধু তো! এখন তো বাবা আবার হিন্দু স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার হয়েছেন। তাই বেশী আসেন আর কি!

মন্মথ সত্যর দিকে কেমন এক রকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। সে দৃষ্টিতে বিস্ময়ের সঙ্গে খানিকটা ভয়ও মেশানো ছিল যেন। বাবাঃ, হিন্দু স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার! সোজা ব্যাপার! অথচ সত্য কত সহজে বললে কথাটা! যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়! সে ভুলেই গেল যে সে মন্মথনাথ ভট্টাচার্য, সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে, সে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরম সমাদরে গৃহীত হয়েছে, সবাই তার দিকে কত সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার ভিতরে যে পাড়া-

গাঁয়ের ভীরু, কুনো ছেলেটি আছে, যার অস্তিত্ব এখনও যায় নি, সে তার ইদানীং কালে আহরণ-করা কৃতিত্ব, সমাদর ও মান-খাতিরের জরির কাজ-করা পোশাক খসিয়ে আদুড় গায়ে ভীরু চোখে আবার যেন সংসারটিকে দেখছে। সেই ভীরুই আবার মুখ খুললে, বললে—হ্যারে সত্য, সেই আনন্দমোহনবাবু আর এসেছিলেন এর মধ্যে ?

—না, বাবা নিজেই গিয়েছিলেন শুনেছি।

মন্মথ অকারণে খানিকটা স্বস্তি পেলে যেন। সে চুপ করে রইল। এতক্ষণে তার মুখ থেকে এবং মন থেকে সেই সময় বিস্ময়টা কেটে গেল। সত্য বললে— বাবা সিটি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার হয়েছেন। এবার ইউনিভার্সিটি সিনেটেরও মেম্বার হবেন।

আবার সেই ভয়টা হয়তো তাকে আচ্ছন্ন করত, কিন্তু এই সময় তার ও সত্যর নাম ধরে ডাক এলো ঘরের ভিতর থেকে। ডাকছেন সত্যর বাবা জ্যোতিপ্রসাদবাবু—সত্য এখানে এস, কে এসেছেন দেখে যাও। আরে, মন্মথ, তুমিও এসেছ দেখছি। ভালোই হয়েছে, এস, ভালো খবর আছে।

নিচের বসবার ঘরে ঢুকল দুজনে। হেডমাস্টার মশাইয়ের সামনে জলখাবারের প্লেট রয়েছে। এখনও খান নি তিনি। ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি একমুখ হাসলেন, একবার দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিলেন। মন্মথ সত্য দুজনেই জানে হেডমাস্টার মশাই বিশেষ উত্তেজিত, তা রাগেই হোক কি অনুরাগেই হোক, না হলে দাড়িতে হাত বুলোন না। তিনি সত্য ও মন্মথ দুজনকে একসঙ্গে এই বাঙ্ক্ত বন্ধুর বাড়িতে পেয়ে খুব খুশী হয়েছেন। ওরা প্রণাম করলে মাথায় হাত দিয়ে ওদের তিনি আশীর্বাদ করলেন।

প্রথমেই সত্যকে প্রশ্ন করলেন—সত্যপ্রসাদ, তোমাকে শেষ যে দুখানা বই দিয়েছি, সে দুখানা পড়েছ ?

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সত্যর শ্যামবর্ণ মুখখানি, তার সুগঠিত দাঁতের সারি প্রকাশিত হলো, সে সসম্ভ্রমে ঘাড় নেড়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার !

—কোন্‌টা বেশী ভালো লাগল ?

সত্য সবিনয়ে বললে—স্যার, দুটো দু'রকমের বই। তুলনা করে বলা কঠিন। তবে অস্কার ওয়াইল্‌ডের গল্প ক'টি বেশী ভালো লাগল।

হেডমাস্টার মশাই মাথা ঝাঁকি দিয়ে সমর্থন জানিয়ে সজোরে বললেন—গুড, ভেরী গুড !

সত্য ও মন্মথ দুজনেরই মনে পড়ল হেডমাস্টার মশাই ঠিক এমনিভাবেই ছাত্রদের

কারও উত্তর শুনে খুশী হলে এই শব্দগুলিই এমনি জোরের সঙ্গে তিনি উচ্চারণ করতেন।

হেডমাস্টার মশাই বললেন—দেখ সত্যপ্রসাদ, এগুলির নাম গল্প, ছোটগল্প। এগুলি সাধারণ শ্রেণীর গল্প নয়। কোনান ডয়েলের গল্পগুলি ডিটেকটিভ শ্রেণীর আর ওয়াইল্ডের গল্পগুলি রূপক শ্রেণীর। তাছাড়া কত সুন্দর সুন্দর ছোটগল্প আছে পাশ্চাত্য দেশে। অথচ আমাদের ভাষাতে কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্রের দু'একটি আছে, সেগুলি রচনা হিসেবে ভালো হলেও তাদের খাঁটি ছোটগল্প বলা চলে না। আর রবীন্দ্রবাবু ইদানীং দু'একটি গল্প লিখেছেন। তবে দু'একটিই, বেশী নয়।

সত্যর সঙ্গে আলাপ শেষ করে তিনি পড়লেন মন্মথকে নিয়ে—কি শ্রীমান মন্মথ, তুমি পড়েছ Uncle Tom's Cabin?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার!

—কার কার চরিত্র তোমার সব চেয়ে ভালো লাগল?

মন্মথ হাসল একটু। হেসে সসম্ভ্রমে বললে—আঙ্কল টম, এলিজা, জর্জ হ্যারিস, জর্জ সেলবি—

হেডমাস্টার মশাই মাঝখান থেকে বললেন—কেন, সাম্বো আর কুইম্বোকে ভালো লাগল না?

মন্মথ ঘাড় নাড়ল, জানালে লেগেছে, ভালো লেগেছে।

হেডমাস্টার মশাই অকস্মাৎ তাকে এক কঠিন প্রশ্নের জালে বেঁধে ফেললেন, বললেন—কেন, সাম্বো কুইম্বোকে ভালো লাগল কেন? ওরা তো ভালো মানুষ নয়? তাহলে ওদের কেন ভালো লাগল?

মন্মথ বললে—লেখিকা ওদের যেমন করে আঁকতে চেয়েছেন তেমনি করেই আঁকতে পেরেছেন। সেই জন্যেই আমার ভালো লেগেছে। প্রত্যক্ষ জীবনে সাম্বো আর কুইম্বোর সঙ্গে পাশাপাশি বাস করা যায় না, বসা যায় না; কিন্তু সাহিত্যে ওদের ঠিক মতো আঁকা হয়েছে বলে ওদের সঙ্গ খারাপ তো লাগেই না, বরং ভালো লাগে।

হেডমাস্টার মশাই আবার প্রশ্ন করলেন—তুমি কি করে জানলে লেখিকা ওদের সত্য চেহারা এঁকেছেন? তুমি তো আমেরিকা যাও নি, সে সময়ের আমেরিকার খবরও তুমি জান না। তুমি তাদের কাউকে দেখও নি! তবে?

মন্মথ একটু ইতস্তত করে বললে—তা দেখি নি। তবে বই পড়ে মনে হয় মানুষগুলো ঠিক এমনিই। সঠিক আঁকা হয়েছে। এটা বোধহয় সত্যের মহিমা! কোনো সত্য, কিংবা কোনো কিছু সত্যভাবে প্রকাশিত হলে তাকে সত্য বলে চিনতে

বোধহয় এক মুহূর্ত দেরি হয় না।

দাড়ি-গোঁফের ভিতর দিয়ে হেডমাস্টার মশাইয়ের মুখখানি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। জ্যোতিপ্রসাদবাবু তারিফ করে বলে উঠলেন—বাঃ, বাঃ চমৎকার! খুব সঠিক বলেছ, খুব ভালো বলেছ!

হেডমাস্টার মশাই এবার ঘন ঘন বার দুয়েক দাড়িতে গোঁফে হাত বুলিয়ে নিলেন! সেই সঙ্গে বার কয়েক ঘাড় দুলে উঠল। তিনি জ্যোতিপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—He is shaping well, মন্মথ গড়নটা ভালোই নিচ্ছে কি বলেন?

জ্যোতিপ্রসাদ একটু হাসলেন, তারপর সস্নেহে একখানি হাত রাখলেন মন্মথর পিঠের উপর।

হেডমাস্টার মশাই অকস্মাৎ যেন একান্ত প্রয়োজনীয় কোনো কথা মনে পড়ে গিয়েছে এইভাবে সত্য ও মন্মথর দিকে তাকিয়ে বললেন—ভালো কথা, হ্যাঁ হে, কলেজে ঢুকে কার কার সঙ্গে তোমাদের আলাপ হলো?

কথাটা সত্য বা মন্মথ কেউই সঠিক বুঝতে পারলে না, তারা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্নের অর্থটা বোঝার চেষ্টা করে আবার হেডমাস্টার মশাইয়ের মুখের দিকে চাইলে। সত্য বললে—বিভূতির সঙ্গে ক্লাসে আবার দেখা হলো স্যার।

শুনেই হেডমাস্টার মশাইয়ের মুখের সব প্রসন্নতা একবার এক মুহূর্তের জন্য তিরোহিত হয়ে তাঁর মুখখানি কঠিন হয়ে উঠল। একবার জোরে গলা ঝেড়ে নিলেন তিনি। মন্মথর মুখখানা এক মুহূর্তে অকারণেই বিবর্ণ হয়ে গেল, বুকের ভিতরটা ভয়ে গুরগুর করে উঠল। সেও অকারণেই। আশ্চর্যের কথা হেডমাস্টার মশাই ওর মুখের দিকে এ সময় তাকালেনও না। পর মুহূর্তেই আবার তিনি সহজ হয়ে এলেন, মুখখানি কোমল হয়ে এলো। তিনি আগের কথার জের টেনে বললেন—আমি সে কথা বলছিলাম না। ছাত্রদের কার কার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে তা আমি প্রশ্ন করি নি। ছাত্র বা সতীর্থ ছাড়া আর কার কার সঙ্গে আলাপ হলো তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

সত্য মন্মথ দুজনে আবার দুজনের মুখের দিকে চাইতে লাগল। কার সঙ্গে পরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা করছেন মাস্টার মশাই? অধ্যাপকদের? মন্মথ বললে—কোনো প্রফেসারেরর সঙ্গে তো তেমন আলাপ হয় নি স্যার। আপনি প্রিন্সিপ্যাল পেডলার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আমার কথা বলে দিয়ে আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন, সেইমতো তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। একদিন পার্সিভ্যাল সাহেব ডেকেছিলেন আমাকে, সত্যকে আর একজনকে। বিপিনবাবু, প্রফুল্লবাবু আর

জগদীশবাবুর সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছে।

হেডমাস্টার মশাই এবার অসহিষ্ণু হয়ে ঘাড় নেড়ে বললেন—তোমাদের মাথায় কিছু নেই। আমি এ আলাপের কথাই বলছি না! পার্সিভ্যাল সাহেব কি পেডলার সাহেব কি বিপিনবাবু, প্রফুল্লবাবু বা জগদীশবাবু এঁদের চেয়ে অনেক প্রবীণ, প্রাচীন, মান্য মানুষ রয়েছেন তোমাদের কলেজে! তাঁদের কার কার সঙ্গে আলাপ হলো তোমাদের?

মন্মথ বোকার মতো তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তাঁর কথা বুঝতে না পেরে। সত্য মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি স্যার কাদের কথা জিজ্ঞাসা করছেন?

মাস্টার মশাই আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—কেন, সেক্স্‌পীয়র, মিলটন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিসটট্‌ল, প্লিনি, ফ্যারাডে, গ্যালভনি, ভোল্‌টা—? কত নাম করব? এঁদের সঙ্গে তোমাদের এখনও পরিচয় হয় নি?

কথাটার মধ্যে প্রকাশ্যে একটা কৌতুক আছে এটা ঠিক, কিন্তু মাস্টার মশাইয়ের বলার গুণে কৌতুককর কথাটাই এমন গভীর অর্থবহ হয়ে তাদের দুজনেরই কাছে ধরা পড়ল যে তারা এক ধরনের আশ্চর্য গৌরব আস্বাদ করলে। সত্যিই তো, ওই সব মানুষরাই তো এখন তাদের নিত্য সহচর, বন্ধু ও পথপ্রদর্শক। বিভূতি তাঁদের কাছে কে, কতটুকু? এঁদের তুলনায় তার শক্তি ও প্রভাব কতখানি? বিভূতি তার স্থূল লৌকিক প্রগল্‌ভতা দিয়ে ওঁদের অতলান্ত, সীমাহীন, নিঃশব্দ ক্রিয়া ও শক্তিকে কতটুকু খর্ব করবার ক্ষমতা রাখে? ওরা দুজনেই নীরবে উজ্জ্বল মুখে মাস্টার মশাইয়ের উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জ্যোতিপ্রসাদ অকস্মাৎ মৃদু স্বরে বললেন—মাস্টারমশাই! তিনি এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন। শুনছিলেন ওদের কথাবার্তা।

তাঁর কথা শুনে মাস্টার মশাই প্রশ্ন করলেন—আমাকে কিছু বলছেন?

জ্যোতিপ্রসাদ হেসে বললেন—বলছি! বলছি—খাবারটা অনেকক্ষণ থেকে পড়ে রয়েছে, খেয়ে ফেলুন।

মাস্টার মশাইয়ের মধ্য থেকে এতক্ষণে সহজ লৌকিক মানুষটি বেরিয়ে এলো। তিনি ইতস্তত করে বললেন—খাব? এখন খাব?

জ্যোতিপ্রসাদ একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—কি হলো? খেতে দ্বিধা কেন? একটু সংকুচিত হাসি হেসে হেডমাস্টার মশাই বললেন—সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এখন ইষ্ট স্মরণের সময় হলো। ইষ্ট স্মরণ না করে খাব তিনি আবার একটু হাসলেন সংকুচিতভাবে। মন্মথ আশ্চর্য হলো মাস্টার মশাইয়ের এই হাসি দেখে।

এমন বিনম্র, এত শান্ত হাসি যে এই রাশভারী, প্রবল বেগবান মানুষটি হাসতে পারেন এ তার কল্পনায় ছিল না। এ যেন আর এক মানুষ।

জ্যোতিপ্রসাদ আর অনুরোধ করলেন না। আহতও হলেন না। প্রসন্নভাবেই বললেন—তা হলে আপনার খেয়ে কাজ নেই। থাক তা হলে।

মাস্টার মশাই আবার একটু হাসলেন। সেই সংকুচিত হাসি। বললেন—আজ থাক, আবার একদিন খেয়ে যাব।

মন্মথ সচকিত হলো মনে মনে। তাই তো সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এবার ফিরতে হবে তাকে। আর দেরি করা যাবে না হোস্টেলে ফিরতে।

জ্যোতিপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন—কতদিন দীক্ষা নিয়েছেন? কোথায় দীক্ষা নিয়েছেন?

মাস্টার মশাই একটু ইতস্তত করে মৃদু নম্রভাবে বললেন—তা আজ বছর দশেক হবে। দক্ষিণেশ্বরে।

জ্যোতিপ্রসাদ একটু হেসে বললেন—বুঝেছি। মহা ভাগ্যবান মানুষ আপনি

মাস্টার মশাই শুধু দুই হাত জোড় করলেন একবার। তাঁর মাথাটিও যেন আপনা-আপনি নমিত হয়ে এলো। মনে হলো এই মুহূর্তে তিনি যেন একবার আপনার গুরু ও ইষ্টকে প্রণাম নিবেদন করে নিলেন।

পরমুহূর্তেই সত্য আর মন্মথর দিকে ফিরে বললেন—ওহে, তোমাদের একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। সেপ্টেম্বর মাসে স্কুলের প্রাইজ ডিস্‌ট্রিবিউশন হবে। তোমরা দুজনেই তো রিসিপিয়েণ্ট,-প্রাইজ পাবে!

মন্মথ এবার তিনজনকে একসঙ্গে সম্বোধন করে বললে—আমি এখন যাই। হোস্টেলে ফিরতে হবে।

হেডমাস্টার মশাই বললেন—হ্যাঁ, আর দেরি ক'র না। চলে যাও।

মন্মথ দুজনকেই প্রণাম করে বেরিয়ে এলো। সত্যও এলো তার সঙ্গে।

ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে বাগানের রাস্তায় দাঁড়িয়েই সে একবার পিছন ফিরে বাড়িটার দিকে চাইল। একবার এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি চলে গেল বাড়ির ছাদের দিকে। নাঃ, সেখানে কেউ নেই। আগস্টমাসের সূর্যাস্তের শেষ আলোও মিলিয়ে গিয়েছে। সেদিন সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল তারই খানিকটা উপরে মসৃণ আকাশে সন্ধ্যাতারা দপদপ করছে। সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সত্যকে বললে—আজ যাই রে সত্য।

—যাবি? কোনান ডয়েলের বইটা নিয়ে যাবি না?

কে জানে কেন, তার আর দাঁড়াতে ইচ্ছা করছিল না। ওই ম্লান আকাশের

মতোই তার মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছে। এক ধরনের অভিমান আসছে মনে। মনে হচ্ছে—এই সময়ে এক মুহূর্তের জন্য এই সন্ধ্যা-তারাটির নিচে সে যদি দাঁড়িয়ে থাকত তা হলে কি এমন ক্ষতি হতো তার! সে সত্যকে বললে—না রে আর দাঁড়াব না। তুই কাল নিয়ে যাস কলেজে।

সে রাস্তায় এসে নামল। মনে হচ্ছে তার চোখে যেন জল এসে যাবে। এই তো সারাক্ষণ এত কথা, এত গল্প, এত আলোচনার মাঝখানেও মনের গোপনে যে ইচ্ছাটিকে, যে চিন্তাটিকে সে অন্ধকারের মধ্যে আড়াল করা প্রদীপের মতো সমস্ত ক্ষণ জাগ্রত করে রেখেছিল সে তো তারই ভাবনা, তাকেই একবার দেখার ইচ্ছা!

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে বুকটা ধক করে উঠল। সেদিনের সেই বেলফুলের মালাটা যে মালতীকে দেওয়া Uncle Tom's Cabin-এর মধ্যে রয়ে গেল। যদি সেটা হারিয়ে যায়!

আরও একটা কথা মনে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সেই মালাটা যে বইয়ের মধ্যে আছে সেটা মালতী প্রথমেই ভিতরটা একবার দেখে বুঝতে পেরেছিল। তা হলে সেই জন্যেই কি মালতী বইটা সত্যকে দেখতে দেয় নি?

এক মুহূর্তে তার সব অভিমান আনন্দ হয়ে গেল, সব ভাবনা সোনা হয়ে গেল, চোখের সামনে নেমে-আসা অন্ধকারে এক আশ্চর্য আলোর ছোঁয়াচ লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এই আনন্দের বেদী থেকে লাফ দিয়ে উল্লাসিত, উদ্দীপ্ত মন অশ্বমেধের দিগ্বিজয়ী তুরঙ্গমের মতো ছুটতে লাগল জীবনের নূতন আস্বাদ গ্রহণের জন্য। পড়ার টেবিলে গিয়ে বসবার জন্য মন তখন অধীর হয়ে উঠেছে।

হোস্টেলে নিজের ঘরের সামনে ঢুকেই মন্মথকে একটা ধাক্কা খেতে হলো। ঘর ভিতর থেকে বন্ধ।

তারা একঘরে থাকে দুজন। সে আর শশাঙ্ক ভট্‌চাজ বলে একটি ছেলে। বাড়ি ভট্টপল্লী। মোটামুটি ভালো ছাত্র। সে অনেক চেষ্টা করে, অনেক আগ্রহ নিয়ে মন্মথর রুমমেট হয়েছে। মন্মথকে সমাদরও সে করে অপর্যাপ্ত। এণ্ট্রান্সে ফার্স্ট হওয়া ছাত্র মন্মথ ভট্‌চাজ পণ্ডিত বাড়ির ছেলে। সেই কারণে ভট্টপল্লীর সন্তান শশাঙ্ক তাকে বেশী আপনার বলে মনে করে। যেমনটা করে রাধাশ্যাম। মন্মথর অযাচিতভাবে দেখাশুনা করে, সময় সময় চাইতে না চাইতে দু' একটা ফাই-

কয়মাশও খেটে দেয়। পাঁচজনের চেয়ে মন্মথকে বেশী আপনার জন মনে করে, নিজেও সে মন্মথকে বেশী আপনার এটাও সে মনে মনে ধরে রেখে দিয়েছে। মন্মথর এসব মধ্যে মধ্যে আতিশয্য মনে হলেও খারাপ লাগে না, ভালোই লাগে। সময় সময় আতিশয্য মনে হলেও সে মুখে কিছু বলে না। চুপ করে থাকে।

কিন্তু শশাঙ্কের একটা ব্যাপারের সঙ্গে তার কিছুতেই মিল খায় না। শশাঙ্ক বড্ড গোঁড়া। মাথায় মস্ত দীর্ঘ টিকি। শশাঙ্ক এ বিষয়ে 'টিকি' নামক প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার বরদাস্ত করে না। সে সরবে ও সদর্পে প্রতিবাদ করে। সে ব্রাহ্মণের শিখা নামক কেশগুচ্ছের বহু গৌরব প্রচার করে উচ্চকণ্ঠে। দু'বেলা শুচি হয়ে শাস্ত্র-মতে সন্ধ্যা ও আহ্নিক করে। খুব তাড়াতাড়ি সে দীক্ষা নেবে সে কথাও সে ঘোষণা করে সরবে।

শশাঙ্কের গোঁড়ামি নিয়ে হোস্টেলের বহু ছাত্র তার সঙ্গে হালকাভাবে কৌতুক এবং ব্যঙ্গও করে আবার বহুবার শশাঙ্ক একা বহুজনের সঙ্গে সক্ষোভে চিৎকার করে তর্কও করে। আর্যধর্মের গুণগান করে, আর্যধর্মের অসম্মানে সে ব্যথিত হওয়ার চেয়ে ক্রুদ্ধ হয় বেশী। সেই ক্রোধকে ধ্বজার মতো উড়িয়ে সে একা বহু-জনের সঙ্গে তর্ক করে। তাকে পরাজিত করে কার সাধ্য? যেন প্রেসিডেন্সী কলেজের হিন্দু হোস্টেলে বিধাতা শশাঙ্ক ভট্টাচার্য নামক ব্যক্তিটিকে আর্যধর্মের ধ্বজা প্রোথিত করবার মহৎ দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং সনাতন ধর্মকে ধারণ করবার অধিকার একমাত্র তাকেই দিয়েছেন।

তার সঙ্গে যখন অন্য পাঁচজনের তর্ক হয় তখন মন্মথ চুপ করে থাকে কখনও কখনও মুচকি মুচকি হাসে, এই তর্ক প্রাণভরে উপভোগ করে, কিন্তু কখনও কোনো পক্ষ নেয় না। শশাঙ্কের উপর আক্রমণ তীব্রতর হলে বা শশাঙ্ক বেশী উত্তেজিত হলে সে থামিয়ে দেয়, দু'পক্ষকে শান্ত করে। তর্কের শেষে তাকে একা ঘরে পেয়ে শশাঙ্ক যখন অভিযোগ করে—হিন্দুধর্মকে হিন্দু হয়ে ওরা অমনভাবে আক্রমণ করলে আর তুই কিছু বললি না, চুপ করে থাকলি? মন্মথ তাতেও তাকে বোঝায়, শান্ত করবার চেষ্টা করে। মোট কথা সাধারণভাবে সহিষ্ণু মন্মথ শশাঙ্ক সম্পর্কে আরও বেশী সহিষ্ণু। শশাঙ্ক মধ্যে মধ্যে তাকে অনুযোগ করে—ধর্মের সমস্ত আচার তুই কেন মানিস না মন্মথ? তুই তো ব্রাহ্মণের ছেলে? মন্মথ উত্তর দেয় না, হাসে। কখনও বলে—মানি রে, সবই মানি। তোর মতো অত বুক ফুলিয়ে সবাইকে দেখাই না, বলি না যে দেখ, আমি ধর্ম কত মানি, দেখ, আমি কত আচার পালন করি। তার কথা শুনে শশাঙ্ক, বলা বাহুল্য, পরিতৃপ্ত হয় না।

সেই শশাঙ্ক বোধহয় এখন দরজা বন্ধ করে সন্ধ্যা করছে। মন্মথ খুব বিরক্ত হলো।

মনে হলো, বেশ, তুই সন্ধ্যা করছিস কর। কিন্তু দরজাটা বন্ধ করেছিস কেন? দরজাটা ভেজিয়ে রাখলেই তো পারতিস! তাতেও তো তোর কোনো অসুবিধা হতো না! সে এসেই একবার আস্তে দরজাটা ঠেলেছিল, দেখলে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল।

সে মনে মনে অধীর হয়ে আছে পড়ার টেবিলে বসবার জন্য। সে এখন মেতে রয়েছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নিয়ে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'লুসি পোয়েমস্‌' ক'টি পড়বার জন্য তার মন এই মুহূর্তে অধীর হয়ে আছে। লুসি বলে যে মেয়েটি 'ডাভ'-এর ঝরনার ধারে, অতি অল্প মানুষের পায়ের ছাপ আঁকা পথের পাশে লোকচক্ষুর সপ্রশংস দৃষ্টির আড়ালে একটিমাত্র নির্জন সন্ধ্যাতারার মতো অথবা শেওলাধরা পাথরের আড়ালে একক ভাওলেট ফুলের মতো অতি স্বল্পপরিচিত থেকে দিন কাটিয়ে অজানিতের মতোই জীবনযাত্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল; অথচ যার জন্য কবির পৃথিবীর রঙ বদলে গেল তারই কথা, তারই ব্যথা আস্বাদ করবার আগ্রহে সে তখন আকুল। কবিতাগুলি কত ক্ষুদ্রায়তন, কি সহজ সরল তার ভাষা! কি সংযতবাক, কি বিরলভাষ! যেটুকু না বললে নয় ততটুকুই বলেছেন; অথচ কি গভীর, কত ভাবগর্ভ! সত্যদের বাড়ির ছাদে, ম্লান আকাশের পটভূমিতে, সন্ধ্যাতারাটির নিচে মালতীর বাঞ্ছিত মুখখানি না দেখে মনে যে বেদনা জমে উঠেছিল, সেই বেদনাই আবার ঘন আনন্দের মূর্তিতে তাকে তাড়িত করে এনেছে এই কবিতাগুলি আস্বাদ করবার জন্য।

সে অনেকক্ষণ বারান্দায় ধীরভাবে অপেক্ষা করে পায়চারি করতে আরম্ভ করলে। পায়চারি করতে করতে বিরক্ত হয়ে শেষে ঘরের বন্ধ দরজায় বার দুয়েক রূঢ়ভাবে আঘাত করলে। তাতেও দরজা খুলল না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো তাকে। এইবার তার বিরক্তি উষ্ণতায় রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করেছে। সে শেষ পর্যন্ত আবার একবার আরও জোরে দরজায় ধাক্কা দিলে। সে উত্তপ্ত হয়েও মনে মনে প্রত্যাশা করছিল দরজা খুলে শশাঙ্ক তার কাছে মার্জনা চাইবে।

দরজা খুলতেই মন্মথ উত্তপ্ত হয়ে বললে—এতক্ষণ দরজা বন্ধ করে কি করছিলি রে শশাঙ্ক? নাকি আজকেই গায়ত্রীদেবী সন্ধ্যার সময় সূর্যমণ্ডল খালি করে বৃষভ-বাহিনী শিবানীর মূর্তি ধরে হিন্দু হোস্টেলে তোর ঘরের জানলা দিয়ে ঢুকে তোর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন? ব্যাপার কি বল্‌ দেখি?

এ বক্রোক্তি করবার সময়ও মন্মথ প্রত্যাশা করছিল শশাঙ্ক তার এই অবিবেচনার জন্য লজ্জিত হয়ে অপ্রস্তুতভাবে তার কাছে ক্ষমা চাইবে।

কিন্তু সন্ধ্যার ম্লান আলোতে শশাঙ্ক দরজা খুলে দরজার দুই পাল্লার উপর দুখানা

হাত রেখে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তার কথার কোনো জবাব দিলে না।
তাতে মন্মথ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তীব্রকণ্ঠে বললে—কি, আজকেই কি তোর সিদ্ধি হয়ে গেল না কি?
এবার তীব্র কঠিন কণ্ঠে শশাঙ্ক বললে—তুই দেখছি একেবারে ম্লেচ্ছ হয়ে গিয়েছিস।
আহত বিষধরের মতো ফণা বিস্তার করে উঠল মন্মথর মন। সে এক পা পিছিয়ে এসে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ক্রোধ-কম্পিত চাপা গলায় বললে—মানে? কি বলছিস তুই?
শশাঙ্ক রূঢ়তর, উচ্চতর গলায় বললে—তুই তো ভালো ছেলে, সেরা ছেলে, মানে বুঝতে পারলি না? তুই নিজে ব্রাহ্মণ, তুই আর একজন ব্রাহ্মণসন্তানের সায়ংসন্ধ্যায় ব্যাঘাত ঘটালি! তুই নিজে আজ সায়ংসন্ধ্যা করেছিস বুঝি সত্যদের বাড়িতে?
ক্রোধের চরম আগুন জ্বলতে আর যেটুকু ইন্ধন ও হবির প্রয়োজন ছিল তা পড়ে গেল। সত্যদের বাড়ির ইঙ্গিতে মন্মথ হিংস্র ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণের বিস্ময় ও বিষ পরিপাক করে নিয়ে তারপর চাপা গলায় হিস্‌হিস্ করে বললে—তুই কি নিজেকে এই কলিযুগে ধর্মের একপদ ষাঁড় ভেবে নিয়ে বিশ্বসংসারের ধর্মরক্ষায় উঠে পড়ে লেগেছিস? ভেবেছিস কি তুই? তুই তো বামুনের ঘরের মুখ্যু। মন্ত্র উচ্চারণ করিস, শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে পারিস না। মন্ত্রের অর্থ জানিস? ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু বলে তো দিনে বেশ বারকয়েক আচমন করিস, ওর মানে জানিস? আসনের সামনে কোষাকুষি আর গঙ্গাজল নিয়ে বসলেই হয় না, ধর্ম নিয়ে আস্ফালন আর চেঁচামেচি করলেই ধর্মপালন হয় না। ধর্ম মানুষের অন্তরের জিনিস, যত পবিত্র তত গোপন। এটা জেনে রাখ! আর কাল থেকে সন্ধ্যা কেন, তুমি হোম-যজ্ঞ করলেও আমার আপত্তি নেই, কেবল দরজাটা খুলে রেখে যা করবার ক'রো। তাতে হোস্টেলের ছেলেরা তোমার ধর্মাচরণ দেখে তোমাকে আরও সম্মান করবে। তাতে সুবিধাই হবে তোমার। তোমাকে আমার অনুরোধ, তুমি যাই কর, আমার কোনো আপত্তি নেই, কেবল আমার অসুবিধা ঘটিয়ো না।
এই সময় একবার কি বলবার চেষ্টা করলে শশাঙ্ক। তাকে চাপা গলায় ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল মন্মথ—থাম, আর চেঁচাস না। তোর তো 'সেন্স' বলে কিছু নেই! থাকলে বুঝতে পারতিস তুই যখন ধর্মের ষাঁড় হয়ে শিং নেড়ে দাপিয়ে বেড়াস তখন অন্য সকলে তোকে কি চোখে দেখে, কি ভাবে তোর সম্পর্কে!

বলে সে শুদ্ধ, স্থির শশাঙ্কের পাশ দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। তসরের শুদ্ধ কাপড়-পরা, অনাবৃতদেহ, গলায়-উপবীত শশাঙ্ক তার এই কঠিন বিষ-তীক্ষ্ণ, অপ্রত্যাশিত আঘাতে বিহ্বল ও স্তব্ধ হয়ে সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে একটা প্রাণহীন প্রক্ষিপ্ত পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল তার দিকে তাকিয়ে।

মন্মথ ঘরের ভিতর ঢুকে প্রথমেই লণ্ঠন জ্বাললে, তারপর টেবিলটি গুছিয়ে নিলে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা-সংগ্রহটি রাখলে টেবিলের মাঝখানে। তারপর জামা-কাপড় ছেড়ে, শুদ্ধ কাপড় পরে সে হাত মুখ ধুয়ে ফিরল। দেখলে শশাঙ্ক তখনও ঠিক তেমনি একইভাবে দাঁড়িয়ে। সে ভ্রূক্ষেপ করল না। আসন পাতলে, আসনে আসনপিঁড়ি হয়ে বদ্ধাঞ্জলি করে বসে চোখ বন্ধ করলে। মন স্থির হলো না। চোখ বন্ধ করলেও মনের মধ্যে এই ঘরখানার আর শশাঙ্কের স্থাণু মূর্তির ছবি মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সে মাত্র একটা প্রণাম করে উঠে পড়ল আসন ছেড়ে। তারপর কাপড় বদলে পড়ার টেবিলে বসবার সময় একবার আড়চোখে শশাঙ্কের দিকে তাকিয়ে তাকে বললে—অমন করে দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ হবে ? কাপড বদলে পড়তে বস !

মার-খাওয়া শশাঙ্কের বুকের ভিতর যে বেদনা এতক্ষণে জমাট বেঁধে ছিল এবার তা উচ্ছ্বসিত আবেগের আকারে ভেঙে পড়ল। সে হুহু করে কেঁদে বললে—তুই আমাকে অমন করে বললি ?

সে কাঁদতে কাঁদতে নিজের চৌকিতে গিয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। মন্মথ আর কোনো কথা বললে না। বই নিয়ে বসল।

খাবার ঘণ্টা পড়লে বই ছেড়ে খেতে যাবার সময় সে দেখলে শশাঙ্ক তখনও তেমনি ভাবে শুয়ে। সে একবার তার পিঠে হাত দিয়ে ডাকলে—এই শশাঙ্ক, খেতে যাবি না ? চল খেতে চল।

শশাঙ্ক মাথা নেড়ে জানালে সে খাবে না।

খাওয়া-দাওয়া সেরে মন্মথ ফিরে দেখলে শশাঙ্ক কাপড় বদলে পড়ার টেবিলে বসেছে। দেখে আর কোনো কথা না বলে সে নিজের বিছানা ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল। ওদের দুজনেরই স্বভাব এইরকম। শশাঙ্ক পড়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত, মন্মথ ওঠে ভোরে।

শশাঙ্কের আলোর দিক থেকে উল্টো দিকে সে পাশ ফিরে শুলো। চোখ বন্ধ করলে। অন্য দিন ঘুমে চোখ আপনিই বন্ধ হয়ে আসে। আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না। একটা নামহীন বেদনা সেই সঙ্গে একটা অস্বস্তির স্পর্শ-লাগা অশু-চিতা তার সারা মন আচ্ছন্ন করে আছে। সমস্ত ভাবনাটা মালতীর সঙ্গে যেন

কোন্ সুদূর সম্পর্কে সম্পর্কিত। শশাঙ্ক সত্যদের বাড়ির উল্লেখ করে কেমনভাবে যেন মালতীকেই আঘাত করেছিল। অথচ ঈশ্বর জানেন মালতীর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক! নিজের মনে মালতীর সম্পর্কে যে সুকোমল আকর্ষণ সে অনুভব করে, ভগবান জানেন, তাকে নিজের কাছেও গোপন রাখতে চায়! এ কথা তো সে কখনও নিজের কাছেও মুখ ফুটে বলতে চায় না। তবে আজ এ ইঙ্গিত কেন?
ভাবতে ভাবতে অত্যন্ত বিষণ্ণ আতুরতার মধ্যে সে কখন ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল শশাঙ্কের ডাকে আর ধাক্কায়। শশাঙ্ক তাকে ধাক্কা দিয়ে ডাকছে—এই মন্মথ, ওঠ, ওঠ। তুই কাঁদছিস কেন ঘুমের মধ্যে?
—কাঁদছি? সে বিছানায় উঠে বসল অবাক হয়ে। মুখে হাত দিয়ে দেখলে চোখের নিচে দুটো গালই ভিজে, বালিশের খানিকটা জায়গাও ভিজে গিয়েছে। সে চোখ মুছে, বালিশটা উলটে নিয়ে টেবিলের উপর ঘড়িটা দেখে আবার শুয়ে পড়ল। এখন মাত্র সাড়ে বারোটা বাজছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে সে ধড়ফড় করে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। ভোর রাত্রে এমনিভাবেই সে ঘুম থেকে জাগে। মনে হয় কে যেন তাকে ডাকছে।
সেপ্টেম্বর মাস। শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস সমস্ত দেহ মায়ের স্নেহস্পর্শের মতো জুড়িয়ে দিচ্ছে। গত সন্ধ্যায় যে তারাটি সন্ধ্যাতারা হয়ে দেখা দিয়ে তাকে সকরুণ বেদনায় বিদ্ধ করে গিয়েছিল সেই এখন দেখা দিয়েছে শুকতারা হয়ে। প্রায়ান্ধকার আকাশে নন্দনের স্মিত হাসির স্পর্শ নিয়ে সে এখন দেখা দিয়েছে। খোলা জানলা দিয়ে শেষ রাতে আকাশের দিকে কিছুক্ষণ জড়তাহীন প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে দিনারম্ভের কাজে লেগে গেল।
বিছানা ঝেড়ে তুলে প্রাতঃকৃত্য করতে চলে গেল সে। এ সময় সবাই ঘুমোয়, সে একাই ওঠে। পড়ুয়া ছেলেরা বেশী রাত্রি পর্যন্ত পড়ে, তার পর ঘুমোয়। প্রাতঃকৃত্য সেরে, কাপড় বদলে প্রাতঃসন্ধ্যা। গভীর প্রসন্নতা, তৃপ্তি ও প্রশান্তির মধ্যে সন্ধ্যা সমাপন করে সে পড়ার টেবিলে বসল।
তার মনে হচ্ছে যেন তার এখনি জন্ম হলো। রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিগত সমস্ত অভিজ্ঞতা, বেদনা, অশুচিতা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ভাবমুক্ত হয়ে একপাত্র আনন্দের মতো সে নূতন জীবনারম্ভ করছে! চোখের সামনে ধীরে ধীরে প্রভাতের আলো স্ফুটতর হচ্ছে। তাতে কত আনন্দ, কত প্রত্যাশা। দিন তার জন্য অপেক্ষা করছে প্রসন্ন বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে। তার বাড়ানো হাতখানি ধরলেই সে তাকে দিব্যলোকে লোকান্তরে নিয়ে যাবে।
সে প্রসন্ন মনে বইয়ের পাতা উলটে চলল।

যখন প্রায় ছ'টা বাজে সে দেখলে তখনও শশাঙ্ক ঘুমুচ্ছে। সে চাকরকে ডেকে দু-জনের জলখাবার মতো জিলিপি আনতে পাঠিয়ে শশাঙ্ককে ডাক দিলে—এই শশাঙ্ক, ওঠ। বেলা হয়েছে।

শশাঙ্ক উঠল।

মন্মথ বললে—যা, মুখ ধুয়ে আয়, সন্ধ্যেটন্ধ্যে যা করার তাড়াতাড়ি কর। কাল রাত্রি থেকে খাস নি, জলখাবার আনতে দিয়েছি। উঠে পড়।

কিছুক্ষণ চৌকিতে সামনাসামনি বসে জিলিপি খেতে খেতে শশাঙ্ক বললে—কাল তোকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। হৃদয়চন্দ্র আর চপলা বলে দুজন এসেছিলেন বিকেলে তোর খোঁজে। আজ বিকেলে আবার আসবেন তাঁরা তোকে নিতে। তুই থাকিস যেন!

খেতে খেতে মন্মথর মুখটা একবার বেঁকে গেল। না, ঠিক বিরক্তিতে নয়। তার সুসম্বদ্ধ জীবনে চপলা একটা ঝড়ের মতো। সমস্ত পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলায় বিঘ্ন নিয়ে আসে। আবার কি বিঘ্ন নিয়ে আসছে সে কে জানে!

পরদিন বেলা চারটের সময় কলেজ শেষ করে হোস্টেলে ঢুকবার মুখেই সে ধরা পড়ে গেল। দেখলে রাস্তার উপর হোস্টেলের গেট থেকে খানিকটা দূরে এইচ. সি. সি. মনোগ্রাম-করা ব্রুহাম গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির ভিতর থেকে দরজার উপর একখানি নিটোল, ফরসা, তরুণ হাতের কনুইয়ের খানিকটা বেরিয়ে আছে। সে বুঝতে পারলে ও হাতখানি কার। মনে হলো সে যেন ধরা পড়ে গিয়েছে। ধরা পড়ে মানুষের মনে যে বিরক্তি আসে সে বিরক্তিও এলো, আবার ভালও লাগল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী বিব্রত বোধ করতে লাগল সে। তার চলা-ফেরা, পড়াশুনোয় যে একটি নূতন ছন্দ এসে তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে আরম্ভ করেছে সেই সহজ ছন্দে ঘা পড়বে, সেই ছন্দ ব্যাহত হবে এর ফলে, এটা বুঝেই সে বিব্রত বোধ করতে লাগল মনে মনে।

তা সত্ত্বেও সে হাসিমুখে এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। গিয়ে দাঁড়াল দরজার সামনে। চোখে চোখ পড়ামাত্র চপলা বলে উঠল—এই যে বাবু এসেছেন!

গাড়িতে আজ হৃদয়চন্দ্র নেই। সামনাসামনি বসে আছে সুবাসী। চপলা হুকুম করলে—উঠে এস গাড়িতে।

মন্মথর হাসিতে এবার বিব্রত ভাবটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে বললে—এই বই-খাতা নিয়ে উঠব কি করে? গঙ্গাজল, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি বই-খাতাগুলো আমার ঘরে রেখে আসি।

সজোরে মাথা নাড়লে চপলা—না, তোমাকে একবার যখন ধরেছি আর ছাড়ছি না। তুমি উঠে এস।

তাকে সোজাসুজি ধমক দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিলে চপলা। বললে—তোমার বই-খাতা কি আমি খেয়ে ফেলব নাকি?

মন্মথকে উঠতে হলো গাড়িতে। চপলা সরে বসে তার বসার জায়গা করে দিলে। গাড়ির দরজা বন্ধ হলো। গাড়ি চলতে লাগল।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে চপলা হঠাৎ তার সামনাসামনি ঘুরে বসল, তার একখানা হাত চেপে ধরে বললে—এই ছেলে, তোমাকে যে আমি পইপই করে বলে দিলাম দশহরার দিন আসতে তা আসা হলো না কেন শুনি?

মন্মথ জানত তাকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, আর প্রশ্নটা এমনি রুষ্ট তিরস্কারের ভঙ্গিতেই দেখা দেবে। সে তাই খানিকটা তৈরিও ছিল মনে মনে। সে সোজাসুজি মিথ্যে কথা বলে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করার অপরাধটা স্খালন করতে চাইলে। বললে—সেদিন তো আমি ছিলাম না কলকাতায়!

চোখ পাকিয়ে চপলা তাকে বললে—কলকাতায় ছিলে না তো কোথায় গিয়েছিলে?

একটু হেসে মন্মথ বললে—বাড়ি চলে গিয়েছিলাম আগের দিন। বাবা চিঠি লিখেছিলেন যাবার জন্যে।

সুন্দর নিটোল ফরসা হাতখানির তর্জনী তুলে চপলা বললে—মিথ্যে কথা!

হাসতে লাগল মন্মথ।

চপলা রুষ্ট হয়ে বললে—হেসে মিথ্যে কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইছ?

হাসতে হাসতেই মন্মথ বললে—না। তোমার মতো এত সহজে এমন সুন্দর করে মুখের ওপরে সত্যি কথাকে মিথ্যে বলতে পারি না! তোমার বলার কায়দা দেখে হাসছি! কত খারাপ কথা কত চমৎকার করে বললে তুমি!

খুব খুশী হলো চপলা। তার স্বভাব রুষ্ট মুখে হাসির ছোঁয়া লাগল। বললে—খুব কথা বলতে শেখা হয়েছে দেখছি! তা যাবার আগে তো আমাকে জানিয়ে গেলে পারতে।

এবার সুবাসী মুখ খুললে। বললে—বাবা, তোমাকে তো আমি সেদিনই বলেছিলাম, তুমি না এলে আমাকে আবার তোমাকে খুঁজতে যেতে হবে! তা সেদিন মেয়ের কি কষ্টই গিয়েছে! তোমার জন্যে অপিক্ষা করে করে বেলা গড়িয়ে গেল, মেয়ে রাগ করে কিছু খেলেই না সেদিন! তখন বিকেল হয়েছে, আমি বললাম—আমি গিয়ে তোমার গঙ্গাজলকে নিয়ে আসি। তা আমাকেও যেতে দিলে না!

ওর যা মেজাজ !

—থাম্ তুই। সুবাসীকে একটা ধমক দিয়ে চপলা মন্মথর যে হাতখানা ধরে থাবতে থাকতে ছেড়ে দিয়েছিল সেই হতখানা আবার চেপে ধরল। বললে—একটা সত্যি কথা বলবে গঙ্গাজল ?

—বল !

—আচ্ছা, সেদিন তুমি যখন আমাদের বাড়ি থেকে চলে আস তখন আসবার সময় আমার শ্বশুরের সেই বুড়ী পিসীমা তোমাকে কিছু বলেছিল ?

মন্মথ চকিত হয়ে প্রশ্ন করলে—তোমাকে কে বললে ?

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চপলা বললে—তা হলে সে বুড়ী তোমাকে বলেছিল কিছু ? কি বলেছিল বলতো !

মন্মথ অনেকদূর পর্যন্ত ভেবে নিলে চপলার মুখের দিকে তাকিয়ে। ওর এই রোষ আগুন হয়ে বৃদ্ধাকে পুড়িয়ে মারবে, মারবার আগে চরম যন্ত্রণা দিতে কসুর করবে না। চপলার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—আমার তোমাদের বাড়ি যাবার সঙ্গে তোমার, কি বলে যেন, তোমার দিদিশাশুড়ীর আমাকে কিছু বলার কি সম্পর্ক ?

খানিকটা ঝাঁজের সঙ্গেই চপলা জবাব দিলে—তাইতো জিজ্ঞেসা করছি তোমাকে। ছেলে আবার উলটে আমাকেই জেরা করে।

মন্মথ স্পষ্ট অনুভব করছে চপলার রাগী, খেয়ালী স্বভাবের আড়ালে একটি উচ্ছ্বসিত আনন্দের গোপন স্রোতের ধারা বয়ে গিয়ে তার এই কোপ-প্রকাশকে একটি সুন্দর মূর্তি দিয়েছে ! তার এই কপট কোপ-প্রকাশের উত্তাপে মন্মথর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। সে হেসে সহজভাবে বললে—না, তোমার দিদি শাশুড়ীর সঙ্গে আমার সেদিন না যাওয়ার কোনো যোগ নেই !

তার সমবয়সী এই খেয়ালী, সুন্দরী ধনীকন্যা ও ধনীবধূটির ঘনিষ্ঠ মানসিক সান্নিধ্যে এসে সমস্ত ব্যাপারটা একটি ভারী সুমধুর খেলার মতো লাগছে তার। চপলার কপট ক্রোধ, তাও ভালো লাগছে। এ এমন মেয়ে যার কাছে এলে প্রতিটি মুহূর্তে সতর্ক হয়ে থাকতে হয়। না হলেই বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা। এবং সে বিপর্যয়ে তারই বিপর্যস্ত হবার আশঙ্কা সর্বাধিক।

চপলা তবু তাকে ছাড়লে না। জিজ্ঞাসা করলে—বেশ, শ্বশুরের পিসীমার সঙ্গে তোমার কি কথা হয়েছিল বল !

মন্মথ বুঝতে পারছে হয় সত্য নয় মিথ্যা একটা পথ ধরে তাকে চলতে হবে। দুটোর মধ্যে আপোস নেই। আর সেটায় পা দেবার মুহূর্ত সমাগত। সে আবার

পালটা প্রশ্ন করলে—শ্বশুরের পিসিমার সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছে সেকথা তোমাকেই বা কে বললে ?

একটু চুপ করে থাকল চপলা। এবার সুবাসী মুখ খুললে, বললে—আমি বলেছিলাম বাবা !

একটু অবাক হলো মন্মথ। যখন সেই কঠিন-হৃদয়া বৃদ্ধা তাকে তিরস্কার করেছিলেন তখন তো সেখানে কেউ ছিল না। তবে সুবাসী জানলে কি করে ? মন্মথ নিজের বিস্ময়টুকু কণ্ঠস্বরে প্রকট করে প্রকাশ করে বললে—কি বলেছিলে তুমি ?

সুবাসী একটা ঢোঁক গিলে বললে—তোমাকে অন্দরের দরজার মুখে ছেড়ে দিয়ে আমি বাড়ির ভেতর ফিরে যেতে যেতে যে দেখলাম ঠাকুমা বাইরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর দেখলাম তুমি তার দিকে এগিয়ে গেলে। তাই আমার মনে হলো তুমি ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলছ। আর বলতে নাই, গুরুজন ব্রাহ্মণ, গুরুজনের চরণে পেনাম, বুড়ার মুখও ভালো নয়, মনও ভালো নয়। তাই ভাবলাম, বুড়ী ওইখানে দাঁড়িয়ে সাঁঝের আঁধারে কি ভালো কথা বলছে !

মন্মথ নিজের মন স্থির করে নিলে। বললে—তুমি কিছু মনে ক'রো না, এইটুকু দেখে, তার ওপর অনুমান করে কিছু বলা কি উচিত ?

এমন সুন্দর করে এমন সুন্দর কথা কবে কে বলেছে সুবাসীকে ? মন্মথর বলা ছোট্ট বাক্যটির পুরো অর্থও সে সঠিক অনুধাবন করতে পারলে না। কিন্তু তাতেও তার মনটি কেমন হয়ে গেল। সে মাথা নেড়ে নম্রভাবে আপনার দোষ স্বীকার করে বললে—তা বটে বাবা, অন্যায় হয়েছে আমার !

এই সময় গাড়ি হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেলে যার ফলে চপলার ঝাঁকি খেয়ে প্রায় উলটে মন্মথর ঘাড়ের উপর পড়ার মতো অবস্থা। সে মন্মথর কাঁধটা চেপে ধরে পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করলে। পর মুহূর্তেই সে গাড়ির ভিতর থেকে সহিসের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল—এই হারামজাদা, কি করে গাড়ি চালাচ্ছিস ? চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি ?

গাড়ি তখন সোজা সমান রাস্তা থেকে পাথর-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে খড়-খড়, ঘড়-ঘড় শব্দ তুলে চলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। চপলা সমান উঁচু গলায় সুবাসীর দিকে চেয়ে তাকে মুখ ভেঙিয়ে বললে—তা বটে বাবা, অন্যায় হয়েছে আমার ! অন্যায় যদি হয়েছে তবে হারামজাদী, তুই আড়ি পেতে সব কথা শুনলিনে কেন ? আড়ি যে পাততে পারিস না, জানিস না, তা তো নয়। সবই তো পারিস ! সবই তো জানিস !

সেই রাগেরই খানিকটা নিয়ে সে এবার মন্মথর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভুরু তুলে

তার একখানা হাত চেপে ধরে সে প্রায় হুকুম করলে—এই ছেলে, বল না বুড়ী তোমাকে কি বলেছিল !

আকস্মিক রাগে মন্মথর মুখখানা কেমন হয়ে গেল। তার যে এমন রাগ হবে তা সে এক মুহূর্ত আগেও বুঝতে পারে নি। সে কোনো কথা না বলে চপলার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

চপলা আশ্চর্য। তার মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত তাকে দেখে নিয়ে সে নিজের দুখানা হাত দিয়ে মন্মথর দুখানি হাত চেপে ধরে বললে—বল না কি বলেছিল বুড়ী। আমি মিনতি করছি লক্ষ্মীটি বল !

রাগ কেটে গেল, সব রাগটা ফিরে এলো অনুরাগের প্রসন্নতা হয়ে। সে হাসি-মুখেই সহজভাবে বললে—সে শুনে কাজ কি এখন ? দরকার হলে বলব।

তার উত্তর শুনে চপলা স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। সে তত-ক্ষণে সকরুণ মিনতির শীতলতা থেকে রোষের উচ্চতম বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছে। সে হুকুম করবে আর তা পালিত হবে না, সে কোনো প্রশ্ন করবে আর তার জবাব পাবে না এ কি করে হয় ? সে মন্মথর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—তার মানে বলবে না ? আচ্ছা বেশ !

তার ফরসা মুখখানায় তখন লালচে আভা ধরেছে, গাল দুটো লালচে হয়ে গিয়েছে, দুই চোখ চকচক করছে। সে চুপ করে রইল। তবে এ অবস্থায় তাকে থাকতে হলো না বেশীক্ষণ। গাড়ি ততক্ষণে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

তার মুখ দেখে মন্মথর মনে কোনো চাঞ্চল্য এলো না। বরং সে এক ধরনের কৌতুক বোধ করলে। সে মনে মনে এটা বুঝেছে যে গঙ্গাজলকে ছাড়লে চপলার চলবে না। তাকে সে কোনোমতে রাগরোষ করেও মেনে নেবে। তবে এর জন্য অনেক ঝড়ঝাপটা সইতে হবে মন্মথকে। চপলাই তাকে হাজার ঝাপটায় বার বার বিব্রত করবে।

গাড়ি থেকে নেমে রুষ্টমুখে তার দিকে তাকিয়ে চপলা বললে—কি নামবে, না গাড়িতেই বসে থাকবে ?

হাসিমুখে লঘুচিত্তে সে তার বইখাতাগুলো তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—এগুলো ধর !

অবাক হয়ে গেল চপলা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খুশীও হলো খুব। মুখে কিন্তু বললে—আ ম ক তোমার ঝি নাকি যে তোমার বই-খাতা ধরব ?

মন্মথ হাসিমুখে বললে—ছি, ও কথা বলতে হয় ? তুমি আমার গঙ্গাজল।

সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিলে চপলা—দাও !

বই-খাতাগুলো হাতে নিয়ে সে প্রায় হেসে গড়িয়ে পড়ল। বললে—বেশ হয়েছে। গঙ্গাজল, এবার আমিও কলেজে পড়ব তোমার সঙ্গে! তারপর সুবাসীকে সে হাঁক দিলে—আয় রে সুবি!
যেতে যেতে পিছন ফিরে সুবাসীকে সে বললে—একবার ঠাকুমা বুড়ীকে ডাকবি তো আমার ঘরে! একটু পরে। বুঝলি!

ঘরের ভিতর হৃদয়চন্দ্র খবরের কাগজ পড়ছিল। তাকে দেখে কাগজখানা নামিয়ে রেখে হাসিমুখে বললে—চপলা তোমাকে ঠিক ধরে এনেছে তো! ওর হাতে পড়েছ আর ছাড়ান আছে। ও পুলিশ সাহেবের বাবা!
হৃদয়চন্দ্রের কথার মধ্যে স্ত্রীর সম্পর্কে এই সপ্রেম অহংকার এবং সস্নেহ আনুগত্য অনুভব করে বড় ভালো লাগল মন্মথর। অথচ এই হৃদয়চন্দ্রই তো এই কিছুকাল আগে পর্যন্ত গোয়াল থেকে পালানো, দড়ি ছেঁড়া রাতচরা ষাঁড়ের মতো স্ত্রীকে ঘরে ফেলে রেখে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত। সেই মানুষ আজ স্ত্রীর প্রায়পূর্ণ আনুগত্য মেনে নিয়ে সন্ধ্যার মুখে স্ত্রীর প্রতীক্ষায় হাসিমুখে বসে আছে এটা আশ্চর্যের কথা বই কি! কিন্তু এই আশ্চর্য সংঘটনের মধ্যে তার খানিকটা হাত আছে এটা সে নিজে অনুভব করে। তার প্রতি চপলার যে আকর্ষণ, প্রীতি ও স্নেহ তার মূলে চপলারও এই ধরনের একটা বিশ্বাস মনে মনে ক্রিয়া করে। চপলা ভাবে মন্মথ নামে তার এই গঙ্গাজল, এ যদি না থাকত তা হলে তার স্বামী মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে আসতে পারত না। আর এই যে হৃদয়চন্দ্র আজ তার আনুগত্য মেনে নিয়ে তার কাছে এসেছে এর পিছনেও ব্রাহ্মণসন্তান মন্মথর একটা পরোক্ষ প্রভাব আছে। স্বামীর কথা শুনে চপলা মন্মথর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—শুনলে তো কথা? আমার কুলুজি কাটছে কেমন?
হৃদয়চন্দ্র কপট বিস্ময়ের ভান করে বললে—বল তো ভাই গঙ্গাজলবাবু, এই কি কুলুজি কাটা হলো? বল তো ভাই, আমাদের পুলিশ সায়েব চপলার ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কোনো সুখ্যাতি কি অখ্যাতি করেছি? আমি কি বলেছি যে অমন ইনটেলিজেন্সের ব্যবস্থা আছে বলেই না অতবড় সাকসেসফুল পুলিশ সায়েব হওয়া সম্ভব হয়েছে?
ভুরু কুঁচকে গেল চপলার। সে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে—কি গালমন্দ দিচ্ছ, অ্যাঁ? এই গঙ্গাজল, কি সব খারাপ খারাপ কথা বলছে বল তো?
হেসে গড়িয়ে পড়ছে হৃদয়চন্দ্র। হাসতে হাসতে প্রায় ভেঙে পড়ে, মন্মথর পিঠে ধাক্কা দিয়ে বললে—দেখ হে গঙ্গাজলবাবু, কাণ্ডটা দেখ একবার। দুটো একটা

ইংরেজী কথা যেই ঢুকেছে আমার কথার মধ্যে, অমনি না বুঝে উনি ধরে নিয়েছেন আমি গালমন্দ করছি ওঁকে। এমত অবস্থায় আমার কি কর্তব্য বলতে পার গঙ্গাজলবাবু? তবু দেখ, আমি ওঁর হেড অব্ ইনটেলিজেন্স ব্যুরো শ্রীমতী সুবাসী ঠাকুরানীর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করি নি!

এতক্ষণে চপলা গম্ভীরভাবে বললে—ও, সুবাসী আমাকে সব খবর যোগায়, আমি সেইসব খবর নিয়ে কাজ করি—এই বলছ তো তুমি? তা বল! তোমার মতো দজ্জাল স্বামী নিয়ে সংসার করব আর আমি খবরাখবর না নিয়ে বোকা সেজে ঘরের কোণে বসে বসে চোখের জল ফেলব সে মেয়ে আমি নই!

হৃদয়চন্দ্র স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে—তুমি যে তা নও তা আমি জানি। হাড়ে হাড়ে জানি ঠাকরুন।

মন্মথ লক্ষ্য করলে এই কথা ক'টি বলতে গিয়ে পরিণত যুবক হৃদয়চন্দ্রের চোখের দৃষ্টিতে, ঠোঁটের প্রান্তে এমন সপ্রেম এক মুগ্ধ অনুরাগ প্রস্ফুট হয়ে উঠল যা দেখে সে একই সঙ্গে বিস্মিত হলো, বিমুগ্ধ হলো এবং সংগোপনে যেন খানিকটা ঈর্ষাও হলো। তার এই বয়সে প্রকাশ্যে কোনো তরুণ দম্পতির নূতন ও সদ্যজাগ্রত প্রেমের এমন গোপন অনুরাগ দেখে নি। তার আরও ভালো লাগল এই ভেবে যে এই মানুষটি তার এই আসক্তি ও প্রেমকে এতদিন মুঠো মুঠো করে বেহিসেবীর মতো, অবিবেচকের মতো মাতালের মতো যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছে। আজ যার দিকে মুখ ফেরাবার তার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভালবাসার সমস্ত অঞ্জলিটি দু'হাতে ভরে নিয়ে তারই দিকে বাড়িয়ে ধরেছে। তারই ফলে এই জবরদস্ত, দুর্দম মানুষটির মধ্য থেকে এমন একটি সুন্দর, মধুর, পরিতৃপ্ত, হাস্যময়, সরল মানুষ আস্তে আস্তে আত্মপ্রকাশ করছে যাকে দেখতে ভালো লাগে, যার সান্নিধ্য বড় তৃপ্তিকর, যার আত্মপ্রকাশের আস্বাদে চিত্ত সরস ও প্রসন্ন হয়। এ আর এক মানুষ! এই মানুষকে পেয়ে গঙ্গাজল খুশী হবে বই কি! খুশী হবারই তো কথা! আহা, তার গঙ্গাজল স্বামীসুখে সুখী হোক!

ওই তো, তার চোখের সামনেই চপলা সুখে মাতাল হয়ে ঘাড় নাড়ছে! ঘাড় নাড়তে নাড়তে সে বললে—তুমি তো এখুনি আমাকে পুলিশ সায়েব বলে গাল দিচ্ছিলে? তা তুমি দেখ তোমার পুলিশ সায়েবের কাজ!

—কাকে আবার শায়েস্তা করবে ঠাকরুন? আমার মতো জবরদস্ত জোয়ানকে তো ইতিমধ্যেই শায়েস্তা করেছ! হৃদয়চন্দ্র তার শেষ ও চরম আনুগত্য কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলে।

স্বামীর কথায় আবার ঘাড় নাড়লে চপলা। বললে—দেখ না, বসেই তো আছ,

বসে বসে দেখ!

বলেই গলা তুলে সে ডাকলে—ও সুবাসী! ওলো ও সুবাসী।

সুবাসী সব সময়েই চপলার কাছে কাছে থাকে। নির্লজ্জের মতো, সময় সময় চোরের মতো সে লুকিয়ে থাকে দরজার পাশেই। এখনও তাই ছিল। দরজার পাশ থেকেই সে সাড়া দিলে—যাই!

সুবাসী ঘরে ঢুকতেই হৃদয়চন্দ্র মন্মথর মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল।

সে হাসি দেখে চপলাও হাসল একটু। কিন্তু কিছু বললে না। সে সুবাসীকে গম্ভীরভাবে বললে—পান আর দোক্তা দিয়ে যা।

পান-দোক্তা এলো সঙ্গে সঙ্গে। পান-দোক্তা নামিয়ে দিয়েও সুবাসী দাঁড়িয়ে রইল। তার দিকে তাকিয়ে চপলা ভুরু তুলে প্রশ্ন করলে—আবার সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকলি কেন? যা! আচ্ছা, এক কাজ কর। ঠাকুমা বুড়ীকে একবার ডেকে দিস।

হাসিমুখে সুবাসী তরতর করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হৃদয়চন্দ্র প্রশ্ন করলে—এখন ঠাকুমাকে কোতল করবে বুঝি?

—দেখ না! বললাম তো বসে বসে দেখ।

হৃদয়চন্দ্র শশব্যস্ত হয়ে বললে—না বাপু, আর যাই কর, বুড়ীকে গালমন্দ ক'রো না!

চটে উঠল চপলা—আমি কি ছোটলোকের বাড়ির মেয়ে নাকি? আমার কি কোনো জ্ঞানগম্যি নেই?

হৃদয়চন্দ্র হেসে চুপ করে গেল।

মন্মথ মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে শক্ত হয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর সেই ঝুল-পড়া, পাকা বাঁশের লাঠির মতো বৃদ্ধা এসে ঘরে ঢুকল। পিছনে পিছনে সুবাসী, তার মুখে সূক্ষ্মভাবে এক দুষ্ট হাসি খেলা করে যাচ্ছে। সেও বুড়ীর পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। ইচ্ছা বোধহয় এই কঠিন বিচারকের হাতে বুড়ীর কেমন বিচার ও শাস্তি হয় তাই দেখা!

চপলা হঠাৎ বললে সুবাসীকে—তুই এখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে কি করছিস লা? তুই যা এখান থেকে!

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলে যেতে হলো সুবাসীকে।

মন্মথ বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে ছিল। একমাত্র সে-ই বৃদ্ধার অবস্থাটা পুরোপুরি বুঝতে পারছে। তার মনে হচ্ছে বুড়ী বোধহয় একটা কথা বললেই ভেঙে পড়বে। বৃদ্ধা যেন বিহ্বল ও আকুল দৃষ্টিতে অসহায়ের মতো তারই মুখের দিকে তাকিয়ে

আছে।

চপলা মিষ্টভাবেই বললে—আপনি দাঁড়িয়ে কেন ঠাকুমা? বসুন, চেয়ারে বসুন!

বৃদ্ধা একবার ঘরের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে একখানা খালি চেয়ারে বসল। বসল একান্ত আড়ষ্ট হয়ে। আজ তার প্রতিবাদ করারও সব শক্তি হারিয়ে গিয়েছে সেটা আর কেউ দেখতে না পেলেও মন্মথ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

চপলা বললে—জানেন ঠাকুমা, আমি গঙ্গাজলকে দশহরার দিন আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছিলাম। ও আসে নি। তা আপনি কি গঙ্গাজলকে কিছু বলেছিলেন?

বৃদ্ধা কিছু বলার চেষ্টা করলে, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না।

চপলা আবার বললে—গঙ্গাজলকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু ও কিছু বলতে চাইছে না। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।

বৃদ্ধা যেন অকূলে কূল পেলে। সে গলা ঝেড়ে নিয়ে অস্পষ্টভাবে বললে—তা ওকেই জিজ্ঞেস কর আমি কি বলেছি।

মন্মথ এবার মুখ খুললে। বললে—তা হলে বলি ঠাকুমা? জানেন ঠাকুমা, গঙ্গাজল আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি বলেছিলাম, দরকার হলে বলব। এখন দেখছি দরকার হয়েছে। বলি এবার?

মন্মথ চপলার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—ঠাকুমা সেদিন আমাকে অনেক আশীর্বাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, ভাই, তুমি খাঁটি বামুনের ছেলে, তোমার আশীর্বাদে আমার হৃদয় প্রাণ ফিরে পেলে, আমার নাতবৌয়ের হাতের নোয়া বজায় থাকল।

ঘরের তিনজনেই সবিস্ময়ে দেখলে বৃদ্ধার দন্তহীন মুখের দুই ঠোঁট ফাঁক হয়ে গিয়ে কাঁপছে থরথর করে, তারপরই তার ঘোলাটে, কালো কুঞ্চিত দুই ছোট ছোট চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

হৃদয়চন্দ্র বললে—কাঁদবেন না, কাঁদবেন না ঠাকুমা। আপনাকে ববং আমরা সবাই একদিন কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে মাকে প্রণাম করিয়ে আনব। কিছু ভাববেন না। যান আপনি।

বুড়ী পালিয়ে বাঁচল।

যা ঘটল, যা ঘটালে মন্মথ তার বিনিময়ে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওনা সে পেয়ে গেল সেই দিনই।

সেই স্থান, সেই কাল। আজ আর সুবাসীকে চপলা আসতে দেয় নি তার সঙ্গে।

দরজা থেকে বেরুতেই দেখলে বুড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আজ মন্মথ নিজে থেকেই বুড়ীকে সম্বোধন করলে—কিছু বলবেন ঠাকুমা ?

অতি সহজ, মমতাময় গলায় বুড়ী বললে—বলব বলেই তো দাঁড়িয়ে আছি ভাই !

হেসে মন্মথ বললে—বলুন তা হলে ?

বর্ষার দিনে ভেজা, পচা গাছের শাখার মতো জরাজীর্ণ, শিরাবহুল, শীর্ণ হাতখানি কাপড়ের ভিতর থেকে বের করতে করতে বুড়ী বললে—বলব—বলব আর কি ভাই, আশীর্বাদ করব।

তার মাথায় হাতখানি রেখে বুড়ী বললে—বেঁচে থাক ভাই, শতায়ু হও, সোনার দোত-কলম হোক। ধর্মে মতি থাকুক। তুমি আজ আমার ছিদ্দ কুম্ভে জল রেখে আমার মান বাঁচিয়েছ।

একটু থেমে একবার পিচ কেটে বুড়ী সখেদে বললে—আঃ আমার কপাল। আমার আবার মান। আজ তুমি সত্যি কথা বললে আমার মান তো মান, আমার পেটের ভাতের ব্যবস্থাও ঘুচে যেত। না খেয়ে শুকিয়ে মরতাম। স্বামী নাই, পুত্তুর নাই, তি-সংসারে কেউ নাই ভাই ! তুমি আজ মানই বাঁচাও নি আমার প্রাণও বাঁচিয়েছ। কি বলে আর আশীর্বাদ করব ভাই ! তা এই জন্মাষ্টমী আসছে, সেদিন তুমি আমার বামুন হবে। কেমন ?

হাসিমুখে সম্মতি জানিয়ে, জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে পুরস্কৃত ও কৃতার্থ হয়ে সে এসে পথে নামল।

৭

হিন্দু স্কুলের বার্ষিক প্রাইজ হয়ে গেল মহা সমারোহে। ঘটনাচক্রে মন্মথ সেই উজ্জ্বল অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হয়ে দাঁড়াল।

সে কি সমারোহ !

বাগানের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ফুলগুলি এক সঙ্গে তুলে, এক সঙ্গে তোড়া বেঁধে সাজিয়ে রাখলে যেমন উজ্জ্বল, মহার্ঘ ও সুন্দর লাগে সভাটি তেমনি সুন্দর ও উজ্জ্বল লাগছিল। শহরের অতি বিশিষ্ট মানুষরা সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন বহু মহিলা। রূপে, সজ্জায়, রুচিতে তাঁরা সভাটিকে আশ্চর্য বর্ণাঢ্য করে তুলেছিলেন। সভায় সামনের দিকে অতিথিদের আসন। তাঁদের পিছনে স্কুলের ছাত্ররা হাস্যোজ্জ্বল মুখে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে বসেছিল। এক পাশে আসন পুরস্কার প্রাপকদের। পুরস্কার প্রাপকদের প্রতিটি জনের জন্য পৃথক পৃথক

আসন চিহ্নিত করা। সেই অনুযায়ী মাস্টারমশাইরা জনে জনে বসিয়ে দিচ্ছিলেন। পিছনে ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন মাস্টারমশাই ঘোরাফেরা করছেন, পাছে চপলমতি বালকরা গোলমাল করে সভার গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ করে, সভার কাজে বিঘ্ন ঘটায়। কয়েকজন মাস্টারমশাই হলের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করার জন্য।

হলের সামনেই দর্শকদের দিকে মুখ করে মাঝখানে খানিকটা জায়গায় সভার মঞ্চ। নিচু চৌকি জোড়া দিয়ে উপরে শতরঞ্চি ও সাদা চাদর বিছিয়ে তার উপর ভারী ভারী একসারি গদি আঁটা চেয়ার পাতা হয়েছে। তার সামনে লম্বালম্বি টেবিল দামী রঙীন রেশমী চাদরে মোড়া। সভামঞ্চের এক পাশে, টেবিলের উপর বড় বড় ফুলের তোড়া। মঞ্চের ওপাশে মেঝের উপর তিন চারখানি টেবিল জুড়ে সাদা চাদর পাতা। তার উপরে লাল রেশমী ফিতে দিয়ে বাঁধা বইয়ের সম্ভারগুলি থরে থরে সজ্জিত। উজ্জ্বল ছাত্রদের পুরস্কার।

একজন মাস্টারমশাই একটি ছোট বেতের ঝুড়ি ভর্তি লাল গোলাপের কুঁড়ি নিয়ে ঢুকবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। অতিথিরা ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে একটি করে লাল গোলাপের কুঁড়ি দিয়ে সংবর্ধিত করছেন। আর একজন অতিথিদের আপ্যায়ন করে নিয়ে গিয়ে যথাযথ আসনে তাঁদের বসিয়ে দিচ্ছেন।

হেডমাস্টারমশাই বয়সে প্রবীণ হয়েও হলের সর্বত্র প্রায় ছুটে বেড়াচ্ছেন। একবার তিনি অতিথিদের আপ্যায়ন করছেন, একবার কোনো বিশেষ মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করছেন, কখনও কাউকে নির্দেশ দিচ্ছেন, কখনও সভামঞ্চের কাছে এসে টেবিলের উপর কাগজপত্র ঠিক রাখা আছে কিনা দেখে নিচ্ছেন, কখনও বা ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখে নিচ্ছেন, কখনও বা কোনো বিশেষ কারও প্রত্যাশা করে হলের দরজার দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর ব্যস্ততার আর অন্ত নেই।

সভাস্থল প্রায় ভর্তি হয়ে উঠছে। সভার সময়ও প্রায় হয়ে এসেছে। আর মিনিট পনেরো বাকী! এমন সময় সত্য ও মন্মথ দুজনে একসঙ্গে হলে এসে ঢুকল। দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করেছিল পুরস্কার বিতরণী সভায় দুজনে একসঙ্গে আসবে। সত্য বাড়ি থেকে আসবে হিন্দু হোস্টেলে, সেখান থেকে দুজনে একসঙ্গে সভায় আসবে।

তারা দুজন সভার দরজায় এসে দাঁড়াতেই যে ক'জন মাস্টারমশাই দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। হাস্যবিস্মিত মুখে পরম সমাদরে তাঁরা তাদের দু'জনকে গ্রহণ করলেন। হেডমাস্টারমশাই দূরে কোথাও ছিলেন। তাদের দেখতে পেয়েই হাসিমুখে দুহাত দুজনের দিকে বাড়িয়ে প্রায় ছুটে এসে দুজনের

পিঠে পরম স্নেহে নিজের হাত দু'খানি স্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা দুজন প্রণাম করল তাঁকে।

হেডমাস্টারমশাই তাদের এইভাবে সমাদর করতে ছুটে আসায় সভার সমস্ত মানুষের দৃষ্টি তাদের দুজনের উপর গিয়ে পড়ল। প্রণাম সেরে উঠতেই তারা দেখলে সভার সমস্ত মানুষ তাদের দুজনের দিকেই তাকিয়ে আছে, তাদের দুজনকেই দেখছে।

মন্মথ সমস্ত সভাটিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলে। চোখ বুলোতে গিয়ে দেখতে পেলে প্রথম সারিতেই বসে আছেন জ্যোতিপ্রসাদবাবু, তাঁর স্ত্রী, তার সঙ্গে সন্ধ্যা, উষা ও মালতী। একবার তার দৃষ্টি আলতোভাবে পড়ল গিয়ে তাঁদের উপর। সে একটু হাসল, মনে হলো তাঁরাও যেন অতি অস্পষ্ট হাসি হেসে প্রত্যুত্তর দিলেন।

দ্বিতীয় সারিতে বসে আছে হৃদয়চন্দ্র আর চপলা। দেখে মন্মথ একটু আশ্চর্য হলো। সে ভেবে কূলকিনারা পেলে না ওরা দুজনে নিমন্ত্রিত হয়ে এখানে এলো কিভাবে! তাদের চোখেও চোখ পড়ল তার। চপলা হাসল বেশ স্পষ্টভাবেই। হেডমাস্টার-মশাই নিজের দুপাশে দুজনকে পিঠে হাত রেখে চলেছেন। কাজেই তাদের দিকে আর ফিরে তাকাবার সুযোগ হলো না। তবু যেতে যেতেই সে ভেবে নিলে যে একবার উঠে গিয়ে হৃদয়চন্দ্র আর চপলার সঙ্গে দেখা করে আসবে। জ্যোতি-প্রসাদবাবু বা তাঁর বাড়ির কারও সঙ্গে দেখা করলেও চলবে। তাঁরা কিছু মনে করবেন না। কারণ সে তো তাঁদের ঘরের ছেলের মতো, প্রায় নিত্য তার সেখানে যাওয়া-আসা। হেডমাস্টারমশাই তাদের নিয়ে গিয়ে পুরস্কারপ্রাপকদের জন্য নির্দিষ্ট আসনের একেবারে প্রথম দুখানায় তাদের বসিয়ে দিলেন। বসল তারা পাশাপাশি।

বসে কিন্তু বড় অস্বস্তি লাগতে লাগল। মনে হতে লাগল সভার সকলেই তার দিকে যেন কুতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সে মুখ নামিয়ে বসে থাকল, মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হবার জন্য সত্যর সঙ্গে দু একটা কথা বলার চেষ্টাও করল। কিন্তু কথা জমল না। এক সময়ে সে বললে—সত্য, তুই বস, আমি একবার দু-একজনের সঙ্গে দেখা করে আসি।

বলেই সে উঠে পড়ল। গুঁড়ি মেরে অত্যন্ত দ্রুত সভার অতিথিদের সামনে দিয়ে সে হলের প্রবেশপথের একেবারে কাছে চলে গেল। সেইখানেই প্রথম সারিতে জ্যোতিপ্রসাদবাবু বসেছিলেন সপরিবারে। জ্যোতিপ্রসাদের ও সত্যর মায়ের মুখের দিকে একবার সশ্রদ্ধ হাসিমুখে তাকিয়ে ঠিক পিছনের দিকে এগিয়ে যাবার

জন্য পা বাড়ালে। প্রথম সারির একেবারে প্রান্তের চেয়ারখানিতে বসেছিল মালতী। সেই শুভ্র রজনীগন্ধার মতো শ্বেত তনুদেহ একেবারে সর্বশুক্ল বস্ত্রে মণ্ডিত, সর্বশুক্লা সরস্বতীর মতো স্থির প্রশান্তভাবে বসে আছে। একবার মালতীর চোখে তার চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পরিব্যাপ্ত নির্মল আকাশের মতো তার নীলাভ, বড় বড় চোখের শান্ত অতলান্ত দৃষ্টির প্রসাদ সে লাভ করলে। সে প্রসাদে উল্লাস নেই, হাসি নেই, দুঃখ নেই; তার মধ্যে যেন কত বেদনা গভীর এক প্রশান্তির মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে। কিন্তু সে ওই একমুহূর্তই। সে তাকে পাশ কাটিয়ে হাসি-মুখে দ্বিতীয় সারির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

চপলা তারই দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে তার হাস্যোচ্ছ্বসিত দৃষ্টি দিয়ে তাকে প্রত্যুদ্গমন করছিল। সে কাছে যেতেই কে একজন চপলার পাশের চেয়ারখানা খালি করে দিলে। তার দিকে ফিরে তাকিয়ে কৃতার্থ হয়ে সে বললে—আমি এক মিনিট এঁদের সঙ্গে কথা বলে চলে যাব।

চপলা তার হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিলে—তুমি বস তো। ওর কাছে তোমাকে অত করে বলতে হবে না। ও আমার খুড়তুতো ভাই।

যিনি চেয়ার ছেড়ে দিয়েছিলেন সেই অল্পবয়সী ভদ্রলোকের মুখের দিকে একটু হেসে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে চপলার পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। একান্ত উৎসুকভাবে নিচু গলায় বললে—তোমরা আসাতে যত খুশী হয়েছি তত আশ্চর্য হয়েছি। কিন্তু তোমরা কি করে এলে?

চপলা ওই সভার ভিড়ের মধ্যেও চোখ পাকিয়ে নিচু গলায় বললে—ওরে ছেলে, ওর কথা শোন! তোমার কথার মানে তো হলো তোমাদের কে নেমন্তন্ন করলে, এই তো?

মন্মথকে এক কথায় চরম অপ্রস্তুত করে দিলে চপলা। মন্মথ বললে—আমি কি তাই বলেছি?

হৃদয়চন্দ্র বললে—ওহে গঙ্গাজলবাবু, ও ভদ্রমহিলার কথা ছেড়ে দাও। আমি তোমার কৌতূহলের উত্তর দিচ্ছি। তোমার গঙ্গাজলের ঠাকুর্দা, মানে আমার দাদাশ্বশুর হিন্দু স্কুলের একজন 'ডোনার' আর 'বেনিফ্যাকটর'। এই স্কুল প্রতি-ষ্ঠার সময় অনেক টাকা দিয়েছেন। আবার দুটো মেডেলের টাকাও দিয়েছেন তার মায়ের নামে! দেখ, তার এক আধটা পাও কিনা!

মন্মথ হাসতে লাগল নিঃশব্দে।

হৃদয়চন্দ্র চপলাকে পার হয়ে নিজের ডান হাতখানা দিয়ে মন্মথর একখানা হাত সস্নেহে চেপে ধরে নিম্নকণ্ঠে বললে—ওহে গঙ্গাজলবাবু, আজ তোমার হাতখানা

ধরতে বড় ইচ্ছে হলো। মনে হলো সঙ্গে সঙ্গে বলি, সেই 'গঙ্গংবারি মনোহারী' সেই যে কি বলে তাই।
চপলার চোখ দুটো স্বামীর কথায় একবার চকচক করে উঠল সেটা মন্মথ দেখতে পেলে। আশপাশ সম্পর্কে তার সজাগ দৃষ্টির আওতা থেকে কিছু হারায় না। হঠাৎ চপলা স্বামীর ও মন্মথর যুক্তভাবে আবদ্ধ হাতের উপর একবার হাত রাখল। তারপর হঠাৎ মন্মথকে ইঙ্গিত করে ফিসফিস করে বললে—শোন!
মন্মথ কানটা তার দিকে এগিয়ে দিলে। চপলা ফিসফিস করে তার কানে কানে বললে—আচ্ছা, ওই যে প্রথম সারির সবচেয়ে পাশে একেবারে সাদা কাপড়পরা মেয়েটি বসে আছে ওই মালতী, নয়?
মন্মথ চমকে সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। একটা দুটো মুহূর্ত তার মুখ দিয়ে কথা বের হলো না। তারপর সবিস্ময়ে ফিসফিস করেই সে প্রশ্ন করলে—তুমি কি করে চিনলে?
মুখ মুচকে হেসে চপলা বললে—কেমন, চিনতে পারলাম তো!
—তা পারলে! তুমি কিংবা উনি তাহলে জ্যোতিপ্রসাদবাবুকে চেন। সেই থেকে ধরে নিয়েছ।
—না গো না খোকা! আমি চিনতে পারি!
বিস্ময় কাটল না মন্মথর। সবিস্ময়ে বললে—তবু কি কি করে চিনলে?
চপলা গম্ভীরভাবে বললে—ওর পাশ দিয়ে চলে আসবার সময় ও এমন করে তোমার দিকে চাইল! তার থেকেই ওকে চিনতে পারলাম। এইবার বুঝেছ?
বুঝতে পারা দূরে থাক অবাক হলো মন্মথ। বললে—কেমন করে চেয়েছিল? ও তো অমনি করেই সবার দিকে তাকায়। অমনি শান্তভাবে, গম্ভীর হয়ে।
পরক্ষণেই সে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—এবার আমি যাই!
নিজের জায়গায় এসে বসতেই সে দেখলে হেডমাস্টারমশাই একটি জলকাচা পিরান-পরা, লম্বা ঢেঙা, তারই বয়সী, কালো রঙের, চোখে নিকেল ফ্রেমের চশমা পরা একটি ছেলেকে খুব আদর করে হাত ধরে এনে একেবারে প্রথম সারিতেই বসিয়ে দিলেন। ছেলেটাকে চেনা চেনা লাগছে। হেডমাস্টারমশাই ওকে বসিয়ে দিয়ে যাবার সময় একবার তাদের দুজনের দিকে চেয়ে ছেলেটিকে কি বলে চলে গেলেন। কিন্তু চেনা চেনা লাগলেও ওকে চিনতে পারছে না মন্মথ। সত্যকে সে জিজ্ঞাসা করলে—ওই ছেলেটাকে চিনিস রে সত্য।
—হ্যাঁরে, চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু মনে পড়ছে না।
তারপর সত্য হঠাৎ বললে—হ্যাঁরে চিনেছি, আমাদের সঙ্গেই তো প্রেসিডেন্সিতে

পড়ে। তার বেশী চিনি না।

হঠাৎ হলের মধ্যে সকলে সচকিত হয়ে উঠল। সভার সভাপতি এসে পৌছেছেন। সভাপতি এইচ. এম. পার্সিভ্যাল সাহেব।

সভার কাজ আরম্ভ হলো।

স্কুলের কার্যকরী সমিতির সভাপতি সকলকে স্বাগত ও সংবর্ধনা জানালেন প্রথমেই, তারপর প্রধান শিক্ষককে স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট বা বিবরণী পড়বার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন, স্কুলের কার্যনির্বাহক সমিতির সম্পাদক অসুস্থ আছেন, তাই তাঁর জায়গায় স্কুলের প্রধান শিক্ষকমশাই স্কুলের বার্ষিক বিবরণী পড়ছেন।

সত্য এবং মন্মথ পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। সেক্রেটারীর অনুপস্থিতির আসল কারণটা তারা জানে। কানাঘুষোয় তারা শুনেছে। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে সেক্রেটারীর মতবিরোধই তাঁর এই অনুপস্থিতির কারণ। কি একটা বিষয়ে ম্যানেজিং কমিটির বিশেষ করে কমিটির সভাপতি ও নব-নির্বাচিত সদস্য জ্যোতিপ্রসাদবাবুর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য হয়। সেই কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তিনি সভায় আসেন নি। আর ঠিক সেই কারণেই জ্যোতিপ্রসাদ এসেছেন সপরিবারে।

সভার সমস্ত কাজকর্মই ইংরেজীতে। সভাপতি ইংরেজ এবং সরকারী শিক্ষা-বিভাগের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নিজে একজন শিক্ষাবিদ্। তিনি স্বভাবতঃই ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন। তারপর হেডমাস্টারমশাই তাঁর বিবরণী পড়বার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর বক্তৃতাও ইংরেজীতে। লিখিত দীর্ঘ রিপোর্ট। ধৈর্যধারণ করে সবটা শোনা কঠিন কাজ, কারণ স্কুলের পরিচালন-সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটি-নাটি বিষয় তার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে বর্ণনা না করেও উপায় নেই। এই দীর্ঘ নীরস ভাষণ অবশ্য সামনের দিকে উপবিষ্ট অতিথিরা মন দিয়েই শুনছিলেন, কিন্তু পিছনের দিকে বসা নিচের ক্লাসের ছাত্ররা চঞ্চল হয়ে উসখুস করতে আরম্ভ করেছে।

হেডমাস্টারমশাই রিপোর্টটা পড়তে পড়তে একবার একটু থামলেন, চশমাটা খুলে টেবিলের উপর রাখলেন, একবার খালি চোখে পিছনের সারির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সব চাঞ্চল্য স্তব্ধ হয়ে সভাস্থল একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল। তিনি আবার চশমা চোখে দিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন।

পড়ার অবশ্য আর অল্পই বাকী ছিল। তাঁর বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে। তাঁর বিব-

রণীর শেষে তিনি বললেন—যে স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে সে স্কুল তার পুরস্কার দেওয়া নিয়েও অহংকার করতে পারে। এই স্কুলই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে বিখ্যাত ব্যক্তিকে শিক্ষাদানের গৌরব করতে পারে। এই স্কুলই এবার প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বারপথে দুটি উৎকৃষ্ট ছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য পাঠাবার গৌরব লাভ করেছে। তাদের মধ্যে মিঃ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য এবং মিঃ সত্যপ্রসাদ ব্যানার্জী এবারকার প্রবেশিকা পরীক্ষায় যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকারের গৌরব লাভ করেছে। তারা আজকের এই পুরস্কার বিতরণী সভার শ্রেষ্ঠ প্রাপক। তারা এই সভায় আমাদের আনন্দবর্ধনের জন্য উপস্থিত আছে এবং তারাও বিদ্যায়তনের আশীর্বাদ সহ পুরস্কার গ্রহণ করবে।
কার্যবিবরণী পাঠ শেষ হলো। সভাকক্ষ ভরে গেল করতালিধ্বনিতে। পিছনের দিক থেকে কমবয়সী ছাত্ররা সবচেয়ে বেশী উৎসাহের সঙ্গে সর্বাধিক শক্তিতে করতালি দিতে লাগল। হেডমাস্টারমশাই হাত তুলে ইঙ্গিত করতে তবে শান্ত হলো তারা।
এর পর উঠে দাঁড়ালেন পার্সিভ্যাল সায়েব। শক্ত সমর্থ চেহারা, বড় বড় চোখ। প্রথম দেখলেই সবচেয়ে তার মধ্যে যা চোখে পড়ে তা তাঁর বড় বড় চোখের শান্ত স্থির দৃষ্টি। সে দৃষ্টি কেমন এক স্বপ্নালুতায় সর্বক্ষণ স্তিমিত, খানিকটা নম্র। দেখেই মনে হয় এ লোকের কাছে গেলে এ কটু কি রূঢ় কথা বলবে না; কিন্তু কাছে যেতেও ভয় হয়। আর আছে শক্ত সবল মুখে একজোড়া পাকা গোঁফ। তাঁর সর্বাঙ্গে এক ধরনের পরিচ্ছন্নতা আছে, যাকে প্রায় শুচিতা বলা চলে।
তিনি বলতে আরম্ভ করলেন। এ বলার সঙ্গে মন্মথ ও সত্যর সদ্য পরিচয় হয়েছে। বলার কোনো তাড়া নেই, উঁচু গলায় জোরে বক্তৃতার ঢঙে কথা বলেন না। কোমল, গম্ভীর, ভরাট কণ্ঠে আস্তে আস্তে পরিষ্কার উচ্চারণে আপনার বক্তব্য বলতে লাগলেন। ছাত্রদের কর্তব্য, জ্ঞানের আশ্চর্য শক্তি, শিক্ষার মহিমা সম্পর্কে কিছু বলে তিনি হিন্দু স্কুলের এবারকার দুই কৃতী ছাত্র সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ করলেন। বললেন—যে দুটি কৃতী ছাত্র আজ এখানে বিশেষভাবে পুরস্কৃত হচ্ছে, আমার পক্ষে বিশেষ সুখের কথা, তারা দুজনেই আজ আমার ছাত্র। আমি কামনা করব, আমার শিক্ষায় তাদের চিত্তের ও বুদ্ধির যেন পরিপূর্ণ উৎকর্ষ সাধিত হয়।
তারপর আরম্ভ হলো পুরস্কার বিতরণ। পার্সিভ্যাল সায়েব পুরস্কার দিতে লাগলেন। হেডমাস্টারমশায়ের হাতে একটি করে পুরস্কারের লাল রেশমী ফিতে-বাঁধা বইয়ের সম্ভার এগিয়ে দিতে লাগলেন একজন মাস্টারমশাই। হেডমাস্টারমশাই প্রাপকের নাম ধরে ডাকেন, এবং কিসের জন্য পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে তা উচ্চারণ

করেন। তারপর পুরস্কারের সামগ্রীটি এগিয়ে দেন পার্সিভ্যাল সায়েবের হাতে। ততক্ষণে প্রাপক এসে নমস্কার করে, অঞ্জলি পেতে ডায়াসের নিচে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পার্সিভ্যাল সায়েব তার হাতে পুরস্কার দিয়ে একটু হাসেন।

প্রথমেই উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে পুরস্কার পেলে মন্মথ ও সত্য। বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য, অঙ্ক, সংস্কৃত ও বাংলায় প্রথম হওয়ার জন্য চারটি পুরস্কার পেলে মন্মথ। বাৎসরিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার জন্য এবং ইংরেজীতে ফার্স্ট হওয়ার জন্য, এবং লেখাপড়া, শিক্ষা-সংস্কৃতি, খেলাধূলা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে স্কুলের শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসেবে তিনটি পুরস্কার পেলে সত্য। শেষ পুরস্কারটি সত্যর হাতে দেবার সময় পার্সিভ্যাল সায়েব তার পিঠে মৃদুভাবে দুবার চপেটা-ঘাত করে তাকে সমাদর প্রকাশ করলেন। তারপর সমস্ত পুরস্কারের অন্তে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য মন্মথ এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করার জন্য সত্য দুজনে দুটি স্বর্ণপদক পেলে। সব সমেত মন্মথর পাঁচটি পুরস্কারের মধ্যে তিনটি পদক, দু দফা বই। সত্যর দুটি পদক, দু দফা বই।

পদক বিতরণের সময় হাততালি পড়ল সবচেয়ে বেশী করে। একটি পদক নেবার সময় মন্মথ আড়চোখে লক্ষ্য করেছিল চপলা আর হৃদয়চন্দ্র জোরে হাততালি দিচ্ছে। তার থেকেই সে বুঝতে পারলে এ পদক ওদের দেওয়া।

সভা শেষ হলো।

সঙ্গে সঙ্গে হেডমাস্টারমশাই সত্য ও মন্মথকে একটু থাকতে বলে সভার সভাপতি ও কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতিকে বিদায় সংবর্ধনা জানাতে বেরিয়ে গেলেন।

হলের মধ্যে এলোমেলো ভিড়। অতিথিরা কেউ কেউ বসে আছেন, কেউ কেউ দল বেঁধে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন। জ্যোতিপ্রসাদ তখনও সপরিবারে বসে রয়েছেন। আর তাঁদের থেকে কয়েকখানা চেয়ার ছেড়ে বসে আছে সেই ছেলেটি। সেই জল-কাচা জামা পরা, নিকেলের চশমা লাগানো, কালো লম্বা ছেলেটি। মন্মথ লক্ষ্য করলে তার বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই, সে যেন আশপাশের কোনো গোলমাল বা মানুষকে দেখছে না, নিবিষ্ট চিত্তে হলের মেঝের দিকে মুখ নামিয়ে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। মন্মথ দেখালে সত্যকে। সত্য বললে—ছেলেটা কে রে? আমাদের সঙ্গে পড়ে, অথচ চিনতে পারছি না। দেখলি হেড-মাস্টারমশাই ওকে কি রকম আদর করে বসালেন।

এই সময় হেডমাস্টারমশাই এসে পড়লেন। তিনি সত্য আর মন্মথকে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন সেই ছেলেটির কাছে। ওদের দুজনকে তার কাছে এনে হাসিমুখে বললেন—তোমরা একসঙ্গে পড়, তোমাদের এখনও পরিচয় হয় নি? খুব দুঃখের

কথা!

ছেলেটি ততক্ষণে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখে তার অপ্রস্তুত, অস্ফুট হাসি।

হেডমাস্টারমশাই পরিচয় করিয়ে দিলেন—লোকেশ, এই হলো মন্মথ আর এ সত্য। আর তোমরাও চিনে রাখ এ লোকেশ, লোকেশচন্দ্র সেন। এবার বাখরগঞ্জ জেলা স্কুল থেকে তোমাদেরই সঙ্গে এণ্ট্রান্স পাস করে সেকেণ্ড হয়েছে।

তিনজনেই পরস্পরের দিকে স্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

হেডমাস্টারমশাই মন্মথ ও সত্যকে বললেন—লোকেশ ইজ এ জেম। তোমরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করো। দদাতি প্রতিগৃহ্নাতির মধ্য দিয়েই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। বিদ্যা এবং সেই সঙ্গে ভালবাসার ও বিশ্বাসের আদান-প্রদান হলে দেখবে তোমরা তিনজনেই উপকৃত হয়েছ। যদি কোনো দিন এ নিয়ে মনে কোনো দ্বিধা আসে তখন মনে করো আমি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি রাখতে আদেশ করেছি। লোকেশ, তুমি মধ্যে মধ্যে আমার বাড়িতে আসবে যেমন আস। আজ যাও তোমরা!

এমন সময় কে যেন মন্মথর কাঁধে হাত রাখল। কেমন এক ধরনের অস্বস্তি ও বিরক্তিবোধ করে সে মুখ ফেরালে। দেখলে, খুব আশ্চর্য হয়েই দেখলে, কাকা জটাধর পুরো সায়েবী স্যুট পরে আত হৃদ্য হাসি মুখ নিয়ে তার কাছে এসে তার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছে। সে কাঁধের থেকে হাতটা সরাবার জন্য একটু সরে গেল। তারপর প্রণাম করে বললে—কাকা, তুমি?

জটাধর একমুখ হেসে বললে—হ্যাঁ, আমিই তো! যাক, তবু চিনতে পেরেছিস। এত প্রাইজ পেলি আর আমাকে বাবা একটা খবর দিলি না আগে?

মন্মথ হাসল একটু, কাকার অনুযোগের কোনো জবাব দিলে না। এই অনুযোগের কিই বা জবাব দেবে সে!

এই সময় সত্য নিজের প্রাইজগুলি নিয়ে চলে গেল তার পাশ থেকে। মন্মথ লক্ষ্য করলে জ্যোতিপ্রসাদবাবু এবং তাঁর বাড়ির মেয়েরা সব উঠে দাঁড়িয়েছেন যাবার জন্য। মন্মথ দেখলে সত্য কাছে যেতেই তার হাত থেকে হাসিমুখে প্রাইজের বই ও মেডেলগুলি নিয়ে নিলে মালতী। তার মনটাও কেমন করে উঠল একবার। সেও যদি নিজের প্রাইজগুলি একবার অমনিভাবে মালতীর হাতে তুলে দিয়ে হাসিমুখে বলতে পারত—তুমি দেখ একবার!

তার বদলে সে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

লোকেশ তার পাশেই এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সে বললে—আমি যাই,

আবার কলেজে দেখা হবে।
তার কথা, সে যে পাশেই আছে এটা যেন ভুলেই গিয়েছিল মন্মথ। তার এক-খানা হাত ধরে বললে—চললেন আপনি? থাকেন কোথায়?
—শেয়ালদ'র কাছে। বলে একটু হেসে সে চলে গেল।
এই সময়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল চপলা, হৃদয়চন্দ্র আর চপলার ভাই। চপলা বললে—এখন কোথায় যাবে? চল আমার বাপের বাড়ি চল আমার সঙ্গে।
জটাধর কথা বলার স্থযোগ পাচ্ছে না। সে এবার বললে—তুই অনেকদিন যাস নি। তোর খুড়ী বলছিল। যাস একদিন! বুঝলি! খোকার আবার অন্নপ্রাশন আসছে।
জটাধর চলে গেল। বাধ্য হয়েই চলে যেতে হলো তাকে। সে চপলার দলবলের কাছে আর কথা বলার স্থযোগ করতে পারলে না।
মন্মথ একটু গলা তুলে বললে—কাকাবাবু, কাকীমাকে বলবেন, আমি যাব দু-একদিনের মধ্যেই।
জটাধর ওর উত্তর শুনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে পরিতৃপ্ত হয়েই চলে গেল।
মন্মথ চপলার অনুরোধে একটু বিব্রত হয়েই একবার চাইলে সত্যর দিকে। সত্যরা চলে যাচ্ছে। মন্মথ ডাকলে—এই সত্য, একটু দাঁড়া।
সে নিজের পুরস্কারগুলি নিয়ে তার কাছে গিয়ে তার হাতে তুলে দিয়ে বললে—এগুলো তুই নিয়ে যা ভাই তোদের বাড়ি। আমি এঁদের সঙ্গে যাচ্ছি। সন্ধ্যের সময় ফিরে আমি নেব এগুলো।
সত্য সেগুলো কে জানে কেন মালতীর দিকেই বাড়িয়ে ধরলে। মালতী মৃদু হেসে বললে—আমার হাত তো জোড়া তোর জিনিসে। সন্ধ্যা দিদিকে দে।
সত্যর মা হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে মন্মথর সব পুরস্কারগুলি নিয়ে নিলেন। কী আগ্রহ ও তৃপ্তির সঙ্গে যে তিনি সেগুলি গ্রহণ করলেন তা দেখে মন্মথর চোখ ছলছল করে উঠল। চপলা একদৃষ্টিতে ওঁদের দিকে তাকিয়ে ছিল। বিশেষভাবে দেখছিল মালতীকে। মালতী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চেয়ে রইল। তার-পরই বেরিয়ে গেলেন ওঁরা।
মন্মথর হাত ধরে টান দিয়ে চপলা বললে—চল, আমরাও যাই।
গাড়িতে যেতে যেতে চপলা বললে—তোমার ওই মালতী সত্যিই স্থন্দরী মেয়ে! আর তেমনি স্থন্দর করে সাজপোশাক করতে জানে। কিন্তু কেমন যেন বুড়োটে রুচি, সব সাদা পরেছে।
মন্মথ কোনো কথা বলছে না, হাসলও না, কেবল একটি অপকট আনন্দ ভিতর

থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসে তার মুখখানিকে একবার উদ্ভাসিত করে দিয়ে গেল।

হৃদয়চন্দ্র প্রশ্ন করল—মালতী কে?

স্বামীর গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে চপলা বললে—তুমি একটি হাঁদারাম। মালতীকে দেখলে না? আমাদের গঙ্গাজলের মালতী!

শশব্যস্ত, বিব্রত হয়ে উঠল মন্মথ। বললে—এই গঙ্গাজল, কি যা-তা বলছ?

—যা-তা বলছি? আমি? তেড়ে উঠল চপলা।

স্ত্রীকে সহাস্যে থামিয়ে দিয়ে হৃদয়চন্দ্র বললে—ওই সাদা কাপড়চোপড় পরা মেয়েটি? ও কে? জ্যোতিপ্রসাদবাবুর মেয়ে?

—না, ভাইঝি। সংশোধন করে দিল মন্মথ।

—আচ্ছা! জ্যোতিপ্রসাদবাবু তো মস্ত উকীল। তা ছাড়া খুব কালচার্ড মানুষ, নানান 'অরগেনিজেশনের' সঙ্গে আছেন। শহরে ওঁর অনেক নাম।

চপলা বললে—তা হবে। তবে বাপু, যাই বল, বাড়ির মেয়েদের বড় ঠেকার, বড্ড দেমাক।

—দেমাক? দেমাক কিসে দেখলে তুমি? স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল হৃদয়চন্দ্র।

চটে গেল চপলা। মুখঝামটা দিয়ে বললে—অত ব্যাখ্যান করতে পারি না বাপু! ওদের দেখে আমার যা মনে হলো তাই বললাম।

সেই যে সে চুপ করে গেল, বাপের বাড়িতে গাড়ি থেকে নামার সময় পর্যন্ত আর কোনো কথা সে বললে না। বাপের বাড়ির গেটে গাড়ি থামলে গাড়ি থেকে নামবার সময় স্নেহমধুর স্বরে চপলা বললে—নাম ভাই গঙ্গাজল, আমার বাপের বাড়িতে এসে গিয়েছি।

চপলার বাপের বাড়ি দেখে কলকাতার সম্পন্নতা ও সচ্ছলতা দেখায় মন্মথর অভ্যস্ত চোখেও বিস্ময়ের ঘোর লাগল। সম্পদ এখানে যত বৃহৎ তত উজ্জ্বল। বাড়িখানা যত বড় তত ঐশ্বর্য।

চপলা ওদের ড্রইং রুমে বসিয়ে চলে গেল বাড়ির ভিতরে। চারটে বাজল বোধ-হয়। ড্রইং রুমের ভিতরে কাছাকাছি একই সময়ে অন্তত পাঁচ ছটা ক্লক নানান শব্দ করে, নানান ধরনের সুরেলো আওয়াজ তুলে বাজতে লাগল। ওদিকে নিচে, বোধহয় বাড়ির গেটে, পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা বাজতে লাগল—ঢং ঢং।

চপলা ফিরে এলো নাচতে নাচতে। স্বামীকে বললে—তুমি ভেতরে যাও, পিসীমা ডাকছেন তোমাকে।

—পিসীমা ? চপলা বলার সঙ্গে সঙ্গে পিসীমার নামটা সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করে হৃদয়চন্দ্র তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল এবং খুড়তুতো শ্যালকের সঙ্গে চলে গেল ভিতরে।

চপলা সায়েববাড়ির দামী সোফায় মন্মথর পাশে বসে পড়ে বললে—একটু বস গঙ্গাজল। এই সবে ঘুম থেকে উঠেছেন কর্তারা। বাবা এখুনি আসছেন, তিনি উঠেছেন। কাকা উঠছেন ; উঠেই আসবেন।

বলতে বলতে চাকর ঘরে ঢুকল দীর্ঘ নল-লাগানো রুপোর গড়গড়া নিয়ে। মাথায় রুপোর কলকে বসানো। তামাকের মিষ্টি গন্ধে ঘরখানা ভরে গেল। মন্মথ বিড়ি সিগারেট তামাক কিছুই খায় না। কিন্তু এই মিষ্টি গন্ধ নাকে আসতে এই তামাক খাবার ইচ্ছা হলো তার।

এ সম্পর্কেই কোনো কথা হালকা করে সে বলতে যাচ্ছিল চপলাকে। কিন্তু বলা হলো না। একজন পুরুষ ঘরে এসে ঢুকলেন। মেদহীন দীর্ঘ দেহ, অত্যন্ত ফরসা দেহবর্ণ, প্রায় শ্বেতপাথরের মতো। পাতলা পাতলা লম্বা গড়ন। গায়ে কনুই পর্যন্ত গেঞ্জি, পরনে কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতি, কোঁচা মাটিতে লুটোচ্ছে, পায়ে দামী কাজকরা [illegible] চটি। উনি ঘরে ঢুকেই মন্মথকে দেখে একটু হাসলেন। তারপর সোফায় বসে গড়গড়ার নলটি তুলে নিলেন।

চপলা উঠে দাঁড়ালো। হাসিমুখে মন্মথকে বললে—আমার বাবা!

মন্মথ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলে। তার সম্ভ্রম প্রকাশ ও প্রণাম করার ধরন দেখে খুশী হলেন ভদ্রলোক। বললেন—হয়েছে, হয়েছে, বস।

সে আবার সোফায় ফিরে গিয়ে বসতে তিনি বললেন—চপলার মুখে তোমার নাম তো অনেক শুনেছি। খুব খুশী হলাম আমি তোমাকে দেখে। আমাদের বাড়ির দেওয়া মেয়েকে পেয়ে কোনো ছেলে সেইদিন আমাদের বাড়িতে এসেছে —এটা একটা মনে রাখার মতো ঘটনা বটে।

মন্মথ চুপ করেই ছিল। সে হাসিমুখে তাঁর কথা শুনছিল। সে বড়লোকদের স্বভাব জানে। এঁরা কথা বলতে চান, শুনতে চান না। সমীহ করে খুশী হয়ে এঁদের কথা শুনলেই ওঁরা খুশী।

কথা বলতে বলতে এক সময় তিনি বললেন, তুমি কিছু খেয়েছ ? [illegible] হ্যাঁ মা, এ কি বুদ্ধি তোমার ? খাবার নিয়ে এস ! তোমাদের গাঙ্গুলী বাড়ির ছেলে পেয়েই ওকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, ওকে কিছু খেতে দেবে না ?

চপলা হাসল। বললে—পিসীমা নিয়ে আসছেন। বললেন আমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন—ওঃ, দিদি আনছে! তবে ঠিক

আছে।

মন্মথ দেখলে পিসীমা বা দিদি তিনি যেই হোন তাঁর আশ্চর্য মাহাত্ম্য এই পরিবারে।

ঠিক এই সময়ে চাকরের হাতে জলখাবার দিয়ে পিসীমা এসে ঘরে ঢুকলেন। চপলা যে চপলা সেও উঠে দাঁড়াল। মন্মথ আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে। চপলা বললে—গঙ্গাজল, আমার পিসীমা, প্রণাম কর।

মন্মথ প্রণাম করলে। পিসীমা তাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বেশ ভালো করে খুঁটিয়ে যেন দুবার দেখে নিলেন।

মন্মথকে তখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস!

মন্মথ সসম্ভ্রমে হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে বললে—আপনি বসুন, না হলে আমি বসব কি করে?

পিসীমাকেও দেখে নিলে মন্মথ। আশ্চর্য রূপসী মহিলা। বয়সে চপলার বাবার চেয়েও বড়। তার মানে বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অত বয়স মনেই হয় না। দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী। আর গায়ের রঙ চপলার বাবার গায়ের রঙের চেয়েও ফরসা, পাতলা ছিপছিপে শরীর, মুখখানি এখনও কচি কচি। কেবল বড় বড় চোখ দুটি তাঁর একটু ভারী ভারী হয়ে এসেছে, দুই চোখের কোলের কাছটা ফোলা ফোলা। এ ছাড়া মুখে কোথাও কোনো দাগ নেই, মসৃণ মুখ। তবে চিবুকের নিচে একটি কোমল মাংসের থাক পড়েছে। মন্মথ সবটা খুঁটিয়ে দেখতে না পারলেও বয়সের একটা স্পষ্ট অনুমান পেলে। মনে হলো বয়েস হয়েছে, কিন্তু বয়স দেখায় না।

দেখাবেই বা কি করে? শরীর তাঁর ভারী হয় নি। আর বয়স চাপা দেবার কত চেষ্টা! অত বয়স হয়েছে, অথচ কি সজ্জার ঘটা! ভদ্রমহিলা যে বিধবা তা তাঁর সিঁথি দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু তাতে সজ্জার কোনো কমতি হয় নি।

পিসীমা আসন গ্রহণ করলেন। বসলেন ভাইয়ের সামনের সোফায়। তিনি বসতে বসতে বললেন—স্বভাবটা বেশ মিষ্টি আর সরল আছে এখনও। এখনও তো পুরো শহুরে ছাপ লাগে নি।

কথাটা যেন তিনি আপন মনেই বললেন। কাউকে শোনাবার জন্য নয়!

বসেও তিনি ভুরু কুঁচকে মন্মথকে দেখছিলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—তোমার বয়স কত হয়েছে?

সবিনয়ে মন্মথ বললে—আজ্ঞে, এই সতেরো পার হয়ে সবে আঠারোয় পড়েছি!

—অ, তাহলে তুমি আমাদের চপলির চেয়ে ছোট। একটু চুপ করে থেকে বললেন—তা তুমি লেখাপড়ায় তো খুব ভালো শুনেছি। লেখাপড়া মন দিয়ে ক'রো বাপু! লেখাপড়ার তুল্য কি জিনিস আছে।

হঠাৎ খেয়াল হতেই পিসীমা বললেন—ও কি, খাও! শরবতটার ঠাণ্ডা আমেজটা নষ্ট হয়ে যাবে। শরবতটা আগে খাও। আমি জল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বলে পিসীমা বেরিয়ে গেলেন? যাবার আগে পিসীমা ভাইকে বললেন—তুমি তো আছ গোপু!

—আছি তো! তামাক টানতে টানতে গোপেশ্বরবাবু বললেন।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন গোপেশ্বরবাপু। মেয়েকে বললেন—তোরা বস মা, আমি আসছি।

চপলা একটু হাসল। তার হাসির অর্থ বুঝতে না পেরে মন্মথ তার মুখের দিকে তাকাতেই চপলা মুখ টিপে হেসে বললে—বাবার উঠে যাওয়া দেখে হাসছি। বাবা বাথরুমে গেলেন। দিনে যখন তখন অন্ততঃ দশ বারো বার যাওয়া চাইই। ওঁর ধারণা ওঁর পেট পরিষ্কার হয় না।

মন্মথ একটু হাসল।

চাকর এসে ঢুকল ঘরে জলের গ্লাস নিয়ে। সে টেবিলের উপর জলের গ্লাস রাখতে রাখতে নিচুগলায় চপলাকে বললে—দিদিমণি, আপনাকে পিসীমামণি ডাকছেন।

সেই অলঙ্ঘনীয় পিসীমা! সেই অলঙ্ঘনীয় আদেশ। চপলা উঠে চলে গেল। মন্মথ ঘরে একা বসে রইল।

হঠাৎ কাদের কথা ভেসে এসে লাগল তার কানে। পাশের ঘরেই কারা কথা বলছে বন্ধ দরজার ওপাশে।

—রাগ করিস না মা। তোর ভালোর জন্যেই বলছি! ওকে নিয়ে অত আদিখ্যেতা করিস না, দেখিয়ে দেখিয়ে অত আদর করিস না, অত মাখামাখি করিস না।

—তুমি এর মধ্যে দোষ দেখছ পিসীমা?

—দোষ দেখছি না! তবে ভয় লাগছে কোন্‌দিন দোষ হয়ে চোখে লাগবে!

—ও আমার চেয়ে বয়সে ছোট। ওর সঙ্গে মিশলেও দোষ হয়ে চোখে লাগবে?

কোনো উত্তর নেই। অন্য পক্ষ নীরব।

—জান পিসীমা, ওরই দয়াতে তোমার জামাই বেঁচেছে? ওরই জন্যেই তোমার জামাইকে পেয়েছি? তোমার জামাইও ওকে আমার চেয়ে কম ভালবাসে না। ওকে দেবতার মতো ভাবে!

—তাইতো বলছি মা! দেবতার দয়া নিয়ে মানুষ বাঁচে। কিন্তু তাই বলে কোনো

সংসারী মানুষ দেবতার সঙ্গে মাখামাখি করতে যায় না! আর একটা কথা তোমাকে সোজা করে বলি মা! তুমি বুঝতে চাইছ না বলেই বলতে হচ্ছে। তোমার স্বামী আজ তোমাকে নিয়ে আনন্দে আছে, সুখে আছে, মজে আছে। কিন্তু মা, যে পুরুষের স্বভাব ভালো নয়, স্বভাব-চরিত্রে দোষ থাকে, তারা নিজের মতোই সংসারকে দেখবে, অন্যকে দেখবে, নিজের পরিবারকেও দেখবে! অন্য পুরুষ, তা সে বয়সে ছোটই হোক, তার সঙ্গে বেশী মাখামাখি, ঢলাঢলি করলে সেও একদিন না একদিন খারাপ চোখে দুষ্টভাবে দেখবেই।

আবার নীরবতা কান্নার ফোঁস ফোঁস শব্দ উঠতে লাগল। তারপর কান্নায় ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বরে জবাব শুনতে পেলে—এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি পিসীমা; আমার মনে ওর সম্বন্ধে কোনো কুভাব নেই। গঙ্গার ঘাটে গঙ্গাজল হাতে নিয়ে ওর সঙ্গে গঙ্গাজল পাতিয়েছি! ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক গঙ্গাজলের মতো। তাতে কোনো পাপ নেই। তুমি বিশ্বাস কর।

—আমি জানি মা, আমি জানি। আমি তোমাকে অবিশ্বাস করি না শুধু তোমার স্বামীর কথা ভেবে তোমাকে সাবধান করে দিলাম। তোমার নামে এই নিয়ে কোনো কথা উঠলে, কি এই নিয়ে তোমার স্বামীর মনে কোনো 'ঃ' ঢুকলে তখন সামলানো কঠিন হবে। আমি তোমাকে বুকে করে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছি। আমার সাত আট লাখ টাকা সবই তোমার। কিন্তু এ নিয়ে কিছু হলে তখন আমার টাকা দিয়েও তোমাকে বাঁচাতে পারব না!

তারপর নীরব। সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেল পাশের ঘর। কথা শুনতে শুনতে মন্মথ এতক্ষণ প্রায় নিশ্বাস রোধ করে বসেছিল। সে বুঝতে পেরেছে কথা হচ্ছিল পিসীমা আর চপলার মধ্যে। আর কথা তাকেই নিয়ে। চপলার শেষ কথাগুলি, চোখের জলের সঙ্গে মিশিয়ে সে যা উচ্চারণ করলে তাতে তার মন একান্ত ভার-হীন, লঘু হয়ে গেল। সে রুপোর পাত্রটা টেনে নিয়ে মিষ্টি ও ফল খেতে লাগল পূজাশেষে দেবতার প্রসাদের মতো।

চপলা এসে ঘরে ঢুকতেই সে বললে—বড্ড খিদে পেয়েছে। আমায় আর কিছু ফল মিষ্টি দেবে গঙ্গাজল?

চপলা এক মুহূর্ত বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ছুটে ঘর থেকে চলে গেল তার প্রায় সমবয়সী গঙ্গাজলের জন্য খাবার আনতে!

বেলা তখনও অনেকটা আছে, মন্মথ উঠে দাঁড়াল ফিরবার জন্য। চপলা বাধা দিয়েছিল। তারপর ছেড়ে দিয়েছিল তাকে। চুপি চুপি বলেছিল তাকে একান্তে

—তোমার মালতীর কাছে যাবার জন্যে ছটফট করছ বুঝি?

তার এ কথায় বড় বিব্রত এবং লজ্জিত হয় মন্মথ। কেন হয় তা সঠিক বুঝতে পারে না, তবু হয়! সে বললে—হ্যাঁ, সত্যদের বাড়ি হয়ে যেতে হবে। প্রাইজের বই আর মেডেলগুলো নিয়ে যেতে হবে তো। আমি আজ আসি!

আসবার সময় গোপেশ্বর গাঙ্গুলী, তাঁর ছোট ভাই ভূপেশ্বর গাঙ্গুলী আর সর্বময়ী কর্ত্রী পিসীমাকে প্রণাম করে সে বলেছিল—আজ আসি পিসীমা!

পিসীমা সদয়ভাবে বলেছিলেন—আবার এসো। তুমি লেখাপড়ায় ভালো ছেলে আর খাঁটি বামুনের ছেলে, খাঁটি ব্রাহ্মণ হয়ো আর ভালো করে লেখাপড়া করো। যদি কখনও কোনো সাহায্যের দরকার হয় বলো। আমার বাবা লেখাপড়ার জন্যে অনেক করেছিলেন।

মন্মথর ভারমুক্ত মনটি এক আশ্চর্য প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সে হেসে বললে—আশীর্বাদ করুন, যেন আমার কোনো সাহায্যের কোনোদিন দরকার না হয়। যদি হয় আমার এই জামাইবাবু রয়েছেন, এই গঙ্গাজল রয়েছে, আমি ওদের কাছে নিশ্চয় বলব। তারপর আপনারা তো থাকলেনই।

সঙ্গে সঙ্গে সে প্রণাম করেছিল হৃদয়চন্দ্রকে। তার প্রণাম পেয়ে হৃদয়চন্দ্র প্রথমটায় বিস্মিত, তার থেকে কেমন যেন দ্রব ও বিগলিত হয়ে গেল। সে কোনো কথা বলতে পারলে না।

তারপর সকলের সামনে নিজের দুখানি হাত নিয়ে চপলার হাত দুখানি ধরে হাসিমুখে বললে—আজ আসি গঙ্গাজল।

চপলা যে স্ত্রীলোক আর সে যে পুরুষ, তার অকুণ্ঠ আনন্দিত চিত্তের এই প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেল। একটি আশ্চর্য প্রসন্নতার সৃষ্টি করে সে বিদায় নিলে।

আসবার সময় সে হেঁটেই চলে আসতে চেয়েছিল কিন্তু চপলাই দেয় নি। সে তাকে ধমক দিয়ে তাদের ল্যাণ্ডো গাড়িতে তুলে দিলে।

চপলার বাপের বাড়ির ল্যাণ্ডো গাড়িখানা মন্মথকে জ্যোতিপ্রসাদের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। জ্যোতিপ্রসাদের বাড়িতে সদাসর্বদা একটি প্রসন্ন আনন্দ একটি স্থির স্মিত হাসির মতো অহরহ বর্তমান থাকে। তাতে সামান্য আনন্দের হাওয়া বাইরে থেকে এসে ধাক্কা দিলে পরিবেশটি উৎসবময় হয়ে ওঠে। সেই উৎসবময়তার পরিবেশ রচিত হয়েছে আজ তাঁর বাড়িতে সত্যর পুরস্কার-প্রাপ্তিকে অবলম্বন করে। মন্মথ তারই মধ্যে পৌঁছতে সেই উৎসব যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

মন্মথ যেতেই জ্যোতিপ্রসাদ আনন্দিত হয়ে বললেন—এই মন্মথ এসে গিয়েছে! তোমার কথাই আমরা বলছিলাম।
মন্মথকে ঘিরে সবাই যেন আনন্দেপ্রভাতী পাখির মতোই কলকল করে উঠল। অনেক আনন্দ আর হাসির পর মন্মথ সত্যকে বললে—এইবার উঠি রে সত্য। হোস্টেলে ফেরার সময় হয়ে আসছে।
—দাঁড়া তোর প্রাইজের বই আর মেডেলগুলো এনে দি!
তার বইগুলো যখন এলো তখন যা একাধিক স্তবকে বিন্যস্ত ছিল তা একসঙ্গে বাঁধা হয়েছে, খবরের কাগজ দিয়ে প্যাক করা হয়ে গিয়েছে। তিনটি মেডেলও একটি বড় পিচবোর্ডের বাক্সের মধ্যে পুরে খবরের কাগজে মুড়ে প্যাক করা। দুটি প্যাকেটই বেশ পরিচ্ছন্ন করে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা।
—কে বাঁধলে এমন করে? মন্মথ প্রশ্ন করলে।
—কে আর? আমাদের বাড়িতে যিনি পরিচ্ছন্নতাকে শিল্পের মতো চর্চা করেছেন সেই ব্যক্তিই নিশ্চয় করেছেন। বলে একটু হাসলেন জ্যোতিপ্রসাদ। বলে হাসি-মুখে তাকালেন মালতীর মুখের দিকে।
মালতীর সেই গম্ভীর শান্ত মুখ। তার দিকে সকলের স্মিত দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে।
সত্য বললে—তুই বইয়ের এত বড় গন্ধমাদন নিয়ে যেতে পারবি এতটা পথ? চল আমি তোকে খানিকটা এগিয়ে দি!
মন্মথ সঙ্গে সঙ্গে হেসে বললে—হ্যাঁ, ত্রেতাযুগ থেকে গন্ধমাদন বইবার দায়িত্ব তো তুমিই নিয়েছ। ওটা তো তোমারই ওপরে। দাও, এগিয়ে দাও আমাকে।
সকলেই তখন হেসে উঠলেন। এমন কি জ্যোতিপ্রসাদ পর্যন্ত। আর ঘরে এক ফোঁটা আতর পড়লে তার গন্ধ যেমন সমস্ত ঘরে অদৃশ্য থেকেও ছড়িয়ে পড়ে, সাদা কাপড়ের উপর এক ফোঁটা লাল রঙ জলে পরিষ্কার করতে গেলে যেমন সারা কাপড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনিভাবে একটি সকৌতুক হাসির আভাস মালতীর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

বইয়ের গন্ধমাদনটা প্রায় সারা পথটাই বয়ে নিয়ে গেল সত্য। মন্মথ দু'একবার তার হাত থেকে নেবার চেষ্টা করেছিল, তাতে সত্য তাকে বাধা দিয়ে বলেছিল —আরে থাম। তোর গায়ের জোর আমার জানা আছে!
তারপরই সত্য গম্ভীরভাবে বলেছিল—দেখ মনু, আমি দেখেছি, তুই খুব সেন্টি-মেণ্টাল, চট করে তোর চোখে জল আসে। জল আসা হয়তো ভালো, কিন্তু তাতে

মন চঞ্চল হয়। মনের চাঞ্চল্য ভালো নয় রে! এই দেখ, আমার মন এত চঞ্চল হয় না। তার কারণ কি জানিস? আমি নিয়মিত 'একসারসাইজ' করি! শরীর শক্ত হলে মনও শক্ত থাকে, শান্ত থাকে। তুই এবার থেকে 'একসারসাইজ' কর। বুঝলি!

মন্মথ মেনে নিলে তার কথা—ঠিক বলেছিস। এবার থেকে তোর সঙ্গেই 'এক-সারসাইজ' করব। তোকেই গুরুজী করে নেব। আচ্ছা, এবার যা তুই!

বইয়ের প্যাকেট নিয়ে হোস্টেলে ঢুকবে এমন সময় হোস্টেলের দারোয়ান বললে—একজন লোক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

—কে? বইয়ের প্যাকেট হাতে ও বগলে মেডেলের বাক্স নিয়ে দাঁড়াল মন্মথ। একটি সাধারণ আধময়লা জামা-কাপড়-পরা মধ্যবয়সী মানুষ এসে কাছে দাঁড়াল।

—কে আপনি? কোথা থেকে আসছেন? মন্মথ জিজ্ঞাসা করলে।

ভদ্রলোক বললেন—আমাকে মাধববাবু পাঠিয়েছেন চিঠি দিয়ে।

অবাক হলো মন্মথ। মাধববাবু পাঠিয়েছেন? আশ্চর্য, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের সুতো অনেকদিন কেটে গিয়েছে। তবে? আবার কি দরকার? সে মনের বিস্ময় মনে চেপে রেখে সহজভাবে বললে, আসুন আমার সঙ্গে।

ঘরে ঢুকে বইয়ের প্যাকেট ও মেডেলের বাক্স নামিয়ে রাখতেই ভদ্রলোক তার হাতে একটি খাম ও একটি মোড়ক-করা বাক্স দিলেন। আরও বিস্মিত হলো মন্মথ। কি আছে চিঠিতে? কি আছে বাক্সেতে?

সে চিঠিখানি খুললে। মাধবাবুর কি সুন্দর ও পরিষ্কার হস্তাক্ষর। বড় বড় পরিচ্ছন্ন অক্ষরে লিখেছেন, আজ হিন্দু স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় ছাত্র হিসেবে তার কৃতিত্বের জন্য সে অনেক পুরস্কার পাবে তা তিনি আগে জেনেছেন। জেনেছেন দ্বিজু মুন্সীর কাছ থেকে। তাই সেই পুরস্কারের সঙ্গে তিনি তাঁর পুরস্কার যোগ করে দিয়ে একটি পকেটঘড়ি পাঠিয়েছেন। সে এটি ব্যবহার করলে তিনি খুব খুশী হবেন।

মোড়ক খুলে সে ঘড়িটি বের করলে। চমৎকার ঘড়িটি! রুপোর ঘড়ি, মাথায় রিঙের সঙ্গে কালো কার বাঁধা।

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন—আপনার পছন্দ হয়েছে?

হেসে মন্মথ বললে—খুব!

ভদ্রলোক বললেন—ঘড়িটা আপনার শার্টের সঙ্গে লাগিয়ে দেব? বাবু বলেছিলেন, ঘড়িটা ওর জামায় লাগিয়ে দিয়ে আসবে।

মন্মথ বিনীতভাবে বললে—ওঁকে আমার প্রণাম দেবেন। আমি গিয়ে একদিন প্রণাম করে আসব ওঁকে। আর বললেন, ঘড়ি আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

ভদ্রলোক চলে গেলে মন্মথ বইয়ের প্যাকেট নিয়ে বসল। মেডেলের বাক্সটি সে খুলল না। ও থাক। ও পরে দেখলেই চলবে। সে প্যাকেটটি আস্তে আস্তে খুললে বড় যত্নে। খুলবার সময় যে বেঁধে দিয়েছে কত যত্ন করে তার সযত্ন পরিচ্ছন্নতার কথা মনে পড়ে প্যাকেটটি সে সেই যত্ন দিয়ে খুলে সেই মনোযোগই যেন তাকে আবার ফিরিয়ে দিলে। খবরের কাগজের প্যাকেটের মধ্যে সেই লাল রেশমী ফিতে দিয়ে আবার বইগুলি সব একসঙ্গে বাঁধা। লাল রেশমী ফিতেটিও সে বড় যত্ন করে খুললে। প্রত্যেক প্রাইজের উপরে যে ছাপা কাগজে পুরস্কারের নাম ও প্রাপকের নাম লেখা ছিল সেগুলি বইয়ের ভিতরে প্রথম পৃষ্ঠায় গঁদ দিয়ে যত্ন করে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। এখন কি কি বই পেয়েছে দেখা যাক! সে কলেজে ভর্তি হয়েছে, অথচ অধিকাংশ বই তার নেই। সে পড়ে কলেজ লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে। তার সে প্রয়োজন এবার প্রায় মিটল। যা যা বই সে প্রাইজে পেয়েছে তার অধিকাংশই কলেজপাঠ্য বই। কেমেস্ট্রী, অঙ্ক, ইতিহাসের বই আর রয়েছে একখানা ভালো চেম্বার্স ডিক্‌স্‌নারী। আর সেই সঙ্গে সেক্‌স্‌পীয়ারের সম্পূর্ণ রচনাবলী। সেক্‌স্‌পীয়ারের রচনাবলীর নিচে আরও একখানি বই রয়েছে। Uncle Tom's Cabin!

এখানা এখানে কেন? সে বইখান তুলে নিলে। বইখানি তাহলে মালতী পড়া শেষ করে এই সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়েছে। বুকটা ধক করে উঠল একটা কথা ভেবে! সেই বেলফুলের শুকনো মালাটা তো এরই মধ্যে ছিল। সেটি কি এখনও আছে? সে পরম আগ্রহে বইখানি খুলে দেখলে। নাঃ নেই তো! তাহলে মালাটি কোথায় গেল? বইটি ওলটাতে ওলটাতে একবারে নিচের দিকে একটি লাল রেশমী ফিতে বাঁধা খাম পেলো সে। আগ্রহের সঙ্গে একান্ত যত্নভরে খামটি খুলে দেখলে সে। সেই বেলফুলের মালাগাছি রয়েছে তার মধ্যে। শুকনো ফুলের পাপড়ি বাদামী হয়ে কোথাও কোথাও ভেঙে রয়েছে। মালাটি বের করতেই একটি ছোট্ট সাদা কাগজের টুকরো বেরিয়ে এলো। তাতে পরিচ্ছন্ন সুন্দর হস্তাক্ষরে ছোট্ট কটি কথা লেখা 'চিরকালের টাটকা মালা'।

সে সেই পরম ধনটি হাতে করে কিছুক্ষণ বসে থেকে কার পায়ের শব্দ শুনেই আবার মালাটি সংগোপনে যত্নের সঙ্গে খামের মধ্যে পুরে ফেললে।

কলেজের হোস্টেলের দারোয়ান তখন দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

কে আবার ডাকছে তাকে।

সে আগন্তুককে তার ঘরে পাঠিয়ে দিতে বললে।

আগন্তুক আর কেউ নয়, দ্বিজু মুন্সী। তার মুন্সী দাদু। প্রৌঢ়কে দেখে তার খুব ভালো লাগল, কিন্তু সে অবাক হলো তার চেয়ে আরও বেশী। সে হোস্টেলে আসবার পর তার সঙ্গে অনেকবারই মুন্সীর দেখা হয়েছে। কিন্তু সব দেখাই হয়েছে মুন্সীর বাড়িতে। হোস্টেলে সে একবারও আসে নি সেই প্রথম দিন পৌঁছে দিতে আসা ছাড়া। তাই সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—মুন্সী দাদু, আপনি? এত রাত্রে?

মুন্সী হেসে বললে—রাত্তির আর কোথায় ভাই? এই তো এখন বোধহয় সাতটা বাজছে।

—সাতটা? সাতটা কোথায় এখন বাজছে—বলে সে ঘড়ি দেখে বললে—এখন বাজছে আটটা কুড়ি!

মুন্সী একটু হাসল। হেসে বললে—কলকাতা শহরে আটটা কি আর রাত্তির ভাই! এই শহরে এখনও বাবুরা কত রাত অবধি আমোদ-স্ফূর্তি করে, কত রাত পর্যন্ত গাড়ি-ঘোড়া চলে। আর আমি তো গরীব মানুষ ভাই! আমি ঘড়ি কোথায় পাব বল। দিনে বাড়ির ছায়া দেখে আর রাত্রিতে অন্ধকার কতটা ঘন হয়েছে, আকাশের তারা কতটা ফুটেছে তাই দেখে সময় আন্দাজ করি।

বলে আবার একটু হাসল মুন্সী। মন্মথর মনে হলো এই সামান্য মানুষটি বড় দুঃখী। দুঃখী মানুষের সহজ স্বাভাবিক হাসিতে সবদা যে বেদনা প্রচ্ছন্ন থাকে সেই বেদনাকে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে মন্মথ। সে তার কাছে সরে এসে বললে—কিন্তু কেন এসেছেন এত রাত্রে তা বললেন না তো?

—শুনলাম আজ স্কুলের প্রাইজে কত বই, কত মেডেল পেয়েছ। তাই দেখতে এলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে একান্ত লজ্জিত বোধ করলে মন্মথ। তাইতো, এই স্নেহশীল বৃদ্ধের কথা তো আজ তার একবারও মনে হয় নি। মনে হয় নি ও সামান্য লোক, দুঃখী মানুষ বলেই কি? সে শশব্যস্ত হয়ে বললে—আমিই তো যেতাম দাদু আপনার কাছে, চারু-মার কাছে। সব নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসতাম।

বলে মুন্সীকে চেয়ারে বসিয়ে যত্নের সঙ্গে সব বই ও সব মেডেলগুলি দেখালে এক এক করে। মুন্সী চোখে চশমা লাগিয়ে সব দেখলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দেখে একান্ত পরিতৃপ্ত মনে চশমাটি মুড়ে খাপে পুরে কোটের পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল। হাসি-মুখে তার মুখে তার মাথায় হাত দিয়ে বললে—আশীর্বাদ করি ভাই অনেক বড় হও। বাপ-মায়ের, বংশের, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।

বলে সে একটু সখেদে বললে—এই তো ভাই, আমার বড় ছেলেটা এই তো চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হলো, লেখাপড়া করলে না, আড্ডা মেরে ঘুরে বেড়ালে। এখন বিয়ে করে আলাদা হয়ে গিয়েছে, পাটের কলে কাজ করে। মেজটাকে তো তুমি দেখেছ, প্রায় তোমারই বয়সী। তা লেখাপড়ায় একেবারে মন নেই! পড়েছে খানিকটা, এখন কিছু না করে ঘুরে বেড়ায়।

বলতে বলতে অকস্মাৎ থেমে গেল বৃদ্ধ। তার সকরুণ দীর্ঘশ্বাসটি রাত্রির অন্ধকারে মিশে গেল।

বলতে বলতে অকস্মাৎ থেমে গেল বৃদ্ধ। তার সকরুণ দীর্ঘশ্বাসটি রাত্রির অন্ধকারে মিশে গেল।

সে যাবার জন্য পা বাড়ালে। বললে—আজ যাই। তুমি একদিন এসো, তোমার সব জিনিস নিয়ে তোমার চারু-মাকে দেখিয়ে যেও।

বৃদ্ধকে এগিয়ে দেবার জন্য তার সঙ্গে যেতে যেতে মন্মথ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধের একটা বাহু চেপে ধরলে। বললে—একটু দাঁড়ান দাদু! একটু থতমত খেয়ে বৃদ্ধ বললে—দাঁড়াব? কেন।

—দাঁড়ান না! বলে সে টেবিলের উপর থেকে কেসসুদ্ধ পকেট ঘড়িটি তুলে নিলে। সেটি হাতে তুলে সে বৃদ্ধের কোটের বোতামের সঙ্গে বাঁধতে লাগল।

বৃদ্ধ অবাক। সে হাঁ হাঁ করে উঠে বললে—আরে করছ কি, কি করছ?

ঘড়িটি তার কোটের বোতামের সঙ্গে আটকাতে আটকাতে মন্মথ বললে—কিছু করি নি, আপনাকে একটা পকেট ঘড়ি পরিয়ে দিচ্ছি।

—পকেট ঘড়ি? আমি পকেট ঘড়ি নিয়ে কি করব?

—পরে থাকবেন, সময় দেখবেন।

একান্ত বিস্মিত, বিব্রত ও আনন্দিত হয়ে বৃদ্ধ যেন কেমন হয়ে গেল। সে অসংলগ্ন-ভাবে বলতে লাগল, ঘড়িতে কি হবে আমার? আমি সময় দেখে কি করব? কি যে তুমি কর ভাই! আঃ কি মুশকিল করলে!

তারপর একতাল পুঞ্জিত আবেগ ও আনন্দের মতো দুঃখী মানুষটি সংসারের নরোত্তম রাজার মতো মন্মথর কাছ থেকে বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধকে হোস্টেলের গেটের কাছে বিদায় দিয়ে নিজের ঘরে ফিরতে ফিরতে তার মনে হলো—আজ তার শুধু পাবারই দিন ছিল যেন। কাউকে কিছু দেবার কথা একবারও মনে হয় নি। কিন্তু দিনের শেষে এই সামান্য দেওয়াটুকু দিয়ে সেদিনের অনেক পাওয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী পাওয়াটা সে পেয়ে গেল।

তিন মাস যেতে না যেতেই কলেজের একটি পরীক্ষা হয়ে গেল। ফলও মোটামুটি জানা গেল পূজোর ছুটির আগেই। মন্মথ নিজের সর্বোচ্চ আসনে নিজেকে সসম্মানেই প্রতিষ্ঠিত রাখতে পেরেছে। অঙ্ক, কেমেষ্ট্রী, সংস্কৃত, ভূগোল, ইতিহাস সবেই তার নম্বর সবচেয়ে উপরে। ইংরেজীতে সে আর সত্য সমান সমান নম্বর পেয়েছে। তাদের নম্বরই অবশ্য সর্বোচ্চ। আর সংস্কৃত, অঙ্ক ও কেমেষ্ট্রীতে তার সমান নম্বর পেয়েছে লোকেশ, সেই লোকেশচন্দ্র সেন।

হেডমাস্টারমশাই বলা সত্ত্বেও লোকেশের সঙ্গে আলাপ হয় নি তার। তার সব-চেয়ে বড় কারণ ছিল পরীক্ষা। পরীক্ষার জন্য আগস্ট-সেপ্টেম্বরের তিনটে সপ্তাহ সব ভুলে, সব ছেড়ে পড়াশুনো নিয়ে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। তাই লোকেশের সঙ্গে ভালো করে আলাপ করা, এমন কি তার খোঁজ করাও হয়ে ওঠে নি। এইবার সে লোকেশের সঙ্গে আলাপ করাব জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

একদিন কথাটা সে বললে সত্যকে—এই সত্য, একটা ভারী অন্যায় হয়ে যাচ্ছে রে!

—কি?

—আরে হেডমাস্টারমশাই অমন করে বললেন লোকেশের সঙ্গে আলাপ করতে! তা তার একবার খোঁজও করলাম না আমরা।

সত্য চুপ করে থেকে বললে—অন্যায় হয়েছে রে সত্যিই। তা চল না আলাপ করি। তা দেখ, ও নিজে থেকেও তো আলাপ করতে পারত।

—পারত। কিন্তু তাতে আমাদের দোষ কমে না। চল ওকে খুঁজে বের করি।

দুজনে বের হলো লোকেশের খোঁজে।

তাকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে দুজনে যখন হতাশ হয়ে দ্বিতীয়বার লাইব্রেরীতে খোঁজ করে বেরিয়ে আসছে তখন নজরে পড়ল কলেজের সামনে মাঠের ভিতর একটি দেবদারু গাছের তলায় লোকেশ একা বসে আছে।

দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়েই সত্য কথা না বলে মন্মথর হাতে চাপ দিয়ে থামতে ইঙ্গিত করল। তারপর তাকে মৃদুস্বরে বললে—দুজনে দুপাশ থেকে গিয়ে ওকে অবাক করে দিতে হবে।

লোকেশ নিবিষ্টমনে কি পড়ছে। বইয়ের উপর একেবারে ঝুঁকে পড়ে একখানা বই পড়ছে।

সত্যর চরিত্রে একটি বিচিত্র অতি-মার্জিত কৌতুকবোধ আছে। মন্মথর চরিত্রে তা নেই। তবু কিন্তু তার বড় ভালো লাগে সত্যর এই সকৌতুক মার্জনা। মধ্যে মধ্যে তার ইচ্ছাও হয় অমনি ব্যবহার করতে। কিন্তু তার স্বভাবও সেরকম নয় আর অমন পরিপাটি মার্জনাও তার মধ্যে নেই। তাই সত্যর কথামতো তারা দুজনে অতি নিঃশব্দে দু'পাশ থেকে লোকেশের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়াল গম্ভীর মুখে।

লোকেশ চমকে উঠে হাতের বইখানি বন্ধ করে তাদের দিকে তাকাল। তাদের দেখে সে যেন প্রথমটায় চিনতেই পারলে না। তারপর চিনতে পেরে যত বিব্রত তত অবাক হলো সে।

সত্য গম্ভীরভাবে বললে—কি ব্যাপার মশাই আপনার? হেডমাস্টারমশাই বলা সত্ত্বেও আপনি আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন না? তা আপনি আমাদের কলকাতায় এসেছেন, আপনারই তো আমাদের সঙ্গে প্রথম আলাপ করবার কথা। তা আপনি তো তার ধার দিয়েও গেলেন না। তা যখন পর্বত মহম্মদের কাছে এলো না, তখন মহম্মদকেই পর্বতের কাছে আসতে হলো। তাই এলাম আমরা

বলে দুজনে তার দু'পাশে বসে পড়ল। এতে লোকেশ নামক ভদ্র-সন্তানটি যত বিব্রত তত সংকুচিত হয়ে পড়ল। সে নিজের ছড়ানো বই-খাতাগুলি শশব্যস্ত হয়ে গুছিয়ে নিয়ে নিজের উরুর তলায় রেখে চাপা দিলে। অল্প হাসতে লাগল বিব্রত ভাবে।

—কি লুকোচ্ছেন মশাই আমাদের দেখে? সত্য সকৌতুক উষ্মার সঙ্গে বললে।

লোকেশ বইগুলোকে উরুর আরও নিচে পাঠাতে পাঠাতে বললে—না, না, কিছু না। ও তো ক'খানা বই।

—ত আপনার বই আপনি লুকোন, কিন্তু আলাপটা করুন।

আরও বিব্রত হয়ে লোকেশ বললে—আমার সত্যি অন্যায় হয়েছে। কিছু মনে করবেন না। আমি তো হ্যারিসন রোডে একটা মেসে থাকি, আমার এক কাকার সঙ্গে। আর কলকাতার তো আমি কিছুই চিনি না।

—চিনবার চেষ্টা করেছেন? কি কি চিনেছেন? সত্য জেরা করতে লাগল তাকে।

কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু হাসতে লাগল লোকেশ।

সত্য ঘাড় নেড়ে বলল—শূন্য—শূন্য পেলেন এ ব্যাপারে। অঙ্ক, সংস্কৃত আর কেমেস্ট্রীতে মন্মথ সমান হাইয়েস্ট মার্ক পেলে কি হবে এ ব্যাপারে শূন্য পেলেন। তার মানে হলো আপনি মেস থেকে কলেজ আর কলেজ থেকে মেস পর্যন্ত যাতা-

স্নাত করেন। আর বাঙাল বলে বড় জোর শেয়ালদা স্টেশনটা চেনেন। তার বেশী কিছু চিনতে চানও নি, চেনেনও না। হাইকোর্ট দেখেছেন ?

লোকেশ কিছু না বলে শুধু হেসে চলেছে অপ্রতিভভাবে।

মন্মথ চুপ করেই ছিল। এক ক্লাসের ভালো ছেলেদের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব থাকে ; ভালো ছাত্র বলে প্রত্যেকেই মনে মনে বেশ স্ফীত যাকে বলে আগ বাড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করতে চায় না। সত্য যতক্ষণ লোকেশের সঙ্গে কৌতুক করে করে কথা বলে চলেছিল ততক্ষণ মন্মথ তাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগটা পেলে। সে লোকেশকে যতটুকু দেখতে পেলে, তাতে তার পরিষ্কার মনে হলো, এ ছেলেটি আর যাই হোক, দাম্ভিক নয়, এ আসলে অত্যন্ত লাজুক, হয়তো নির্জনতাপ্রিয়। তার মুখের অপ্রতিভ হাসির মধ্যে কোথায় যেন একটি কুমারীর নির্মলচিত্তের সলজ্জ সংকোচ লুকিয়ে আছে। সে নিশ্চিন্ত হয়ে সত্যকে বললে—এই সত্য, তুই ওকে এত করে 'আপনি' 'আপনি' করছিস কেন ? ওকে তুমি বল। কি বল লোকেশ, তোমাকে তুমি বলে ডাকলে রাগ করবে না তো ?

লোকেশ শশব্যস্ত হয়ে বললে—আমিও তাই বলব ভাবছিলাম ! আমারও কেমন লাগছিল !

তার কথার ভঙ্গিতে সত্য এবং মন্মথ দুজনেই জোরে হেসে উঠল। লোকেশও হাসতে লাগল তাদের সঙ্গে। কিন্তু উচ্চকণ্ঠে হাসি নয়, সেই কুমারীর মতো সলজ্জ হাসি।

তিনজনের মধ্যে গল্প জমে উঠল। লোকেশের পরিচয়কে কেন্দ্র করেই। লোকেশের বাড়ি বাখরগঞ্জ জেলায়। সেখানকার হাইস্কুল থেকে সে পাস করে এসেছে। তারা তিন ভাই, দুই বোন। সে সকলের প্রিয়। বাবার ইচ্ছা ছিল না যে সে কলকাতা আসে পড়তে। কিন্তু তার প্রবল ইচ্ছা ও এক সম্পর্কিত কাকার সহায়তায় সে কলকাতায় পড়বার অনুমতি পেয়েছে বাবা-মায়ের কাছ।

সত্য হেসে তাকে বললে—তুমি যে বাঙাল, তা তোমার স্বভাবেই বুঝেছিলাম। আর বুঝেছিলাম তোমার হ্যারিসন রোডের মেসে থাকার কথা শুনে।

লোকেশ একটু হাসল।

মন্মথ বললে—তুমি হোস্টেলে সিট নিলে না কেন ?

লজ্জিতভাবে লোকেশ বললে—বাবা কিছুতেই আমাকে কাকার কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকতে দিলেন না। বললেন—তুমি যদি তোমার কাকার কাছে না থাক তা হলে তোমাকে কলকাতায় পড়তে হবে না।

—মেসে পড়ার অসুবিধা হয় না।

লোকেশ লজ্জিতভাবে একটু হাসল। হেসে বললে—মেসে পড়ার পক্ষে 'অ্যাটমসফিয়ার' খুব ভালো নয়, তবে আমার খুব অসুবিধা হয় না। কাকা আমার জন্যে একটা গোটা ঘর ভাড়া করে দিয়েছেন।

এই সামান্য কথা থেকেই ওরা দুজনে বুঝতে পারলে লোকেশ বেশ সম্পন্ন ঘরের ছেলে। বাড়ির অবস্থা ভালো। সেটিকে একটু যাচাই করে নেবার জন্য মন্মথ বললে—তোমার বাবা কি করেন ভাই ?

লজ্জিত লোকেশ বললে—বাবা তো বি. এ. পাস। কিছু করেন না। নিজের যা জোতজমা আছে তাই দেখতে তাঁর সময় চলে যায়।

মন্মথ ও সত্য বুঝতে পারলে নিজের পারিবারিক সমৃদ্ধির সম্পর্কে বেশী কিছু বলতে লোকেশ নারাজ।

মন্মথ বললে—তুমি কিন্তু হোস্টেলে থাকলে ভালো করতে! আমি তো স্কুলে পড়বার সময় এর বাড়ি ওর বাড়ি থেকে পড়েছি। আদর কেউ কম করে নি। কিন্তু এখন হোস্টেলে এসে দেখতে পাচ্ছি পড়া অনেক ভালো হয়।

লোকেশ বললে—বুঝি তো! কিন্তু আমার যে কিছু অসুবিধা আছে।

বলতে গিয়ে লোকেশের মুখে এমন এক দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল যে তা দুজনেরই চোখ এড়াল না।

—অসুবিধা ? কি অসুবিধা ? সত্য জিজ্ঞাসা করলে।

আবার লজ্জায় লোকেশের মাথা নুয়ে পড়ল। সে বললে—আমি আবার নিরামিষ খাই কি না!

অবাক হলো দুজনেই।—কেন, নিরামিষ খাও কেন ?

লজ্জায় লোকেশের মাথা নুইয়ে পড়ল। সে হেসে বললে—এমনিই!

মন্মথ বললে—আরে তোমাদের মাছের দেশ, বালাম চালের রাজ্য। বাঙালী নামক প্রাণী মাছ ভাত খেয়ে মানুষ, আর তুমি মাছ খাও না ?

সত্য বললে—ছেড়ে দে ওকে মনু! ও বাঙাল! ওরা অমনিই! কিন্তু কি খাও তা হলে ?

এবার এতক্ষণে যেন লোকেশের মনের দরজাটি খুলে গেল। সে এক মুখ হেসে বললে—কেন দুধ, দই, ক্ষীর, মাখন!

—একেবারে ননীচোরা গোপাল! ঠাট্টা করে বললে মন্মথ।

সঙ্গে সঙ্গে লোকেশের মুখখানা কেমন হয়ে গেল যেন। মুহূর্তে সব হাসি মিলিয়ে গিয়ে মুখখানি তার কেমন কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। তার দুই চোখ জলে ছল ছল করে উঠল। দেখে অবাক হয়ে গেল ওরা দুজনেই। সত্য সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—

কি হলো ?

—কিছু না, কিছু না। বলে শশব্যস্ত হয়ে উঠল লোকেশ! তারপর মুখ ঘুরিয়ে চশমা খুলে চোখ মুছে সে বললে—আমার একটা কাজ করে দেবে ?

—কি বল ?

—কিছু বই কিনে দেবে ?

—এ আর কঠিন কাজ কি ? এই তো কাছেই কত দোকান!

লোকেশ এই সময় পা বদলে নিজের আসন বদল করলে। উরুর নিচের বইগুলো এই সময় ঠেলে বেরিয়ে এলো। উপরের বইখানা হাতে তুলে নিলে মন্মথ! মলাটটা উলটে দেখলে কি বই পড়ছিল লোকেশ। বইখানার নামাঙ্কিত পৃষ্ঠার উপর থেকে চোখ তুলে সে এক বিস্মিত দৃষ্টিতে লোকেশের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বিস্মিতভাবে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে - তুমি পড়ছিলে ?

লোকেশ তার দিকে হাত বাড়িয়ে বিব্রতভাবে বললে—দাও ভাই, দাও বই-খানা।

মন্মথ অবাক হয়ে বললে—তুমি এই সংস্কৃত অক্ষরে লেখা বেদান্ত দর্শনের শঙ্কর-ভাষ্যের শ্রীধর গোস্বামীর টীকা পড়ছিলে ? তুমি তো দেখছি সাংঘাতিক লোক হে ?

সত্য বুদ্ধিমান ছেলে। এক আধটা কথা শুনে সব ব্যাপারটা সে বুঝে নিয়েছে! সে হালকা চালে বললে—মনু, তোকেও বাঙাল পণ্ডিতিতে হারিয়ে দিতে চলেছে বুঝি! সাবাস বাঙাল! কিন্তু একটা কথা বলি। যতই অরিজিনাল শঙ্করভাষ্য আর শ্রীধর গোস্বামীর টীকা পড় তুমি, এই হুগলী জেলার নব্যন্যায়ের পণ্ডিতের ক্ষুরধার বুদ্ধির পার পাবে না, এটা তুমি জেনে রেখো।

মন্মথ বেদান্ত দর্শনখানার পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় থেমে গেল। সত্যকে বললে—দেখেছিস বাবুর পেজ মার্ক দেবার কাগজ ?

বলে সে একখানা একশো টাকার নোট বইয়ের ভিতর থেকে তুলে ধরলে।

লজ্জিত ও বিব্রত হাসি হেসে লোকেশ বললে—আরে, ওইটা দিয়েই তো বই কিনব বলছিলাম। কলকাতা আসবার সময় মা লুকিয়ে আমাকে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—কিছু আলাদা কিনবার দরকার হলে এই টাকায় কিনে নিস।

সত্য গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে—মায়ের কাছ থেকে এই রকম নোট ক'খানা নিয়ে এসেছ ?

লোকেশ বোকার মতো একান্ত সরলভাবে বলে ফেললে—চারখানা।

মন্মথ ও সত্য দুজনেই হেসে উঠল হোহো করে। লোকেশ নিজের ত্রুটিটা বুঝতে

পেয়ে কিছুক্ষণ তাদের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থেকে হেসে উঠল। কৈফিয়তের মতো বললে—মায়ের হাতে কিছু কিছু টাকা সব সময়ই থাকে। তাই থেকে আমাকে দিয়েছেন আসবার সময়।

সত্য ও মন্মথ দুজনেই বুঝলে এই আধপাগলা, লাজুক, মেধাবী ছেলেটি ধনীর সন্তান। বড় আদরের সন্তান। অথচ তার বেশ-বিলাস, পোশাক-আশাক কোনো দিকেই কোনো দৃষ্টি নেই। জলকাচা, ইস্ত্রিহীন জামা, আধময়লা কাপড় পরে অবলীলাক্রমে কলেজে চলে আসে। বেদান্ত দর্শন নিয়ে সে মাথা ঘামায়। ঠাকুর-দেবতার নাম শুনলেই, 'ক' শুনে কৃষ্ণ স্মরণের মতো তার চোখে জল আসে। এ এক বিচিত্র প্রাণী। নিরামিষ খায়, মেসে একখানা পুরো ঘর নিয়ে থাকে আপনার মনে। এ বিচিত্র বস্তুটিকে দেখে তারা দুজনেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে।

সত্য বললে—কই তুমি কি বই কিনবে বলছিলে না, চল দেখি!

বলে সত্য উঠে দাঁড়াল। অন্য দুই বন্ধুকেও হাত ধরে টেনে তুলে দিলে।

মন্মথও হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল। উঠতে উঠতে সে বললে—শরৎকালে আগেকার দিনে রাজারা দিগ্বিজয়ে বের হতেন। আজ এই শরৎকালের প্রারম্ভে আমরা দুই রাজপুত্র, সত্য ও মন্মথ, লোকেশ নামক রাজ্য জয় করলাম।

দুজনের পিঠে দুই হাত দিয়ে চলতে চলতে সত্য হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। দুজনের কাঁধে দুই হাতের চাপ দিয়ে বললে—এই, আবার বসে যাও এই দেবদারু গাছের তলায়। আমি কাল একখানা নতুন গান শিখেছি, তোমাদের শোনাই।

লোকেশ তার মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললে—গান?

—কেন, আপত্তি আছে নাকি? তোমার বেদান্তে বুঝি গান শুনতে মানা? তা হোক, তবু শোন।

তারা তিনজনে আবার ফিরে এসে দেবদারু গাছের ছায়ায় বসল। সত্য বললে—লোকেশ, তোমার ব্রহ্ম আমার গান শুনলে রাগ করবেন না, এটা হলফ করে করে বলতে পারি! শোন—

সত্য গান ধরলে—

> আজি শরত তপনে প্রভাত তপনে কী জানি পরাণ কী যে চায়।
> ওই শেফালীর শাখে কী বলিয়া ডাকে, বিহগ, বিহগ কী যে গায়॥
> আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে, রহে না আবাসে মন হায়—
> কোন্ কুসুমের আশে কোন ফুলবাসে সুনীল আকাশে মন ধায়॥

দীর্ঘ গান। একাধিক চতুষ্পদী স্তবকে সজ্জিত। কোলাহল-মুখরিত কলকাতা শহরে, জনারণ্যের মধ্যেও নির্জন, শরতালোক-প্লাবিত, নির্মল, রৌদ্রকরোজ্জ্বল, প্রসন্ন হাস্য-উদ্ভাসিত আকাশের নিচে তিনটি তরুণ শরতের গানে মগ্ন হয়ে গেল। তাদের কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছে, যৌবনে তারা তখন প্রবেশ করেছে কিনা তা তারা নিজেরাও সঠিক জানে না, জীবনের এই আশ্চর্য মহেন্দ্রক্ষণে তিনটি পরিচ্ছন্নচিত্ত তরুণ শরতের আশ্চর্য উদাস সৌন্দর্যের সরোবরে মুক্তচিত্ত হয়ে যেন সাঁতার দিয়ে ফিরতে লাগল।

দেবদারু গাছের তলায়, কোমল ঘাসের আসনে পাশাপাশি বসেছে তারা। মন্মথ আর লোকেশ দু পা আধখানা ছড়িয়ে, আধখানা জুড়ে বেষ্টন করে নিয়েছে দুই হাত দিয়ে, সত্যকে মাঝখানে রেখে দুজনে দুপাশে বসে সত্যর গান শুনে চলেছে। মাঝখানে বসে দেবদারু গাছের গুঁড়িতে পিঠটা ঠেস দিয়ে, ডান হাতে তুড়ি দিয়ে তাল দিতে দিতে চাপা গলায় গানখানি গেয়ে চলেছে সত্য :

শরতের এই সোনার আলোভরা, শিউলিঝরা, পাখিডাকা দিনে কে কবে কাকে কোথায় বুঝি ভালবেসেছিল কি বাসে নি, কে কার দুঃখে কোথায় চোখের জল ফেলেছিল কি ফেলে নি, কে বুঝি কাকে কবে আপনার সব দিতে গিয়ে দেয় নি, সব দিতে গিয়ে দেওয়া হয় নি কি নেবার মানুষ নেয় নি, মুখ ফিরিয়ে থেকেছিল, সেই পুঞ্জীভূত বিশ্ববেদনার অশ্রুবাষ্প তাদের তিনজনেরই বুকের ভিতর যেন মাথা কুটে মরতে লাগল। সে বেদনা যেন লক্ষ বাসনার জন্ম দেয় মুহূর্তে মুহূর্তে। কিন্তু সে বেদনারও কোনো মূর্তি নেই, সে বাসনারও কোনো স্বরূপ নেই। শুধু নাম-হীন বেদনা আর বাসনা বুকের ভিতর একের সঙ্গে অন্যে মাখামাখি হয়ে পরস্পরের গলা জড়াজড়ি করে যেন একই সঙ্গে গভীর দুঃখে ও পরম সুখে জন্ম-জন্মান্তরের চেপে-রাখা কান্না কেঁদে চলল।

তারই ছোঁয়ায় মাথার উপরের মেঘলেশহীন আকাশ থেকে কর্কশদেহ প্রবীণ দেবদারু গাছটা, পায়ের নিচের মাটি, ঘাস, সবুজ ঘাসের মাথায় সাদা সাদা ঘাসের শীষ পর্যন্ত সব, সব যেন নিরুদ্ধ-রোদন, বেদনাঘন, অত্যাশ্চর্য এক আনন্দের মতো কাঁপতে লাগল তাদের চোখের সামনে। মন্মথর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন স্বপ্নাতুর হয়ে এসেছে। তারই মাঝখানে মন্মথ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলে, লোকেশের কচি কচি দাড়ি-গোঁফে ভর্তি, ব্রণকুটিল শ্যামবর্ণ গালের উপর দিয়ে দুটি জলের ধারা চোখের ঝরনা থেকে নিঃশব্দে উৎসারিত হয়ে তার গলার ও চিবুকের দিকে নেমে চলেছে।

আশ্চর্য তো ছেলেটা! বোধহয় খুব সেন্টিমেন্টাল ; কথায় কথায় চোখে জল

আসে। নয়তো বাড়ির জন্যে মন কেমন করে। এটা ঠিক যে সত্যর এই গানটার মধ্যে কেমন একটা মন-কেমন-করা ভাব ও ভাবনা আছে। কিন্তু তাই বলে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়বে এ কেমন কথা! তবে ছেলেটার স্বভাবটাই বোধহয় অমনি। এই তো একটু আগে ননীচোরা গোপালের প্রসঙ্গ উঠতেই ছেলের চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল! অবশ্য এমনি ধারায় একটা ব্যাপার সে ও সত্য দুজনেই প্রত্যক্ষ করেছিল সত্যদের বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্তিমূলক গান শুনে আনন্দমোহন বসু মশাই আর শিবনাথ শাস্ত্রীমশাই দুজনেরই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু ওঁরা দুজন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি, আর ঈশ্বরের নাম শুনে ভক্তিনত থেকে ভক্তির ধারা চোখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু এখানে? সত্যর এখানে তো ঈশ্বরের নামগন্ধও নেই এতে মাত্র প্রকৃতির, শরতের সৌন্দর্যের বর্ণনা। আর এ ছেলের বয়স তো মোটে সতেরো আঠারো। ও কাঁদবে কেন? এ তো চোখে জল আসার গানও নয়, আর ওর চোখে জল আসার বয়সও হয় নি! তা হলে?

প্রশ্নটা মন্মথর কাছে প্রশ্নই থেকে গেল। উত্তর মিলল না। তার মধ্যেই সত্যর গান শেষ হলো। সত্যও লোকেশের চোখের জল দেখেছিল আগেই।

মন্মথ একটু মৃদু হেসে বললে—দেখ, ওর কাণ্ডটা দেখ! ছোকরা গান শুনে কেঁদেই চলেছে।

লোকেশ এবার আর শশব্যস্ত হলো না। বেশ ধীরে সুস্থে সে কোঁচার খুঁট দিয়ে দুই চোখের জল মুছে নিলে।

সত্য তার মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে, একটু হেসে বললে—অমন করে কাঁদছিলে কেন?

লোকেশ অস্ফুটভাবে বললে—কি জানি!

মন্মথ তাকে ঠাট্টা করে বললে—তুমি কাঁদলে আর তুমিই বলছ 'কি জানি'? কেন কাঁদলে তুমি জান না?

লোকেশ চুপ করে থাকল।

সত্য গম্ভীরভাবে বললে—ওর হয় বাড়ির জন্যে দেশের জন্যে মন কেমন করছিল, নয় তো খিদে পেয়েছিল।

তার বলার ভঙ্গিতে তিন জনেই হেসে উঠল। মন্মথ অকুণ্ঠ হাসি হাসলে। সত্য কথাটা বলে নিজেও খুব হাসলে। সব চেয়ে বেশী হাসল লোকেশ। সে হেসেই চলল। হাসতে হাসতে সে আবার কাঁদতে লাগল। তারপর কান্না সামলে নিয়ে আবার হাসি।

শরতের প্রসন্নতার সঙ্গে সে হাসি মিশে গেল এক হয়ে। এই হাসির সোনার সুতোয় তিনজনে গাঁথা হয়ে গেল একখানি প্রীতি ও প্রসন্নতার মালায়।

লোকেশ প্রায় একশো টাকার বই কিনলে। অধিকাংশ বিজ্ঞান আর মূল সংস্কৃত গ্রন্থ।

যাবার সময় সত্য অকস্মাৎ বললে—আজ বিকেলবেলা আমাদের বাড়ি এস লোকেশ। বাবার সঙ্গে আলাপ করে যাবে। আসবে তো?

লোকেশ ইতস্তত করে বললে—আসব তো! কিন্তু আমি তো ঠিকানা জানি না ভাই!

সত্য মন্মথকে বললে—দেখছিস কেমন বাঙাল! ঠিকানা চিনে আসতে পারবে না! আচ্ছা, আমি আর মনু তোমার মেসে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব।

বিকেলবেলা হ্যারিসন রোডের হোটেলে লোকেশের খোঁজে গিয়ে হাজির হলো তারা দুজনে। তাদের মনের চেহারাটা এখন এমনই দাঁড়িয়েছে যেন লোকেশের সঙ্গে তাদের কতকালের পরিচয়! হোটেলে ঢুকে খবর নিতেই জানা গেল লোকেশবাবু থাকেন তেতলায়।

ময়লা অন্ধকার সিঁড়ি, চারিপাশে আধো-অন্ধকার ঘর—কোনোটা খোলা, কোনো-টায় তালাবন্ধ। তার মানে বাসিন্দারা কাজকর্ম সেরে কেউ ফিরেছেন, কেউ তখনও ফেরেন নি। পরিবেশটা ওদের দুজনেরই কাছে ভালো লাগছিল না। সত্য সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মন্মথকে বললে—দেখ মনু, লোকেশ সকালবেলা এত টাকার বই কিনলে, সবই পড়ার বাইরের বই। তার মানে ওদের অবস্থা খুব ভালো কিন্তু তা সত্ত্বেও কেমন জায়গায় থাকে দেখেছিস!

মন্মথও ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

কিন্তু তেতলায় উঠে তারা অবাক। তারা যেন এক আশ্চর্য পৃথিবীতে পৌছে গিয়েছে। তেতলায় মাত্র একখানি ঘর। সমস্ত পরিবেশটি যত নির্জন তত পরি-চ্ছন্ন। আর তার সবটাই যেন আকাশ। শরৎকালের বিকেলের সোনার আলোয় ছাদের ঘরখানিকে হাসিতে ভাসিয়ে দিয়ে আকাশ যেন পরমাদরে কোলে করে রয়েছে ঘরখানিকে। দুজনের চোখেই এই পার্থক্যটি ধরা পড়েছিল। সত্যর চোখে ধরা পড়েছিল আরো বেশী করে। সত্য বললে—সাবাস ভাই! এই নোংরা পরি-বেশে এমন আশ্চর্য জায়গা! এ তো একটা ম্যাজিক রে মনু! কিন্তু গৃহস্বামী কই?

গলা তুলে সত্য ডাকলে—লোকেশ, লোকেশবাবু আছেন?

কোনো শব্দ নেই। নির্জন নিঃশব্দ পরিবেশে নিচে হ্যারিসন রোডের জনকোলাহল ও গাড়িঘোড়ার খানিকটা শব্দ স্পষ্টতর হয়ে আসছে এইমাত্র। কিছুক্ষণ পর ছাদেই কোথায় যেন খড়মের শব্দ উঠল। তারপরই একজন খাটো কাপড় পরা, খড়ম পায়ে, খালি গা, মধ্যবয়সী ভদ্রলোক তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাদের দেখে বললেন —কাকে খুঁজছেন বাবা, লোকেশকে? আপনারা লোকেশের বন্ধু? আসুন।

ভদ্রলোকের পিছন পিছন যেতে যেতে সত্য জিজ্ঞাসা করলে—লোকেশ কোথায়?

ঘরের ভিতর ঢুকে ভদ্রলোক বললেন—আপনারা বসুন বাবা। লোকেশ আপনাদের বসতে বলে গিয়েছে। সে এখনি আসবে। আপনারা দরজার কাছে জুতো খুলে ঘরে বসুন।

—কোথায় গিয়েছে?

—হিন্দু স্কুলের হেডমাস্টার মশাই লোকেশকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। তাই গিয়েছে। বলে গিয়েছে এখনি আসবে। আপনারা বসুন। আমি তো এইমাত্র আপিস থেকে এসেছি, হাত মুখটা ধুয়ে আসি। আমি সম্পর্কে লোকেশের কাকা। আপনারা আরাম করে বসুন।

ওরা দুজনে ঘরের সবটা বেশ ভালো করে দেখলে। একখানা চৌকি, সচরাচর মেসে-হোটেলে যেমন চৌকি হয়, তার আকারটি তেমনি হলেও প্রকারটি ভিন্ন। বেশ দামী, পরিচ্ছন্ন ও বার্নিশ-করা। কিন্তু অমন ভালো চৌকিখানার উপরে শুধু একটি শতরঞ্জি পাতা। শতরঞ্জিখানি অবশ্য দামী। মাথার কাছে একটি ছোট বালিশ। আর কোনো বিছানা, তোশক, চাদর—এ সবের চিহ্ন নেই। মেঝেটা যেন অতিরিক্ত পরিচ্ছন্ন, কোথাও একটি কুটো নেই। একপাশে বইয়ের একটি র‍্যাক, বইয়ে ভর্তি। মনে হয়, কেউ যেন কোনো এক যত্ন লাগিয়ে তাকে পরিপাটি করে গুছিয়ে রেখেছে। র‍্যাকের পাশে একটি ছোট ডেস্ক। তার সামনে পরিপাটি করে একটি কম্বল পাতা পাট করে। বোঝা গেল, লোকেশ ওই কম্বলের উপর বসে লেখাপড়া করে। একপাশে একটি আলনায় গুটি দুই কাপড় আর জামা রাখা। সঙ্গে একখানি পাটকরা গামছা। লোকেশের এই ঘরখানি থেকে লোকেশের একটি বিচিত্র অজানা পরিচয় তাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তার খানিকটা তারা বুঝতে পারছে, খানিকটা বোধগম্য হচ্ছে না তাদের।

এই সময় লোকেশের খুড়োমশাই এসে ঘরে ঢুকলেন। এসে বসলেন মেঝের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে মন্মথ এবং সত্য দুজনেই চৌকিতে বসে থাকার জন্য শশব্যস্ত হয়ে উঠল। ওরা নেমে বসার উদ্যোগ করতেই তিনি বললেন—বস বাবা, তোমরা

বস! তোমরা অতিথি, নারায়ণ, তোমরা বস যে যেমন বসে আছ।
—তা আপনি মেঝের ওপর বসলেন কেন? ওই কম্বলটার ওপর বসুন না!
ভদ্রলোক একটু হাসলেন। বললেন—না বাবা, ওর ওপর কি বসতে পারি? ও আসন বড় পবিত্র!
ওরা দুজনেই খুব আশ্চর্য হলো তাঁর কথা শুনে। একটা দুটো কথার মধ্য দিয়েই গল্প জমে উঠল। লোকেশের সম্পর্কে গল্প। গল্প বই কি! এক বিচিত্র কাহিনী।
অত্যন্ত সচ্ছল ও সম্পত্তিবান ঘরের ছেলে লোকেশ। বাপ-মায়ের সব চেয়ে বড় ছেলে, জ্যেষ্ঠ সন্তান। মা বাপের বড় আদরের। ছেলেবেলা থেকে যত আশ্চর্য ওর মেধা তত অদ্ভুত ওর চরিত্র। ছেলেবেলায় কোনো কিছু একবার শুনেই মনে রাখতে পারত। প্রায় শ্রুতিধর ছিল সে। পাঠশালায় ঢুকে অন্য সহপাঠীদের অনেক পেছনে ফেলে সব বিষয়েই প্রায় পুরো নম্বর পেত। অন্য দিকে বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তনের সময় প্রতি সন্ধ্যায় তার হরি-সংকীর্তনের দলের সঙ্গে যাওয়া চাইই। দুই হাত তুলে হরিনাম করতে করতে দলের আগে আগে নাচতে নাচতে যেত সে। এর কখনও ব্যতিক্রম হয় নি। এবারও এই বৈশাখ মাসে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েও সে সেই ছেলেবেলার মতো হরিনাম করে এসেছে প্রতি সন্ধ্যায়। শুধু কি হরিনাম করা! হরিনাম করে আর দুই চোখে জলের ধারা বয়। সে প্রায় ঐ ছেলেবেলা থেকেই।
বড় ধার্মিক প্রকৃতির ছেলে। আর ধীরে ধীরে ধর্মভাব বেড়ে যাওয়ার জন্যে ওর মা আর বাবা দুজনেই অত্যন্ত চিন্তিত। এমনিতেই খুব হাসি খুশী মানুষ। কিন্তু কখনও কখনও একনাগাড়ে চুপচাপ থাকে, চোখ ছলছল করে, সেই সময় সর্বক্ষণ কাঁদো কাঁদো হয়ে থাকে। মধ্যে মধ্যে আপন মনে গোপনে কান্নাকাটি করে। কেন সে কাঁদে কে জানে। ওর মা বাবা এজন্যে ওকে কাকুতি-মিনতি করেছে, বকাবকি করেছে, শেষকালে হাতজোড় পর্যন্ত করে জিজ্ঞাসা করেছে, কেন কাঁদছে তার কারণ জানবার জন্যে। তাতে তার কান্না বেড়ে গিয়েছে, হাউহাউ করে কেঁদেছে, কোনো উত্তর দেয় নি। মাঝখানে দু-তিনবার ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে সন্ন্যাসী হবার জন্যে। ওর বাবার অর্থবলও আছে, লোকবলও আছে, পসার-প্রতিপত্তিও আছে। তাই কোনোক্রমে প্রতিবারই খুঁজে নিয়ে আসতে পেরেছে।
অথচ এমনিতে অত্যন্ত মিশুক ছেলে; আনন্দ করে, হেসে কাটিয়ে দেয়। যেখানে থাকে সেখানে সবাইকে হাসিতে খুশীতে মাতিয়ে রাখতে পারে। বিশেষ করে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ওর কাছে থাকতে পেলে কি খুশী হয়। পড়াশুনোয়ও খুব

যে একটা মন আছে এমনও নয়। তবে যখন পড়তে ধরে তখন পড়াশুনো নিয়েই মেতে থাকে। মাঝখানে হঠাৎ খেয়াল হলো সংস্কৃত শিখবে। ব্যস আর যায় কোথায়! আমাদের গ্রামে ওদের বাড়িতেই রাধামাধব বিগ্রহের মন্দিরের সংলগ্ন নাটমন্দিরের পাশের ঘরে টোল আছে। সেই টোলে পড়তে লাগল। দু এক বছরের মধ্যেই এমন সংস্কৃত শিখেছে যে টোলের পণ্ডিতমশাই বলেন, এমন ছাত্র তিনি দেখেন নি।

খুড়োমশাই লোকেশের এই বিচিত্র পরিচয় তার এই দুটি নূতন বন্ধুর কাছে দিচ্ছিলেন আর তারা অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছিল। খুড়োমশায়ের সোৎসাহ বিবৃতি কতক্ষণ চলত তা বলা শক্ত। তবে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ উঠতেই খুড়োমশাই থেমে গেলেন। বললেন, ওই আসছে! ওর প্রশংসা করে কাউকে কিছু বললে ছেলে আবার খুব চটে যান। তা আমি চুপ করলাম বাবা! এইবার তোমরা বন্ধুর সঙ্গে গল্প কর।

খুড়োমশাই খড়ম খটখট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর সিঁড়ির মুখ থেকে উঠে এলো লোকেশ। ঘরের মধ্যে মন্মথ আর সত্যকে বসে থাকতে দেখে সে ছুটে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল। হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা করে বললে—তোমরা কতক্ষণ এসেছ?

—কিছুক্ষণ!. খুড়োমশাইয়ের কাছে বিচিত্র লোকেশ-চরিত্র-গাথা শুনছিলাম।

ও কথার ধার দিয়েই গেল না লোকেশ। কেবল পিছন ফিরে একবার খুড়োমশাইয়ের অবস্থানটা দেখে নিলে।

সত্য জিজ্ঞাসা করলে—আমাদের হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে গিয়েছিলে কেন?

একটু অপ্রস্তুতের মতো হেসে লোকেশ বললে—উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন এক্ষুনি একবার যাবার জন্যে।

সত্য কি ভাবলে তা মন্মথ জানে না, কিন্তু তার নিজের মনে একটু ঈর্ষা হলো। মনে হলো, এই ছেলেটি তাদের হিন্দু স্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের প্রত্যক্ষ ছাত্র না হয়েও এত ভালবাসা ও প্রশ্রয় পায় কেন? সে চুপ করেই থাকল। তবে সত্য জিজ্ঞাসা করলে—যদি কিছু গোপন না হয় তা হলে বলেই ফেল না কেন ডাকার কারণটা।

একটু চুপ করে থেকে একটু লজ্জিত সংকোচের সঙ্গে লোকেশ বললে—বরানগর মঠ থেকে এক সাধু এসেছিলেন ওঁর বাড়ি। তাই দেখা করবার জন্যে ডেকেছিলেন।

সকৌতুক সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের সঙ্গে সত্য বললে—সাধু? আরে বাপরে, বল কি,

সাধুর কাছে গিয়েছিলে? দেখো ভাই, সাবধানে থেকো, সাধু-টাধু হয়ে যেও না শেষ পর্যন্ত!

মন্মথর মনে কি অস্পষ্ট ভাবনা ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার খবর সে নিজেও জানে না। সে কিন্তু সত্যর মতো এক কথায় লোকেশের এই সাধুসঙ্গকে উড়িয়ে দিতে পারলে না। সে দ্বিধাগ্রস্তভাবে হেসে বললে—না, লোকেশ সাধু হতে পারে, সন্ন্যাসী হতে যাবে কেন? বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সকলকে এ কষ্ট সে দেবে কেন?

সত্য হাল্কা করেই বললে—আরে লোকেশ আমাদের সঙ্গ ধরেছে, ও যাবে কোথায়? ওকে আমি এবার থেকে সাধুবাবু বলে ডাকব।

লোকেশ অকস্মাৎ হা হা করে হেসে উঠল। তার সেই ছেদহীন হাসি। কে যেন তার ভিতর থেকে তাকে কৌতুক করে এই হাসি হাসাচ্ছে। অনেকখানি হেসে, চোখের জল মুছে সে বললে—তা বেশ বলেছ ভাই, সাধুবাবু। খাসা নাম! তবে দেখো, সাধুবাবুর বদলে সাধুবাবা বলো না, তা হলে আপত্তি করব। আর সবারই সামনে ও নামে ডাকা চলবে না।

বলতে বলতে আবার হাসির ধাক্কায় সে ভেঙে পড়ল। তার মনের ভিতরের হাসির ও কৌতুকের কোনো অফুরন্ত ধার থেকে যেন হাসিটা বেরিয়ে আসছে। হাসি থামিয়ে দুই বন্ধুর মুখের দিকে এক একবার করে চেয়ে নিয়ে সে বললে— তা হলে তোমাদের নামও তো বদলে দিতে হয় ভাই!

সত্যকে বললে—তোমার নাম, এই সাধুবাবুর সঙ্গে মিলিয়ে বদলানো কঠিন। তোমার নাম সত্যবাবুই থাকুক। তবে মন্মথর নামটা বদলে দিতে হবে। মন্মথ-নাথের বদলে শিববাবু বলব ওকে। তাহলেই দাঁড়াল কি দেখ! সাধুবাবু, সত্য-বাবু আর শিববাবু। সত্য শিব সাধুবাবু।

বলে আবার সেই হাসি!

মন্মথর কাছে লোকেশের এই চেহারাটা একটু অস্বাভাবিক লাগল। এ কেমন ধারা মন! এখনই চোখ দিয়ে জল পড়ে, পরমুহূর্তেই হাসতে হাসতে আর কূল-কিনারা পায় না।

ওদিকে তখন শরৎকালের দিনটি আসন্ন সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে কলকাতা শহরে তার সোনার আলো আকাশ থেকে ভারে ভারে ঢেলে দিয়ে সারা শহরকে যেন ভাসিয়ে দিয়েছে, হাসিয়ে দিয়েছে। সেই আলোর দিকে তাকিয়ে সত্যর মুখ-খানি কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সেই আশ্চর্য সোনার আলোরই যেন ছটা বাজল তার মুখে। সে চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—তোমার জন্যে সেই কখন

থেকে বসে আছি আমরা। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে! চল, ওঠ তাহলে।
আনন্দিত তিন মূর্তি শরতের প্রসন্নতার বিগ্রহের মতো হাসতে হাসতে এসে পড়ল হ্যারিসন রোডের উপর। সেখান থেকে সত্যদের বাড়ি।

সত্যদের বাড়ির দোতলার সেই ঘর। অতি সাধারণ সম্ভার দিয়ে সজ্জিত অথচ অপরূপ শোভায় শোভন সেই বসার ঘরখানিতে লোকেশ আর মন্মথকে হাজির করে ভিতরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সত্য অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকলে—মা, দেখ কাকে নিয়ে এসেছি দেখ!
তারপর গলা তুলে ডাক দিলে—এই দিদি, মলি, এই উষা, দেখে যা, কি এনেছি।
প্রথমেই ছুটে এলো সবচেয়ে যে ছোট। উষা। দাদাকে বললে—কি এনেছ দাদা?
—একটা সাধুবাবু।
হাত পেতে উষা বললে—কই দাও।
সঙ্গে সঙ্গে ঘরে হাসির ঢেউ উঠল। সবচেয়ে বেশী হাসতে লাগল লোকেশ নিজে। সবচেয়ে জোরে, সবচেয়ে বেশী। সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—এস, নিয়ে যাও।
এই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল সন্ধ্যা আর মালতী। সন্ধ্যা এবং মালতীর কাছে সে এক অভিনব, অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য! উষা কাছে যেতেই নিজের বাড়ানো দুই হাত দিয়ে লোকেশ যেন প্রায় ছোঁ মেরে উষাকে প্রবল আবেগে তুলে নিলে নিজের কোলে। তাদের বাড়িতে এরকমভাবে কেউ, বিশেষ করে অনাত্মীয় কোনো জনের কাউকে কোলে তুলে আদর করা শুধু শোভন ও সুন্দর নয় বলেই বিবেচিত হয় না, সেটা অনেকটা বিসদৃশ ও অশালীন তাদের কাছে। স্নেহ-মমতা বা ক্রোধ-ক্ষোভ কোনো কিছু নিয়েই বাড়াবাড়ি করা কি আতিশয্য প্রকাশ তাদের পরিবারের রুচিতে বাধে। তাই যখন লোকেশ তিন বছরের উষাকে বুকের মধ্যে নিয়ে দুই হাত দিয়ে বেষ্টন করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কই নাও এবার! এই তো আমি সাধুবাবু তোমাকে দেবার জন্যেই তো এসেছি! তা তুমি দেবে না, আমি দেব? আমি তো দেখছি আমিই পেয়ে গেলাম, তখন সন্ধ্যা ও মালতী দুজনেই অবাক হয়ে গেল। সন্ধ্যা ও মালতী দুজনেই লোকেশের এই আশ্চর্য সহজ ব্যবহারে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। কোনো কথা বলতে পারলে না। এ ধরনের আদর ও আত্মীয়তা-প্রকাশ তাদের পরিবারে রীতি-বিরুদ্ধ, কিন্তু তারা এর মধ্যে কোনো অশোভনতা দেখতে পেল না।

উষা কিন্তু লোকেশের বাহু বন্ধনের মধ্যে বিব্রত হয়ে পড়েছে। এই অপরিচিত সদানন্দ হাস্যমুখ মানুষটির সমাদর তার কাছে খারাপ না লাগলেও অনভ্যাস হেতু সে বিব্রত বোধ করছিল। সে তার কোলের মধ্যে পা ছুঁড়ে বললে—তুমি আমাকে নামিয়ে দাও!

—নামিয়ে দেব? নামিয়ে দিলে যে দেওয়াও হবে না, নেওয়াও হবে না। তোমাকে আদর করে আমি যে অনেক পাচ্ছি!

তার কোলের মধ্যে বন্দী থেকে বিরক্ত হয়ে উঠেছে উষা। সে হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ করে হঠাৎ লোকেশের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ডান হাতের দুটো আঙুল দিয়ে তার গালে ছোট চিমটি কেটে রুষ্ট স্বরে বললে—তুমি একটা ভূত।

ভূত? কথাটা শুনেই হা হা করে তার সেই উচ্চ কণ্ঠ, ছেদহীন অফুরন্ত হাসি হাসতে হাসতে লোকেশ নিজের হাসি দিয়ে সারা ঘরখানাই শুধু নয়, সমস্ত বাড়ি-খানাই যেন ভরিয়ে তুললে। তার অট্ট হা হা শব্দের ছেদহীন হাসিতে শরতের সন্ধ্যার সোনার আলো যেন দ্বিগুণ খুশীতে থরথর করে কাঁপতে লাগল। গোটা বাড়িখানার অভ্যস্ত গাম্ভীর্য ভেঙে গিয়ে তাতে তার ধাক্কা লেগে সারা বাড়িটাই যেন হেসে উঠল। সেই আশ্চর্য হাসির ছোঁয়াচ সত্য, মন্মথ থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা এমন কি স্বভাবগম্ভীর মালতীর মুখেও অস্পষ্ট হাসির মাধুর্য হয়ে নিজের প্রতিধ্বনি তুললে। লোকেশ হাসতে হাসতে ঘাড় দুলিয়ে বললে—ভূতই তো, আমি একটা ভূত! তুমি আগে ভূত দেখ নি তো? আজ দেখলে।

তার অকপট হাসির প্রবল ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে সত্যের মা ছুটে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালেন চোখে বিস্মিত জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিয়ে। সেই বিস্মিত জিজ্ঞাসা নিয়েই তিনি সেই বিচিত্র দৃশ্য দেখলেন। তিনি কি করবেন, কি বলবেন ভেবে ঠিক করার আগেই তাঁকে দেখতে পেয়ে উষাকে চৌকির উপর নামিয়ে দিয়ে তার নড়বড়ে দীর্ঘ পা ফেলে এক মুহূর্তে সত্যের মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। হাসিমুখে একান্ত সপ্রতিভভাবে বললে—আপনি মা? বলার সঙ্গে সঙ্গে সে দুই হাত তাঁর পায়ের উপর রেখে যেন শুধু প্রণামই করলে না, একেবারে প্রণত হলো। প্রণাম সেরে যখন হাসিমুখে আবার উঠে দাঁড়াল সে, তখনও তার হাত দুটি যুক্তকর হয়ে আছে। শ্রদ্ধা এবং ভক্তির এই অকপট সানন্দ প্রকাশে তার জয়ের যেটুকু বাকী ছিল তা সে যেন সম্পূর্ণ করে নিলে। অথচ সে যে এ কাজ সজ্ঞানে, সচেষ্টভাবে করছে এ কথা মনে করার বিন্দুমাত্র অবকাশও ছিল না। তার পরি-চিত সত্য এবং মন্মথ দুজনেই তার এই বিচিত্র প্রকাশ দেখে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ

হয়ে গিয়েছে।

লোকেশের কি ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আবার তার লম্বা হিলহিলে পা ফেলে ফিরে গিয়ে হাজির হলো উষার কাছে। উষাকে সে যে চৌকিখানায় বসিয়ে দিয়েছিল সেইখানে উষাকে খানিকটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তার পাশে একান্ত স্বচ্ছন্দ হয়ে প্রায় এলিয়ে বসে পড়ে বললে—তুমি ভূত দেখেছ ? দেখ নি তো ? কিন্তু আজকে তো দেখলে ?

ততক্ষণে এই বিচিত্র মানুষটির সুকোমল বৈচিত্র্য উষাকে আবিষ্ট করেছে। সে মুগ্ধের মতো তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—তুমি কেন ভূত হবে ? তুমি তো মানুষ, দাদার বন্ধু ! কিন্তু তুমি ভূত দেখেছ ?

সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে লোকেশ বললে—দেখেছি ! দেখেছি কেন ? আমিই তো একদিন ভূত হয়ে গিয়েছিলাম !

—সে কি রকম ? বল না ! তার কাছে সরে এসে তার গালে একখানা কাঁচ হাত রেখে তার মুখখানি নিজের দিকে ফিরিয়ে নিলে উষা।

ব্যস, ভূতের গল্প জমে উঠল। কখন সত্য, মন্মথ থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা, মালতী, এমন কি সত্যর মা পর্যন্ত তাকে ঘিরে তার চারপাশে এসে শ্রোতা হয়ে বসে গিয়েছেন !

গল্প বলে চলেছে লোকেশ। প্রথমেই বলে নিয়েছে -আমি তো বাঙাল। তাই আমাকে প্রাণ দিয়ে বলতে হলে আমি ঢাকার ভাষাতেই বলছি। বলেই সে তার পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বলতে আরম্ভ করলে। সকলের মুখে, মন্মথ লক্ষ্য করলে, এমন কি মালতীর মুখেও একটি চাপা মুচকি হাসি খেলে গেল। সত্যর মা বললেন—বল বাবা, তুমি তোমার নিজের ভাষাতেই বল !

লোকেশ বলতে লাগল : 'জানেন সে খুব বেশী দিনের কথা নয়। এই বছর দুয়েকের বেশী নয়। আমি এই তো এখনও রোগা আর লম্বা। তখন শুধুমাত্র হিলহিলে লম্বাই হয়েছি। গায়ে এখন যেটুকু মাংস আছে তখন তাও ছিল না। শুধু একটা কাঠির মতো লম্বা ছিলাম, আর এই তো দেখছেন কালো রঙ। যারাই তখন আমাকে প্রথম দেখত তারাই হয় অবাক হতো নয়তো মুখ ফিরিয়ে হাসতো আমার চেহারা দেখে।'

নিজের সম্পর্কে এমন ধরনের কথা কেউ সচরাচর বলে না। এমন সহজ অকপট ভঙ্গিতে সে কথা আরম্ভ করলে যে তার কথা চুম্বকের মতো তার শ্রোতাদের প্রথম থেকেই আকৃষ্ট করে তুললে। সত্য মাঝখান থেকে বললে—কিন্তু এখন বুঝি তোমার চেহারা খুব ভালো হয়েছে লোকেশ ? শুনে অন্য সবাই মুখ মুচকে

হাসবার আগেই লোকেশই অট্টহাস্য করে উঠল। তার সেই ছেদহীন তুমুল হাসি। হাসতে হাসতে সে বললে—আরে সেই কথাই তো বলছিলাম। আমার এখনই তো এই চেহারা, তখন তা হলে কেমন ছিল বুঝতে পার।

সত্যর মা একবার পুত্রের এই রুচিহীন অভদ্র উক্তিতে রুষ্ট হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু লোকেশকে এ ধরনের কথা বলার মধ্যে যে কোনো অভদ্রতা বা নিষ্ঠুরতা থাকতে পারে তা অন্য কারও মনে একবারও আসে নি। সবাই ভাবছে, এ এমন একজন মানুষ, যাকে ভালো মন্দ সব বলা যায়, তাতে তার কিছু এসে যাবে না।

লোকেশই আবার বলতে লাগল—গল্প শোন এখন।

বলে সে নিজের লম্বা দেহ ও হাত-পাগুলো চৌকির উপর আরও আরাম করে ছড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগল—ঢাকায় আমার কাকার বাড়ি থেকে এক বিয়েতে বরযাত্রী যাচ্ছি। আমার এক খুড়তুতো দাদার বিয়ে। আমাদের তো জলের দেশ। সে দেশের চেহারা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। তোমাদের গঙ্গা নদী দেখে আমাদের নদীকে বুঝতে পারা যাবে না, আন্দাজও করা যাবে না। কয়েক মাইল পর পর পর নদী। তার এপার ওপার নজর চলে না। আমার কাকার বাড়ি বুড়িগঙ্গার ধারে। সেও সেই রকম নদী। তা যাক। যে সময়ের কথা বলছি তখন আষাঢ় মাসের প্রথম। আমার খুড়তুতো দাদার বিয়ে। নৌকোয় করে যেতে হবে বিশ বাইশ মাইল। আকাশ পরিষ্কার, মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। রোদ্দুরে চারদিক হাসছে সকাল থেকে! সকাল সকাল আমরা, মানে বরযাত্রীর দল, বর আর বরকর্তা মাছের ঝোল ভাত খেয়ে নৌকোয় উঠলাম। কাকা বরকর্তা। বর তো একেবারে নটবর সেজে নৌকোয় উঠল। পরনে পাটের কাপড়, গায়ে গরদের উড়ুনি, গলায় টগর ফুলের মালা, মাথায় টোপর। আমাদের সঙ্গে গানের নানান সরঞ্জাম। গান বাজনায় মেতে, নৌকো বেয়ে আমরা চললাম বুড়িগঙ্গা দিয়ে। আমরা যাব বুড়িগঙ্গা যেখানে শীতলক্ষ্যায় মিশেছে সেখানে গিয়ে বুড়িগঙ্গা থেকে শীতলক্ষ্যায় পড়ব।

লোকেশের গল্প বলার সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে শ্রোতারা সবাই একান্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। ঊষা আরও সরে গিয়ে তার কোলের উপর বসে পড়ে একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে গল্প শুনছে। সন্ধ্যা ও মালতী দুজনেই তার বেশ কাছে সরে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে গল্প শুনছে। সত্যর মা পর্যন্ত গল্পে নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছেন। সত্যও বেশ নিবিষ্ট মনে গল্প শুনছে।

মন্মথও গল্প শুনছিল। কিন্তু এক মনে গল্প শোনার ক্ষমতা কোথায় তার? দ্বিধা-

বিভক্ত মনোযোগের খানিকটা গল্প থেকে বার বার ছুটে চলে যাচ্ছিল অভিনিবিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে বিশেষ একজনের মুখের দিকে। গল্প শুনতে শুনতে মধ্যে মধ্যে তার অবাধ্য দৃষ্টি মালতীর মুখের উপর অবাধ্য, দুরন্ত শিশুর মতো আছাড় খেয়ে পড়ে তার মনোযোগ ও মমতা আকর্ষণ করতে চাচ্ছে। কিন্তু বার বার সে লক্ষ্য করছে যে তার দিকে অন্য জনের দৃষ্টি কি মনোযোগ কোনোটাই নেই। সে এক-মনে গল্প শুনে চলেছে, তার বড় বড় চোখের শান্ত গম্ভীর দৃষ্টি সবক্ষণ লোকেশের মুখের উপর স্থিরভাবে নিবদ্ধ। দেখতে দেখতে তার মনের মধ্যে যেন কেমন করতে লাগল। বাইরে যখন শরৎকালের সোনার রোদ্দুর শেষ বারের মতো অন্তিম স্বর্ণহাস্য করছে তখন তার মনে নির্জন, মেঘমলিন, আষাঢ় সন্ধ্যার ছায়া নেমে তার সমস্ত চিত্তকে বিমর্ষ ও বিকল করে তুললে। সে আস্তে আস্তে সকলের অগোচরে পূর্বদিকের বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল একা।

এদিকে লোকেশের গল্প তখন ঘন হয়ে উঠে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছতে চলেছে। লোকেশ বলছে :

—বুড়িগঙ্গা শেষ করে আমরা যখন শীতলক্ষ্যা আর বুড়িগঙ্গার সঙ্গমে এসে পড়লাম তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে। সেই সময়ে মেঘ করে এলো ঘন হয়ে। সঙ্গে ঝড়ো বাতাস। আমাদের তো গান বাজনা মাথায় উঠল। বরকর্তা খুড়োমশাই চেঁচামেচি করে বার বার বলতে লাগলেন নৌকো চরের কাছে, তীরের কাছে নিয়ে যেতে। তাঁর বকাবকিতে নৌকো চরের কাছাকাছি গিয়েছে এমন সময় প্রবল বাতাসে নৌকো উলটে গেল। ব্যস, তারপর আর কোনো খবর জানি না।

তারপর যখন আবার জাগলাম তখন বুঝলাম আমি ভূত হয়ে গিয়েছি। নৌকো উলটে যাওয়ার পর আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, না অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, না মরে গিয়েছিলাম, তা জানি না, তবে তখন আমার ধারণা হয়েছিল যে আমি বোধহয় মরে গিয়ে ভূত হয়ে গিয়েছি।

তার গম্ভীরভাবে এই অদ্ভুত কথাগুলি বলায় সে যে কোনো গম্ভীর কথা অথবা কোনো অতি হাস্যকর কথা বলছে তা তার শ্রোতারা ঠিক ধরতে পারছিল না। কিন্তু তাতে তার গল্পের আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমল না, বরং বেড়ে গেল।

সে বলে চলেছে—আমি মানুষই থাকি কি ভূতই হয়ে থাকি যাই হোক না কেন প্রথমেও বুঝতে চেষ্টা করলাম আমি কোথায় রয়েছি। প্রথমেই মনে হলো যেন জলে সপসপ করছে। পাশ ফিরলাম, মনে হলো ভিজে তুলো সব গায়ে সেঁটে লেগে যাচ্ছে। খুব রাগ হলো। কে এমনটা করলে? ভিজে তুলো গা থেকে

ছাড়াতে গেলাম। হাত ভর্তি হয়ে গেল। কি কাণ্ড বলতো! তখন মনে পড়ল নৌকোডুবি হয়ে আমি নদীর চরে ভিজে কাদামাটির ওপর পড়ে আছি। কি সর্বনাশ! তখন মনে ভয় হলো। মনে হলো একা আমি এই নির্জন নদীর চরে পড়ে আছি কাদা মেখে।

সকলেই প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে গল্প শুনছে! মন্মথ বাইরে বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার মনটা ঘরেই গল্পের কাছে পড়ে ছিল। সে শুনতে শুনতে মুখ বেঁকালে। যত বাজে কথা, যত গাঁজাখুরি ব্যাপার!

লোকেশের গল্প চলছে—আমি তো কোনোক্রমে কাদা-মাখা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মনে মনে বুঝলাম, আর সবাই মরে গিয়েছে, আমিই শুধু একা বেঁচে আছি, অন্যদের খুঁজতে চারিদিকে চাইতে লাগলাম। আকাশে মেঘ নেই, কিন্তু চাঁদও নেই, শুধু লক্ষ লক্ষ তারা ফুটে আছে। চারিদিক খুব অন্ধকার! সেই সঙ্গে নিস্তব্ধ, নির্জন। সেই অন্ধকারে খুব কষ্ট করে চারিদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হলো, আমার থেকে খানিকটা দূরে কে যেন বসে আছে, তার সাদা কাপড় দেখা যাচ্ছে। আমি সজোরে গলা ফাটিয়ে ডাকলাম—কে ওখানে? আমার মনে হলো কেউ বোধহয় মরে গিয়ে ভূত হয়ে বসে আছে! আমার ডাক শুনে হঠাৎ কে চিৎকার করে বিকৃত গলায় কেঁদে উঠল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল। তখন আমি বুঝলাম ও ভূত নয়, মানুষ। কারণ ভূত তো ভয়ে ছুটে পালিয়ে যায় না! কিন্তু আমি? আমিই কি তা হলে ভূত হয়ে গিয়েছি?

সকলের মুখেই তখন একটি বিচিত্র হাসি দেখা দিয়েছে। মন্মথ দেখতে পেলে সবাই হাসছে, এমন কি যে কখনও হাসে না, সর্বদা গম্ভীর হয়ে থাকে, সেও হাসছে। তার মন যত বিমর্ষ তত অবসন্ন হয়ে উঠল। সে ঘরের ভিতরে ঢুকে একবার তিক্ত ও বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সকলের দিকে চেয়ে সত্যর কাছে এসে মৃদুস্বরে বললে—সত্য, আমি চললাম রে, আমার শরীরটা খারাপ করছে!

সত্য তার দিকে ফিরে অন্যমনস্কভাবেই যেন বললে—এখন যাবি?

—হ্যাঁ, আমি যাই!

—আচ্ছা। আবার আসিস।

মন্মথ তখন ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করেছে। তার দুই ঠোঁট কাঁপছে, চোখে জল এসে গিয়েছে। সে আসবে না, আর এ বাড়িতে আসবে না কোনো দিন!

গল্প তখন শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।—আমি প্রাণভয়ে ছুটছি আর ডাকছি—ও ছোড়দা, আমি, আমি! হাত বাড়িয়ে ছুটে যাচ্ছি সেই কাদার মধ্যে দিয়ে।

আমি যত ছুটি ছোড়দাও তত ছোটে আর বিকৃত গলায় চেঁচায়—ভূত, ভূত!
সকলে তখন হাসিতে হাসিতে ভেঙে পড়ছে। একতলায় বারান্দায় বেরিয়ে গিয়েও মন্মথ সে হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছে। সে দ্রুত পায়ে বাগানের পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। সে কেবল মনে মনে বলছে—সে আসবে না, আর আসবে না। এ বাড়িতে। কোনোদিন আর আসবে না। সে প্রায় ছুটতে ছুটতে চোখের জল মুছে ফেললে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে।
বেশ কিছুক্ষণ পর।
গল্প ও হাসি শেষ হয়ে গেলে সত্যর মা-ই উঠলেন সর্বপ্রথম। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করলেন মন্মথ নেই। সত্যকে জিজ্ঞাসা করলেন—মন্মথ কোথায় গেল রে?
—মনুর শরীর খারাপ লাগছিল, তাই চলে গিয়েছে।
সত্যর মা বললেন—শরীর খারাপ? কি হলো? না খেয়ে চলে গেল?
তিনি খাবার ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেলেন।
মন্মথর চলে যাওয়ায় সকলেই আশ্চর্য হয়েছে। সন্ধ্যা বললে—মনু চলে গেল? কি ছেলে মা! না খেয়ে চলে গেল?
তারপর মালতীর দিকে তাকিয়ে বললে—দেখেছিস মালু, কেমন ছেলে, না খেয়ে চলে গেল!
মালতী তখন উঠে দাঁড়িয়েছে? ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে শুধু বললে—একের নম্বর বোকা!

•

মন্মথ যদিও প্রতিজ্ঞা করেছিল যে এ বাড়ি সে আর আসবে না তবু সে পরদিন বিকেলেই সত্যদের বাড়ি না এসে পারলে না। প্রতিজ্ঞা আর থাকল কোথায়?
সত্যদের বাড়ি থেকে যাওয়ার পর রাত্রিতে যথারীতি পড়তে বসেছিল। কিন্তু পড়ায় মন বসে নি। খেতেও যায় নি সে, না খেয়েই শুয়ে পড়েছিল। তার রুম-মেট শশাঙ্ক তাকে পরম স্নেহে গায়ে হাত দিয়ে খাবার জন্য উঠতে অনুরোধ করেছিল। সে ওঠেও নি, খেতেও যায় নি। বার বার ডাকায় বরং একটু বিরক্ত হয়েছিল। মন তখনও রাগে অভিমানে ভর্তি! রাগটা যে স্পষ্টভাবে কার বিরুদ্ধে তা সে জানে না। তবে সেই রাগ আর অভিমানকে অবলম্বন করেই প্রতিজ্ঞাটাকে সে আঁকড়ে ধরে রইল মনে মনে।
সকালে উঠেই কিন্তু মনের মধ্যে রাগ আর অভিমানের বিন্দুমাত্র চিহ্ন কোনোখানে সে খুঁজে পেল না। ভুল বলা হলো। খুঁজবে কে? খুঁজবার মতো কি তার মনের অবস্থা তখন? তখন তারা সারা মন এক হাহাকারে আতুর হয়ে উঠেছে।

মনে হচ্ছে তার সব হারিয়ে গেল। কোথাকার কে একজন এসে তার সব কেড়ে নিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে তার সাম্রাজ্য থেকে। আর সে বিতাড়িত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই অবস্থাতেই সারাটা দিন কাটল। কলেজে গেল বটে, ক্লাস করলেও ঠিক, কিন্তু সত্য কি লোকেশ দুজনকেই সেদিন সে বেশ হিসেব করে এড়িয়ে গেল।

কলেজ শেষ করেই মন্মথ আর থাকতে পারলে না। সে ছুটল সত্যদের বাড়ি। সত্যদের বাড়ির হাতার মধ্যে ঢুকে তার কেমন লজ্জা করতে লাগল। সত্যদের বাড়ি আসার পক্ষে এখনও যেন বড্ড সকাল আছে! রোদ্দুরে এখনও সাদা সাদা আভা, এখনও তাতে সোনা রঙ ধরে নি। কিন্তু আর ফিরবার উপায় নেই। সন্ধ্যাদি তাকে দোতলার ঘর থেকে দেখে ফেলেছে। নেমে আসছে সন্ধ্যাদি!

নিচের বারান্দায় উঠতেই সন্ধ্যাদি এসে তার হাত ধরলে একান্ত আগ্রহে—কাল অমন করে কাউকে না বলে চলে গেলি কেন মনুভাই?

মন্মথর অনেক কথা একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু সে সবের বদলে সে সন্ধ্যার কথারই উত্তর দিলে—কাল শরীরটা বড় খারাপ লাগছিল সন্ধ্যাদি। তাই চলে গেলাম। কিন্তু সত্য কই? তার সঙ্গে একটু বিশেষ দরকার আছে।

মিথ্যা কথাটা শেষকালে জুড়ে দিয়ে এত সকাল সকাল আসার কারণটা ব্যক্ত করে সে যেন বাঁচল।

সন্ধ্যা বললে—সত্য তো কলেজ থেকে এসে এখনি জোড়াসাঁকো চলে গেল। সেখানে একটা গানের পালার রিহার্সাল আছে। মলিরও যাবার কথা। তার শরীর খারাপ করছে বলে সে গেল না।

মন্মথর ইচ্ছা করতে লাগল মালতীর কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু পারলে না। কেমন এক লজ্জায় পারলে না। সে চুপ করে রইল।

সন্ধ্যা বললে—কাল মলি তোর সম্বন্ধে কি বলছিল জানিস? বলছিল তুই একের নম্বর বোকা।

মন্মথ কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল। হাঁ করে চেয়ে রইল সন্ধ্যার মুখের দিকে।

সন্ধ্যা বললে—কি, এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবি? ওপরে যাবি না?

মন্মথ বললে—না, আর ওপরে যাব না। আমি চলে যাই। সত্যর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

সন্ধ্যা বিরক্ত হয়ে বললে—খুব যে সত্য সত্য করে ভদ্রতা করছিস। আমরা বুঝি কেউ নই নাকি? তবে একটু দাঁড়া, একটা নতুন খাবার করেছি, নিয়ে আসি।

ঠিক এই সময়েই উপরের সিঁড়ি থেকে মালতীর গলা শোনা গেল। সে সন্ধ্যাকে ডেকে বললে—দিদি, তুই আমাদের রহিম কোচোয়ানকে বল না গাড়িটা বের করতে। আমায় জোড়াসাঁকোয় পৌঁছে দিক।

বলতে বলতে সে নেমে এসে সন্ধ্যার পাশে দাঁড়াল। মন্মথর দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত। শুধু সন্ধ্যাকে বললে—তুই ওকে খবর দিতে বলে দে। আমি কাপড়টা বদলে আসি।

সন্ধ্যা কোচোয়ানকে খবর দেবার জন্য বাগানে নামল। মালতী সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল ভ্রূক্ষেপ না করে।

মন্মথর বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। সে ছুটে সিঁড়ির কাছে গিয়ে সকাতর কম্পিত স্বরে যেন ভিক্ষুকের মতো ডাকলে—মালতী। শোন, মালতী!

সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠতে উঠতে মালতী ফিরে দাঁড়াল—কি?

তেমনিভাবেই মন্মথ অন্তরের সব আর্তি একত্রিত করে তাকে বললে—শোন!

—কি শুনব? আমি কোনো বোকার কথা শুনিনা! বলে সে প্রায় ছুটে সিঁড়িতে উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাগান থেকে ফিরে সন্ধ্যা তার কাছে এসে বললে—তুই একটু বস ভাই! আমি আমার নতুন খাবার নিয়ে আসি। কি অদ্ভুত মেয়ে দেখলি। এখনি সত্য গেল। সত্য কত সাধাসাধি করলে। শরীর খারাপ বলে গেল না। আবার এখনি শরীর ভালো হয়ে গেল, এখনি যাওয়া চাই জোড়াসাঁকো। যদি কিছু বলতাম এ নিয়ে তো আর যেত না।

কয়েক মিনিট পর।

বাইরে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে মন্মথ সন্ধ্যার হাতের তৈরি সরভাজা সরপুরিয়া খাচ্ছে, সন্ধ্যা পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোতিপ্রসাদবাবুর ব্রুহাম গাড়িখানা মালতীকে জোড়াসাঁকো নিয়ে যাবার জন্য দাঁড়াল বারান্দার সামনের রাস্তায়।

একেবারে সাদা জামা-কাপড়ে সজ্জিত হয়ে নেমে এলো মালতী। তাদের পাশ দিয়ে, মন্মথর দিকে না তাকিয়ে, সন্ধ্যার সঙ্গে হেসে দুটো কথা বলে সে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

মন্মথ তখন উঠে দাঁড়িয়েছে খাবার প্লেট হাতে।

গাড়িখানা চলতে আরম্ভ করল। হঠাৎ চলন্ত গাড়ির দরজার কাছে মাথাটা বাড়িয়ে এনে গাড়ির দরজার ফ্রেমে মাথাটি ঠেকিয়ে তাদেরই দিকে, যেন তারই

দিকে চেয়ে রয়েছে মালতী। মালতী চেয়েই আছে। শুধু চেয়েই আছে নয়, তার দুই চোখে, সুকুমার ঠোঁটের দুই প্রান্তে হাসির সুস্পষ্ট আভাস।
মন্মথর বার বার মনে হতে লাগল মালতী কি তারই দিকে তাকিয়ে হাসছিল ?

৯

দুটো বছর কেটে গেল স্বপ্নের মতো। স্বপ্নেরই মতো শুধু নয়, এক অবিচ্ছিন্ন সুখ-স্বপ্নের মতো। মন্মথ একবারও খেয়ালও করে নি, করতে পারে নি কেমন করে দিনগুলো কাটছে, কোনো দিন হিসেবও করে নি দিনগুলো কেটে কোথায় গেল, কি দিয়ে গেল তাকে, কি নিয়ে গেল তার কাছ থেকে। সতেরো থেকে উনিশ বছর বয়সে কে কবে তার হিসেব করেছে ? বেহিসাবের কালই তো এটা।
এরই মধ্যে সে পাস করে বি. এ.তে ভর্তি হয়েছে। এফ. এ. সে পাস করলে ফার্স্ট গ্রেডে . লোকেশ সেকেণ্ড আর সত্য ফোর্থ। পরীক্ষাকে উপলক্ষ্য করে ওদের তিনজনের ঘনিষ্ঠতা আরো ঘন হয়ে উঠল।
পরীক্ষার দিন পনেরো আগে থেকে তাদের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লেখাপড়ার আসর বসত সত্যর বাবার মক্কেল নিয়ে বসবার পাশের ঘরখানিতে। ভোরে স্নান সেরে মন্মথ আর লোকেশ এসে হাজির হতো সত্যর পড়ার ঘরে। সত্য তার আগে থেকেই বই খাতাপত্র নিয়ে বসে থাকত। ওরা দুজন এসে পড়াশুনো আরম্ভ হতো। সকালবেলা সত্যর মা সন্ধ্যা ও মালতীকে নিয়ে বেয়ারার হাতে জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে নেমে আসতেন। জলখাবারের মধ্যে দুধ আর মিষ্টি। জল খাইয়ে, উচ্ছিষ্ট থালাবাসন তুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যেতেন।
পরিচয়ের প্রথম দিকে লোকেশকে নিয়ে মন্মথর সে কি যন্ত্রণা গিয়েছে। লোকেশ এসে একান্ত স্বচ্ছন্দে যখন সন্ধ্যা, উষা আর মালতীকে নিয়ে গল্প আরম্ভ করত তখন মন্মথ আর সেখান থেকে নড়তে পারত না। মনে যত অস্বাচ্ছন্দ্য তত এক অকারণ উদ্বেগ বোঝার মতো চেপে থাকত। লোকেশ উঠে গেলে, ও বাড়ি থেকে চলে গেলে তবে সে নিশ্চিন্ত হতো।
কিন্তু ধীরে ধীরে সেটা কেটে গেল। কেটেই গেল না শুধু, তাদের সম্পর্কটা একটা অদ্ভুত চেহারা নিলে। জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে লোকেশের একটা আশ্চর্য সম্পর্ক গড়ে উঠল। বিশেষ করে মালতীর সঙ্গে। একদিন একটা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে সেটা ধরা পড়ে গেল।
সত্যদের বাড়িতে তুই বলে সম্বোধন করাটা কেউ খুব একটা পছন্দ করেন না।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু কি সত্যর মা পারতপক্ষে বাইরের কাউকে কেন, বাড়ির ছেলেমেয়েদেরও তুই বলে সম্বোধন করেন না। মালতী সত্য পরস্পরকে তুই বলে, সন্ধ্যা সকলকেই তুই বলে। তার তুইয়ের সীমা মন্মথ পর্যন্তই ছিল। তার বাইরে নয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল লোকেশ সকলকেই তুই বলে। এমন কি সন্ধ্যাকে পর্যন্ত। লোকেশের সন্ধ্যাকে তুই বলে কথা বলা যেদিন সত্যর মা ও জ্যোতিপ্রসাদবাবু প্রথম শুনেছিলেন সেদিন তাঁদের মুখে কিঞ্চিৎ বিরক্তির আভাস ফুটে উঠেছিল ক্ষণেকের জন্য। সেটা লোকেশ দেখতে পায় নি। দেখতে পেয়েছিল কিনা, কিংবা বুঝতে পেরেছিল কিনা তাও অবশ্য বুঝতে পারা যায় নি। ওঁরা সরে গেলে কথাটা সন্ধ্যা তাকে বলেছিল চুপিচুপি—এই লোকেশ, তুই আমাকে তুই বলে কথা বলিস না।

লোকেশ একান্ত বিস্মিত হয়ে বলেছিল—কেন রে, তোকে তুই বলায় কি দোষ হলো?

সন্ধ্যা মানুষটা বড় নরম। কারও মনে কোনো ব্যথা লাগবে এই কল্পনায় ও শঙ্কায় সে প্রায় প্রতি মুহূর্তে বিব্রত হয়। সে বিব্রত হয়ে বললে—দোষ কি তা জানি না, তবে বাবা মা বোধহয় এটা পছন্দ করেন না।

লোকেশের কাছে সেটা বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। সে চোখ বড় বড় করে বললে —ওঁরা পছন্দ করেন না? আচ্ছা, আমি মাসীমা আর মেসোমশাইকে জিজ্ঞাসা করে নেব ওঁরা পছন্দ করেন কিনা! যদি পছন্দ না করেন তাহলে, দরকার হলে, তোকে আপনিও বলতে পারি!

সন্ধ্যা চরম বিব্রত হয়েছিল, কিন্তু হেসে গড়িয়ে পড়েছিল মালতী। হাসতে হাসতে বলেছিল সন্ধ্যাকে—ও একটা ভূত। ও ভূত সব পারে। এই ভূত, শোন্, তুই যেন কাকা-কাকীমাকে খবরদার এ কথা জিজ্ঞাসা করতে যাস নি। সে এক বিশ্রী ব্যাপার হবে।

লোকেশ সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়ে বলেছিল—আচ্ছা রে বাবা, আচ্ছা! তুই না মহা মুরুব্বির মতো কথা বলিস। আর তোর বাহাদুরী এমন যে তোকে মুরুব্বিয়ানায় বেশ মানায়, আর তোর মুরুব্বিয়ানা সবাই বেশ মেনে নেয়। আমি তো সত্য আর মন্মথর ওপর তোর সর্দারি দেখে অবাক হয়ে যাই।

তার কথায় সন্ধ্যা এক সঙ্গে অনেক হাসির খোরাক পেলে। সে হাসতে লাগল। কিন্তু মালতী অকস্মাৎ মুখ ঘুরিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে, এক মুহূর্তে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে চিৎকার করে উঠল—দিদি, তুই একটুও কিছু দেখিস না। আজ মালী যে এখনও ফুল দিয়ে যায় নি সেটা খেয়াল করিস নি! তুই যেন কি। সব

ভুলে ওই বুড়ো খোকার সঙ্গে গল্প করছিস!

লোকেশ হা হা করে হেসে উঠল। হেসে বললে—যাক, তোর কাছে একটা আদরের সম্বোধন পাওয়া গেল। বুড়ো খোকা। তা আমাদের তিনজনের একজন মহাবোকা, একজন বুড়ো খোকা আর সন্ধ্যে কি বল তো? ওর-ও একটা নাম দে! তা হলে বেশ হবে।

মালতী হেসে বললে—সেটা তোর জন্যে বাকী রেখেছি তুই বল!

লোকেশ মাথা চুলকে বললে—মুশকিল করলি!

—কিসের মুশকিল?

—নিজের মাথা চুলকে তো এর সমাধান হবে না। অন্যের মাথা চুলকে বুদ্ধি বের করতে হবে। আয় সরে আয়, তোর মাথা চুলকে আমার মাথায় বুদ্ধিটা গজিয়ে নি।

বলে সে আপনার লম্বা শীর্ণ হাতখানা মালতীর মাথার দিকে বাঁশের লগির মতো এগিয়ে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে সকৌতুকে ও সভয়ে মালতী সরে গেল তার হাতের কাছ থেকে। দূরে সরে গিয়ে তাকে শাসিয়ে বললে—খবরদার, আমার মাথায় হাত দিবি না!

সন্ধ্যা আশ্চর্য হয়ে দেখছিল। একি তাদের চেনা মালতী! গম্ভীর, শান্ত, স্বল্প-বাক!

সন্ধ্যার আশ্চর্য হওয়া আরও একটু বাকী ছিল। মালতী অকস্মাৎ বললে—লোকেশ, আমি আসছি, একটু দাঁড়া!

বলেই সে ছুটে পাশের ঘরে চলে গেল। সন্ধ্যা এ মালতীকে কখনও দেখে নি।

লোকেশ এ ঘর থেকে চিৎকার করে বললে—ওরে আমি দাঁড়াব কি, আমি তো বসেই আছি। বসেই থাকব, তুই আয়!

অল্প সময়ের মধ্যেই মালতী একখানি কাগজ হাতে ফিরে এলো। বিজয়িনীর মতো কাগজখানা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে—পড়্; পড়ে দেখ্!

লোকেশ একবার মনে মনে পড়ে নিয়ে চিৎকার করে হেসে উঠে বললে—শোন্, সন্ধ্যা, তুই শোন্।

লোকেশ চিৎকার করে পড়তে লাগল—

ওরা তিন বন্ধু,
নয় বটে জন্তু;
প্রথমটি একেবারে বোকা,
দ্বিতীয়টি বুড়ো রাম খোকা,

তৃতীয়টি নাম যার সত্য,
কেবলি সে দিয়ে যায় ধোঁকা!

চিৎকার করে পড়ে পড়া শেষ করে লোকেশের সে কি হাসি!

এই সময়ে ঘরে ঢুকল সত্য আর মন্মথ। দুজনেই একটু অবাক। সত্য বললে—ও পাগল, অমন হাসছে কেন? মনে হচ্ছে আমাদের বসার ঘরে তেরটা শেয়াল একসঙ্গে ডাকছে বিকেল বেলায়!

লোকেশ যতক্ষণ চিৎকার করে কবিতাটা পড়ছিল আর হাসছিল তার সঙ্গে মালতীও পাল্লা দিয়ে হেসে চলাছিল। সত্য এবং মন্মথ ঘরে ঢুকতেই মন্মথর চোখে তার চোখ মিলতেই সে হাসি থামিয়ে গম্ভীর হবার চেষ্টা করতে লাগল, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি চাপতে গেল। না পেরে সে শান্ত ধীর পায়ে চলে গেল পাশের ঘরে।

কিন্তু লোকেশ যেন পাগল হয়ে গিয়েছে। সে একটা হাত তুলে সত্যর দিকে প্রসারিত করে দিয়ে হেসেই চলল, হেসেই চলল। যত সে হাসছে তত তার চশমার পুরু কাঁচের ওপরে দুই চোখ থেকে আবরল ধারায় জল ঝরে পড়ছে।

মন্মথ অবাক হলো দেখে। লোকেশের এই পাগলের মতো খুশী খুশী ভাব সে বেশ ভালো করে চিনেছে এই দু বছরে। কিন্তু যখনই এর সঙ্গে নূতন করে সাক্ষাৎ হয় তখনই তার অবাক লাগে। এই পদ্মাপারের ছেলেটা এত অল্প সময়ের মধ্যে এই স্বভাব-গম্ভীর, অনেক পরিমাণে নিজেদের চিন্তা ও আবেগের মধ্যে আবদ্ধ পরিবার-টির গাম্ভীর্য ও কঠিন ভব্যতার বেড়া ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে এত অক্লেশে এমন লণ্ডভণ্ড পাকায় কি করে? আর মালতীর মতো মেয়ের সঙ্গে এই আশ্চর্য হৃদ্য সম্পর্কই বা ওর সম্ভব হলো কি করে?

তার চেয়েও মন্মথ আশ্চর্য হয় আরও একটা কথা ভেবে। এমন অকুতোভয় অনাবিল আনন্দ ওর মধ্যে কি করে এলো? একদিনের একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা ওর মনে দাগ কেটে দিয়েছে প্রচণ্ডভাবে। কিছুকাল আগের কথা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবিবাবুর 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয়ে সত্য ও মালতী দুজনেই বিশেষ ভূমিকায় নেমেছিল। মালতী নেমেছিল সরস্বতীর ভূমিকায়। সে অভিনয়ে দর্শকদের মধ্যে জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ির সকলের সঙ্গে লোকেশ ও মন্মথও উপস্থিত ছিল। অভিনয়ের আশ্চর্য সুন্দর স্বাদটি সকলের সঙ্গে মন্মথও বহন করে নিয়ে এসেছিল আপনার মনে। লোকেশ কি বহন করে নিয়ে এসেছিল লোকেশই জানে। কারণ লোকেশের মন সচরাচরের মন নয়, ও যত হাসতে পারে তত ওর কাঁদবার শক্তি। যে উৎস থেকে কখনও হাসি কখনও কান্না প্রবল উৎসারে

বেরিয়ে আসে সে অতি সহজ উৎসার ; এমনটি কদাচিৎ দেখা যায়।

অভিনয়ের পর যখন সবাই মালতীর অভিনয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, মন্মথও যখন মালতীর সম্পর্কে নিজের স্ব-আরোপিত লজ্জা অতিক্রম করে মালতীর অভিনয় সম্পর্কে দুএকটা প্রশংসার কথা উচ্চারণ করছিল মৃদুস্বরে, তখন লোকেশ নামক ব্যক্তিটি, যে কথায় কথায় হাসে ও কাঁদে, সে চুপ করেই ছিল, যেন অনেকটা বিমনা হয়ে।

তারপর দু তিনখানা গাড়িতে ওরা জোড়াসাঁকো থেকে ফিরল জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ি। সত্যর সঙ্গে মন্মথ ও লোকেশ ফিরেছিল। তারা অপেক্ষা করছিল মেয়েদের ফেরার জন্য। জ্যোতিপ্রসাদবাবু মেয়েদের নিয়ে ফিরলে ওরাও সকলের সঙ্গে উঠে গেল উপরে ওদেরই সঙ্গে। আজ সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে সত্য, উষা পর্যন্ত জ্যোতিপ্রসাদবাবুর সামনেই খানিকটা যেন উচ্চকণ্ঠেই কলরব করছিল। তার সঙ্গে, আশ্চর্যের কথা, মন্মথও আজ যোগ দিয়েছিল। কিন্তু লোকেশ একেবারে চুপচাপ। যার প্রাণে আনন্দ সচরাচর প্রায় অহরহই ঝরনার অবিরাম জলধারার মতো উচ্ছ্বসিত হয়, সেই উচ্ছ্বাস যে অহরহ হাসিতে ও চোখের জলে সর্বদা মশগুল থাকে সে আজ নিশ্চুপ। সত্য এবং মন্মথ দুজনেই তাকে এ বিষয়ে দু একবার সকৌতুক খোঁচা দিয়েছিল। কিন্তু লোকেশ সাড়া দেয় নি।

উপরের ঘরে উঠে সবাই যখন বসবার অবকাশ পেলে তখন বিশ্রামের সুযোগে সবাই আরও খানিকটা প্রগল্‌ভ হবার সুযোগ পেলে। মালতীও বসেছিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই সে উঠে দাঁড়াল। খানিকটা আত্মগতভাবে যেন বললে—যাই, কাপড় বদলে ফেলি গিয়ে।

লোকেশ একটা আসনে চুপ করে বসেছিল। বসেছিল মালতীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। সে দৃষ্টি সকলের প্রকাশ্য দৃষ্টির সম্মুখেই কেমন যেন স্বপ্নাতুর, স্তিমিত, কিন্তু একান্ত একাগ্র। মালতী পাশের ঘরে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই সে অকস্মাৎ উঠে দাঁড়াল। তার দীর্ঘ দক্ষিণ হাতখানি যেন একটি স্বপ্নময় ইঙ্গিতের মতো তার দিকে প্রসারিত করে সে বললে—এই মালতী, শোন্।

তার মৃদু কণ্ঠস্বরে এমন একটি অনিবার্য আবেগময় আকুতি প্রকাশিত হলো যে মালতী তার যাবার জন্য প্রসারিত পদক্ষেপ বন্ধ করে তার দিকে তাকালে। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে এসে দাঁড়াল তার সামনে। পুরু চশমার আড়াল থেকে তার ক্ষীণ দৃষ্টিকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে মুখ, চোখ, ভ্রূ কুঞ্চিত করে একটা বিকৃত মুখভঙ্গী করে সে মালতীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তার এই আচরণে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলে, এমন কি পরিপক্ক চরিত্র ও বয়সের মানুষ জ্যোতি-

প্রসাদবাবু এবং তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত সকলে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁদের চোখের সামনে একটা দুর্বোধ্য ঘটনা ঘটছে যার অর্থ তাঁরা সঠিক বুঝতে পারছেন না।

লোকেশের কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মালতীর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে তাঁর মাথার রুক্ষ চুলের গায়ে গায়ে লেগে-থাকা রজনীগন্ধার ভাঙা পাপড়ির টুকরোগুলি সুযত্নে একটি করে তুলে নিয়ে তার মাথার স্বল্প অবিন্যস্ত রুক্ষ চুলে পরম সমাদরে দুবার হাত বুলিয়ে সমান পরিপাটি করে দেবার চেষ্টা করলে। তারপর তার পিঠে একটা মৃদু চাপড় মেরে বললে—যা।

আরও আশ্চর্য, মালতী অসংকোচে তার সমস্ত সমাদর হাসিমুখে গ্রহণ করে প্রসন্ন মনে, শান্ত পদক্ষেপেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরের সবাই বিস্মিত। মন্মথ বিস্মিত এবং ব্যথিত দুইই। সকলেই যা ঘটল সেটা সঠিক বুঝতে গিয়েও যেন শেষ মুহূর্তে বুঝতে পারলেন না। কেবল সত্য বললে—লোকেশটা একটা বদ্ধ পাগল।

যাকে পাগল বলা হলো সে ততক্ষণে আবার নীরবে নিজের জায়গায় গিয়ে বসেছে।

যেটা সেদিন সঠিক বুঝতে পারা যায় নি সেটা বুঝতে পারা গেল সেই দিনই আর খানিকটা পর। যেন এই দুর্বোধ্য বিস্ময়কে ব্যাখ্যা করার জন্যই ঘটনাটা কেউ অলক্ষ্য থেকে সংঘটন করে দিলে। আনন্দ ও খাওয়া-দাওয়ার পর যখন মন্মথ ও লোকেশের চলে যাবার সময় হয়েছে, তারা যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে এমন সময় চাকর এসে জ্যোতিপ্রসাদবাবুকে খবর দিলে হিন্দু ইস্কুলের হেডমাস্টার মশাই এসেছেন, সত্যকে ডাকছেন। হিন্দু ইস্কুলের হেডমাস্টার মশাই এসেছেন শুনে জ্যোতিপ্রসাদবাবুর আগে আগে সত্য, মন্মথ ও লোকেশ তড়বড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। জ্যোতিপ্রসাদবাবু ধীরে ধীরে নেমে গেলেন তাদের পিছনে পিছনে। যাবার আগে স্ত্রীকে নিচুগলায় হেডমাস্টার মশাইয়ের জন্য কিছু জল-খাবার পাঠিয়ে দিতে বললেন।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু নেমে যেতেই দেখলেন হেডমাস্টার মশাই, যাঁর মুখে অনেক দাড়ি-গোঁফ, যিনি অধিকাংশ সময় মুখের একটা গম্ভীর চেহারা নিয়ে পৃথিবী ও জীবন যে কত গম্ভীর ব্যাপার তা অহরহ বুঝিয়ে দেন, সেই মানুষ চেয়ারে বসে আছেন। আর ছাত্র তিনজন তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু জ্যোতিপ্রসাদ-বাবু আজ লক্ষ্য করলেন, মাস্টারমশাই আজ খুব হাসিখুশী। তিনি সবচেয়ে কাছে

দাঁড়ানো সত্যর একখানা হাত ধরে কথা বলছেন।

জ্যোতিপ্রসাদবাবুকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন হাসিমুখে। হাসিমুখে বললেন—আজ আমি ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ বাঁড়ুজ্জেমশাই। সন্ধ্যাহ্নিক সেরে এসেছি। একটু ভালো করে মিষ্টি আনতে বলুন।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু হাইকোর্টের নাম করা উকিল। তিনি হাসিমুখে বললেন—নিশ্চয়, সে ব্যবস্থা আগেই, আপনার আসার খবর পেয়েই করে এসেছি। সন্দেশ আসছে। কিন্তু তার আগে শুভ সন্দেশ দিন। আমি তো আপনাকে শুধু সন্দেশ খাওয়াব।

তিনি হাসতে হাসতে হেডমাস্টার মশাইয়ের সামনের চেয়ারে বসলেন। হেডমাস্টার মশাইয়ের মিষ্টি খেতে চাওয়ার মধ্যেই তিনি কিছু বুঝতে পেরেছেন। হেডমাস্টার মশাই যখন এতটা রাত্রিতে এসে হাসিমুখে মিষ্টি খেতে চাইছেন তখন নিশ্চয়ই সুসংবাদ আছে।

হেডমাস্টার মশাই একবার নিজের চারিপাশে ছাত্র তিনজনকে সহাস্য প্রসন্ন মুখে দেখে নিয়ে বললেন—সংবাদ আছে, তাই দেবার জন্যেই তো এসেছি। কিন্তু আপনার গৃহটি যে নানা রত্নের আগার সেটি আবার ভালো করে অনুভব করছি।

জ্যোতিপ্রসাদ হেডমাস্টার মশাইয়ের কথা শুনে একবার প্রসন্নমুখে উপস্থিত ছেলে তিনটির দিকে চেয়ে চোখ বুলিয়ে নিলেন। আশ্চর্য, এই কিছুক্ষণ পূর্বের আধ-পাগল লোকেশকে সবচেয়ে শান্ত, সবচেয়ে নম্র মনে হচ্ছে। একই মানুষের দুটো চেহারা অল্প কিছুক্ষণের তফাতে ফুটে উঠেছে পর পর, কিন্তু একটার সঙ্গে অন্যটার কোনো মিল নেই। তাই ভাবতে ভাবতেই তিনি অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করলেন—আবার নতুন কোন্ রত্ন সংগ্রহ করলাম?

হেডমাস্টার মশাই সত্যর হাতখানি ছেড়ে দিয়ে সেই হাতখানি রাখলেন লোকেশের পিঠের উপর। অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে হাতখানি রেখে বললেন—এই যে আমাদের লোকেশ! আমি কথাটা শুনেছিলাম বটে। আজ চোখে দেখছি।

কথাটা বোধহয় জ্যোতিপ্রসাদবাবুর পুরোপুরি মনঃপূত হলো না। তবু তিনি ভদ্রতার খাতিরে একটু হাসলেন।

হেডমাস্টার মশাই বললেন—আপনার গৃহে সত্য নামক যে চুম্বকটি আছে তার আকর্ষণে একদা মন্মথ নামক লৌহখণ্ড আকর্ষিত হয়ে এসেছিল। আজ দেখছি সেও চুম্বকে পরিণত হয়েছে। এই দুই চুম্বকের টানে তৃতীয় লৌহখণ্ডটি এসে এখানে সমুপস্থিত। উপযুক্তই হয়েছে।

একটু হেসে তিনি আবার বললেন—এবার সংবাদটা বলি। আচ্ছা তার আগে

বলুন তো, সিনেটের মিটিং কবে আছে ?

জ্যোতিপ্রসাদ অনুভব করছেন হেডমাস্টার মশাই ধীরে ধীরে তাঁকে প্রত্যক্ষ-ভাবে পরিবেশন না করেও, মূল সংবাদটার কাছে টেনে নিয়ে আসছেন। তিনি একটু হেসে বললেন—কাল বিকেল পাঁচটায় !

হেডমাস্টার মশাই হেসে বললেন—আপনি জানবার আগেই খবরটা তা হলে আপনাদের জানিয়ে যাই। আপনার সত্য এফ. এ.-তে ফোর্থ হয়েছে সংবাদ পেলাম।

সবাই তার মুখের দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইল। লোকেশ আর মন্মথর একখানা করে হাত সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি ও সমাদর বহন করে তার দুই কাঁধের উপর সস্নেহে স্থাপিত হলো।

দৃশ্যটি বয়স্ক দু'জন মানুষের চোখে বড় সুন্দর মনে হলো। হেডমাস্টার মশাই লোকেশ ও মন্মথর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমরা আমাকে 'পার্শিয়াল' মান পক্ষপাতদুষ্ট মানুষ মনে করো না। তোমাদের সংবাদও আমি নিয়ে এসেছি। এ তো 'খবর' নয় এ একেবারে খাঁটি 'সংবাদ' !

বলে তিনি একটু হেসে বললেন—লোকেশ, তুমি সেকেণ্ড হয়েছ। আর—সত্য সাগ্রহে বললে—মনুর খবর বলুন স্যার।

হেডমাস্টার মশাই হেসে বললেন—আমাদের মনু ফার্স্ট ই হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। লোকেশ ওঁদের দুজনের সামনেই মন্মথকে তার দুই হাঁটুর উপরে দুই হাত দিয়ে বেষ্টন করে কোলে তুলে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। মন্মথ বিপন্ন হয়ে বললে—আরে, আরে, আরে করছিস কি ? পড়ে যাব যে !

কে কার কথা শোনে ! তাকে বাগিয়ে ধরতে ধরতে লোকেশ বললে—এই সত্য, তোর শক্ত শক্ত হাত দিয়ে মনুকে তুলে দে তো। আমার হাতগুলো লম্বা হলে কি হবে, বেশী জোর নেই তো ! ধর্ তুই !

সত্য তার বাবা এবং হেডমাস্টার মশাইয়ের সামনে এই ধরনের প্রগল্ভ আচরণ নিজের স্বভাব ও অভ্যাস অনুযায়ী অবশ্যই করত না। কিন্তু আজ তারও মনে লোকেশের পাগলামীর ছোঁওয়া লাগল যেন। সে সঙ্গে সঙ্গে তার দুই হাত দিয়ে মন্মথকে অক্লেশে কোলে তুলে নিলে পুতুলের মতো। লোকেশ ততক্ষণে হাত ছেড়ে দিয়ে মন্মথর গায়ে পিঠে হাত বুলোতে আরম্ভ করলে। গাভী যেমন করে নিজের বাচ্চাকে সস্নেহে লেহন করে নিজের অন্তরের স্নেহ প্রকাশ করে এ অনেকটা সেই রকম। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ

করল।
এই আকস্মিক প্রগল্‌ভতার চেয়েও বেশী কিছু, যা প্রায় স্থূল অসভ্যতার সামিল, লোকেশের সেই স্থূল অসভ্যতার প্রথম মুহূর্তে জ্যোতিপ্রসাদবাবুর দুই ভুরু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। পরমুহূর্তে তিনি তার চোখের জল দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। এক মুহূর্তে সমস্ত অভিজ্ঞতাটি এই পরিশীলিত-চিত্ত, বুদ্ধিমান মানুষটির চোখে একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তিতে প্রতিভাত হলো। তিনি বুঝতে পারলেন এই পল্লীবাসী তরুণটি এই মুহূর্তে নিজের সার্থকতা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা করছে না অথবা তার চেয়ে ভালো ফল করার জন্য মন্মথকে ঈর্ষাও করছে না। বরং মন্মথর সার্থকতায় সে পরিপূর্ণ আনন্দিত, উন্মত্ত। এমন প্রেম, এমন আত্মভোলা অনু-কম্পা, এমন অহংলেশশূন্য হৃদয়ের সাক্ষাৎ আর কোথায় মিলবে! ওর অন্তরের অকপট আনন্দের চিহ্ন তো ওর দুই চোখ থেকে দুটি বিগলিত ধারায় মঙ্গল স্বস্তিক ঘৃতধারার মতো প্রবাহিত হয়ে নিজেকে সপ্রমাণ করছে। তিনি যেন একটি দিব্য দৃশ্য দর্শনের পবিত্রতা অনুভব করলেন। একবার নিজের অজ্ঞাতেই তাঁর দুই চোখ মুদিত, দুই হাত বদ্ধাঞ্জলি হয়ে গেল। তিনি যেন কাকে অকারণে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করলেন।
আর একজন অন্যত্র অন্য দৃশ্য দেখতে পেলে। সে মন্মথ। সত্যর কোলে উঠে যখন সকলের মাথা ছাড়িয়ে তার মাথাটা প্রায় আকাশে ঠেকেছে; অহংকার পরিতৃপ্তি, আনন্দ এবং একধরনের অপ্রস্তুত ভাবে যখন তার চিত্ত পরিপূর্ণ ও বিব্রত তখন তার দৃষ্টি পড়ল দরজার দিকে। দরজার মুখে সন্ধ্যা, উষা আর মালতী দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যা আর উষার মুখে এক মুখ হাসি, আর মালতী খুব গম্ভীর-মুখে তার বড় বড় দুই চোখ বিস্ফারিত করে সারা আকাশকে তার মধ্যে স্থাপন করে তার দিকে, শুধু একমাত্র তারই দিকে তাকিয়ে আছে। সে মালতীর এ দৃষ্টিকে চেনে। তার প্রাণের ও অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ অংশকে সে যখন উন্মুক্ত করে তখন সে এমনিই গম্ভীর মুখে চেয়ে থাকে। তেমনি চাওয়া সে চেয়ে আছে মন্মথর দিকে।
দেখে মন্মথর বুকের ভিতরটায় কেমন করে উঠল। পরমুহূর্তে মনে হলো, সত্যর কোলে উঠতে কোনো বাধা না দেওয়াতে যেন সে এক ধরনের লঘু চপলতা প্রকাশ করেছে। ফার্স্ট হয়েছে তো হয়েছে কি, কি এমন হয়েছে? সে পরমুহূর্তে সত্যকে শশব্যস্ত হয়ে বললে—সত্য, এই সত্য, আমাকে নামিয়ে দে! কি করছিস কি?
ততক্ষণে সত্যর মা দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে দেখে হেডমাস্টার

মশাই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। হাত জোড় করে নমস্কার করে বললেন—এত সব ভালো ভালো খবর নিয়ে এলাম, তার বদলে আমার ভালো ভালো খাবার কই ?
সত্যর মা একটু হেসে মাথার ঘোমটাটি সম্ভ্রম প্রকাশের জন্যই সামান্য একটু টেনে দিয়ে বললেন—খাবার জন্যেই তো আপনাকে ডাকতে এসেছি। আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ। এমনি তো জুতো পরে খাবেন না! ওপরে চলুন, জায়গা হয়েছে। হাত-মুখ ধুয়ে খাবেন। আপনার সায়ং সন্ধ্যা হয়েছে তো ?
অনেকখানি হেসে হেডমাস্টার মশাই বললেন—খাব বলেই তো সন্ধ্যা সেরে এসেছি। চলুন। নৃত্যন্তি-ভোজনে বিপ্রাঃ তা আমার তো নৃত্য করাই উচিত। আজ যে আনন্দ ভোজন করেছি তাতে চিত্ত আমার নৃত্যই করছে। আপনার খাবার খেলে সে নাচ হয়তো খানিকটা চাপা পড়বে। বৃদ্ধ বয়সে তো বেশী নৃত্য ভালো নয়!
বলে ছেলেদের বললেন—চল হে বালকগণ!
তারপর মালতীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি তাকে সস্নেহে বললেন—কেমন আছ মা-জননী ? তোমার মুখ অত গম্ভীর কেন ?
জ্যোতিপ্রসাদবাবু তার হয়ে কৈফিয়ৎ দিলেন—বেশী আনন্দের সময় আমাদের মলি-মা বেশী গম্ভীর হয়ে যায়।
হেডমাস্টার মশাই বললেন মালতীকে—তুমিও তো এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছ ? তোমাদের ফলও শীঘ্র বের হবে।
সত্য সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—মলিদের রেজাল্ট কবে বেরুবে স্যার ?
—তা সঠিক বলতে পারি না। তবে আর দেরি নেই। এবার তো সংস্কৃত কলেজিয়েটের গোপীনাথ শাস্ত্রী মশাই ট্যাবুলেটর আছেন।
কথাটা অন্য কারও উপর কি প্রতিক্রিয়া ঘটালে তা বলা শক্ত, তবে সত্য এবং মন্মথ পরস্পরের দিকে একবার ইঙ্গিতপূর্ণভাবে চাইলে। মন্মথ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মৃদু স্বরে সত্যকে বলল—গোপীনাথ পণ্ডিতমশায়ের কাছে গেলে তো হয় রে। মালতীর রেজাল্ট জানা যায়। উনি তো রাধাশ্যামের বাবা ; আমাকে খুব ভালবাসেন।
সত্য বললে—কাল তাহলে ঘুরে আয় না একবার।
মন্মথ বললে— ঘুরে আয়, মানে আমাকে একলা যেতে বলছিস ?
—হ্যাঁ, তা কি। একলাই তো যাবি!
—তুইও চল না আমার সঙ্গে।
—আরে আমি তো গোপীনাথ শাস্ত্রী মশাইকে আর ওঁর ছেলে রাধাশ্যামকে

দেখেছি মাত্র। আমার সঙ্গে তো আলাপ নেই কারও। তার চেয়ে তুই একলাই যা!

মন্মথ বললে—না ভাই, সে আমার বড লজ্জা করবে।

—লজ্জা? সত্য অবাক হয়ে বললে—লজ্জা করবে কেন? তা হলে যাস না তুই!

মন্মথ বললে—আচ্ছা রে বাবা আচ্ছা। আমি একলাই যাব।

সত্য প্রশ্ন করলে—মলির রোল নাম্বারটা জানিস তো?

মন্মথ জানত। কিন্তু সে মিথ্যা কথা বললে। বললে—ঠিক মনে নেই। লিখে দে তো!

উপরে গিয়ে সত্য একটা কাগজে মালতীর রোল নাম্বারটি লিখে এনে দিলে।

পরদিন সকালবেলায় মন্মথ বেনেটোলায় গোপীনাথ শাস্ত্রী মশাইয়ের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিলে—রাধাশ্যাম!

দরজা খুলে রাধাশ্যামই এসে দাঁড়াল দরজায়। মন্মথকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাধাশ্যাম আশ্চর্য হলো। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে ফুটে উঠল এক বিচিত্র দৃষ্টি যার মধ্যে যত সন্দেহ তত ক্ষোভ। দু বছর আগের মন্মথকে দেখে যে উচ্ছ্বাসে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত সে রাধাশ্যাম আর নেই।

মন্মথ একটু অবাক্ হলো, তার চেয়ে বেশী পরিমাণে নিজেকে অপমানিত বোধ করতে লাগল। সে প্রত্যাশা করেছিল, দীর্ঘদিন অদর্শনের পর সেই আগের মতোই রাধাশ্যাম তাকে দুর্লভ ধরনের মতো বুকে জড়িয়ে ধরবে, আনন্দ করবে, আস্ফালন করবে। তার বদলে এই নিরুত্তাপ, সন্দিগ্ধ রাধাশ্যামকে দেখে সে যেন খানিকটা ভয়ও পেয়ে গেল।

রাধাশ্যাম শুষ্কভাবে জিজ্ঞাসা করলে—কি মনে করে?

মন্মথর মনটা কেমন সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল রাধাশ্যামের এই শুষ্ক সমাদরহীন আহ্বানকে সে ক্ষুব্ধ প্রত্যুত্তর দিয়ে চলে যায়। কিন্তু এসে যখন পড়েছে তখন তো আর ফেরার উপায় নেই। সে মুখে সচেষ্ট হাসি এনে খুশী হবার ভান করে বললে—এই একবার এলাম!

রাধাশ্যাম সমান নিরুত্তাপ শুষ্কতার সঙ্গে বললে—তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, কি মনে করে এলি!

মন্মথর কাছে রাধাশ্যামের মনের চেহারাটা এইবার পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ল। এতদিন কি তার রাধাশ্যামের কথা একবারও মনে হয়েছিল? হয় নি তো! যদি হতো তা হলে রাধাশ্যামের থেকে অনেক দূরে থেকেও রাধাশ্যামের মনটাকে

পুরোপুরি বুঝতে পারত। অজস্র ভালবাসা দিয়ে, সমাদর দিয়ে তাকে অভিষিক্ত করে রাধাশ্যাম তো তার কাছে বিশেষ কিছু চায় নি ; শুধু চেয়েছিল তার নিয়ত সঙ্গ ও সান্নিধ্য, চেয়েছিল পৃথিবীর কাছে প্রচার করবে—মন্মথ নামক এই দুর্লভ সামগ্রীটি তার, একান্তভাবে তার। তার বদলে সে বিপরীত ব্যবহারই পেয়েছে মন্মথর কাছ থেকে। মন্মথ বুঝতে পারলে, রাধাশ্যামের তার সম্পর্কে মনের অবস্থাটা প্রত্যাখ্যাতা নারীর মতো। ভাবতেই তার চিত্ত থেকে সব ক্ষোভ আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল, মনে স্বাভাবিক প্রসন্নতা আবার ফিরে এলো। সে পরিষ্কার বুঝতে পারলে রাধাশ্যাম তার উপর ভীষণ চটে আছে। সে আস্তে আস্তে সামনের চৌকিতে বসে রাধাশ্যামের হাত ধরে টেনে পাশে বসিয়ে হেসে বললে—তুই আমার ওপর খুব রেগে আছিস!

রাধাশ্যাম তার ধরা হাতখানা ছাড়িয়ে নেবার মৃদু চেষ্টা করলে। কিন্তু মন্মথ ছাড়লে না। হেসে বললে—আমি বাড়ি বয়ে এসে তোর হাত ধরেছি শ্যাম, তুই হাত ছাড়িয়ে নিবি?

এমন মিষ্টি করে মন্মথ বোধহয় তার সঙ্গে কখনও কথা বলে নি জীবনে। তার উপর এই নূতন নামে সম্বোধন শুনে রাধাশ্যামের চোখে জল এলো, গলাও বোধ-হয় বুজে এসেছিল আবেগে অভিমানে। সে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললে—না, তোর ওপর রেগে থাকব কেন বল? আর রেগে থেকেই বা লাভ কি?

মন্মথ এবার সহজ হয়ে আসতে পেরেছে। সে বললে—রেগে থেকেই বা লাভ কি? এই তো তোর রাগ ভাঙাচ্ছি। বলছি—ও ভাই শ্যাম, আমার ওপর রাগ করিস না, রাগ রাখিস না। যদি রাগ করে থাকিস ভুলে যা! যদি দোষ করে থাকি ভুলে যা। এই দেখ, তোর নামের রাধাটা আমার বুকের মধ্যে রেখে দিয়ে শুধু তোকে শ্যাম বলে ডেকেছি!

রাধাশ্যাম এবার একটু হাসল। তা সত্ত্বেও মুখ ভার করে বললে—আমি কি তোর মতো লেখাপড়ায় ভালো, না তোর মতো কথা বলতে পারি! তুই এক কথাতেই মাৎ করে দিস! তা কি মনে করে এলি বল!

মন্মথ আসল কথাটা সোজাসুজি বলতে পারলে না। ভাবলে যা মনে করে এসেছে তা পরিষ্কার করে বলা হয়ে গেল তখন আর ছলনা করা চলবে না যে তাদের মনে করেই শুধুমাত্র তাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যই এসেছে। তাই বললে—বারে বারে ও কথা শুধোচ্ছিস কেন? তোদের দেখতে এসেছি। পণ্ডিত-মশাইকে প্রণাম করতে এসেছি।

বলতে বলতে প্রায় এক রাজবুদ্ধি খেলে গেল মাথার ভিতরে। সে বললে—এক.

এ.র রেজাল্ট বেরুতে তো আর দেরি নেই। অথচ এখনও পর্যন্ত কোনো খবর জানতে পারছি না। তাই মনে হচ্ছে রেজাল্ট কি খারাপ হলো না কি? মনে মনে খুব ভয় হচ্ছে অথচ ভয়ে কারও কাছে যেতে পারছি না! যাব, জিজ্ঞেস করব, তারপর যখন শুনব প্লেস অনেক নেমে গিয়েছে, কি যাঁকে জিজ্ঞেস করব তিনি বলবেন—তোমার ফল তো বাপু ভালো হয় নি, তখন? তাই অনেক ভেবেচিন্তে পণ্ডিতমশাইয়ের কাছেই এলাম। উনি যদি কিছু জানেন! আর রেজাল্ট খারাপ হলে, ওঁর মুখ থেকে সেটা শুনলে লজ্জা কি অপমান নেই। ওঁর মুখে রেজাল্ট খারাপ হয়েছে শুনলে বড় জোর দুঃখ পাব, কিন্তু লজ্জাও লাগবে না অপমানও মনে হবে না।

এবার প্রত্যাশিত ফল ফলল। তার বুদ্ধির তীর রাধাশ্যামের হৃদয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে বিদ্ধ হয়েছে। রাধাশ্যাম বিগলিত হয়ে গেল। সে মন্মথর একখানা হাত সজোরে চেপে ধরে আবেগের সঙ্গে বললে—বাবার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতে তোর আবার অপমান কিসের রে? সত্যিই তো! তুই আমাদের মনু! আমাদেরই মনু! তোকে নিয়ে আমাদের কত গর্ব, কত অহংকার রে।

তারপর একটু থেমে বললে—জানিস, আজকালকার দিনে ইংরেজনবিসরা, ব্রাহ্মরা আমাদের পণ্ডিতদের দেখে কখনও আড়ালে, কখনও সামনাসামনি মুখ বাঁকায়। বলে—ওরা টুলো পণ্ডিত, সংস্কারগ্রস্ত। ওরা একটা মরা ভাষা, মরা আদর্শ নিয়ে দু হাজার বছর পিছনে কূপমণ্ডুকের মতো বসে আছে নানান বাজে আচার আর অন্ধ সংস্কারের বেড়া তুলে। ওরা একালে অচল। তাই যখন আমাদেরই কেউ ওদের শিল ওদের নোড়া দিয়ে ওদেরই দাঁত ভেঙে দেয় তখন খুব ভালো লাগে। আর তুই তো আমাদেরই।

মন্মথ হাসতে লাগল। তার পিঠে হাত দিয়ে তাকে খুব কোলের কাছে টেনে এনে বললে—নিশ্চয়, তাতে কথা আছে? আমি বামুন-পণ্ডিতের ছেলে, আমি কি ভিন্ন কিছু হতে পারি? তবে কালধর্ম বলে তো একটা কথা আছে। সেই কাল-ধর্মে এখন বিদেশীরা এসে রাজা হয়েছে। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, তাদের ধারা-ধরন না জানলে কালের সঙ্গে চলবি কি করে? এই তো ইংরেজদের আগে মুসল-মানরা আমাদের দেশের রাজা ছিল। তখনও তো ফারসী উর্দু শিখতে হয়েছে।

এ সব তত্ত্ব আলোচনা রাধাশ্যামের কাছে খুব রুচিকর। এ সম্পর্কে তার মতামত মন্মথর মতামতের মতো ধোঁয়াটেও নয়, উদারও নয়। সেই ধরনের আলোচনার পত্তন হতেই রাধাশ্যামের চোখ জ্বলে উঠল। মন্মথ দেখলে রাধাশ্যামের চেহারা পালটে গিয়েছে। মাঝখানে বেশ কিছুদিন সে রাধাশ্যামকে দেখে নিব তার সঙ্গে

ঘনিষ্ঠভাবে মেশে নি। সে আজ অনুভব করলে ওর মধ্যে একজন গোঁড়া অসহন-শীল মানুষ তার বুকের মধ্যে ও চোখের তারায় অসহনীয় উত্তাপ নিয়ে জেগে উঠেছে। এবার সে কি বলবে তা মন্মথ আবছা আবছা জানে।

সেই সব কথাই বললে রাধাশ্যাম। বললে—কালধর্মের কথা বললি তা বুঝলাম। কিন্তু ওই কালধর্মের সূচের মতো ছিদ্র দিয়ে শেষ পর্যন্ত বড় বড় হাতির মতো ভুল সব কালে কালে পেরিয়ে গিয়েছে, আজও যাচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছিস! এই তো কলেজে পণ্ডিতমশাইদের কাছেই শুনি, প্রাচীন কালের যে সব জাত ইতিহাসে খুব উন্নতি করেছিল তারা আজ কোথায়? তারা সব কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। কেবল প্রাচীন সংস্কৃতি, সভ্যতা আর সনাতন ধর্ম টিঁকে আছে এই আমাদের দেশে। এ সব এ দেশের পণ্ডিতদের মতো নয়; এ সব তোদের সায়েবাবুরাই বলে থাকে। এই সনাতন সভ্যতা আর ধর্মকে কে বুকে নিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে রে এত কাল ধরে? বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের ভারতবর্ষের চিরকালের ব্রাহ্মণ সমাজ।

মন্মথ হেসে বললে—তুই সবই ঠিক ঠিক বলেছিস। কেবল একটু ভুল হলো তোর!

সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে রাধাশ্যাম বললে—কি ভুল?

শান্ত কৌতুকের সঙ্গে মন্মথ বললে—ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ সমাজই একা একে বাঁচিয়ে রাখে নি, রেখেছে ভারতবর্ষের মানুষ, সাধারণ মানুষ। তার মধ্যে অবশ্য ব্রাহ্মণ সমাজও বাদ পড়ে না, তারাও আছে।

—এর মধ্যে ব্রাহ্মণদের কৃতিত্ব সব চেয়ে বেশী নয় তুই বলতে চাস? আবার সেই উত্তেজনা রাধাশ্যামের কণ্ঠে রনরন করে উঠল।

মন্মথ হেসেই বললে—তুই উত্তেজিত হচ্ছিস কেন? আমি যদি তোর মতো উত্তেজিত হই তাহলে তো এখুনি ঝগড়া হয়ে যাবে। তা শোন, তোর কথার জবাব দি। শান্ত হয়ে শোন, বিবেচনা করে দেখ, উত্তেজিত হোস না। দেখ, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবনে সেই প্রাচীন কাল থেকেই নানান বিচিত্র পথ দিয়ে জীবন সম্পর্কে এক ধরনের চর্চা হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। কখনও কখনও তার ইতর-বিশেষ হলেও নানান ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় ভারতবর্ষের ভিন ভিন্ন চেহারায় ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তার অব্যাহত চর্চা হয়েছে। কালের ধাক্কায় আর স্থানের পার্থক্য তার বাইরের চেহারটা আলাদা হলেও তাদের সমস্ত কিছুর ভিতরে এমন কিছু স্পষ্টভাবে এক যে তাদের সব পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের এক বলে চিনতে ভুল হয় না। কেমন জানিস? এই ভারত-বর্ষের চার প্রান্তের কথা মনে কর। পূর্বে গৌহাটীতে কামাখ্যার মন্দির, পশ্চিমে সোমনাথ, উত্তরে কেদারনাথ, দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা, সব জায়গায় দেবতার যে

যে মূর্তিটি থাকুক তার পূজা হচ্ছে এক মন্ত্রে। সব জায়গাতেই শিব আর গৌরীকে এক মন্ত্রে অঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিলে রাধাশ্যাম। বললে –সে মন্ত্রটা কি মন্ত্র তা বল!

'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং' নয়?

হেসে মন্মথ বললে—বটে। তাতে ভুল নেই।

—মন্ত্রটা তো সংস্কৃততেই। আর তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে পূজুরী বামুনরাই! কেমন কিনা!

মন্মথ খুব এক চোট হাসল। বললে—ওরে শ্যাম, পূজুরী বামুনকে আমি বিন্দুমাত্র খাটো করতে চাই না। কিন্তু এইবার বামুনরা কি ক্ষতি করেছে দেখ।

উত্তেজিত রাধাশ্যাম প্রগাঢ় বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল—ক্ষতি করেছে? কি ক্ষতি?

মন্মথ বললে—সংস্কৃত ভাষাকে আর সংস্কৃতির চর্চাকে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবদ্ধ রেখে। দ্বিতীয়ত সংস্কৃত ভাষাকে কালোচিত পরিবর্তনে বাধা দিয়ে। তার ফলে সে দেবভাষা হয়েই রইল, সাধারণ মানুষের মুখে আর ব্যবহৃত হবার গৌরব পেলে না। মানুষের ভাষা হলো না।

রাধাশ্যাম প্রায় পাগলের মতো বললে—তুই এসব কথা বলছিস মনু?

মন্মথ হেসেই বললে—হ্যাঁ, বলছি রে!

রাধাশ্যামের গলা আবেগে কাঁপতে লাগল—তবু ভালো তুই সংস্কৃতকে দেবভাষা বলে স্বীকার করে নিয়েছিস!

—না নিলে কি ক্ষতি হতো?

—কি ক্ষতি হতো জানি না, তবে তুই স্বীকার করে নিয়ে আমার একটা সুবিধাই করে দিয়েছিস!

মন্মথ হাসল।

রাধাশ্যাম আবেগে কম্পিত গলায় বললে—সংস্কৃত যদি দেবভাষা হয় তা হলে তোকে বলি মনু, সেই দেবভাষাকে চর্চা করবার জন্যেও চরিত্রে কিছু দেবোচিত গুণের দরকার। সবারই কি সব জিনিসে অধিকার থাকে রে! দেবত্বের চর্চা করে মনটাকে পরিচ্ছন্ন করে তবে তো তাকে নিজের মনে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যাবে। বুদ্ধির সঙ্গে চিত্তের, চরিত্রের সংস্কার করতে হবে!

মন্মথ প্রচণ্ড জোরে হাসতে লাগল। তাতে রাধাশ্যাম চটে গেল। বললে—তুই হাসছিস কেন? হাসবার কথা কি বলেছি?

মন্মথ বললে—তোর বুদ্ধির তারিফ করছি। তুই নব্য ন্যায়ের পণ্ডিতদের মতো

খুব ধরেছিস তো আমাকে ?

রাধাশ্যাম খুব খুশী হলো মন্মথর এই প্রশংসায়। মন্মথ জানত তার এ কথায় রাধাশ্যাম খুশী হবে।

মন্মথ তার খুশী দেখে কৌতুক বোধ করে বললে—কিন্তু ব্যাপারটার আর একটা দিক আছে সেটা ভেবে দেখেছিস ?

আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল রাধাশ্যাম। সে আবেগের শীর্ষে শীর্ষে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ফিরছে। সে বললে—বল কোন্ দিক্ ? বল, বলে ফেল !

মন্মথ তার কাঁধে হাত রেখে বললে—বলব বইকি ? একটা দিকের কথা বলেছি, অন্য দিকের কথাটা বলতে হবে বইকি ! কথাটা হলো মাতৃভাষাকে দেবভাষায় রূপান্তরিত করে তা শুধুমাত্র দেবতা আর দেবোপম পুরুষ মানে ব্রাহ্মণদের ব্যবহারের জন্যেই সংরক্ষিত হলো। তার ফলে দেবতার ভাষা আর মানুষের নিত্য ব্যবহার্য ভাষায় মূর্তি না পেয়ে তার সজীবতা হারিয়ে ফেললে। তার সহজ প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে গেল। ভাষা সোনার বাটি হয়ে ভাণ্ডারে সিন্দুকের মধ্যে তোলা রইল, সাধারণ মানুষের জীবনে প্রতিদিনের ভোজন-পাত্র হিসেবে আর ব্যবহার হলো না। তার দুটো কুফল হলো, ভাষার মৃত্যু হলো আর এই ভাষায় যাঁরা চর্চা করলেন তাঁদের সঙ্গে বাকী মানুষের সাংস্কৃতিক বিভেদ ঘটে গেল।

রাধাশ্যাম মন্মথর কথাগুলো চুপ করে শুনলেও তার চোখ দুটো অগ্নিপিণ্ডের মতো উজ্জ্বল হয়ে যেন জ্বালা ও উত্তাপ উদ্গিরণ করছিল। কিন্তু দেখে অবাক হলো না মন্মথ। সে কেবল স্পষ্টভাবে বুঝলে রাধাশ্যামের গোঁড়ামি তাকে কতখানি অসহিষ্ণু ও সংকীর্ণ করে ফেলেছে।

রাধাশ্যাম প্রবল আবেগে কিছু উচ্চারণ করে বোধহয় মন্মথকে বিবেচনাহীনের মতো কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ঘরে ঢুকল একটি মেয়ে। বালবিধবা তরুণী। অনেকক্ষণ থেকে সে দরজার আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখছিল কে এসেছে। এখন মন্মথকে দেখে চিনতে পেরে হাসিমুখে ঘরে এসে ঢুকল।

তাকে দেখে রাধাশ্যাম চুপ করে গেল। মন্মথ শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। সংকুচিত হলো সে খানিকটা। কারণ এই বছর ছয়েকের মধ্যেই তার বিবাহ হয়েছিল এবং এর মধ্যে শ্বশুরবাড়ির দাম্পত্য-জীবনের পাট চুকিয়ে কুড়ি বছর বয়স হতে না হতেই থান কাপড় পরে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে। অথচ মন্মথ খবরটা জেনেও আসে নি, আসা হয় নি তার।

তাই মন্মথ শশব্যস্ত হয়ে তাকে প্রণাম করবার জন্ম হাত বাড়ালে হেঁট হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সংকুচিত হয়ে খানিকটা সরে গিয়ে মেয়েটি বললে—থাক, থাক ভাই, প্রণাম

করতে হবে না। এমনিই আশীর্বাদ করছি। আর ভগবান তোমাকে তো অহরহ আশীর্বাদ করছেন। কত নাম শুনি তোমার!

কথাগুলি বড় ভালো লাগল তার। কিন্তু মন্মথর মনে হলো, এই অতি মধুর কথাগুলির আড়ালে কোথায় যেন একটি সকরুণ অভিমান লুকিয়ে রয়েছে। সে অকপটে অপরাধ স্বীকার করে বললে—আপনি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছেন আমি খবর পেয়েছি, কিন্তু পরীক্ষার জন্যে আসা হয় নি। আপনি কেমন আছেন লক্ষ্মীদি?

তার কথাগুলি একান্ত সহজে মেনে নিয়ে লক্ষ্মী একটু হেসে বললে—যম যেমন রেখেছে ভাই! আমার কথা বাদ দাও। তোমার কথা বল! তুমি তো কত বড় হয়ে গিয়েছ! লেখাপড়া করছ খুব ভালো!

তার পর একটু হেসে বললে—তোমার কনে বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে। তা ন' দশ বছর হলো বয়েস। দেখতে ভারী সুন্দর। একেবারে পদ্মফুলের মতো।

আজকের সকালে মন্মথর সমস্ত পরিকল্পনা ও আয়োজনের মধ্যে বিধবা লক্ষ্মীর আবির্ভাব যেমন একটা আকস্মিক প্রক্ষিপ্ত ব্যাপারের মতো, তেমনি তার মনোরাজ্যে আকস্মে তার দশ বছর বয়সের ভাবী বধূর বার্তাও তার চেয়ে অনেক বেশী আকস্মিক ও প্রক্ষিপ্ত। সে মনে মনে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। কি করবে কি বলবে সে ভেবে পেলে না। তার মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। সে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

সেটা তার লজ্জা কল্পনা করে নিয়ে লক্ষ্মী বললে—অত লজ্জা করতে হবে না বিয়ের কথা শুনে। তোমরা এ কালের ছেলে! বস, বস ভাই, তুমি বস! আমি জলখাবার আনি।

লক্ষ্মী তাকে অল্পে অল্পেই রেহাই দিয়ে গেল। লক্ষ্মী যেতেই আবার মন্মথর উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল রাধাশ্যাম। তার কণ্ঠস্বর সপ্তমে উঠল। তার সমস্ত তর্কের আড়ালে এমন ক্ষুব্ধ ব্যাকুলতা ছিল যা মন্মথকে স্পর্শ না করে পারলে না। এই মতপার্থক্যের মধ্য দিয়ে মন্মথ যেন পরের হয়ে গেল, আর তাদের থাকল না, এই বোধটাই রাধাশ্যামকে সব চেয়ে পীড়া দিয়ে তাকে উদ্দীপ্ত করে তুলছে।

মন্মথকে বাঁচালেন গোপীনাথ ভট্‌চাজ মশাই আবির্ভূত হয়ে। তিনি গঙ্গাস্নান করে ফিরেছেন বাবুঘাট থেকে। দরজায় ঢুকেই মন্মকে দেখে একবার তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠে পরমুহূর্তেই তা মিলিয়ে গেল। মন্মথর মুখের হাসি তাঁর মুখেও ফুটে উঠল আয়নার মতো।

মন্মথ উঠে দাঁড়িয়ে বললে সসম্ভ্রমে—ছুঁয়ে প্রণাম করব?

হাসিমুখে গোপীনাথ বললেন—করবে বই কি? তুমি পা ছুঁয়ে প্রণাম না করলে কে করবে? তোমার মধ্যে বাগ্‌দেবী বিদ্যার যজ্ঞকুণ্ড জেলেছেন, অহরহ সেখানে তপস্যার হবিঃ পড়ে সে শিখাকে প্রদীপ্ত করে রেখেছে। তুমি তো সেই অগ্নিতে পবিত্র। তুমি প্রণাম করবে বইকি! কিন্তু তোমার কি খবর? অনেক দিন তো আস নি!

মন্মথ নত মুখে অপ্রতিভ হাসি হাসি মুখে বললে—অপরাধ হয়ে আছে! আপনার কাছে অপরাধ করলে সহজেই ক্ষমা মেলে তাই অপরাধ করতে সাহস পাই। বিপদে পড়লে তখন মনে পড়ে আপনার কথা। সকলের আগে মনে পড়ে।

স্নেহ ও সম্মানপিপাসু এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই দীপ্তিমান ইংরেজনবিস তরুণের কথা শুনে গলে গেলেন। বললেন—এতক্ষণ চিৎকার করছিল কে? রাধেশ্যাম বুঝি? বুঝলে মন্মথ, রাধেশ্যাম আমার এখনও পণ্ডিত হন নি। কিন্তু পণ্ডিত হওয়ার সব দোষগুলি ওঁর মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে।

গোপীনাথ কথা বলে চলেছেন তার মধ্যেই মন্মথ একটু হাসল। লজ্জিত হাসি। যাতে রাধাশ্যামের উপর বর্ষিত এই তিরস্কারের তীক্ষ্ণতা ও ভার খুচে গিয়ে সেটা লঘু হয়ে যায়। তার হাসির স্পর্শে পণ্ডিতমশায়ও একটু হেসেই বললেন— অত্যন্ত তার্কিক হয়েছে, রাসভের মতো চিৎকার করে। তার উপর অত্যন্ত অনুদার। আমি ওকে বারবার বলি পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠ গুণ ও প্রকাশ নিরভিমানতায় আর উদারতায়। আমি ওকে বারবার রামরাম স্মৃতিতীর্থ মশাইয়ের উদাহরণ দিই, বুনো রামনাথের কথা বলি। তবে কি জান অধিকাংশ পাণ্ডিত্যই বিদ্যার নিষ্ফল অহংকার হয়ে দাঁড়ায়। ঈশ্বরের কৃপা না হলে পাণ্ডিত্যের কি বিদ্যাচর্চার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ প্রসাদ এই নিরভিমানতা বা উদারতা, এ লাভ করা যায় না।

বলেই তিনি সচেতন হয়ে বললেন—তুমি কি বিপদের কথা বলছিলে? কি বিপদে পড়লে তুমি?

মন্মথ লজ্জিতভাবে বললে—এফ. এ. পরীক্ষার ফল বের হতে তো আর দেরি নেই। কিন্তু কোনো খবরও পেলাম না। আর ভয়ে কারও কাছে জিজ্ঞাসা করতে যেতেও পারছি না, পাছে খারাপ কোনো খবর বলে। যদি ফল খারাপই হয়ে থাকে তো আপনার কাছ থেকে জানলে তো কোনো লজ্জা নেই! তাই এসেছি, যদি কিছু খবর পেয়ে থাকেন। আপনার তো ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সম্পর্ক আছে!

গোপীনাথ মন্মথর এই আন্তরিকতা ও আত্মীয়তার স্পর্শ মাখানো কথায় বড় পরিতৃপ্ত হয়ে হেসে বললেন—না, তোমার ফল আমি সঠিক জানি না। তুমি বরং একটু বস, আমি ঠাকুরঘর থেকে নিত্য পূজাটা সেরে আসি। গঙ্গায় অবশ্য

জপটা সেরে এসেছি। তুমি বস, আমি এলাম বলে।

তর্ক আর জমল না। পণ্ডিতমশাই চলে গেলেও জমল না। কারণ তিনি রাধা-শ্যামের উত্তপ্ত উৎসাহে জলসেচ করে দিয়ে গিয়েছেন। দুজনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকার পর মন্মথ চৌকির উপর রাখা বইখানি তুলে নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করলে—কি বই রে?

রাধাশ্যাম বললে—দেখ না, খুলেই দেখ! তোর আবার ভালো লাগবে কিনা দেখ! তোর কি রবিবাবু ছাড়া আর কারও লেখা ভালো লাগবে?

প্রত্যাখ্যাতা স্ত্রীলোকের আহত অহংকার ও অভিমানের মতো রাধাশ্যামের অজ্ঞাত অভিমান বার বার খোঁচা দিয়ে চলেছে মন্মথকে। মন্মথ রাধাশ্যামের মনটা বুঝতে পেরে হাসিমুখে বইখানি খুলে ধরলে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'।

রাধাশ্যাম তীক্ষ্ণভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—পড়েছিস? না রবিবাবুর লেখা নয় বলে ছুঁয়ে দেখিস নি?

মন্মথ মনে মনে অকস্মাৎ বিরক্ত হয়ে উঠল। সে প্রশ্ন করলে—তুই পড়েছিস?

রাধাশ্যাম বললে—পড়েছি বই কি? না পড়েই কি আমি তোকে জিজ্ঞেস করছি!

মন্মথ বললে—বঙ্কিমের শেষ বই যা বেরিয়েছে পড়েছিস?

রাধাশ্যাম রূঢ়ভাবে বললে—কি বই?

মন্মথ কঠিনভাবে বললে—তার মানে পড়িস নি। নামও জানিস না!

মন্মথর এই আকস্মিক সোজাসুজি আক্রমণে রাধাশ্যাম থমকে গেল। মন্মথ মৃদু স্বরে বললে—বঙ্কিমের শেষ বই এ পর্যন্ত যা বেরিয়েছে তার নাম 'ধর্মতত্ত্ব'। গত বছর বেরিয়েছে। পড়েছি আমি। বঙ্কিম এ পর্যন্ত যা যা লিখেছেন আমি সব পড়েছি। তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি! তুই তো 'দেবী চৌধুরাণী' পড়লি? ভালো লেগেছে তোর?

রাধাশ্যামের মনে হলো মন্মথ যেন হঠাৎ তার গলাটা টিপে ধরেছিল, হঠাৎ কি ইচ্ছাতে কে জানে তাকে ছেড়ে দিলে। সে মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সোৎসাহে বললে—ভালো লেগেছে কিনা মানে? নিষ্কাম ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন বঙ্কিম।

মন্মথ হা হা করে হেসে উঠল। অনেকখানি হাসি। তার হাসিতে অপমানিত বোধ করে রাধাশ্যাম রুষ্টকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—তুই হাসির কি পেলি আমার কথায়?

আবার খানিকটা হেসে মন্মথ বললে—হাসব না তোর কথা শুনে? ওরে শ্যাম, কোনো বড় কবি কি বড় লেখক, সব বড় লেখকই এক অর্থে কবি, তাঁরা কেউ

ভগবানের পক্ষের উকিল-ব্যারিস্টার নন, তাঁরা কেউ ভগবানের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য প্রচারের পক্ষ সমর্থন করে বক্তৃতা করেন না। সৃষ্টিকর্তা এই যে সৃষ্টি করেছেন, সেই সৃষ্টির মহিমার রসে তাঁরা মজে গিয়ে মধ্যে মধ্যে সৃষ্টিকর্তার তারিফ করে প্রাণের আনন্দে কথা বলে ওঠেন আর চুপ করে থাকতে না পেরে। তাই কখনও হয় কবিতা কখনও উপন্যাস। তাঁদের মুখ দিয়ে সৃষ্টিকর্তাই যেন নিজে নিজের তারিফ করেন—বুঝলি!

রাধাশ্যামের মধ্যে তার্কিক আবার উদ্যত হয়ে উঠেছে। সে উচ্চকণ্ঠে বললে—তা হলে তুই বলতে চাস যে লেখক কিছু প্রমাণ করতে চান না? ধর্ বঙ্কিম তাঁর 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনীর বিধবা-বিবাহ দিয়ে বিষ খাইয়ে তাকে মেরেছেন! তাতে কি তিনি বিধবা-বিবাহ অন্যায় তা প্রমাণ করতে চান নি?

মন্মথ হেসে বললে—না রে না। বঙ্কিমের সে রকম কোনো মতলব ছিল না। কুন্দনন্দিনীর মতো অমন কোমল, সুন্দর কচি মেয়ে বিধবা হয়ে আবার বিয়ে করেছিল বলে তার মুখে বিষ তুলে দেবেন বঙ্কিমের হৃদয় এমন কঠিন নয় রে! জানিস, বঙ্কিম কখনও ওই জায়গাটা পড়তে পারেন না, পড়তে গেলে তাঁর চোখে জল আসে। ছোট্ট কচি মেয়ে কুন্দ, অনেক বজ্জাতির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে সে বিষ খেয়েছিল। বিধবা হয়ে বিয়ে করেছিল বলে এ শাস্তি তার হয় নি।

আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল রাধাশ্যাম—কুন্দ বিধবা হয়ে বিয়ে করে অন্যায় করে নি?

রাধাশ্যামের মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে যেন তার এই কঠিন অনুদার হৃদয়কে মন্মথ আর একবার দেখবার চেষ্টা করলে। বারবার মনটা তার মুচড়ে উঠতে লাগল এই ভেবে যে, যে-বয়সে মানুষের মন সর্বাধিক উদার ও মমতাপ্রবণ থাকে সেই বয়সে রাধাশ্যাম তার সদ্য-বিধবা বোনের করুণ মুখখানি, এ কথা উচ্চারণ করবার সময় মনে করতে পারে নি, মনে হয় নি তার! সে মনে মনে নিদারুণ কঠিন হয়ে উঠে অতি মৃদু অথচ অতি কঠিন কণ্ঠে উচ্চারণ করলে—না!

প্রায় গর্জে উঠল রাধাশ্যাম—না? সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় লক্ষ্মী এসে ঢুকল খাবারের থালা আর জল নিয়ে।

সে দিকে রাধাশ্যামের ভ্রূক্ষেপ নেই। সে সগর্জনে যা উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল তাকে যেন মন্মথ এক মুহূর্তে বহ্নিমান হয়ে জ্বলে উঠে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে। কঠিন কণ্ঠে তাকে ধমক দিয়ে বললে—থাম। অর্বাচীনের মতো চিৎকার করিস না!

তার মতো শান্ত, মধুর স্বভাব, প্রিয়ভাষী মানুষের এই আকস্মিক ক্রোধে রাধা-

শ্যাম ও লক্ষ্মী, দুই ভাইবোনেই কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। লক্ষ্মীর হাতের থালা ও জল এক মুহূর্ত কেঁপে গিয়ে আবার স্থির হলো ; কেবল ভর্তি গ্লাস থেকে খানিকটা জল ছলকে পড়ে গেল মেঝের উপর।

ওদিকে ধমক খেয়ে রাধাশ্যামের ঠোঁট কাঁপতে আরম্ভ করেছে। মন্মথ এক মুহূর্তের মধ্যেই সব লক্ষ্য করে নিলেও দৃক্‌পাত করলে না। কারণ সে অনুভব করতে পারছে যে, সে এই মুহূর্তে যা করেছে তা না করলে, আরও নিষ্ঠুর কিছু ঘটতে পারত তার চোখের সামনেই ; অথচ সে নিষ্ঠুরতাকে সে আর তখন প্রতিরোধ করতে পারত না।

পরমুহূর্তেই লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে, যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে হেসে, চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে দুহাত বাড়িয়ে যেন অতি দুর্লভ সামগ্রী গ্রহণ করছে এমনিভাবে লক্ষ্মীর দুই হাত থেকে খাবারের থালা ও জলের গ্লাস ধরে নিলে। নিতে নিতে বললে—এ কত লক্ষ্মীদি ! আর এ যে রাজভোগ ! বাবাঃ, এত খাব কি করে ?

তার হাসিতে, তার কায়মনোবাক্যের সমগ্র প্রকাশভঙ্গিতে একান্ত পরিতৃপ্ত হয়ে লক্ষ্মী হেসে বললে—বামুন-পণ্ডিতের ঘরে কি আর রাজভোগ মেলে ভাই ! তবে তোমার ভাগ্য তো রাজার ভাগ্য, তাই তোমার ভাগ্যে রাজভোগ এসেছে। কাল সন্ধ্যেতে শোভাবাজারের রাজবাড়ি থেকে গোবিন্দের প্রসাদ দিয়ে গিয়েছিল। তোমারই জন্যে এসেছিল বোধহয় ! খাও !

হাসিতে মুখ ভর্তি করে থালার ফলে মিষ্টিতে হাত দিতে দিতে মন্মথ বললে—আমার ভাগ্য দিদি ! তবে সাধক-তপস্বীর ভাগ্য তো করি নি যে স্বয়ং গোবিন্দ কি রাধারাণী হাত বাড়িয়ে প্রসাদ দেবেন ! তবে মন্মথর ভাগ্য নিয়ে এসেছি তাই আপনার হাত থেকে আজ ভগবানের প্রসাদ পেলাম।

তার কথায় কি ছিল কে জানে, লক্ষ্মীর চোখ দুটি পাকা ফলের মতো ফেটে গিয়ে তা থেকে রসক্ষরণের মতো জল ঝরে পড়তে লাগল। মন্মথ লক্ষ্মীর চোখের জল দেখে আর কোনো উচ্চবাচ্য করলে না, একমনে খেতে লাগল।

এই মুহূর্তে পণ্ডিতমশাই পূজা সাঙ্গ করে ঘরে এসে ঢুকলেন। প্রগল্‌ভ পুত্রকে চৌকির এক কোণে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকতে এবং বিধবা কন্যাকে অশ্রুপাত করতে এবং তারই পটভূমিতে মন্মথকে একান্ত নির্বিকার চিত্তে নিবিষ্টভাবে খাদ্য গ্রহণ করতে দেখে কোনো কিছুই তিনি অনুধাবন করতে পারলেন না। তাই বিস্মিত হয়ে মন্মথকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হলো ?

মন্মথ নির্বিকারভাবে হাসিমুখে বললে—আজ্ঞে না, কিছু হয় নি।

ঠিক এই সময়েই লক্ষ্মী চোখ মুছতে মুছতে বাড়ির ভিতর যাবার আগে বাপকে হাসিমুখেই বলে গেল—দুঃখে কাঁদতেই তো এসেছি বাবা, দুঃখেই কাঁদি। সুখে তো কাঁদতে পাই না, এখন সুখে কাঁদছিলাম।

লক্ষ্মী ঘরের ভিতর চলে যেতেই রাধাশ্যামও নেমে পড়ল চৌকি থেকে। সে ঘর ছেড়ে নেমে গেল রাস্তায়।

পণ্ডিতমশাই একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—মেয়েটা অল্প বয়সে বিধবা হয়ে ঘরে এসেছে সে এক দুঃখ। কিন্তু দুঃখের উপর দুঃখ কি জান, রাধাশ্যাম একদিন ভগ্নীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে করতে বলে বসল—তুই নিশ্চয় কোনো মহা অন্যায় করেছিলি, তা না হলে এ দুর্ভাগ্য তোর হবে কেন?

শুনে মন্মথ অন্তরে অন্তরে গভীর পরিতৃপ্তি অনুভব করলে যে সে না জেনেই সঠিক কারণেই এই মূর্খ, সংকীর্ণচিত্ত শাস্ত্রবোধহীনকে তিরস্কার করতে পেরেছে!

পণ্ডিতমশাইয়ের কথা শুনে সে মুখে কিছু বললে না।

পণ্ডিতমশাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—দুর্ভাগ্য তো আমার কন্যার নয়, আমার। সংসারের সব সুখ, সব আনন্দের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে ওকে বাধ্য হয়ে সারা জীবন যাপন করতে হবে ভাবলে আমার নিজেরই বুক শুকিয়ে ওঠে। ওর সম্মুখে কত দীর্ঘ নিরানন্দ জীবন! মধ্যে মধ্যে ভাবি, ওর যদি আবার বিবাহ দিতে পারতাম। কিন্তু আমি পারব না তাও জানি। বিদ্যাসাগর মশাই দয়ার সাগর ছিলেন। বিধবা-বিবাহের আইনও প্রণয়ন করিয়ে দিয়েছেন কিন্তু দেশের সে আইনের সুযোগ নেবার শক্তি কি সাহস কোনোটাই আমার নেই, হবেও না। আমি যজমান সেবক ব্রাহ্মণ। যজমান নিয়ে কাজ করে, দশকর্মের নিয়ম পালনে আমার জীবন চলে। চলিত স্মৃতিকে আর আচারকে লঙ্ঘন করার সাধ্য তো আমার হবে না বাবা!

কিছুক্ষণ নীরব থেকে পণ্ডিতমশাই বললেন—বৈধব্য নিয়ে শুধু পড়াশুনোই করি নি, কন্যা বিধবা হয়ে সকরুণ মুখে বাড়িতে আসার পর থেকে অনেক ভেবেছি এ নিয়ে। ভেবে যা মনে হয়েছে তাতে সাধারণভাবে বৈধব্য পালনের যে নিয়ম রয়েছে তা ঠিকই আছে, তাতে কোনো ভ্রান্তি নেই।

মন্মথর মনে তখনও সদ্য-বিধবা কন্যাটির অশ্রুরেখাই যেন তাকে একটা প্রতিবাদ করতে বললে। সে সসম্ভ্রমে একটু হেসে বিনয়ের সঙ্গে বললে—তা কেন বলছেন পণ্ডিতমশাই? স্ত্রীলোকের পক্ষে যা পালনীয় পুরুষের পক্ষে তা পালনীয় নয় কেন?

পণ্ডিতমশাই একটু হাসলেন বিষণ্ণভাবে। বললেন—আমার কথা না শুনেই তুমি

প্রশ্ন উত্থাপন করছ! আগে আমার সম্পূর্ণ কথা শোন! কালধর্ম আর বয়োধর্ম দুই মিলে তোমাদের কথাঞ্চিৎ অসহিষ্ণু করেছে, কিছু মনে করো না।

মন্মথ পণ্ডিতমশায়ের তিরস্কার হাসির সঙ্গে মেনে নিলে।

পণ্ডিতমশাই বললেন—বৈধব্য পালনের যে সাধারণ নিয়ম রয়েছে তা অসংগত নয়। তা স্ত্রীলোকের পক্ষেও যেমন প্রযোজ্য, পুরুষ সম্পর্কেও ততখানি প্রযোজ্য; অন্ততঃ প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

পণ্ডিতমশাই একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—বাবা, বৈধব্যের অর্থ কি? মানব জীবনের কি বিচিত্র ধর্ম দেখ! একটি পুরুষ কি একটি স্ত্রীলোক বিবাহ করে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কাউকে নয়, বিবাহ করে পিণ্ডদোষের গণ্ডীর বাইরে সম্পূর্ণ এক অনাত্মীয় স্ত্রীলোক বা পুরুষকে। দুটি অনাত্মীয়, অধিকাংশ-ক্ষেত্রে পূর্ব-অপরিচিত স্ত্রীলোক ও পুরুষ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার করে। এই জীবনযাত্রা ও সংসার যাত্রার মধ্য দিয়ে তারা যে নারায়ণকে সাক্ষী করে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, সেই নারায়ণকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত জীবনের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে, সজ্ঞানে অজ্ঞানে কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা পরস্পরকে ভালবাসার তপস্যা করবে। এই যুগল-জীবনের প্রেম-চর্চার মধ্যপথে কেউ যদি অন্যের জীবন থেকে অপসৃত হয় তখন কি হবার কথা বলতো?

মন্মথ উত্তর না দিয়ে পণ্ডিতমশাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

পণ্ডিতমশাই অতি পবিত্র শাস্ত্রপাঠের বিনম্রতা নিয়ে বললেন—তখন একজনকে হারিয়ে অন্যজনের জীবন শূন্য, রিক্ত হয়ে যাবার কথা, হয়ও! তখন কি আর এই পার্থিব জীবনের প্রগল্‌ভ আনন্দ আস্বাদ করার তৃষ্ণা থাকে? থাকে না বাবা! সে পুরুষেরও বটে, স্ত্রীলোকেরও বটে। দুইয়ের পক্ষেই সমান। তখন পুরুষকে অবলম্বন করতে হয়—যে নারায়ণকে যুগলে এতদিন প্রদক্ষিণ করেছে তাঁকে। পুরুষের তখন তাঁকে হয় পিতারূপে, নয় জননীরূপে সেবা করে, পূজা করে জীবনের শূন্যতা পূর্ণ করতে হয়। আর স্ত্রীলোককে তখন নারায়ণকে অবলম্বন করতে হয় স্বামীরূপে, স্বামী আর নারায়ণ তখন এক হয়ে যান স্বাভাবিকভাবে। এই হলো সাধারণ নিয়ম।

বলে একটু নীরব থেকে আবার বলতে লাগলেন—তুমি মহামহোপাধ্যায় রামরাম স্মৃতিতীর্থকে দেখেছ! এই প্রসঙ্গে তোমাকে একটা মজার কথা, লঘু কথা বলি। মহামহোপাধ্যায় রামরাম আগে স্মৃতিরত্ন ছিলেন। সরকার থেকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেবার পর উনি নিজেই নিজের স্মৃতিরত্ন উপাধিটা বদলে স্মৃতিতীর্থ করে নিয়েছেন। অতি বিচিত্র, অতি সুন্দর আবার অতি তেজস্বী মানুষ! তা যাক!

ওঁর যখন বত্রিশ বছর বয়স তখন ওঁর স্ত্রীবিয়োগ হলো। নিজে বিখ্যাত পণ্ডিত, অতি মহৎ পণ্ডিতবংশের সন্তান। সবাই ওঁকে আবার বিবাহ করতে বললে। উনি বললেন—আমার তো পত্নীবিয়োগ হয় নি! সবাই তো শুনে অবাক। উনি বললেন—আমি নারায়ণের মধ্যে আমার হারানো পত্নীকে ফিরে পেয়েছি। সেই বত্রিশ বছর বয়েস থেকে আজ পচাশি সাতাশি বছর বয়সেও দিব্যি পরমানন্দে স্বপাক আহার করে বৈধব্য পালন করছেন!

তারপর একটু ঝোঁক দিয়ে বললেন—এটা সাধারণ নিয়ম। এই সাধারণ নিয়ম না থাকলে মানুষের জীবনে ভ্রষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে, সমাজজীবনের কেন্দ্রে নারায়ণের আসন টলে। আর বাবা, সে স্ত্রীলোকই হোক আর পুরুষই হোক, যে বিশেষ একজনকে ভালবেসে কৃতার্থ হয়েছে, ধন্য হয়েছে, সে কি আর কাউকে সেই ভালবাসার শূন্য আসনে বসাতে পারে? তা পারে না! কিন্তু যারা পার্থিব সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারে না, তাদের সে চেষ্টা করা উচিত বলেই এই নিয়ম। ভালবাসাও তো বাবা, তপস্যার সামগ্রী, বোধহয় শ্রেষ্ঠ তপস্যার বিষয়। তবে যারা সে তপস্যা করতে পারবে না, অথবা যারা আমার এই কন্যা লক্ষ্মীর মতো, কিংবা তোমাদের কি বলে গো, কি নাম যেন, তোমাদের সেই বইখানি, আহা কি নাম, হ্যাঁ, 'বিষবৃক্ষ', সেই বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনীর মতো, যাদের মনে প্রথম স্বামীর ছাপ পড়েছে কি পড়ে নি, ভালবাসা তো দূরের কথা, তাদের জন্যে বিধবাবিবাহের দরজা খুলে দেওয়া উচিত।

মন্মথ সোৎসাহে নিজের অজ্ঞাতেই উত্তেজিত হয়ে নড়েচড়ে বসে বললেন—খুব সংগত বলেছেন!

গোপীনাথ হেসে বললেন—আমরাও সচরাচর সংগত কথাও বলি গো! তোমরা আমাদের টুলো পণ্ডিত বলে ছাপ দিয়ে আমাদের কথা না শুনেই রায় দাও। তা যা বলছিলাম!

—বলুন বলুন!

—তা যারা জীবনে ভালবাসার আস্বাদই পেলে না তারা কোন্ স্মৃতি নিয়ে সেই স্মৃতির তপস্যা করবে? অথচ বৈধব্যের সাধারণ নিয়ম তাদের ওপর প্রয়োগ করে তাদের পীড়ন করতে সমাজ আজ শ্লাঘা বোধ করে। এই বিকৃত দৃষ্টির চিহ্নই তুমি আর এক মূর্তিতে দেখতে পাবে বহু বিবাহের মধ্যে। একদিকে স্ত্রীলোকের জন্য এক নিয়ম, অন্যদিকে পুরুষের জন্য একেবারে বিপরীত নিয়ম। সুস্থ সমাজে, ভগবানের সৃষ্ট দুই প্রাণীর জন্যে দু রকম নিয়ম তো হবার কথা নয়! এ কদাচার ছাড়া আর কিছু নয়!

মন্মথ বললে—এ অবস্থা বেশীদিন চলবে না পণ্ডিতমশাই। মেয়েরাও এবার লেখা-পড়া শিখছে।

কথাটা বোধহয় গোপীনাথ পণ্ডিতমশায়ের পুরোপুরি মনে লাগল না। তাই তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, খানিকটা দ্বিধার সঙ্গেই বললেন—হ্যাঁ, মেয়েরা তো আজকাল লেখাপড়া শিখছে। কিন্তু ফল কি খুব ভালো হবে?

বলে একটু চুপ করে থেকে বললেন—ভাবছি, লক্ষ্মীকে লেখাপড়া শেখাব নতুন করে।

মন্মথ সাগ্রহে বললে—তাই পড়ান পণ্ডিতমশাই, সে খুব ভালো হবে। আমি বরং মধ্যে মধ্যে এসে লক্ষ্মীদিকে খানিকটা করে দেখিয়ে দিয়ে যাব।

এবার গোপীনাথ সত্যই খুব খুশী হয়ে বললেন—এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। এর চেয়ে আর ভালো কি হতে পারে। তুমি যদি সত্যিই একটু করে দেখিয়ে দাও—

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মন্মথ আবার বললে—দেব, নিশ্চয় দেখিয়ে দেব।

বিনা অনুরোধে লক্ষ্মীকে পড়াবার প্রস্তাব করবার পূর্ব মুহূর্তে সে ভাবে নি যে সে নিজে থেকে এ প্রস্তাব করবে। কিন্তু বার বার দু বার বলে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে ভাবতে চেষ্টা করলে মনে মনে কেন সে এ প্রস্তাব করলে উপযাচক হয়ে।

পণ্ডিতমশাই বললেন—আমি একবার লক্ষ্মীকে বলে দেখি কথাটা। তার মতটা কি জানি। তারপর যা হয় হবে।

তারপর অকস্মাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন—তোমার খুড়ো-খুড়ীর সঙ্গে তোমার কতদিন দেখা হয় নি? কতদিন যাও নি তাদের বাড়ি?

মন্মথ সংকুচিত হয়ে গেল। অপরাধীর মতো বললে—তা অনেকদিন হবে। অনেক দিন যাই নি, যাওয়া হয় নি। তবে কাকাও কোনো খোঁজ-খবর করেন নি যাই নি বলে।

পণ্ডিতমশাই বললেন—তোমার খুড়ো-খুড়ীকে জানি, তোমাকেও জানি। ওরা এক ধাতুর মানুষ, তুমি ভিন্ন ধাতুতে তৈরি। তোমাদের মিল না হবারই কথা। কিন্তু বাবা, সংসারে চলতে গেলে সবারই সঙ্গে তোমাকে চলতে হবে; কাউকে বর্জন করে তো চলতে পারবে না। খুড়ো-খুড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো না। হাজার হোক তোমার পিতার সহোদর ভাই। সম্পর্ক না রাখলেও অপযশ। তবে তোমার খুড়ো জটাধরের ছেলেটা তোমার খুব নাম করে।

মন্মথ মেনে নিলে—যাব নিশ্চয় যাব কাকার বাড়ি। দু একদিনের মধ্যেই যাব।

—হ্যাঁ যেও। একটা মজার কথা জান। তোমার কাকা আজকাল বেশ পয়সা-ওয়ালা লোক হয়েছে তো। আধুনিক কায়দা-কানুন অনেক আয়ত্ত করেছে।

সে আমাকে বললে কি জান? বললে মেয়ের, মানে লক্ষ্মীর আবার বিয়ে দিন। শুনে তোমার খুড়ীর সে কি রাগ! সে রেগে বললে—তুমি বুঝি আজকাল খুব সায়েব হয়েছ? তা না হলে বিধবার বিয়ে দিতে বল তুমি? তোমার কি বাহাত্তুরে ধরেছে? ওদের দু জনের দুরকম মত দেখে চুপ করে গেলাম। আমার কোনো সুখ-দুঃখ নিয়ে ওদের মধ্যে আর কলহ হয় কেন?

একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন—তুমি তখন কি বলছিলে যেন? কি একটা বিপদে পড়েছ! কি বিপদ হলো তোমার বল!

একটু ঢোঁক গিলে মন্মথ বললে—আমি তো এবার এফ. এ. পরীক্ষা দিয়েছি, আপনি জানেন বোধহয় রেজাল্ট বের হবার সময় হলো, অথচ কোথাও কোনো খবর পাচ্ছি না। তাই বড় ভয় হচ্ছে হয়তো রেজাল্ট খারাপ হয়েছে। তাই ভয়ে আর কারও কাছে না গিয়ে আপনার কাছে এলাম, যদি আপনি কিছু বলতে পারেন।

পণ্ডিতমশাই বললেন—তোমার পুরো খবর আমি জানি না। আমি পরীক্ষকও ছিলাম না, কিংবা 'ট্যাবুলেশনে'র কাজও আমার হাতে আসে নি। তবে আমার হাতে এবার এণ্ট্রান্সের 'ট্যাবুলেশন' আছে। সে কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

মন্মথ যে উদ্দেশ্যে এসেছিল সেই প্রচ্ছন্ন প্রত্যাশার কেন্দ্রস্থলে পৌঁছেছে সে। সে বিস্ময়ের ভান করে বললে—আপনার কাছে এণ্ট্রান্সের ট্যাবুলেশন পড়েছে? কি আশ্চর্য!

পণ্ডিতমশাই হেসে বললেন—আশ্চর্য কিসের?

মন্মথ লজ্জিতের ভানে বললে—না, আমার জানা একজন এণ্ট্রান্স দিয়েছে। তার নম্বরের খোঁজ করছি। আপনার কাছে আছে নাকি তার নম্বর? থাকলে একটু বলে দেবেন?

পণ্ডিতমশাই আনন্দের সঙ্গেই বললেন - কত নম্বর? কই, বল দেখি?

মন্মথ নম্বরটি মন্ত্রজপের মতো মনে রেখেছিল, কিন্তু পকেট থেকে টুকরো কাগজটি বের করে পড়ে মনে না থাকার ভান করে সেটি সসংকোচে গভীর লজ্জার সঙ্গে উচ্চারণ করলে।

শুনে পণ্ডিতমশাই বিস্মিত হয়ে বললেন—এ তো কোনো স্ত্রীলোকের রোল নাম্বার!

মন্মথ গভীরতর লজ্জার সঙ্গে ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল। পণ্ডিতমশাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার লজ্জানত মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মন্মথ এক অনাত্মীয়া তরুণীর পরীক্ষার ফল নিয়ে চিন্তিত এটা তাঁর কাছে স্বাভাবিকভাবেই একটা ত্রুটির মতো শুধু

নয়, একটা গোপন অপরাধের মতো মনে হলো। মন্মথর লজ্জার অনুপাতেই তাঁর ভ্রূর কুঞ্চন জটিল হয়ে উঠল। তিনি প্রশ্ন করলেন—মেয়েটি কে হে ?

মন্মথ ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। সে সহজভাবেই বললে—আমাদের সঙ্গে সত্য পড়ে। সেই সত্যর খুড়তুতো বোন। আমি ওদের বাড়ি মধ্যে মধ্যে যাই তো।

শেষের কথাটা অনেকটা শোনাল কৈফিয়তের মতো। পণ্ডিতমশাই প্রশ্ন করলেন—সত্যর ভগ্নী, মানে অ্যাডভোকেট জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ির মেয়ে ?

আর কথা বলতে সংকোচ হচ্ছে মন্মথর। সে ঘাড় নেড়েই জানাল—হাঁ।

পণ্ডিতমশাই অপ্রসন্ন মুখে প্রশ্ন করলেন—রোল নাম্বার কত বললে ? নাম কি ?

রোল নাম্বার আবার বলে মন্মথ নামটি যেন দুর্লভ মিষ্টান্নের মতো আস্বাদ করে উচ্চারণ করলে—মালতী বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতমশাইয়ের মুখের অপ্রসন্নতা ঘুচে এক বিচিত্র সহাস্য কৌতূহল প্রকাশিত হলো তাঁর মুখে। তিনি প্রশ্ন করলেন—মালতী বন্দ্যোপাধ্যায় ? দাঁড়াও, দাঁড়াও, দেখে আসি।

তিনি দ্রুত পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। তাঁর এই মনোভাব পরিবর্তনের কোনো কারণ মন্মথ বুঝতে পারলে না। একটা গভীর অস্বস্তির মধ্যেই বসে রইল সে। কিন্তু মালতীর সম্পর্কে তার এই কৌতূহল পণ্ডিতমশাই যে ভালো চোখে দেখেন নি তা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে মন্মথ। এটা সে ঠিক অনুমান করতে পারে নি। এখন বুঝতে পারছে, এদিকে এ নিয়ে পদক্ষেপ করা তার পক্ষে যুক্তিযুক্ত কাজ হয় নি। আজই আলোচনার মধ্যে একবার মহামহোপাধ্যায় রামরাম স্মৃতিতীর্থের নাম গোপীনাথ পণ্ডিতমশাই সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করেছেন। তাঁকে এঁরা কুলপতির তুল্য শ্রদ্ধা করেন। সেই রামরাম স্মৃতিতীর্থের দৌহিত্রীর সঙ্গে যার বিবাহ হবার কথা সে অন্য অনাত্মীয়া স্ত্রীলোক সম্পর্কে কৌতূহলী হবে এটা পণ্ডিতমশাইয়ের ভালো না লাগারই কথা। কাজেই এখানে মালতীর পরীক্ষার ফল জানতে আসাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি।

এই সময়েই পণ্ডিতমশাই হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন। তার মুখের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন—মেয়েটি আশ্চর্য মেধাবিনী হে মন্মথ ! খুব ভালো ফল করেছে। আমার কাছে তো সকলের পরীক্ষার সম্পূর্ণ ফল নেই, যতখানি আছে তাতে দেখলাম মেয়েটি খুব ভালো করেছে ! ইংরিজীতে, বাংলায় খুব ভালো নম্বর পেয়েছে। অঙ্কে কিছু কম। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, মেয়েটি দেবভাষায় শতকরা বিরাশি নম্বর পেয়েছে।

বলে মালতীর মোট নম্বরটা জানিয়ে সব বিষয়ের নম্বরগুলিও বলে দিলেন। শেষে

বললেন—বৃত্তি তো পাবেই। মেয়েদের মধ্যে ওর নম্বরই সর্বোচ্চ হবে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন—একটা কথা বলি, কিছু মনে করো না। বুঝতে পারি সত্য তোমার বন্ধু, ছাত্রও খুব ভালো। এ মেয়েটিও লেখাপড়ায় খুব ভালো বুঝতে পারছি। ওদের বাড়িতে বিদ্যার খুব চর্চা আছে, শিক্ষায় ওদের গৃহ ও মন দুইই সমুজ্জ্বল। কিন্তু বাবা, তুমি ওদের চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ মন্দ একথা বলছি না. তবে আমাদের থেকে পৃথক্, অনেক পৃথক। ওর সঙ্গে তোমার ঠিক মিশ খাবে না। তুমি বেশী মেলামেশা করো না ওদের সঙ্গে।

ঘাড় হেঁট করে পণ্ডিতমশায়ের উপদেশ নতমস্তকে সদ্‌বুদ্ধি ও সৎবাক্যের ভারী বোঝার মতো চাপিয়ে নিয়ে সুবোধ বালকের মতো প্রণাম নিবেদন করে সে পণ্ডিতমশায়ের গৃহদ্বার অতিক্রম করলে। রাস্তায় নামার সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপর থেকে অবাঞ্ছিত উপদেশের বোঝা আপনিই খসে পড়ে গেল। ভারমুক্ত প্রসন্ন মনে সে যাবার জন্যে পা বাড়ালে।

পিছন থেকে দরজায় দাঁড়িয়ে আবার ডাকলেন পণ্ডিতমশাই। বললেন—ওহে মন্মথ শোন শোন, একটা প্রয়োজনীয় কথা বলতে ভুলে গেছি। একটা চিন্তায় গুরুভারে আর এক লঘু চিন্তা চাপা পড়ে গিয়েছে।

মন্মথকে আবার গিয়ে বসতে হলো পণ্ডিতমশায়ের চৌকিতে। বললেন এই দেখ বৃদ্ধ হয়েছি, স্মৃতি আর সব ধারণ করে রাখতে পারে না। যত অবাস্তব বিষয় স্মৃতিতে বোঝার মতো চেপে থেকে কাজের কথা হারিয়ে যায়। তোমার পরীক্ষার ফলের কথা তো আলোচনাই করা গেল না। কারণ ও বিষয়ে জানি না তো কিছু। তবে তোমার সংস্কৃতের নম্বর আমি জানি। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তোমাদের সংস্কৃতের প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। কদিন আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি প্রসঙ্গত এফ. এ.র সংস্কৃত পরীক্ষা সম্পর্কে কথা বলতে বলতে যে সর্বাধিক নম্বর পেয়েছে তার কথা উল্লেখ করলেন সবিশেষ প্রশংসার সঙ্গে। নাম জিজ্ঞাসা করায় জানলাম তুমি। তখন তোমার পরিচয় দিলাম। স্মৃতিতীর্থ মশায়ের দৌহিত্রীর সঙ্গে তোমার বিবাহ সম্পর্কের কথাও বললাম। তিনি খুব তৃপ্তির সঙ্গে বললেন আমাকে—একদিন ছেলেটিকে নিয়ে আসুন তো! একবার দেখি শ্রীমানকে। ওর পরীক্ষাপত্রে এমন বিশিষ্ট মেধা ও ব্যুৎপত্তির চিহ্ন আছে যা দুর্লভ, যা খুব পরিণত শাস্ত্রাধ্যায়ীর পক্ষেও ঈর্ষার বস্তু। শাস্ত্রের ও সত্যের মর্মভেদ করে দেখার আশ্চর্য দৃষ্টি ছেলেটি ভাগ্যগুণে লাভ করেছে। তাকে একবার আসুন তো, একটু পরিচয় করে তৃপ্তিলাভ করি। তা তুমি কবে আসবে?

মন্মথর পক্ষে এ গভীর ও অপ্রত্যাশিত আনন্দের কথা। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সি-প্যাল সামান্য ব্যক্তি নন। বিদ্যা, জ্ঞান ও চরিত্রের ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মশায়ের চরিত্রে। দেশের মানুষের কাছে তিনি গল্পকথার মানুষ। সেই মানুষ নিজে থেকে তার সঙ্গে পরিচয় করতে চেয়েছেন, এ তো সহজ ভাগ্য নয়। তবু মন্মথ খুব অভিভূত হলো না। সে কেমন অস্পষ্টভাবে অনুভব করছে মহামহো-পাধ্যায় রামরাম স্মৃতিতীর্থের অদৃশ্য অস্তিত্ব তাকে চারিদিক থেকে নাগপাশের মতো বেষ্টন করছে ধীরে ধীরে। সে মুখে সচেষ্ট সম্মানের সসম্ভ্রম হাসি ফুটিয়ে বললে—আপনি যেদিন বলবেন সেই দিনই যাব। তবে আমি একবার দেশে যাব মনে করছি। রেজাল্ট বের হবার আগে একবার দেশ থেকে ঘুরে আসি। দেশে যাবার কথা সে মুহূর্ত পূর্বেও চিন্তা করে নি। কেবল এই সাক্ষাতকারকে পিছিয়ে দেবার জন্যই যেন সে এই প্রয়োজনটাকে সৃষ্টি করে নিলে।

পণ্ডিতমশাই তার কথা মেনে নিয়ে তাকে সস্নেহে বললেন—তাই হবে। তুমি দেশ থেকে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এস। আমি বরং ন্যায়রত্নমশাইকে বলে রাখব।

মন্মথ আবার প্রণাম করলে। সে জানে পণ্ডিতমশাইরা বড় সবল মানুষ কিন্তু প্রণাম পেতে বড় ভালবাসেন।

রাস্তায় পা দিতেই বেনেটোলা লেনের মুখেই মন্মথ পুলিশের হাতে পড়ল। রাধা-শ্যাম পুলিশ হয়ে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার জন্যে। তারই জন্যে দাঁড়িয়েছিল অথচ তাকে দেখে মুখ ভার করে দাঁড়িয়েই রইল, কাছে এলো না।

মন্মথ ওর এই সব ছেলেমানুষী রাগকে ভালো করেই চেনে। সে মুখে হাসি ভর্তি করে তার কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলে। বললে—শ্যাম, তুই আমার ওপর রাগ করেছিস ?

রাধাশ্যাম গলা ঝেড়ে নিয়ে বললে—তোর ওপর কি আমার মতো অর্বাচিনের রাগ করা সাজে ? কথা বলতে গিয়ে তার গলা কেঁপে কেঁপে উঠল।

মন্মথ বললে—তুই সত্যি খুব সরল আর বোকা। তোকে তখন যদি ধমক না দিতাম কি হতো বল তো ?

আবার সেই স্বল্পবুদ্ধি গোঁয়ার রাধাশ্যাম শিং বাগিয়ে প্রশ্ন করলে—কি হতো ?

মন্মথ চুপি চুপি বললে—লক্ষ্মীদির চোখে তোর সামনে যে জল তখন পড়লো, সেই জলই ঝরতো। তবে আমার কথা শুনে মন খুশী হয়ে ঝরতো না, তোর কথার খোঁটায় দুঃখে জল পড়তো, বুঝলি ? আরে সদ্য বিধবা হয়েছে, তার কাছে বিধবা-বিবাহের নিন্দা করে ? একনিষ্ঠ বৈধব্যের গুণগান করা যায় তার সামনে ?

রাধাশ্যাম তো বুঝতেই চাইছিল, বুদ্ধি দিয়ে নয়, মন্মথর ভালবাসা আর সহানুভূতির মধ্য দিয়ে। তার মধ্য থেকে এবার এক মুহূর্তে সেই চিরকালের মন্মথ-সঙ্গ-পিপাসু রাধাশ্যাম আত্মপ্রকাশ করলে। সে বললে—বেশ বাবা, বেশ। হয়েছে হয়েছে। এখন তো চল, একটু বেড়িয়ে আসি!

মন্মথ ভয় পেয়ে গেল। রাধাশ্যামের মধ্যেকার চিরকালের স্ত্রীলোক যেন আর তাকে ছাড়তে চায় না। সে শশব্যস্ত হয়ে বললে—না রে, আমার আর বেড়ালে চলবে না। বহুদিন বাড়ি যাইনি। আজ বিকেলে দেশে যাব। কাজেই এখন যাই। দেশ থেকে ফিরে আবার আসবো।

মন্মথ তাকে ছেড়ে পা বাড়ালে। প্রত্যাখ্যাত স্ত্রীলোকের মতো তার সনাতন অসহায় ঈর্ষার দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে চেয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে রইল রাধাশ্যাম। তার বুকের ভিতর যেন কান্না ফুঁপিয়ে উঠছে। মন্মথ তাকে এমনি করে অবহেলা করতে পারলে!? সেই মন্মথ যাকে সে কলকাতা চিনিয়েছিল!?

খবরটা সে আর চেপে রাখতে পারলে না।

ভেবেছিল দুপুরবেলা স্নান আহারের পর খানিকটা ঘুমিয়ে গল্প ও বিশ্রাম করে হোস্টেল থেকে যথারীতি বিকেলবেলায় গিয়ে সত্যদের বাড়ির সান্ধ্য-আসরে খবরটা পরিবেশন করবে। কিন্তু উৎসাহিত মন ততক্ষণ যেন অপেক্ষা করতে রাজি হলো না। তাকে ঠেলে নিয়ে গেল সত্যদের বাড়ির দিকে।

কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট কাজ করিয়ে নিলে তার বুদ্ধি। তার লৌকিক বুদ্ধি তাকে যেন শিখিয়ে দিলে—এখনি খবরটা পেয়েছে বলে এখান হ্যাংলার মতো একা একা সত্যদের বাড়ি যাবে খবরটা দিতে? মালতী খুব ভালো ফল করেছে তাতে তোমার এত উৎসাহ প্রকাশের কি আছে হে? বলছি, শোন, খবরদার একা যেয়ো না! লোকেশকে সঙ্গে নাও। দুজনে একসঙ্গে গেলে সেটা বেশ শোভন হবে।

আমহার্স্ট স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ে পৌছে সেই অনুযায়ী সত্যদের বাড়ির পথ আমহার্স্ট স্ট্রীটে না ঢুকে সে সোজা হেঁটে গিয়ে পৌছুল শেয়ালদাতে লোকেশের মেসে। আষাঢ় মাস, কদিন আগে বেশ বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে আছে। বেলা নটা সাড়ে নটার রৌদ্রে আকাশ আর পৃথিবী যেন নিঃশব্দে আপন মনে অট্টহাস্য করে চলেছে বলে মনে হলো মন্মথর। আর সেই নিঃশব্দ পরমানন্দময় হা-হা হাসি কলকাতার এই অসংখ্য চলমান মানুষের মধ্যে, অন্তত তার বুকে প্রতিধ্বনি তুলে চলেছে। তার মনও যেন নিঃশব্দে করতালি দিয়ে ওই হাসর

সঙ্গে তাল রেখে হেসে চলেছে। তার পা যেন মাটিতে পড়ছে না। শুকনো ফুলের মালা, খামের ওপর অর্থহীন অথচ অতি ইঙ্গিতময় ছোট্ট কটি অক্ষর কি রাগত স্বরে দুটো কথা—এ সবের চেয়ে আরও অনেক প্রত্যক্ষ, অনেক পরিমাণে গভীরতর অনুরাগের প্রত্যয়ে তার মন আজ আশ্চর্য শান্ত, আশ্চর্য আনন্দে আনন্দিত। মালতী যে ভালো ছাত্রী তা সে মোটামুটি জানত। ইংরেজী বাংলা যে সে ভালই জানে তাও মন্মথ জানত ভালো করে। কিন্তু মালতী যে সংস্কৃতে এত ভালো নম্বর পাবে, পেতে পারে এ তার কল্পনার বাইরে ছিল। সংস্কৃতের প্রতি মালতীর এই সুগভীর অনুরাগকে কে তার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেল? সে উত্তর সে আর মালতী ছাড়া আর কেউ জানবে না, কেউ বুঝবে না। এমন কি সত্যও না!

লোকেশের মেসে এসে সে সোজা উঠে গেল তেতলায়, লোকেশের রাজ্যে। লোকেশের কাকা তখন গামছা পরে খড়ম পায়ে স্নানের জন্য তৈরি হচ্ছেন। তাকে দেখে একটু নিঃশব্দ হাসি হেসে সকৌতুক ইঙ্গিতে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন লোকেশ তার পড়ার আসনে চুপ করে বসে আছে। সামনে একখানা বই খোলা, কিন্তু সে পড়ছে না, তার দিকে পিছন ফিরে বোধহয় গরাদে দেওয়া জানলার ওপারে চেয়ে আছে, বোধহয় আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে। নড়ে না, চড়ে না, চুপচাপ স্থির মূর্তির মতো বসে।

অনেকক্ষণ দরজার কাছে তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার মনও কেমন ধীরে ধীরে শান্ত, প্রায় স্তব্ধ হয়ে এলো। যে আকাশ এতক্ষণ নিঃশব্দ অট্টহাস্যে তার ভিতরে হাসছিল, ওই স্তব্ধ স্থির মূর্তির ভিতর দিয়ে জারিত হয়ে সেই হাস্যময় আকাশই যেন শান্ত স্তব্ধ এক গম্ভীর বন্ধুর মতো তাকে আলিঙ্গন করলে। তারই স্তব্ধতা শান্তি ও গাম্ভীর্যের স্পর্শ অন্তরে বহন করে সে মৃদুস্বরে ডাকলে—লোকেশ!

সাড়া পাওয়া গেল না একটা ডাকে। গোটা তিনেক ডাকের পর লোকেশ চমকে জেগে উঠে তার দিকে চেয়ে বলল—আয়, তোরই কথা ভাবছিলাম!

আশ্চর্য হয়ে মন্মথ বললে—আমার কথা?

খুব সহজভাবে লোকেশ বললে—হ্যাঁ, তোরই কথা। মনে হচ্ছিল তুই যদি আসিস এখন বেশ হয়। আয় বস।

মন্মথ এবার সহজ হয়ে গেল। সেই আনন্দও নেই সেই স্তব্ধ শান্তও নেই। সব কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে ছায়ার মতো; কয়েক মুহূর্ত পূর্বের সব অস্তিত্ব ও অভিজ্ঞতা হারিয়ে গিয়েছে। সে বললে—বসব না। আয়, উঠে আয়। একবার সত্যদের বাড়ি যেতে হবে।

—এই সকালে ? কেন রে ?
—মালতীর পরীক্ষার খবর জেনেছি। জানাতে যেতে হবে।
লোকেশ উঠে পড়ল। জামা গায়ে দিলে। তারপর চটিতে পা গলাতে গলাতে প্রশ্ন করলে—কেমন করেছে ? খুব ভালো তো ? স্কলারশিপ পাবে না ?
মন্মথ অবাক্ হয়ে বললে—তুই কি করে জানলি ?
—এই দেখ, কি করে নাকি জানলাম! ভালো ছাত্রী! স্কলারশিপ পাওয়াই তো উচিত! আর তা না হলে তুইই কি এত উৎসাহ নিয়ে ছুটে আসতিস ?
তার ব্যাখ্যাটা মেনে নিলে মন্মথ। বললে—জানিস, মালু সংস্কৃতে শতকরা বিরাশী নম্বর পেয়েছে।
তার মুখের দিকে চেয়ে লোকেশ বিচিত্র এক হাসি হেসে বললে—পাবারই তো কথা! চারিদিকে সংস্কৃতের নম্বর ছড়াছড়ি যাচ্ছে। না পেলেই অন্যায় হতো।

সত্যদের বাড়িতে তখন জ্যোতিপ্রসাদবাবু কোর্টে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। তাদের দুজনকে দেখে হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার হে ? প্রাতর্ভ্রমণ করতে নাকি ? তা লোকেশ, তোমার হাতে ঠোঙায় কি ? খাদ্যদ্রব্য নাকি ?
লোকেশ মাঝ রাস্তায় অকস্মাৎ এক ঠোঙা জিলিপি কিনেছিল। সে বললে—আজ্ঞে জিলিপি! খাবার জন্যে কিনে আনলাম। একটা খবর আছে, মনু এনেছে। মালতী বোধহয় এণ্ট্রান্সে মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে। স্কলারশিপ পাবে।
সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির চেহারা বদলে গেল। মৌমাছি যেমন মৌচাকের উপর আনন্দ-মগ্ন হয়ে জমে থাকে বাড়ির সকলে তেমনি এই আনন্দ-সংবাদটির মধুবিন্দুকে কেন্দ্র করে মন্মথর চারিদিকে জমে উঠল।
সন্ধ্যা বলে উঠল—মা, একদিন আমাদের একটা 'সেলিব্রেট' কর। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর।
সত্যর মা হাসিমুখে বললেন—কর, তবে এখন বাইরের কাউকে জানাবার কি নেমন্তন্ন করবার দরকার নেই। যা করার কর নিজেদের মধ্যে। সামনের শনিবার সন্ধ্যার খাওয়ার ব্যবস্থা কর। সন্ধ্যা, ভার নাও তুমি!
মালতী তার সেই চিরাচরিত গম্ভীর শান্তমুখে আকাশ-রঙা চোখ বিস্তৃত করে তাকিয়েছিল চুপচাপ। খুশী সে হয়েছে ঠিকই। কিন্তু প্রগল্‌ভের মতো বাক্যে কি হাসিতে তা সে প্রকাশ করবে কি করে ?
জ্যোতিপ্রসাদবাবু কোর্টে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন—তাই ঠিক থাকল তাহলে। শনিবার সন্ধ্যেতে। সত্য, তুমি মালতীদের বাড়িতে ঠন-

ঠনেতে খবরটা দিয়ে এসো, আর ওদের নেমন্তন্ন করে এসো।

তিনি নেমে চলে গেলেন।

মন্মথ মৃদু স্বরে সত্যকে বললে—কিন্তু আমি তো ভাই, শনিবারে থাকবো না! তা নাই বা থাকলাম। আমাকে বাদ দিয়েই এবারটা হোক না। পরে আবার কোনোদিন খাওয়া-দাওয়া হবে পাকাপাকি রেজাল্ট বের হলে। পরীক্ষার পরও মন্মথ কলকাতায় রয়ে গিয়েছিল যে কারণে, সে কথা কেউ জানত না, যার জন্য লোকেশকে পর্যন্ত ছলছুতো করে সে আটকে রেখেছিল তা তো হয়েই গেল। এবার বাড়ি যেতে বাধা কি!

কিন্তু সত্য চিৎকার করে প্রতিবাদ করে বললে—সে কি কথা! তুই না থাকলে হয়? শনিবারে থাকবি না কেন? যাবি কোথায়?

মন্মথ মৃদুস্বরে বললে—আমি কাল বাড়ি যাব রে। অনেকদিন বাবা-মাকে দেখি নি, একবার যাওয়া দরকার। তাই কাল যাব ঠিক করেছি।

মালতী তার স্থির শান্ত চোখের গম্ভীর ছাবটি একবার মন্মথর মুখের উপর দীপ-শিখার মতো স্থাপন করে আবার পরমুহূর্তে সরিয়ে নিলে।

লোকেশ হঠাৎ বললে—হ্যাঁ রে মালতী, একটা কথার জবাব দেতো!

এতক্ষণে মালতীর মুখখানিতে হাসির আভাস ফুটে উঠল। সে প্রসন্ন হাস্যময় দৃষ্টিতে লোকেশের মুখের দিকে চেয়ে বললে—জিজ্ঞাসা কর, তবে তো তোর কথার জবাব দেব কিনা ভেবে দেখব।

লোকেশ বললে—আচ্ছা ঠিক করে বল তো, সংস্কৃতে এত নম্বর পেলি কি করে? মন্মথ কি তোর খাতাখানা লিখে দিয়ে এসেছিল?

কথাটা কৌতুকের, কিন্তু নিদারুণ লজ্জায় মালতীর হাতির দাঁতের রঙের মসৃণ পেলব মুখখানিতে অস্বাভাবিক লালের ছোপ লাগল। সে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

লোকেশের অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। সে বললে—ওঃ, খব মনে পড়েছে, আমার একটা কাজ বাকী আছে।

সত্য প্রশ্ন করলে—কি কাজ?

উত্তর না দিয়ে লোকেশ জিলিপির ঠোঙাটা নিয়ে এসে সেটা খুলে ফেলে সত্য ও মন্মথর দিকে হাত প্রসারিত করে মানুষ যেভাবে কোনো গৃহপালিত জন্তুকে ডাকে সেইভাবে তাদের দুজনকে ডাকতে লাগল—আঃ, আঃ, আয়, আঃ, চ্যু, চ্যু, চ্যু, আঃ আঃ—

—ও কি করছিস? সন্ধ্যা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে।

লোকেশ গম্ভীরভাবে বললে—কেন, বুঝতে পারছ না? বড়বাজারের ষাঁড়কে

জিলিপি খাওয়ানো দেখ নি? আমি এই ষাঁড় দুটোকে, মালতীর নামে, জিলিপি খাওয়াচ্ছি। হামারা প্যুণ্ হোগা!

তার কথায় সকলে অট্টহাস্য করতে লাগলো। এমন কি মালতী পর্যন্ত। সে হাসতে হাসতে ছুটে নেমে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর যখন মন্মথ লোকেশ ও সত্যর সঙ্গে নিচে নেমে এলো তখন দেখলে মালতী বাগানের গায়ে একটা রজনীগন্ধার ঝাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। মন্মথর তৃষিত চোখ তাকেই খুঁজছিল। তাকে দেখতে পেয়ে তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মন্মথর মনে হলো যেন মালতী কারও অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। কার অপেক্ষায়? কার আর? সে ছাড়া আর কার?

সে দুই বন্ধুকে পরিত্যাগ করে তার দিকে পা বাড়াতেই সে ছোট্ট করে মৃদু স্বরে ডাকলে—শোন!

এমনভাবে ছোট্ট কথাটি উচ্চারণ করলে সে মনে হলো দূরের মানুষকে শব্দের আকশি দিয়ে কোলের কাছে, মনের কাছে টেনে নিয়ে এলো।

মন্মথ এসে দাঁড়াল তার কাছে। তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কোনো প্রশ্ন করবার আগেই মালতী নিজের বড় বড় শান্ত চোখের দৃষ্টি তার দুই চোখের উপর স্থাপন করে বললে—শনিবারটা থেকে যাও, কেমন? বাড়ি পরে যেও। বুঝলে? মন্মথ কোনো কথা না বলে তার মুখের দিকেই চেয়ে রইল।

মালতী আগের চেয়ে অনেক মৃদু স্বরে তার চোখ মাটির দিকে নামিয়ে বললে—তুমি সেদিন না থাকলে আমার খুব খারাপ লাগবে। তুমি যেও না।

বলেই সে আর অপেক্ষা করলে না। মাথা নিচু করে কাপড়ের পাড়টা আঙুলে জড়াতে জড়াতে সে দ্রুতপায়ে উপরে যাবার জন্য সিঁড়িতে পা দিল।

শনিবার রাত্রিতে সত্যদের বাড়ি খাবার সময় বাবার জন্য তার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। এখানে কত আলোকোজ্জ্বল সমারোহ, কত আনন্দ, কত ঐশ্বর্য! তার এখানকার জীবন কেমন করে কে জানে, কার নির্দেশে কে জানে, কলকাতা শহরের উজ্জ্বলতম, সবচেয়ে আনন্দঘন জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের কিছু উৎকৃষ্ট মানুষের সঙ্গে তার জীবন এক সুতোয় গাঁথা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার বাবা? সে যখন এই মুহূর্তে মহানগরীর আলোয়, হাসিতে, সমৃদ্ধিতে উচ্ছল এক জীবনের আনন্দ আস্বাদ গ্রহণ করছে বহু আনন্দ ও অতি উৎকৃষ্ট ভোজের মধ্য দিয়ে তখন তার বাবা কি করছেন?

এখন কটা বেজেছে? ডাইনিং হলের মধ্যে আজ দেশী প্রথায়, গালিচার আসন সারি সারি পেতে খাবার জায়গা হয়েছে। সেই আসনে বসে খেতে খেতে সে

চোখের সামনের ক্লক ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল। রাত্রি বেশী হয় নি। আটটা কুড়ি। বাবা এখন কি করছেন? অন্তত দেড় দু ঘণ্টা আগে গোবিন্দের ও শালগ্রামের সন্ধ্যারতি ও শীতল শেষ হয়ে গিয়েছে। বন্ধ ঠাকুরঘরের ভিতর পিলসুজে এখনও হয়তো শয়ান বিগ্রহের মুখে আলো ফেলে প্রদীপটি জ্বলছে। তা ছাড়া সব অন্ধকার; চোখের সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে সব অন্ধকার। বাবা হয়তো একটা টেমি কি সেই ছোট চৌকো লণ্ঠনের মৃদু আলোয় ঘরের দাওয়ায় লোমওঠা কুকুরের গায়ের চামড়ার মতো সেই পুরনো গালচের আসনে বসে শুকনো মুড়ি চিবিয়ে চলেছেন। পাশে বোধহয় শীতলের প্রসাদী দুধের বাটিতে পোয়া খানেক দুধ আছে। শুকনো মুড়ি, দু চার টুকরো শশা কি একটু পাটালির টাকনা দিয়ে খেতে খেতে যখন সেই শীর্ণস্বাস্থ্য প্রৌঢ় মানুষটির চোয়াল ব্যথা হয়ে যাবে, তখন জলের ঘটি থেকে একটু জল বাঁ হাতে ঘটিটি উঁচু করে ধরে গলায় আলগোছে একটু ঢেলে দেবেন। আবার চলবে শুকনো মুড়ি চিবানোর পর্ব। মা কাদম্বরী এখনও নিশ্চয় খায় নি। দিনের ভাত রাখা আছে জল দিয়ে ভিজিয়ে। দিনের কিছু তরকারি, হয়তো কিছু চুনো মাছও আছে তার সঙ্গে। বাবার খাওয়া হলে রান্নাঘরের অন্ধকারে বসে মা তখন খাওয়া শেষ করবে। বাবা তখন চৌকো লণ্ঠনটি হাতে নিয়ে শয্যায় গিয়ে বঙ্কিমের কোনো রচনা কিংবা কোনো সংস্কৃত গ্রন্থ নিয়ে বসবেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল বাড়িতে মৃদু খুটখাট শব্দ উঠবে। সে শব্দ এত মৃদু, যে শব্দ উঠছে কিনা তাও পাঠরত বাবার কানে সঠিক ধরা পড়বে না। সে শব্দ মায়ের গৃহস্থালির কর্মসংক্রান্ত হাঁড়িকুঁড়ি নাড়ার! এমনিতেই মানুষটা খুব ঠাণ্ডা, তার সঙ্গে মধুর স্বভাব। পাছে বাবার প্রথম ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে সেইজন্য সে কাজকর্ম করে যথাসম্ভব শব্দ না তুলে। তারপর খাওয়া হলে—

তার চিন্তা হঠাৎ বাধা পেয়ে গেল। লোকেশ পাশে বসেছিল, সে তাকে বাঁ হাত দিয়ে মৃদু ধাক্কা দিলে। বললে—এই মনু, কি ভাবছিস এমন করে? এত অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিস? পোলাও নিবি না?

সন্ধ্যা পোলাওয়ের পাত্র নিয়ে চামচ হাতে তার পাশে দাঁড়িয়ে। তার চোখে চোখ পড়তে সন্ধ্যা বললে—কি এমন করে ভাবছিস মনুভাই? দু বার ডাকলাম, শুনতে পেলি না? পোলাও নিবি? নে একটু?

বলতে বলতে দু চামচ পোলাও সে পরিবেশন করলে মন্মথর পাতে।

মন্মথ হাত নেড়ে নিষেধ করে চাইল সন্ধ্যার মুখের দিকে। চেয়েই রইল সরল শূন্য দৃষ্টিতে।

লোকেশ বাঁ হাতটা তার পিঠে সস্নেহে স্থাপন করে বললে—খা রে মনু, পোলাও

ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বাড়ির কথা ভেবে মন খারাপ করিস না! খা! কাল পরশু তো বাড়ি যাবিই!

মন্মথ সঙ্গে সঙ্গে তার কথা মেনে নিয়ে একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার পাতার দিকে মন দিলে।

কিন্তু ভাবনা ছেদহীনভাবে ক্রিয়া করেই চলল। মায়ের খাওয়া হলে মা হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার করবে, চুল বাঁধবে, সিঁথিতে সিঁদুর পরবে, তারপর পান মুখে দিয়ে শুতে চলে যাবে। মন্মথ ছেলে, তবু সে গতবার বাড়ি গিয়ে লক্ষ্য করেছে শুতে যাবার সময় সেই অল্পাকাঙ্ক্ষী, ভীরু, শান্ত মেয়েটির পানের রসে রাঙানো ঠোঁটে একটি অস্পষ্ট হাসি রক্তাভ রসসিক্ত ঠোঁটের অন্তরালে যেন লেগে থাকে। যে ক'দিন সে বাড়িতে ছিল সে বিশেষ লক্ষ্য করে দেখেছিল। দেখে তার বড় ভালো লেগেছিল।

একটু লজ্জাও লেগেছিল। এত ভালো লেগেছিল যে মমতায়, স্নেহে তার চোখে জল এসেছিল। তার বাবা আর তার মা, হলোই বা সে সৎ-মা, তবু মা তো, তাদের দু জনের জীবনে রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে এই যে গোপন রহস্যময় হাসিটুকু, এইটুকুই তাদের নিরুৎসব, শুষ্ক, দরিদ্র জীবনে গোপনে গোপনে রস-সঞ্চার করে তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, সংসারে আসক্ত করে রেখেছে। আজও সে কথা মনে করে চোখে জল এলো।

আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে আবার একখানা হাত পড়ল পিঠের উপর। লোকেশের হাত। লোকেশ শুধু মৃদু, অতি মৃদুস্বরে বললে—খা।

ভাবনা কিন্তু তখনও ছেদহীন। বাবার ঘরে খিল পড়ল খুট করে। সে যে কয়দিন বাড়িতে ছিল সে কয়দিন তার লজ্জায় মা যত পেরেছে রাত্রি করে শুয়েছে, যত কম শব্দ তুলে পারে তত কম শব্দ তুলে দরজা বন্ধ করেছে। তবু পল্লীগ্রামের নিস্তব্ধ রাত্রির প্রায় মধ্যপ্রহরে সে শব্দ অনন্ত নৈঃশব্দ্যের মধ্যে 'ডাল পড়লে ঢেঁকির মতো কি পাত পড়লে কুলোর মতো বড় হয়ে এসে বেজেছে তার কানে। তারপর সব যেন অনন্ত অন্ধকারে অথৈ শব্দহীনতার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে।

সামনে পাশে খোলা ছোট ছোট জানলা দিয়ে যতদূর চাও অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। তারই মধ্যে রাত্রি আপনার রূপ নিয়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে। বাড়ির পাশের বাঁশবনে বাঁশের গায়ে বাঁশ লেগে ক্যাঁ-ক্যাঁ-কট্-কট্ শব্দ উঠেছে, গাছের ডালে রাতচরা পাখি আর পেঁচা পাখা ঝটপট করে নিজের ভাষায় চাপা শব্দ তুলেছে। পুকুরের জলে কে যেন কোথায় ডুবল আর উঠল তারই শব্দ, বোধহয় কোনো বড় মাছ উঠে আবার ডুবে গেল। বাঁশবনে কোথাও সাপের চোয়ালে ধরা-পড়া

যন্ত্রণাকাতর ব্যাঙের শব্দ। সে সব শব্দ দিনে পাওয়া যায় না। সে সব রাত্রির নিজস্ব শব্দ। তাতে ভয় লাগে কষ্ট হয়। সেই ভয় আর কষ্টেই তো তাদের সংসার তাদের গ্রামখানা ঘেরা।

সে আপন মনে খেতে খেতে ভাবলে—সে নিশ্চিত জানে সে অনেক টাকা রোজগার করবে। এ অন্ধকারকে এ ভয়কে তাড়াবে। অন্তত তার বাড়ির চারপাশ থেকে তাড়াবে। নিশ্চয় তাড়াবে!

আঃ, আজ যদি সে এমনি করে বাড়িতে একটা উৎসব করে, আলো জ্বেলে, অনেক সুখাদ্য পরিবেশন করে তার বাবাকে, মাকে আর ছোট ভাইটাকে, সৃষ্টি সেই করা তার উৎসব মধ্যে টেনে আনতে পারত!

হঠাৎ তার মাথায় একটা কল্পনা বিদ্যুতের মতো খেলে গেল। এন্ট্রান্স পাস করার পর তার পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়ার খবরে যেমন গ্রামে নাটকীয় টেলিগ্রাম আসা আর সেই সঙ্গে গঙ্গাজলের কাছ থেকে খবর নিয়ে লোক আসায় একটা উৎসব সৃষ্টি করে যদি এবারকার খবর নিয়ে। সেই ভালো! তার সব ব্যবস্থাই করে যাবে সে। কেবল একবার গঙ্গাজলকে বলে যেতে হবে! তা হলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সে চিন্তায় একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে খেতে খেতে মাঝপথে হাত গুটিয়ে নিলে। তার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। সে আর বসে থাকে কেন?

লোকেশ একটু হেসে তার পিঠে নিজের বাঁ হাতখানা রেখে আবার মন্মথর দিকে তাকিয়ে বললে—খাওয়া হয়ে গেল তাহলে! এখনও যে দই মিষ্টি আছে রে!

মন্মথ এতক্ষণে আবার বর্তমান অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছে। সহজ হয়েছে। সে হেসে বললে—তাই তো, তোর তো বলতে গেলে খাওয়াই হয় নি! আমরা মাছ মাংস পেট পুরে খেলাম আর তুই খানিকটা নিরামিষ তরকারি দিয়ে খানিকটা পোলাও খেয়েছিস মাত্র। দই মিষ্টি ছাড়া তোর খাওয়া শেষ হবে কি করে?

কথাটা সত্যি। লোকেশ একটু হাসল। মালতী দইয়ের হাঁড়ি নিয়ে এসেছে। লোকেশ তার পোড়া কালো বাঁশের মতো লম্বা বাঁ হাতখানা প্রসারিত করে বললে—এই মালু, দইয়ের হাঁড়ি নিয়ে এইখানে আগে আমার কাছে আয়। আমি যে মাছ মাংস খাই না, আমি যে একজন নিরামিষাশী ত্যাগী সাধুপুরুষ তা তা তুই বার বার ভুলে যাস! আয়, এসে নিজের মাথাটা কেটে না দিতে পারিস, দইয়ের মাথাটা সবটা কেটে দে আমাকে। আমার বামে দক্ষিণে দুই অনার্য হিংসুক দেখুক আর জ্বলে পুড়ে মরুক।

হাসির ঢেউ উঠল। লোকেশের কথায় সবচেয়ে বেশী হাসলেন জ্যোতিপ্রসাদবাবু।

হাসতে হাসতে বললেন—আমাদের লোকেশের মনটি শরৎকালের আকাশের মতো, কোনো কিছুর দাগ পড়ে না তাতে। শুধু হাসছে।

খাওয়া শেষ হলো।

খাওয়ার পর বাড়ি ফিরতে মন্মথ মৃদু স্বরে লোকেশকে জিজ্ঞাসা করলে—লোকেশ, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সত্যি জবাব দিবি ?

লোকেশ হাসতে লাগল তার সেই বিটকেল হাসি। হাসতে হাসতে বললে—বল্ কি বলছিস বল ? এত 'সিরিয়াসলি' বলছিস কেন ? বলে ফেল !

তারপর একটু থেমে বললে—তুই কি জিজ্ঞাসা করবি, বলব ?

গভীর আগ্রহে মন্মথ বললে —বল তো, বল তো !

লোকেশ হাসতে হাসতে বললে —তুই জিজ্ঞাসা করবি, আমি তোকে খাবার সময় তুই বাড়ির কথা ভাবছিস, এটা বললাম কেমন করে ?

নির্জন আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে দুজনে চলছিল পাশাপাশি। লোকেশের কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল তার সামনাসামনি। বললে—এই কথাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। কি করে আমার মনের কথা অমন অনায়াসে বললি তুই ?

হাসতে লাগল লোকেশ, বললে—আমি যে ম্যাজিক জানি রে। 'থট রিডিং'-এর কথা শুনেছিস ? আমি সেই থট রিডিং জানি। বলে আবার হাসি।

হাসি থামিয়ে লোকেশ বললে—তুই এতে এত অবাক হচ্ছিস কেন ? আমি নিজেকে যেমন জানি তোকেও তো প্রায় সেই রকমই জানি রে ! কাজেই তুই কি ভাবছিস তা বলা কি আমার পক্ষে খুব শক্ত ? শক্ত নয়। আর এটা তুই কিছুদিন অভ্যাস কর, তুইও আমার সম্পর্কে বলতে পারবি। চল, অনেক রাত্রি হয়েছে।

আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে দুজনে হ্যারিসন রোডের মুখে এসে পড়ল। এবার মন্মথ যাবে পশ্চিমে হিন্দু হোস্টেলে আর লোকেশ যাবে পূর্ব দিকে, শেয়ালদা। মন্মথ বললে —আচ্ছা আয় ! বাড়ি থেকে ফিরে এসে দেখা করব।

লোকেশ বললে—কাল যাস না, পরশু যাস ! বলে সে আর দাঁড়াল না, লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল।

ধীরে ধীরে হিন্দু হোস্টেলের দিকে যেতে যেতে মন্মথ কেবল ভাবতে লাগল—এ কি থট রিডিং ? না তাকে খুব ভালো করে জানে বলে কথাটা বলতে পারলে লোকেশ ? কোন্‌টা ঠিক ? কিন্তু একটা কথা মন্মথ তো রবিবারে মানে আগামী কাল যাবার কথা বলেছিল ওদের, যদিও মনে মনে সে ঠিক করে রেখেছে যে কাল রবিবার দিন, গঙ্গাজলের সঙ্গে দেখা করে তবে যাবে। তা হলে ? সে কথাটা কি করে বললে লোকেশ ? তা হলে এই বলার, বলতে পারার অর্থ কি ?

ছেলেমানুষের মতো যে কল্পনাটি মন্মথ যৌবনের চতুরতা দিয়ে গত রাত্রি থেকে লালন করছিল সেটিকে একটা বাস্তব মূর্তি দেবার জন্য তার মন যেন এই কয়েক প্রহরের মধ্যে একান্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। সে কাল বাড়ি চলে যাবে। সে বাড়িতে থাকবার সময়ই তার এফ. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে। বাড়িতে থাকতে থাকতে যাতে পরীক্ষার ফলটা আগের বারের মতো তার কাছে বাড়িতে পৌছয় তার ব্যবস্থা করে যেতে চায় সে।

কিন্তু এই পরিকল্পনায় তাকে সাহায্য করবার মতো মানুষ, অসীম শক্তিসম্পন্ন ও বিচিত্র ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষ আছে মাত্র একজন। মাথার মধ্যে কল্পনাটি আসার সঙ্গে সঙ্গে মুখে সকৌতুক চাপা হাসি নিয়ে সে এসে কল্পনার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়েছিল। সে চপলা। সে সব পারে, যে একান্ত অসঙ্গত কাজও প্রবল জোরের সঙ্গে সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে করতে পারে। তারই দ্বারস্থ হতে হবে তাকে। একবার তার মনে লাগলে হয় তাহলে সঙ্গত অসঙ্গত যাই হোক না সে হাসিমুখে তা করার ভার নেবে। আর এ তো এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, অন্যায় কাজও নয়। চপলা বড়-লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ ; তাকে শুধু সে বলে যাবে পরীক্ষার ফলটা বের হলে যেন একটা টেলিগ্রাম অবশ্য অবশ্যই করে, পারলে আগের বারের মতো একজন লোক পাঠিয়ে খবর দেয়।

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সে প্রথম গেল চপলার শ্বশুরবাড়ি। রবিবারের দিন, সকাল-বেলা। বাড়িতে সকলেই আছেন। কাজেই সে বাড়ির ভিতর না গিয়ে রাস্তায় গেটের থেকে একটু দূরে দাঁড়াল। বাড়ির একজন চাকরের সঙ্গে দেখা হতেই সে তাকে শশব্যস্ত সম্মানে সম্মানিত করে বললে—চলুন বাড়ির ভেতরে চলুন। কর্তার সঙ্গে দেখা করবেন। কর্তা সেরেস্তাতেই আছেন। তবে ছোটবাবু আর ছোট বউ-রানী এই একটু আগে বাপের বাড়ি গেলেন। আজ সেখানে কে কে সব বড় বড় লোক আসবে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া আছে।

মন্মথ বললে—আমি যাই এখন।

একটু মিথ্যে কথা বলতে হলো তাকে। সে বললে—এইখানে এসেছিলাম এক জায়গায়। আরও এক জায়গা যেতে হবে। এখন আসি। কাল আবার বাড়ি যাব। তাই তাড়া আছে। কর্তাকে আমার প্রণাম দিয়ো, বলো আমি একদিন এসে প্রণাম করে যাব। আর ঠাকুমাকে, মানে বাবুর পিসিমাকেও প্রণাম দিও।

কেমন ?

সে আবার পথে নামল। উপায় নেই। তাকে আজ চপলাকে ধরতেই হবে। যেমন করে হোক ধরতে হবে। না হলে খেলাটা আর হবে না। সে বেশ জোর পায়ে হনহন করে হেঁটে এসে পৌছুল চপলার বাপের বাড়ির গেটের সামনে। সেদিন সে চপলাদের সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমেছিল আর আজ পায়ে হেঁটে একা আসতে হয়েছে। কাজেই গেটের মুখে দারোয়ান যে আটকাবে তা জানাই ছিল।

স্বাভাবিকভাবেই লিভারি-পরা দারোয়ান তাকে একবার আড়চোখে দেখেও দেখলে না। সে টুলের উপর বসে একমনে তামাক পাতা ডলছিল, সেই কাজেই অবিচল মনোযোগ দিয়ে সে নিজের গাম্ভীর্য আর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখলে।

মন্মথ এবার ডাকলে—দারোয়ানজী, একটু কাজ করতে হবে।

দারোয়ান তার দিকে একবার একটু গম্ভীরভাবে তাকালে, কোনো কথা বললে না। বাড়ির সামনে হাতায় বেশ কয়েকখানা জুড়ি গাড়ি, ল্যাণ্ডো দাঁড়িয়ে আছে!

সে এবার একটু গম্ভীরভাবে ডাকলে—এই শোন!

দারোয়ানের গম্ভীর মুখে একটু বিরক্তি ফুটে উঠল, কিন্তু তা সত্ত্বেও উঠে এলো সে!

মন্মথ একটু গম্ভীরভাবে বললে—চপলা দিদিমণি এসেছেন জামাইবাবুর সঙ্গে ?

দারোয়ান গম্ভীরভাবে বললে—হাঁ আয়া!

সঙ্গে সঙ্গে সে শশব্যস্ত হয়ে উঠল! বলল—হঠিয়ে হঠিয়ে! বলতে বলতে সে যথা-সম্ভব তাড়াতাড়ি গেটটা খুলে দিলে। গেটের দুটো পাল্লা প্রসারিত করে খুলে দিয়ে সে এক পাশে সরে দাঁড়াল।

মন্মথ একটু অবাক ও শশব্যস্ত হয়ে সরে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মস্ত দু'ঘোড়ায়-টানা জুড়িগাড়ি তার পাশ দিয়ে বিপুল বেগে হাতার ভিতর ঢুকে গেল। দারোয়ান সঙ্গে সঙ্গে সোজা খাড়া হয়ে জোড় পায়ে দাঁড়িয়ে শক্ত হয়ে সেলাম জানাল।

অবাক হলো মন্মথ। জিজ্ঞাসা করলে—কে এলো ?

দারোয়ানের মর্যাদা ততক্ষণে আরও বেড়ে গিয়েছে। সে গম্ভীরভাবে বললে—কই ভারী রইস আদমী!

মন্মথ বললে—তুমি এবার চপলা দিদিমণিকে একটা খবর দাও।

—কোউন্ খবর দিবো ? ভ্রূ কুঁচকে উঠল দারোয়ানের। বললে—আজ মুলাকাত

নহি হোগা। আজ তো দেখতা হ্যায়, বহত ভারী ভারী আদমী আয়া। আতা ভি হ্যায়। আজ সবলোগ কামমে হেঁ!

মন্মথ এবার ধমকের সুরে বলল—তা হোক। তুমি গিয়ে বল চপলা দিদিমণিকে যে গঙ্গাজল এসেছে।

দারোয়ান মুখ বিকৃত করে বললে—কেয়া?

মন্মথ অসহিষ্ণু হয়ে বললে— বুঝতে পারছ না? সমঝ্তা নহি? গঙ্গামাঈকে পানি জানতা হ্যায়? যা কর বলো গঙ্গাপানি আয়া হ্যায়।

দারোয়ান অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে বিমূঢ়ের মতো স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল, তারপর বিকট হাসি হাসতে লাগল। হাসি শেষ করে বললে—আপ গঙ্গাপানি? আচ্ছা!

বলে আবার হাসি।

ওদিকে মন্মথর চোখের সামনে তখন বিচিত্র ব্যাপার ঘটছে। জুড়ি গাড়িখানা প্রশস্ত হাতার ভিতরে বাগানের মধ্য দিয়ে চক্রাকার পথ বেয়ে ঘুরে গিয়ে যেই গাড়িবারান্দায় দাঁড়াল অমনি সিঁড়ি বেয়ে একদল লোক, তাঁদের পোশাক-আশাক থেকে মনে হলো তাঁরা সকলেই অভ্যাগত, তাঁরা সকলে সিঁড়ি দিয়ে প্রায় ছুটে এসে দাঁড়ালেন গাড়ির দরজার সামনে। যারা নামলেন তাঁদেরই একজন গাড়ির দরজা খুলে দিলেন সসম্ভ্রমে। কিন্তু যিনি নামলেন তাঁকে মন্মথ এতদূর থেকে ভালো করে দেখতে পেলে না। তাঁকে প্রায় মাঝখানে নিয়ে সকলে সিঁড়ি বেয়ে আবার বাড়ির ভিতরে উঠে গেলেন। গাড়িখানা গাড়িবারান্দা থেকে সরে গেল। মন্মথর সঙ্গে দারোয়ানও দেখছিল সমারোহ। এই সমাগম ও অভ্যর্থনার মধ্যে এমন কোনো সমারোহ ছিল যা এ বাড়িতেও সুলভ নয়। সেটা দারোয়ানের এই দৃশ্য দেখার ভঙ্গি থেকেই মন্মথ বুঝতে পারলে। মন্মথ দারোয়ানকে বললে—তাহলে যাও দারোয়ানজী।

—আচ্ছা ঠহরো। বলেগা তো, আপকা গঙ্গাপানি আয়া হ্যায়? আঁ? আচ্ছা! যেতে যেতে দারোয়ান ফিরে বলে গেল—দেখো, হিঁয়েই ঠহর্না! আভি এক দো গাড়ি আয়েগা!

দারোয়ান চলে গেল দ্রুতপদে, আবার ফিরে এলো আরও তাড়াতাড়ি অল্পক্ষণের মধ্যেই। বললে—চলা যাইয়ে সিধা। দিদিমণি খড়ী হ্যায় গাঢ়ীবরান্দেমে।

ঘোরানো রাস্তা বেয়ে মন্মথ গাড়িবারান্দায় পৌঁছে দেখলে গাড়ি বারান্দায় সিঁড়ির মাথায় চপলা মুখে সবিস্ময় হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে সে ছুটে নেমে এলো হাত বাড়িয়ে। বললে—ওমা, আমার কি ভাগ্যি! আমি কোথায়

যাব! তুমি এখানে এলে কি করে?

তারপর তার ডান হাতখানা ধরে টানতে টানতে চপলা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। মুখ ফিরিয়ে আবার বললে—কি করে তুমি খুঁজে পেলে আমাকে?

মন্মথ হাসিমুখে তাকে সন্ধানের পূর্ণ বর্ণনা দিলে। দিতে হলো তাকে। না দিয়ে তো নিস্তার নেই। বললে—তোমার ও বাড়িতে গিয়ে শুনলাম তোমরা দু'জনে এবাড়িতে এসেছ নেমন্তন্নে। তাই চলে এলাম।

—কি ব্যাপার?

মন্মথ হাসিমুখে বললে—ব্যাপার একটু আছে। ব্যাপারটা সামান্যই; তোমার কাছে তো সামান্যই বটে। আমার কাছে অবশ্য অসামান্য।

চপলা কিছু বলবার আগেই আরও একখানা ঘোড়ার গাড়িকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখা গেল। চপলা মন্মথ দু'জনেই থমকে গেল। পরমুহূর্তে চপলা বললে—ওই ঘরের মধ্যে চল। আবার কে এলেন যেন! আজ অনেক বড় বড় মানুষ আসছেন এখানে। এই একটু আগে সুরেনবাবু, মানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন। এখনি ওঁরা সবাই বেরিয়ে আসবেন অভ্যর্থনা করতে। চল, পাশের ঘরে চল বরং।

তারা দু'জনে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। পাশের ঘরে প্রায় ঘরজোড়া নিচু চৌকির উপর ফরাস। সেই ফরাসের উপর বসে বন্ধ জানলা দিয়ে ওরা তাকিয়ে রইল।

মন্মথ বিস্মিত হয়ে বললে—এর আগে যিনি এলেন তিনি সুরেন্দ্রবাবু? আরে বাস!

ইতিমধ্যে অভ্যাগতরা সবাই আবার ওদিক থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ালেন। চপলা ইঙ্গিতে আঙুল তুলে দেখিয়ে মৃদুস্বরে বললে—ওই যিনি মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মনে হচ্ছে, কাঁচা দাড়িগোঁফ, উনিই সুরেন্দ্রবাবু!

সবিস্ময়ে দেখছিল মন্মথ।

আবার একখানা জুড়ি এসে দাঁড়িয়ে গেল। এবার সুরেন্দ্রবাবু নিজে দরজা খুলে দিয়ে গাড়ির ভিতর যিনি ছিলেন তাঁকে আপ্যায়ন করে নামিয়ে নিলেন। হাত জোড় করে নমস্কার প্রতি-নমস্কার বিনিময় হলো। দেখে চপলা মৃদু স্বরে বললে—উনিই বোধহয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

আরও আশ্চর্য হলো মন্মথ। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র? বাবাঃ, কত বড় মানুষ! সহজে এলেন!

মন্মথ প্রশ্ন করলে—আজ কি ব্যাপার তোমাদের এখানে?

চপলা অন্য সময় যেন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলে অন্যের সম্পর্কে আজ কিন্তু সে রকমভাবে কিছু বললে না। আজ বেশ প্রগাঢ় সম্ভ্রমের সঙ্গেই বললে—কি জানি বাপু, কংগ্রেসের সব লীডাররা আসবে আজ। ওদের কি মিটিং আছে। জান, গত রবিবার এসে দেখলাম, বাবা, কাকা, পিসীমা সব খুব গম্ভীর হয়ে কথাবার্তা বলছেন। কি কি খাওয়ানো হবে, কোন্ ঘরে মিটিং হবে, কোথায় সব খাবার পরে বিশ্রাম করবেন এই সব কথাবার্তা।

তারপর চপলা বললে—চল, আমার ঘরে চল। তার আগে বরং ওর সঙ্গে একবার দেখা করে যাও। ও এখানেই কোথাও আছে। এই মিটিংয়ের ব্যাপারে বাবা-কাকাদের সঙ্গে আছে। চল তোমাকে মিটিংয়ের ঘরটা দেখিয়ে নিয়ে যাই।

সিঁড়ির পাশের যে ঘরে তারা বসেছিল সে ঘর থেকে বেরিয়ে মার্বেল-মোড়া চওড়া দরদালান ঘরে যেতে যেতে একটা বাঁক ফিরতেই দেখা হলো হৃদয়চন্দ্রের সঙ্গে। চপলার সঙ্গে মন্মথকে দেখে হৃদয়চন্দ্রের মুখখানি খুশীতে ভরে উঠল। সে কাছে এসে অতি মৃদু নিম্নস্বরে সমাদর করে বললে—এস এস ভাই, গঙ্গাজলবাবু। কিন্তু চপলার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে—তুমি এখানে এলে কেন?

চপলা স্বামীর প্রশ্নে আজ রাগ করলে না, একটু হেসে চাপা গলায় বললে—আমি না এলে, গঙ্গাজলকে এসব দেখাত কে? ওকে একবার মিটিংয়ের হলঘরটা দেখিয়ে দাও।

হৃদয়চন্দ্র বললে—পাশের এই জানলা থেকে একটু দেখে নাও। ওর ভেতরে তো যাবার উপায় নেই।

বলতে বলতে হৃদয়চন্দ্র একদিকের কোণের জানলার কাছে মন্মথকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে পাশে দাঁড়াল।

মস্ত লম্বা হল ঘর। মার্বেলমোড়া সমস্ত মেঝেটা জুড়ে দামী গালচে পাতা। তার উপরে মেহগনি কাঠের অতি উজ্জ্বল কালচে রঙের সায়েববাড়ির টেবিল লম্বালম্বি পাতা। তার চারিপাশে সাহেববাড়ির তৈরি রাঙা ভেলভেটের কুশন-আঁটা একই রকমের চেয়ার পাতা। সেই চেয়ার আলো করে দেশের বিশিষ্ট মানুষরা সব বসে আছেন।

মন্মথ জিজ্ঞাসা করলে—কত লোকের বসার চেয়ার রয়েছে? পঞ্চাশ জন?

হৃদয়চন্দ্র হেসে বললেন—না হে, এপাশে চাল্লশ, ওপাশে চাল্লশ, এই আশ আর দু'মাথায় দু'খানা। মানে বিরাশি জনের বসার জায়গা রয়েছে। তা এসেছেন এখনও পর্যন্ত জনা পঞ্চান্ন। আরও আসবেন সব। বোম্বে-ম্যাড্রাস থেকেও এসে-

ছেন এক আধজন।

বলে হৃদয়চন্দ্র বললে—ওই দেখ, মাঝখানে রাজনারায়ণবাবু রয়েছেন, তার দু'খানা চেয়ার বাদ দিয়ে সুরেন্দ্রবাবু, বেঙ্গলীর এডিটার, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র। তারপর তার পিঠে হাত দিয়ে বললে—চল, আমরা ওপরে যাই। তোমার সঙ্গে একটু গল্প করে আসি। এখন আমার কোনো কাজ নেই।

তারপর আবার অনেক ঘুরে মস্ত চওড়া মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় সেই আগেরবারের ড্রইংরুম পার হয়ে একখানা ঘরে এসে ঢুকল তারা।

একটা কৌচে আরাম করে বসে হৃদয়চন্দ্র বললে—বস ভাই, আরাম করে। তোমার গঙ্গাজল এসে যাবে এখুনি।

বলতে বলতেই চপলা এসে ঘরে ঢুকল। বললে গঙ্গাজল—গঙ্গাজল, দুপুরবেলা খেয়ে যাবে তুমি!

মন্মথ বিব্রত হয়ে বললে—কাল আমি বাড়ি যাব যে। কাজেই আমাকে সকাল সকাল ফিরতে হবে। গোছগাছ করতে হবে না?

এইবার তার স্বভাবমতো ধমক দিলে চপলা—কি এত গোছগাছ করতে হবে? কিছু করতে হবে না। আমি পিসিমাকে বলে এসেছি। আর কি এদিক-ওদিক করা যায় তার? তোমরা বস, আমি জলখাবার নিয়ে আসি। উনিও জল খান নি সকাল থেকে।

চপলা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। মন্মথ জিজ্ঞাসা করলে—আজ কিসের মিটিং? হৃদয়চন্দ্র বললে—কংগ্রেসের সাবজেক্ট কমিটির মিটিং। আসছে মিটিংয়ে কি কি বিষয় আলোচনা হবে তারই একটা প্রাথমিক আলোচনা হবে আর কি!

মন্মথ শুনবার জন্য তার মুখের দিকে উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে দেখে হৃদয়চন্দ্র উৎসাহিত হলো। বললে--জান ভাই গঙ্গাজলবাবু, ইংরেজ বিদেশ থেকে, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এখানে এসে রাজ্য পেতেছে, আমাদের শাসন করছে। তাদের মনোভাবটা এমন যে তারাই শুধু মানুষ আর আমরা মানুষ নই, কোনো চার পা-ওয়ালা প্রাণী। কাজেই তারা তাদের দেশে যে অধিকার ভোগ করে, আমরা এখানে তা পাবার যোগ্য নই। সেইখানেই কংগ্রেসের প্রতিবাদ। কাজেই কংগ্রেস এমন সব জিনিস চাইছে, এমন সব অধিকার আমাদের এখনই দরকার যা পেলে আমরা খানিকটা মানুষের মধ্যে গণ্য হব। কংগ্রেসের বিভিন্ন দাবির মধ্যে প্রথম আমাদিগকে সেণ্টার আর প্রভিন্স দু'জায়গাতেই কাউন্সিল তৈরি করে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে সেই সঙ্গে যে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল রয়েছে তা উঠিয়ে দিতে হবে। দেশের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা, সেই সঙ্গে টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রসার

চাই। আমাদের দেশের লোকেদের মিলিটারি এডুকেশন দিতে হবে, আর সামরিক খাতে খরচা কমাতে হবে। একসিকিউটিভ আর জুডিসিয়ারি তফাত করতে হবে, পৃথক করতে হবে। ইংল্যাণ্ডে যে রকম, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হয়, ভারতবর্ষেও সেই রকম বিভিন্ন সার্ভিস পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই তো গঙ্গাজলবাবু, তোমার মতো স্টুডেণ্ট, তুমি যদি আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে চাও তাহলে তুমি সম্ভবত অনায়াসে পাস করে যাবে। কিন্তু পরীক্ষাটা যদি বিলেতে দিতে হয়, তোমার তো যাওয়া হবে না। তোমার যাওয়ার ক্ষমতাও নেই পয়সা খরচ করে. আর তুমি গেলেও তুমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে, তোমাকে সমাজে পতিত্ত করবে। কেমন কি না?

মন্মথ হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। বুকের ভিতর একটি সম্পূর্ণ নূতন কামনা নূতন চেহারা নিয়ে ফুটে উঠল।

আই. সি. এস. হলে তো মন্দ হয় না! সে তো ভালই হয়। স্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান; সে তো সহজ কথা নয়। এই কিছুদিন আগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীক বাবু'র অভিনয় দেখতে গিয়েছে সে অভিনয়ের দৃশ্য-বিরতির অবসরে সবাই যেন মধ্যে মধ্যে একটা বিশেষ দিকে তাকিয়ে বিশেষ একজনকে লক্ষ্য করছিল। সে সেটা লক্ষ্য করে সকলের দৃষ্টি অনুসরণ করে দৃষ্টি প্রেরণ করেও সেই বিশেষ দ্রষ্টব্যকে দেখতে পায় নি। সে চুপি চুপি সত্যকে প্রশ্ন করেছিল—সবাই কাকে অমন করে দেখছে রে?

সত্য হেসে বলেছিল—তুইও দেখ, দেখলেই বুঝতে পারবি।

—দেখলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম না। সবাই ওই প্রথম সারির ওই কোণার দিকে চাইছে।

সত্য হেসে বলেছিল—তুই বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তুই ঠিকই বুঝেছিস! তা দেখনা, ওখানে কে রয়েছে।

—একজন খুব ফরসা, একেবারে সায়েবদের মতো ফরসা, পাতলা লম্বা ভদ্রলোক, মুখে অল্প অল্প দাড়ি, বসে আছেন। ওঁকেই সবাই দেখছে না কি?

সত্য আবার হেসে বলেছিল—হ্যাঁ, সবাই আজ ওঁকেই দেখছে। উনি কে জানিস?

—না তো!

—উনি মহর্ষির মেজ ছেলে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতবর্ষে ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম স্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান। সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছেন। ক'দিন থেকেই আবার নিজের কাজের জায়গায় ফিরে যাবেন।

সত্যর কথা শুনে মন্মথ তাঁকে আবার একবার ভালো করে দেখেছিল। কিন্তু সেই আলোকজ্জ্বল সমারোহের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত, সকলের দৃষ্টির লক্ষ্য মানুষটির কৃতিত্বকে মনে মনে অনুসরণ করবার মতো কল্পনার সাহস তার হয় নি। আজ হৃদয়চন্দ্রের কথা শুনে সেদিন যে কল্পনা করতে সে সাহস করে নি সে সহজেই করতে পারলে। সত্যই তো এখানে যদি সে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার সুযোগ পায় সে পরীক্ষা সে অনায়াসেই পাস করতে পারবে; চাই কি ফার্স্ট হওয়াও অসম্ভব নয় কিছু তার পক্ষে।

সে হৃদয়চন্দ্রের মুখের দিকে হাসি হাসি মুখে যতক্ষণ তাকিয়ে ছিল ততক্ষণে সব ছবিটা নূতন কামনার রক্তিম রঙে রঞ্জিত হয়ে মনের উপর দিয়ে পার হয়ে গেল।

এই সময় চপলা ঘরে ঢুকল জলখাবার নিয়ে। সোফার কৌচের সামনে ছোট টেবিলের উপর খাবার রুপোর থালা দুটি নামিয়ে দিলে। পিছনে পিছনে চাকর এসে রুপোর গ্লাসে জল রাখলে টেবিলের ওপর।

চপলা একটু কৈফিয়তের সুরে বললে—আমার কিন্তু আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। পিসিমা লক্ষ্মীর ঘর খুলেছিলেন রুপোর থালা, বাটি গেলাস বের করতে। তাই পিসিমার সঙ্গে থেকে তাঁকে সাহায্য করছিলাম। চৌষট্টি জন অতিথি, বাবামশাই, কাকামশাই, এখানে তোমরা দু'জন আর দাদাভাই থেকে ছেলেরা চারজন, এই তোমার বাহত্তর জন। এই বাহাত্তর জনের জন্যে বাহাত্তরখানা রুপোর থালা, পাঁচটা করে তিনশো ষাটটা রুপোর বাটি, বাহাত্তরটা রুপোর গেলাস—সব পিসিমার সামনে গুণে গেঁথে রান্নাশালার মুহুরীবাবুকে জিম্মা করে দিয়ে এলাম। তাই একটু দেরি হলো। চাকররা এখন সব বাসন পরিষ্কার করতে নিয়ে গেল।

মন্মথ মনে মনে বিস্ময় অনুভব করছিল এদের ঐশ্বর্যের পরিমাণ দেখে সে জলখাবার খেতে খেতে সবিস্ময়ে ছোটছেলের মতো প্রশ্ন করে বসেছিল—আচ্ছা, কত জনকে খাওয়ানোর মতো রুপোর বাসন আছে এ বাড়িতে?

হৃদয়চন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল মন্মথ। সেই জন্য হৃদয়চন্দ্র বললে—ভাই গঙ্গাজলবাবু, তোমার এ প্রশ্নটা, বিশেষ করে আমাকে এ প্রশ্ন করাটা একেবারে ছোটছেলের মতো হলো!

সে আরও অবাক হয়ে বললে—কেন?

হৃদয়চন্দ্র হেসে বললে—এটা আমার শ্বশুরবাড়ি ভাই! কোনো জামাই কি শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির খোঁজ রাখে না রাখা উচিত? তুমি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তুমিই বল!

মন্মথ লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলে, হাসল লজ্জিতভাবে।

চপলা মুখ ভার করে বললে—আহা, কথা শোন না! কি ঢঙের কথা! আমি বলছি ভাই গঙ্গাজল! আমিও অবিশ্যি সঠিক জানি না! কারণ বড় হয়ে বেশ জ্ঞান হবার আগেই তো নিজের বাপের বাড়ি ছেড়ে অন্য লোকের বাড়িতে বউ সেজে ঢুকেছি। তবে যা শুনেছি তাতে চার শো, সাড়ে চারশো লোককে ওই রকম-ভাবে খাইয়ে দেবার মতো পুরো রুপোর বাসন আছে। পাঁচ সাতজনকে খাওয়া-বার মতো সোনার বাসনও আছে শুনেছি।

মন্মথর চোখ বড় বড় হয়ে উঠল—সোনার বাসন?

চপলা হেসে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। সে হাসির আড়ালে পিতৃগৃহের ঐশ্বর্য সম্পর্কে অহংকার প্রচ্ছন্ন রইল না। সে হেসে বললে—হ্যাঁ গো? আমার বিয়ের পর আমার শ্বশুর ভাশুর আর ওঁদের জামাই, এই বাবুকে সোনার বাসনে খাইয়েছেন। তারপর নতুন জামাই হয়ে বাবু যখন জামাই ষষ্ঠীর সময় এসেছিলেন প্রথমবার সেবারও বাবুকে এঁরা সোনার থালায় খাইয়েছেন। জিজ্ঞেস কর না, ওই তো সামনেই বসে আছে।

হৃদয়চন্দ্র হেসে বললে—অস্বীকার করার উপায় নেই ভাই। এ বাড়িতে দু-চার বার সোনার বাসনে খেয়েছি। কিন্তু তোমাকে সত্যি বলছি ভাই, তাতে ভাত বেশী মিষ্টি লাগে নি।

চপলার মুখ ভার হয়ে উঠল। সে বললে—কথা শুনছ গঙ্গাজল! সোনার থালায় বুঝি ভাত বেশী মিষ্টি লাগে? না লাগবার জন্যে কেউ খেতে দেয়? খেতে দেয়া খাতির করবার জন্য? না কি তুমি বল!

এর পরে কথাবাতা কোন্ দিকে বইতো তা বলা কঠিন, কারণ তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে চপলার অনির্দিষ্ট মেজাজের উপর। তবে মন্মথ আজকাল লক্ষ্য করেছে চপলা স্বামীর সঙ্গে আর ঝগড়া-ঝাঁটি করে না। এখন তাকে বেশ প্রবলভাবে স্বামী-অনুরাগিণী ও যথেষ্ট প্রিয়বাদিনী বলা চলে। তার উপর মন্মথ উপস্থিত থাকলে সে মাধুর্য ও অনুরাগ আরও ঘন হয়; তার কারণটাও মন্মথ মনে মনে অনুমান করতে পারে। মন্মথ সেই সুতো যাকে অবলম্বন করে ওদের দু'জনের জীবন নবীন অনুরাগে আসক্তিতে মিছরির দানার মতো দিনে দিনে জমে উঠছে। তা সত্ত্বেও চপলার কোন্ কথার উত্তরে হৃদয়চন্দ্র কি রসিকতা করে অথবা কি বলে আবেগকে কোন্ দিকে বয়ে নিয়ে যেত তা কে বলবে?

কিন্তু তাতে বাধা পড়ল। একজন চাকর এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

সেটা প্রথমেই নজর পড়েছিল হৃদয়চন্দ্রের। সে জিজ্ঞাসা করল—কি রে?

চাকর সসংকোচে নিবেদন করলে—আজ্ঞে, বড় বাবুমশাই ডাকছেন আপনাকে। বললেন, যদি আপনি খুব ব্যস্ত না থাকেন তাহলে একবার যেতে।

হৃদয়চন্দ্র উঠে দাঁড়াল। বললে—চল, যাচ্ছি। বল গিয়ে যাচ্ছি।

চাকরটি সন্ত্রস্ত পায়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। এ বাড়িতে চাকরদের সব সময়েই বড় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। এখানে আবহাওয়া সত্যদের বাড়ির মতো নয়। এখানে পান থেকে চুন খসলে কথায় কথায় অপমান তো আছেই, ক্ষেত্র বিশেষে কর্তারা প্রহার করতেও কুণ্ঠা করেন না। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাপ বা অপরাধ হয়েছে কি না তার বিচারও হয় না এবং সব সময়ে লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়ে থাকে।

হৃদয়চন্দ্র বললে—তুমি বস ভাই গঙ্গাজলবাবু, তোমার গঙ্গাজলের সঙ্গে কথা বল। আমি ঘুরে আসি। বুঝতে পারছি অতিথিদের কোনো কিছু দরকার পড়েছে, মুশ-কিল আসান করতে হবে।

হৃদয়চন্দ্র বেরিয়ে গেল। চপলা স্বামীর পরিত্যক্ত কৌচে বেশ মৌজ করে বসে প্রশ্ন করলে—তারপর, কি ব্যাপার বল তো! তুমি যে আজ নিজে থেকে এসে অবাক করে দিলে গঙ্গাজল!

মন্মথ একটু হাসল। বললে—তা বটে। একটু দরকার আছে তোমার কাছে।

চপলা খুব খুশী হয়ে হেসে বললে—বল! আমার কি ভাগ্যি!

মন্মথ বললে—যা বলব তা কেবল তোমাকেই বলতে পারি কলকাতা শহরে। আর তা করার ক্ষমতাও তোমার আছে।

চপলা অসহিষ্ণু হয়ে বললে—অত ভণিতা করতে হবে না তোমাকে। বলতো কি করতে হবে।

—আমি কাল বাড়ি যাচ্ছি। বাবার জন্যে, বাড়ির জন্যে ক'দিন থেকেই মন কেমন করছে। বাড়ি গেলে ক'দিন থাকতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে ফেরা হবে না। অথচ এরই মধ্যে আমার এফ. এ.-র রেজাল্ট বের হবে তা রেজাল্ট বের হলে খবরটা আমাকে আগের বার যেমন দিয়েছিলে তেমনিভাবে সঙ্গে সঙ্গে একটা টেলিগ্রাম করে খবরটা দিতে হবে। আর তারপর পারলে, আগের বারের মতো একজন লোক পাঠিয়ে দিও।

চপলা হেসে ভেঙে পড়ল—ওমা, এই কথা! এ আবার কাজ নাকি? নিশ্চয়ই করব। কিন্তু একটা কথা—ফার্স্ট হতে পারবে তো? সেবার ফার্স্ট হয়েছিলে বলে সবাইকে বলে বেড়িয়েছিলাম। আমার খুশী দেখে পিসীমা শুধু টেলিগ্রামই করান নি, একজন লোক পাঠিয়েও খবর দিয়েছিলেন।

মন্মথ একটু হাসল। বললে—পরীক্ষার ব্যাপার, ওতে ভাগ্য আছেই। কাজেই

সঠিক কি কিছু বলা যায়? তবে পরীক্ষা তো খারাপ দিই নি, ভালই দিয়েছি। ফার্স্ট হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। তবে ফল যাই হোক একটা খবর দিও, আর পারলে একজন লোক পাঠিও।

—নিশ্চয়। নিশ্চিন্ত থাক তুমি। ফল যাই হোক, টেলিগ্রামও করব, লোকও পাঠাব। আর তুমি ফার্স্ট হলে আমি তোমার গঙ্গাজলবাবুকে নিয়ে নিজে যাব তোমাদের বাড়ি।

মন্মথ ভয় পেয়ে গেল। এই হলো আসল চপলা। কি পারে কি না পারে ও, তা বলা খুব কঠিন। ওর মন ও আবেগ উদ্দীপ্ত হলে ও সব পারে। কোনো বিবেচনা তখন থাকে না ওর সামনে, ভালো-মন্দ, সঙ্গত-অসঙ্গত কিছুই বিচার করবে না, সে হাসিমুখে সে কাজে এগিয়ে যাবে। তাই ওর পক্ষে স্বামীকে নিয়ে, কি স্বামীকে বাদ দিয়ে ওর বাড়ি চলে যাওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। সে তাই শশব্যস্ত হয়ে বললে

—আরে না, না, তোমাকে যেতে হবে না সেখানে। তুমি যেন যেয়ো না!

প্রতিবাদ হতেই চপলা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। চটে উঠে বললে—যাব না? কেন যাব না? নিশ্চয় যাব।

মন্মথ তাকে বুঝাবার চেষ্টা করে বললে—তুমি সেখানে যাবে কোথায়? সে কি একটা যাবার জায়গা! সেখান পর্যন্ত গাড়ি যাবে না তোমার। তুমি পৌঁছুবে সেখানে কি করে? আর তুমি গেলে তোমাকে থাকতে দেব কোথায়, বসতেই বা দেব কোথায়? আমার গরীব বাবা-মা ভয়ে দুশ্চিন্তায় সারা হয়ে যাবে, খুব বিব্রত হবে।

চপলা একটা হাতের ঝটকা দিয়ে যেন সব অসুবিধাকে তাড়িয়ে দিয়ে, উড়িয়ে দিয়ে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা, আগে তো তোমার ফল বের হোক তখন ও সব ভেবে দেখব।

মন্মথ বললে—সত্যরাও হয়তো একটা টেলিগ্রাম করবে। কিন্তু সত্য নিজেও তো পরীক্ষা দিয়েছে। ধর কোনো কারণে ওর ফল যদি ভালো না হয় তখন ওদের টেলিগ্রাম করার মন নাও হতে পারে! তাই তোমাকে বলে যাচ্ছি।

চপলা এবার একহাতের বদলে দু'হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে—হ্যাঁ রে বাবা, আচ্ছা। ফল বের হলে আমি তোমাকে টেলিগ্রাম করব, একজন লোকও পাঠাব নিজে যাব না। কেমন হয়েছে তো? কি ছেলেরে বাবা। তোর বাড়ি গিয়ে আমি কি সব খেয়ে দিয়ে আসব না কি?

চপলার আবেগ তাকে 'তুমি' থেকে 'তুই'তে পৌঁছে দিয়েছে। মন্মথ হেসে বললে —আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। এবার এ কথায় ক্ষান্ত দাও তো। তারপর প্রসঙ্গ

পরিবর্তন করবার জন্য সে চপলাকে বললে—গঙ্গাজল, আমার একটা কথার জবাব দেবে।

—কি বল, বলে ফেল। দেখি, জবাব দিতে পারলে দেব।

—ওই যে জামাইদাদা বললেন, সোনার থালায় ভাত বেশী মিষ্টি লাগে না ভাই, এ কথাটা কি সত্যি ?

তার কথা বলার ধরন দেখে চপলা একটু আশ্চর্য হলো। মন্মথ একথা বলে ঠিক কি জিজ্ঞাসা করতে চাইছে তা সঠিক না বুঝতে পেরে সে মন্মথর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মন্মথ তার প্রশ্নটা বিস্তৃত করে বললে—সোনার থালায় তো কখনও খাই নি। সোনার থালায় খাওয়া দূরে থাকুক, সোনার থালায় যে খাওয়া যায় তাও ভাবি নি কোনো দিন। গরীব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে, লেখাপড়ায় খানিকটা ভালো বলে তোমরা আদর কর, যত্ন কর।

তার কথা শুনে চপলা হঠাৎ তার একখানা হাত চেপে ধরে বললে—সোনার থালায় খাবে আজ ?

শুনে মন্মথ শশব্যস্ত ও বিব্রত হয়ে হাঁ হাঁ করে উঠল—আরে, আরে, পাগল বলে কি ? তাহলে আমি না খেয়ে এখুনি পালিয়ে যাব। আমায় আটকে রাখতে পারবে না।

চপলা হেসে বললে—বেশ, বেশ, তোমাকে সোনার থালায় খেতে হবে না বাপু! তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে—বামুন পণ্ডিতদের ধারাধরনই অমনি। যাতে সবারই মান-খাতির বাড়ে তাতেই তাঁরা মনে করেন তাঁদের মান গেল।

—কেন একথা বলছ গঙ্গাজল ?

চপলা হেসে বললে—একটা কথা মনে পড়ে গেল। এই বছরখানেক আগে ঠিক এমনি ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের এই বাড়িতে।

—কি ঘটনা ?

—পিসীমার এক গুরু এসেছিলেন ত্রিবেণী থেকে খুব বড় পণ্ডিত আর সাধক।

—ত্রিবেণী থেকে ? একটু কৌতূহলবশতই জিজ্ঞাসা করেছিল মন্মথ। তার পর কৌতূহলী প্রশ্ন করেছিল—কি নাম বলতো পিসীমার গুরুর ?

মন্মথর কথা ও অনুমানই সত্য হলো। যে নাম মন্মথ শুনতে চাচ্ছিল সেই নামটিই শুনলে সে। গুরুর নাম মহামহোপাধ্যায় রামরাম স্মৃতিতীর্থ।

মন্মথ একটু হাসল। প্রশ্ন করলে—তারপর ?

চপলা বলতে লাগল—ঘোড়ার গাড়ি গিয়েছিল ত্রিবেণী তাঁকে আনতে। তিনি

এলেন সেই গাড়িতে। তারপর কি আদর যত্ন, আর কি ধুম সারা বাড়িতে। দুপুরবেলা খুব আদর করে সবচেয়ে দামী গালচের আসন পেতে তাঁকে বসানো হলো তাতে। তারপর সোনার থালায় ভাত সাজিয়ে পিসীমা নিজে দু'হাতে করে পাঁচটা সোনার বাটি সোনার থালায় বসিয়ে এনে থালা সামনে নামিয়ে দিলেন। দেখেই ভট্‌চাজমশায় ভুরু কুঁচকে বললেন—এ কিসের থালা মা? আমাকে খেতে দিয়েছ? এত চকচক করছে কেন?

পিসীমা খুব বড় মুখে হাসি হাসি ভাবে জবাব দিলেন—এ সোনার থালা।

— সোনার থালা? আমাকে সোনার থালায় কেন খেতে দিয়েছ মা! আমি গরীব ব্রাহ্মণ, কুশাসনে বসি, কলার পাতায় খাই। তোমরা রাজা লোক, তোমাদের অনেক সম্পদ, অনেক ধন-দৌলত এ তো জানা কথা, সবাই জানে। কিন্তু আমাকে তা বিশেষভাবে জানাবার তো দরকার ছিল না মা!

জান ভাই গঙ্গাজল, আমার পিসীমার মতো মানুষ, তিনিও ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন।

ভট্‌চাজমশাই বললেন, পিসীমার ভয় ভাঙাতে হেসেই বললেন—আর তাছাড়া মা, তুমি আমার কাছে যে আশ্রয়ের জন্য আমার পায়ে মাথা রেখেছ, সে তো এই সব পার্থিব সম্পদের বিনিময়ে পাবার ধন নয় মা! সব সম্পদ, সম্পদের সকল অভিমান ত্যাগ করে তবে তার সন্নিকটস্থ হওয়া যায়। তুমি আমাকে এ থালা বদ্‌লে কলার পাতায় খেতে দাও মা! খেয়ে আমারও তৃপ্তি হবে, তোমারও কিঞ্চিৎ বোধ হবে।

পিসীমা তো সঙ্গে সঙ্গে সোনার থালা বদ্‌লে কলা পাতায় ভাত দিয়ে বাঁচে।

তিনি খেতে বসে বেশ হাসতে হাসতে জমিয়ে গল্প করতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন—একটা গল্প বলি মা, শোন। এ আমার জীবনের ঘটনা নয়, আমার পিতামহের জীবনের ঘটনা। তা ধর তোমার আশি একশো বছর আগের কথা। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে তাঁর অনেক প্রভাব ছিল। তখনকার দিনের চন্দননগরের ফরাসী সরকারের দেওয়ান,—তাঁর নামটা আর করব না, তাঁদের বংশের সঙ্গে তোমাদেয় চেনা-জানা থাকতে পারে—তিনিও গুরুর মতো সম্মান করতেন আমার পিতামহ শ্রীধর ন্যায়বাগীশকে! তিনি একবার সোনার থালায় সিধে সাজিয়ে, সঙ্গে রেশমের থলিতে একশো স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন পিতামহের কাছে। পিতামহ সে মূল্যবান সিধে স্পর্শ করেন নি, ফিরে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এ তো বাপু নিতে পারব না। তোমাদের কর্তা চৌধুরী মশায়ের পতিতা-সংসর্গ আছে।

জান গঙ্গাজল, আমি সেখানে ছিলাম। গল্পটা বলে তিনি একটু হেসে বললেন আমার পিসীমাকে—মা, তোমার বোধহয় এখন মনে হচ্ছে, এ গরীব বামুন বড়-লোকি দেখাচ্ছে। তা যদি মনে কর মা, তবে তাই। আমার তো ওইটুকুই সম্বল! আর যদি মনে কর, আমি দম্ভ প্রকাশ করছি, তা হলেও অসঙ্গত বলব না। খানিকটা দম্ভ এর মধ্যে আছে। আসল কথা কি জান মা, মানুষের এই মনকে সব সময় সচেতন রাখতে হয়। ছোট ছেলেদের যেমন কখনও শাসন করে, কখনও আদর করে বশে রাখতে হয় তেমনি আর কি! তোমাদের এখানে রাশি রাশি ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য যেন চারিদিকে রাজ-সম্পদের মতো ছড়ানো রয়েছে। এখানে এই ঐশ্বর্য সম্পদের মাঝখানে বসে এই ঐশ্বর্যের আস্ফালন আর ছটায় যে কোনো লোকের মাথা নিচু হয়ে যাবে, মন ভয় পাবে, লুব্ধ হবে। আমিও তো মানুষ মা। আমিই বা এর ব্যতিক্রম হব কি করে? তাই নিজের মনকে শাসন করবার জন্য, তার লোভ তাড়ানোর জন্য, আর ভয় ভাঙাবার জন্য গল্পটা করলাম; তোমাদের শোনানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শোনালাম। নিজে সোনার থালা উঠিয়ে কলা-পাতায় খেলাম।

বুঝলে গঙ্গাজল, তাঁর বুড়োসুড়ো চেহারা। কিন্তু যখন হেসে হেসে কথা বলছিলেন তখন তাঁকে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল একটা দশ বছরের ছেলে হড়বড় করে আপনার মনের সব কথা বলে যাচ্ছে। অথচ সে তো ঠিক ছেলেমানুষও নয়। তার সঙ্গে আর কিছু আছে, যা পেলে মন বড় শান্তি পায়, অকারণে আনন্দ হয়। আমি তো দেখলাম আমার পিসীমা, কি ভীষণ জেদী আর দাম্ভিক মানুষ, পিসীমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কোনো কারণ নেই জল পড়ার, তবু চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বাবা-কাকার চোখও দেখলাম জলে ছলছল করছে। মা-কাকীমারও সেই অবস্থা। বিকেলবেলা যখন তিনি গাড়ি চেপে ত্রিবেণী ফিরে গেলেন তার আগে বাবা-কাকা ওঁর পা ধরে বললেন—আমাদের দীক্ষা দিন! তা ভট্চাজ মশায় ওঁদের দু'জনের মাথায় হাত দিয়ে চুলগুলো ছোটছেলেকে আদর করার মতো এলোমেলো করে দিয়ে বললেন—সময় হলেই দীক্ষা হবে! ভাবনা কি? আমিই দীক্ষা দেব। তবে এখনও সময় হয় নি। বলে দু'জনের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—বোধহয় ভাবছ, এ বুড়োর তো আশির ওপর বয়স হয়েছে। কবে মরে যাবে·· তা বলি শোন বাবা, তোমাদের দীক্ষা না দিয়ে আমি মরব না। আমি তোমাদের দীক্ষা দিয়ে যাব।

মন্মথ হাসতে লাগল কথাগুলি শুনে।

চপলা ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে—হাসছ কেন বলতো?

মন্মথর হাসি বেড়ে গেল। সে বললে—তুমি যার কথা বললে এতক্ষণ আমিও যে তাঁকে চিনি!
প্রচুর উৎসাহিত হয়ে চপলা তার হাত চেপে ধরে বললে তুমি চেন রামরাম ভট্-চাজ মশায়কে? কি করে চিনলে?
মন্মথ একটু মুচকে হেসে বললে—উনি বছর দুয়েক আগে একবার আমাদেরবাড়ি গিয়েছিলেন। নিজে থেকে গিয়েছিলেন।
আশ্চর্য হয়ে চপলা প্রশ্ন করলে—নিজে থেকে? কেন?
—আমাকে আশীর্বাদ করতে গিয়েছিলেন?
—ওমা, তাই নাকি? কেন?
—আমার এণ্ট্রান্সের খবর শুনে আমাকে দেখতে আর আশীর্বাদ করতে গিয়েছি-লেন। আর—
চপলা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রশ্ন করলে—আর কি?
এবার মন্মথ ছোটছেলের মতো হেসে ভেঙে পড়ল। হাসতে হাসতে বললে—তুমি স্মৃতিতীর্থ মশাইকে যতটা বুদ্ধিহীন ভাবছ তা উনি ন'ন। নির্লোভ ব্রাহ্মণ ঠিকই তবে বুদ্ধিসুদ্ধিও আছে!
কথাটা চপলার খুব একটা পছন্দ হলো না। সে বললে—এমন করে কথা বলছ কেন?
মন্মথ গম্ভীর হয়ে বললে- বলছি, প্রমাণ পেয়েছি বলে!
—কি, ওঁর বুদ্ধির প্রমাণ? কি রকম বলতো?
—সে বলে কি হবে?
চপলা জেদ ধরে বসল। মুখ ভার করে তাকে বললে— কেন বলবে না? ওঁর নিন্দে করবে অথচ নিন্দের কারণ গোপন করবে এটা কি ভালো হয়?
মন্মথ এবার কথাটা বলে ফেললে—উনি আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন ওঁর নাত-নীর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে। ওঁর দৌহিত্রীর সঙ্গেআমার বিয়ে হবে।
চপলার মতো মেয়েও কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর একান্ত আনন্দে খুশী হয়ে বললে—ওমা, তাই নাকি?
পরমুহূর্তেই সে কৌচ থেকে লাফিয়ে উঠল। বললে—যাই, পিসীমাকে বলে আসি!
সঙ্গে সঙ্গে কৌচ থেকে লাফিয়ে উঠে, ছুটে গিয়ে দু হাতে দরজা আগলে মন্মথ বললে—এই দেখ, তুমি একেবারে পাগল গঙ্গাজল। এই কথা পিসীমাকে বলে?
বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে চপলা বললে—কেন, তাতে দোষের কি হলো?
—দোষের নয়? আচ্ছা, মেনে নিলাম দোষের নয়? কিন্তু তুমি আমার মুখ থেকে

কথাটা শুনে পিসীমাকে বলবে, সেটা লজ্জার হবে না ?

—লজ্জা ? লজ্জাই বা কিসের ?

—কি মুশকিল ; আমার লজ্জা লাগবে। তোমাকে হাত জোড় করে মিনতি করছি, এ কথা বাড়িতে কাউকে বোলো না !

চপলা মেনে নিলে—আচ্ছা বলব না।

তারপর আবার ফিরে এসে কৌচে বসতে মন্মথ নিশ্চিন্ত হলো।

পা দোলাতে দোলাতে চপলা বললে—কনে ঠাকুরমশায়ের কি রকম নাতনী ?

—মেয়ের মেয়ে।

—কনেকে দেখেছ ?

—ছিঃ, বিয়ের আগে বুঝি কেউ নিজের কনে দেখে ?

চপলা মুখ মুচকে হেসে বললে—দেখে না বুঝি ? তা হবে। বলে চুপ করে গেল। তারপর বললে—কনের বয়স কত ?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্মথ বললে—কে জানে কত বয়েস! হবে দশ এগারো। কচি খুকি তো এখনও।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিয়ে চপলা হাসিতে ভেঙে পড়ল। মন্মথ অবাক হয়ে গেল, এর ভিতর চপলা হাসির কোন্ খোরাক পেলে? ওর সবই অবশ্য আলাদা রকম। চপলা কিন্তু তখনও হেসে কুটি কুটি। একদিকে সে হাসছে অন্যদিকে এক হাত দিয়ে সে চোখের জল মুছছে। হাসি কমিয়ে সে বললে—কচি খুকি! কি বললে, কচি খুকি! কচি খুকিতে বুঝি মন উঠছে না ? তাই—

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সে গম্ভীর হয়ে চুপ করে গেল। দুই চোখের পাশে যে জল তখনও লেগেছিল সেই জল সে সযত্নে মুছতে লাগল কাপড়ের খুঁট দিয়ে। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, তোমার তার খবর কি ?

অবাক হয়ে গেল মন্মথ। চপলার প্রশ্ন সে আদৌ বুঝতে পারল না। সে বোকার মতো জিজ্ঞাসা করলে—আমার কার কথা জিজ্ঞাসা করছ ?

ঠোঁট বাঁকিয়ে চপলা বললে—কচি খোকা, কিছুই বুঝতে পার না ? তোমার সেই সে! তোমার মালতীর কথা জিজ্ঞেস করছি।

মন্মথর বুকের ভিতরটায় হঠাৎ ওই নাম অন্যের মুখে উচ্চারিত হয়ে তার বুকে যেন ধাক্কা দিলে। মুখখানা সেই ধাক্কাতেই যেন খানিকটা রাঙা হয়ে উঠল। ধাক্কার চেহারাটাও যেন তার মন চিনতে পারলে। তার খানিকটা লজ্জা, খানিকটা ভয়, তার সঙ্গে খানিকটা বিরক্তি। সে বললে—কি পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের মতো ঠাট্টা কর! ছিঃ ?

সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তিতে ও রাগে ঝেঁজে উঠল চপলা। ভ্রূ কুঁচকে বললে—কি ? আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মতো কথা বলি তুমি বুঝি ওই শহুরেদের সঙ্গে মিশে খুব শহুরে হয়েছ ? সেই জন্যে আমার কথা পছন্দ হচ্ছে না ? সেই জন্যে বুঝি কচি খুকির বদলে ধাড়ী মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাচ্ছ।

চপলা রাগে কাকে কোথায় কি বলছে সে খেয়াল হারিয়ে ফেলেছে। মন্মথ তার রাগ দেখে ভয় পেয়ে গেল। অপমানিত হবার কারণ থাকলেও অপমানিত বোধ করার মতো মন নেই তার। রাগে অধীর হয়ে চপলা গলা অনেকখানি তুলে চিৎকার করছে। চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে এ বাড়ির বয়স্কদের কেউ হয়তো এখনি এসে ঢুকে পড়বে ঘরের ভিতরে ; জিজ্ঞাসাবাদ করবে তার রাগের কারণ। তখন—। ওঃ, সে কী ভীষণ লজ্জা, কী ভয়ের একটা কুৎসিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

মন্মথ তার কাছে সরে এসে তার সামনে হাত জোড় করে চাপা গলায় শশব্যস্ত মিনতি করে বললে—ও গঙ্গাজল, রাগ করো না। আস্তে কথা বল। এখনি কে কোথায় শুনতে পাবে। গঙ্গাজল, শুনছ। আমার বলায় দোষ হয়েছে। রাগ ক'রো না!

চপলা চুপ করল। কিন্তু চপলা আশ্চর্য! সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের কুৎসিত, অপ্রতিরোধ্য, অগ্নিদাহী ক্রোধকে মনের কোন্ বিচিত্র খাতে প্রবাহিত করে দিয়ে তাকে কৌতূকের সুখস্পর্শ উত্তাপে রূপান্তরিত করে ছেড়ে দিলে। বললে—তবে যে বাহাদুরী করে শহুরেপনা দেখাচ্ছিলে ? তোমার মালতীর কথা বল তা হলে !

একে ভাগ্য ও ভবিতব্য বলে মেনে নিতে হল মন্মথকে ! সে নিশ্বাস ফেলে বললে—কি শুনতে চাও বল !

—কেমন আছে তোমার মালতী ? ভুরু নাচিয়ে আপন খেয়াল মতো। প্রশ্ন আরম্ভ হলো খেয়ালী ধনী কন্যার মন্মথর উত্তর দিতে ভালো লাগছিল না। তবু হাসি মুখেই জবাব দিতে হলো—ভালই আছে !

—ভালো আছে মানে কি ? তোমার সঙ্গে মেলামেশা করে ?

—তা করে। আর সে ভালই আছে। খায় দায়, লেখাপড়া করে বেড়ায় ঘুমোয়, গান গায়, অভিনয় করে।

তাকে অনুসরণ করে চপলা বললে—অভিনয় করে ? সে আবার কি ? মানে থিয়েটার করে ?

—হ্যাঁ।

—সে কি গঙ্গাজল !

—কেন, তুমি তো ওর গান শুনেছ !

—তা শুনেছি। খুব ভাব দিয়ে গান গায়। অত ভাবটাব ভালো লাগে না বাপু! তবে গানের গলাটা খুব ভালো।

মন্মথ মুখে অস্পষ্ট হাসি নিয়ে চুপ করে রইল। কি বলবে সে?

চপলা প্রশ্ন করলে—মেয়েটা, বাবা মেয়েটা বললে আবার তোমার রাগ হবে, তোমার মালতী লেখাপড়ায় কেমন?

ঘাড় নেড়ে মন্মথ ছোট্ট উত্তর দিলে—ভালো। বেশ ভালো।

আবার প্রশ্নকারিণীর ভ্রূ কুঁচকে গেল। বললে—বেশ ভালো? বেশ ভালো মানে কি? পড়াশুনোয় তোমার মতো?

মন্মথ অপ্রস্তুত হয়ে হেসে বললে—তা কি করে বলব? তবে ভালই, বেশ ভালই। অনেক পড়াশুনো করেছে। বিশেষ করে ইংরেজী বই পড়েছে অনেক। ওর ভাই সত্যর মতোই। সত্যর মতোই ইংরেজী জানে।

—কী পড়ে তোমার মালতী?

—এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছে। বিরস কণ্ঠে জবাব দিল মন্মথ। তার আর ভালো লাগবে না। তার কেবল মনে হচ্ছে মালতীকে সে যেন অকারণে তার অসম বিরুদ্ধ পক্ষ এই ক্রোধী, চপল, নিষ্ঠুর মেয়েটির সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

—এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছে? বাবাঃ, বাহাদুর তো খুব। আমাদের বিদ্যে তো সেই প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, আর ফার্স্ট বুক অবধি। তা মেয়েমানুষের এত পড়ে কি হবে? কি করবে পাস করে?

—তা জানি না। বোধহয় কলেজে পড়বে।

—তা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা তো দিয়েছে, পাস করতে পারবে তো? এবার সত্য সত্যই আন্তরিকতার সঙ্গে প্রশ্নটা করলে চপলা। এই সামান্য আন্তরিকতা ও অপরিমেয় অনভিজ্ঞতায় হেসে উঠল মন্মথ।

সঙ্গে সঙ্গে আবার ভ্রূ কুঁচকে উঠল প্রশ্নকারিণীর—হাসছ কেন?

মন্মথ হাসতে হাসতে বলল—পাস করতে পারা কি বলছ, ও এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে!

চপলা এবার সত্যি সত্যি অবাক হলো! অনুপস্থিত প্রতিপক্ষ সম্পর্কে তার সমস্ত বিরোধিতা দূর হয়ে গেল এক মুহূর্তে। সে একান্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে তারিফ করে বললে—বটে! তা হলে তো তোমার মালতী খুব বাহাদুর ভাই গঙ্গাজল!

পরক্ষণেই নূতন প্রশ্ন নিয়ে সে মন্মথকে বিব্রত করলে—কিন্তু এখনও তো এণ্ট্রান্সের ফল বের হয় নি! এই তো আমাদের ছোট খোকন এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছে। বেচারা তো ভয়ে শুকিয়ে আধখানা হয়ে গিয়েছে। খাওয়া-

দাওয়া ছেড়েছে দুর্ভাবনায় অথচ তিনজন মাস্টার ছিল। ভয় ওর ইংরেজী আর সংস্কৃততে।

মন্মথ হেসে উঠল। বললে—জান, মালতী সংস্কৃতে আশির ওপর নম্বর পেয়েছে!

এবার গভীরতর বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে চপলা বললে—খুব বাহাদুর বটে বাপু! তা তুমি এত নম্বর জানলে কি করে?

—আমাদের পণ্ডিতমশাই, সংস্কৃত কলেজের, গোপীনাথ শাস্ত্রী আমার কাকার গুরু। তাঁর ছেলে রাধাশ্যাম আমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি এবার এণ্ট্রান্সের ট্যাবুলেটর আছেন। তাঁর কাছ থেকে জানলাম।

– তিনি কোথায় থাকেন

—বেনেটোলা লেনে।

—আমাদের ছোট খোকনের নম্বরটা জেনে দিতে পারবে?

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বললে—তুমি তো কাল বাড়ি চলে যাচ্ছো। তা আমাকে তোমার ঠিকানাটা লিখে দাও তো।

সঙ্গে সঙ্গে অনেক হাঁক-ডাক। কাগজ এলো, দোয়াত এলো।

মন্মথ ঠিকানা লিখে দিলে।

ঠিকানা-লেখা কাগজটা তার হাতে দিতে দিতে মন্মথ বললে—উনি কিন্তু তোমাদের ঠাকুরমশাইকে খুব ভালো করে জানেন। খুব ভক্তি করেন তাঁকে।

চপলা কাগজটা কাপড়ের খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে বললে—দেখি, কি করা যায়!

তারপর তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—কিন্তু এ তুমি কি করছ?

প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে মন্মথ বললে—কি?

চপলা তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কটু কণ্ঠে খানিকটা রসিকতার আমেজ মিশিয়ে বললে—বুঝতে পারছ না? কচি খোকা না কি তুমি?

মন্মথ আহত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

চপলা বললে, বেশ ঝাঁজের সঙ্গেই বললে—তুমি এই যে মালতীর সঙ্গে মেলামেশা করছ, এ কি ভালো করছ?

মন্মথ হতবুদ্ধি হয়ে গেল, রাগও হলো তার রাগত ভাবেই বললে—কেন কি দোষের হলো তাতে? আমি তো শুধু মালতীর সঙ্গেই মিশি না, ওদের বাড়ির সকলের সঙ্গেই মিশি। সন্ধ্যাদি আছে, ঊষা আছে, সত্য আছে, তা ছাড়া লোকেশ বলে আরও একটি ছেলে আছে।

চপলা বললে—মালতীর সঙ্গে মেশা আর ওদের সঙ্গে মেশা এক কথা?

মালতীকে তুমি ভালবাস না ?

একটু লজ্জিত এবং সেই সঙ্গে একটু বিব্রতও হলো মন্মথ। বুকের ভিতর তার কেমন একটা অস্বস্তি এবং বিচিত্র অপরাধবোধ জেগে উঠল। তবু তার সবটাকে অস্বীকার করবার জন্যই যেন মন্মথ বললে—মালতীকে ভালবাসি কি না জানি না, তবে মালতীর সঙ্গে মিশে আমি নিশ্চয়ই অন্যায় করি নি।

—না, কর নি! তুমি মালতীকে ভালবাসবে আর বিয়ে করবে আর একজনকে ? এটা ঠিক কি না তুমিই বল না! বল!

কথাটা মন্মথর বুকে যেন তীক্ষ্ণধার তীরের মতো বিঁধে গেল। তার মুখখানা যেন সাদা হয়ে গেল তার সব রক্ত উবে গিয়ে। সে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে একান্ত অসহায়ভাবে চপলার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তার মুখের চেহারা দেখে বোধহয় মায়া হলো চপলার। সে বললে—অমন করে চাইতে হবে না আমার মুখের দিকে। আর বেশী মেলামেশা ক'রো না মালতীর সঙ্গে। যখন ঠাকুরমশায়ের নাতনীর সঙ্গেই তোমায় বিয়ে হবে তখন মালতীর সঙ্গে মেলামেশা কম কর। তারপর আস্তে আস্তে ছেড়ে দাও। না হলে সবারই কষ্ট, তোমার, মালতীর, তোমার যে বউ হবে তার, সবারই।

মন্মথ তার এই গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে বলা কথাগুলির আঘাতে যেন প্রচণ্ড প্রহার খেলে। সে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে মাথা নামিয়ে চুপ করে বসে রইল, যেন কত গুরুতর অপরাধ করেছে সে। তার স্বাভাবিক বুদ্ধি যদি সহজ অবস্থায় থাকত তা হলে চপলার এই সব বলার মধ্যে, উপদেশের মধ্যে যে অতি হাস্যকর কিছু আছে, এবং সেই সঙ্গে তার নারীহৃদয়ের অকারণ ও অবুঝ ঈর্ষা আছে তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারত। কিন্তু সে অবস্থা তার তখন আর নেই।

চপলা উঠে দাঁড়াল। তার অপরাধ-ভারানত মাথার দিকে চেয়ে তার বোধহয় মায়া হলো খানিকটা। সে তার মাথায় হাত রেখে বললে—ওমা, তুমি অমন করে বসলে কেন ? মাথা তোল, মুখ তোল! তুমি একটু বস, খাবার জায়গা হতে কত দেরি আছে আমি দেখে আসি। কেমন ?

চপলা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

চপলা কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে মন্মথ বুঝতেও পারে নি। সে অনেকক্ষণ একভাবে নতমস্তকে মহা অপরাধীর মতো বসে থেকে এক সময় মুখ তুললে। প্রহার-খাওয়া শিশুর কম্পিত দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার বুক থেকে কেঁপে কেঁপে। একটা গভীর অপরাধবোধে তার সমস্ত মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হয়ে তার সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধি যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। চপলা যদি এইবার এই

নিয়ে একে ওকে বলে? ওর তো অমনি হৈচৈ করা স্বভাব। যদি গোপীনাথ পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করে বিশেষভাবে তার সঙ্গে মালতীর সম্পর্কের কথা বলে দেয়? চপলার পিসীমার গুরু রামরাম স্মৃতিতীর্থ মশাইকে যদি এসব জানায় চপলা তার পিসীমার মারফত? যদি তার বাবাকে জানায়?

মন্মথর মন রাগে টান টান হয়ে উঠল। নিজের ভিতরের সমস্ত ক্রোধকে সজ্ঞানে সে উদীপ্ত করে তুলবার চেষ্টা করলে। চপলা বলে বলুক। ওর যাকে খুশী ও বলুক। রামরাম স্মৃতি তীর্থকে, গোপীনাথ পণ্ডিত মশাইকে, তার বাবাকে—যাকে খুশী, যা খুশী বলুক চপলা। বলে যা পারে ওরা করুক। তারপর যা বলবার সে জবাব দেবে। বলবে—হ্যাঁ, মালতীকে আমি ভালবাসি, হ্যাঁ ভালবাসি। কিন্তু কোনো অন্যায় করি নি তা বলে!

কিন্তু মন্মথর মন কিছুতেই সম্পূর্ণভাবে আপনার ভালবাসার অপরাধকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে না।

মালতীর মুখখানি, সেই অনতিপক্ক ফলের মতো, হাতির দাঁতের রঙের মুখখানি বড় বড় নীলাভ চোখের দৃষ্টি মেলে সামনে চেয়ে আছে। কোনো কথা বলছে না, হাসছে না, কেমন যেন গম্ভীর কত বিষণ্ণ। সে মুখ মনে পড়তেই তার চোখ দিয়ে অকারণে জল পড়তে লাগল।

বিকেলবেলা সে ছাড়া পেলে চপলাদের বাড়ি থেকে।

সারাদিন কত হৈচৈ, কত খাওয়া-দাওয়া, গল্পগুজব সত্ত্বেও মনের সে স্বচ্ছন্দ প্রফুল্লতা আর ফিরে এলো না। রুপোর থালায়, পাঁচটা রুপোর বাটিতে, রুপোর গেলাসে খাওয়া সত্ত্বেও না।

বিকেলবেলা সে যখন চলে আসছে তখন চপলা তাকে বললে—একবার পিসী-মার সঙ্গে দেখা করে যাও। পিসীমা দেখা করতে চান তোমার সঙ্গে।

মন্মথর কিছুই ভালো লাগছিল না। তবু পিসীমা, এ-বাড়ির পিসীমা!

তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে কে যাবে এ-বাড়ির চৌহদ্দি থেকে। কাজেই যেতে হলো।

কিন্তু পিসীমার কাছে পৌঁছে মন্মথ অবাক হয়ে গেল। এ-পিসীমা আর এক পিসীমা! অতি প্রসন্ন মমতাময়ীর মতো এক মুখ হেসে, অতি প্রসন্নতার সঙ্গে তার প্রণাম গ্রহণ করে তার মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বললেন—বস বস, বাবা বস। তুমি ঠাকুরমশাইয়ের নাতজামাই হবে, আমাদের বাড়িতে এসেছ. আমার কি ভাগ্যি?

তাকে সমাদরের সঙ্গে কাছে বসিয়ে পিসীমা বললেন—কার সঙ্গে তোমার বিয়ে

হবে ? সারদার মেয়ের সঙ্গে ?

মুখ নত করলে মন্মথ স্বাভাবিক লজ্জায়। তার সঙ্গে বিব্রত ও এক ধরনের অস্বস্তিও বোধ করতে লাগল সে। মুখ নিচু করেই বললে—আমি কারও নাম তো জানি না!

—জান না ? ঠাকুরমশায়ের তো দুই ছেলে আর একমাত্র মেয়ে সারদা। তাহলে সারদারই মেয়ে হবে।

তারপর যথেষ্ট আদর করে তাকে বিদায় দিয়ে হাসি মুখে বললেন—আবার এসো বাবা! তা তুমি তো জামাই। তুমি নিজে থেকে আসবে কেমন করে ? সেটাও তো একটা কথা বটে। তা চপলি যখন আছে, চপলিই ঠিক ধরে নিয়ে আসবে তোমাকে।

আসবার সময় তার হাতে ফরাসডাঙার ধাক্কা-দেওয়া কালাপাড় ধুতি ও জরি-বসানো চাদর দিয়ে তাকে জামাতার সম্মান দেখালেন পিসীমা।

হাত পেতে ধুতি-চাদর নিতে বিব্রত বোধ করছিল সে। মৃদুস্বরে সামান্য প্রতিবাদও করলে সে। বললে—আবার এসব কেন দিচ্ছেন ?

অন্য কেউ হলে হয়তো পিসীমা বিরক্ত হতেন তাঁর কথার প্রতিবাদে, তা সে প্রতিবাদ যত মৃদুই হোক। কিন্তু মন্মথর কথা শুনে তিনি হেসে বললেন—কেন দিচ্ছি ? কেন দিচ্ছি এখন তুমি বুঝতে পারবে না বাবা। তোমার জামাই হোক তখন বুঝতে পারবে।

বলে রূপসী মহিলাটি অত্যন্ত হৃদ্য হাসি হাসলেন। তারপর বলে দিলেন তাকে গাড়ি করে তার হোস্টেলে পৌঁছে দিতে।

পিসীমার সমাদরে মন্মথর আদর আরও যেন বেড়ে গেল। গাড়ির কাছ পর্যন্ত এসে চপলা ও হৃদয়চন্দ্র তাকে গাড়িতে তুলে দিলে। চপলা তাকে হেসে একান্তে বললে—তুমি সেই দুপুর থেকে মুখটা পেঁচার মতো করে আছ কেন ? আমি সেই কথাগুলো বলেছিলাম বলে ? সে সব কখন কি বলেছি কিছু মনে রাখতে হবে না। আমার কথায় কিছু মনে করে ? আমি তো কোনো কথা কিছু ভেবে বলি না। আর তা ছাড়া আমি তো তোমার গঙ্গাজল! তবে হ্যাঁ, তোমার ওই মালতীর সঙ্গে মেলামেশা একটু কম ক'রো। তাতে দুঃখটা কম পাবে।

ভাবী জামাতার সম্মান হিসেবে কাপড়-চাদর হাতে নিয়ে গাড়িতে আড়ষ্টের মতো একান্ত ম্রিয়মাণ হয়ে সে বসে থাকল। কাপড়-চাদরটা পাশের আসনে নামিয়ে রাখবার কথাটাও তার মনে হলো না। মনে হলো কে যেন তাকে এক অপ্রতিরোধ্য শাস্তি দিয়ে তার চারিপাশে নিষেধের একটা দুর্লঙ্ঘ্য গণ্ডী টেনে দিচ্ছে।

গাড়িতে পাথুরেঘাটা থেকে কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট পর্যন্ত এসে সে গাড়ির কোচম্যানকে ভিতর থেকে ডেকে থামাল। কিন্তু বড়লোকের বাড়ির কেতাদুরস্ত কোচম্যান সেকি সহজে রাজী হয়? তার মাঝপথে নেমে যাবার অনুরোধ সে কিছুতেই শুনতে রাজী নয়! অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে সে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে। গাড়ি থেকে নেমে তার অস্বস্তি কমল অনেকটা।

ধুতি-চাদর দুটি হাতে করে সে পথ চলতে লাগল। তবু মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছে এ বোঝাটা না থাকলেই যেন ভালো হতো। সে মর্মে মর্মে অনুভব করছে রামরাম ভট্‌চাজ নামক এক বৃদ্ধ কোন্ দূরান্তরে তার কাছ থেকে অদৃশ্য থেকেও তাঁর সহস্র তর্জনী উদ্যত করে হাসিমুখে যেন বার বার অশ্রুত কণ্ঠে বলছেন—ও কাজ ক'রো না, ও কাজ ক'রো না। তাঁর মুখে হাসি আছে বটে, কিন্তু সেই সহাস্য প্রসন্নতার অন্তরালে যেন কোন্ এক কঠিন নিষেধ প্রচ্ছন্ন আছে।

চলতে চলতে হঠাৎ তাকে থামতে হলো। বাধা পেয়ে থামতে হলো।

চলতে চলতে সে অনুভব করলে কে তাকে যেতে বাধা দিচ্ছে। একখানা হাত তাকে আটকেছে। কে? সে চমকে ফিরে তাকালে। চারিপাশে চেয়ে দেখলে সে কোথায়, কে তার পথরোধ করেছে।

ওঃ, সে হাঁটতে হাঁটতে শ্রীমানী বাজারের কাছে এসে পড়েছে। কিন্তু কে পথ আগলেছে তার?

কে ও? দাড়িগোঁফওয়ালা একজন প্রৌঢ় পুরুষ, একজন সন্ন্যাসী।

দাড়িগোঁফের আড়াল থেকে নিঃশব্দ হাসি হেসে সে তার কাঁধে একখানা হাত রেখে বললে—কিয়া ভাই, হমকো পছানতা নহি?

—না তো! বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল মন্মথ।

লোকটি হা হা করে হেসে অস্থির। যেন তার না-চেনার মধ্যে কোথাও এক সুবিপুল কৌতুক লুকিয়ে আছে।

অনেক হেসে সে নিজের হাসি নিজেই উপভোগ করে থামল। থেমে বললে—ওইসাই হোতা হ্যায় ভাই! ভুল যানাই তো দুনিয়াকা হাল হ্যায়!

মন্মথ তার দাড়ি গোঁফে সমাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু ভাবছিল—ওকে কি সে এর আগে দেখেছে? দেখলে কোথায় দেখেছে?

লোকটা পরমাত্মীয়ের মতো মৃদু হেসে তাকে বললে—কিয়া, পছানতা নহি? চিনছ না হামাকে? দো বরিষ পহেলে কো বাত সোচো! তুমকো বোলা নেহি—তুম পরীক্ষামে সব সে উঁচা হোগা?

এইবার সব মনে পড়ল তার। মাধববাবুর বাড়িতে দেখা হয়েছিল এই সাধুর সঙ্গে। সে হেসে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়ে বললে—হ্যাঁ, বলেছিলে। তোমার কথাও ঠিক হয়েছিল।

সে সাধুকে সেবার বুজরুগ ভেবে ভালো করে আমল দেয় নি। এবারও সে পরীক্ষা করার সুযোগটুকু ছাড়লে না তাকে বিশ্বাস করা সত্বেও। হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে —এবার কি হবে?

সাধু আবার তার সেই ক্ষ্যাপা-ক্ষ্যাপা হাসি খুব হেসে নিলে একচোট। তার কাঁধে হাত রেখে বললে—ই দফে কিয়া হোগা তুম জানতা নহি? তুম্‌হারা আসন তো পাকা হো গয়া! ই দফে ভি সবসে উঁচা হোগা। ইসকে বাদ ভি সব পরীক্‌সামে ওইসাই হোগা! বাকি—

বাকি—? 'বাকি' মানে তো 'তবে'? 'তবে' বলে আবার কি বলতে চায় পাগল। সে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আবার কি বলছ?

—কুছ নহি! সাধুকো দো চার আনা দে দেও কৃপা কর। চায়ে আউর গাঁজা পিব।

মন্মথ হাসতে লাগল। বললে—তুমি খুব ভালো সাধু। তুমি গাঁজা খাবে আর আমি তোমাকে পয়সা দেব?

সাধু চোখ বড় বড় করে বললে—কেয়া ভাই, কসুর হুয়া? গাঁজা পিব বোলনেসে কোন্ কসুর হুয়া? তুমলোগ বিড়ি-সিকরেট-তাম্বাকু পিতা তো ঠিক হ্যায়, হামারা গাঁজা পিনেসে কসুর হোগা?

মন্মথ বললে—তোমাকে পেট ভরে গাঁজা খাওয়াব, কিন্তু তুমি 'বাকি' বলে কি বলছিলে বলতে হবে!

সাধু গম্ভীর হয়ে গেল। তার দিকে তাকিয়ে বললে—আও হামারা সাথ আও, বৈঠো।

মন্মথ বিব্রত হলো। তারপর বললে—আচ্ছা চল, কোনো চায়ের দোকানের কাছে চল।

শ্রীমানী বাজারের কাছে একটা চায়ের দোকানের সামনে এসে সে সাধুকে বললে —চায়ের সঙ্গে আর কি খাবে?

—কুছ নহি ভাই। খালি চায়ে পিয়েগা।

—কুছ মিঠাই?

—নহি। আচ্ছা, তো দো কচৌরী বোল দেও।

চায়ের সঙ্গে কচুরী খেতে খেতে সাধু বললে—দো বরিষকে অন্দর তুমহারা

জিন্দীগী বদল যায়েগা!

মন্মথর বুকটা ধক্‌ করে উঠল। আবার এ এক বুজরুগি! তবু সে শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করলে—কি রকম বদলাবে?

সাধু চা শেষ করে চায়ের ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—কভি ত্রিবেণী গিয়া?

আবার তার বুকটা ধক্‌ করে উঠল। কি বলতে চায় সাধু?

সাধু বললে—নহি গিয়া। আচ্ছা, যব যায়েগা তব দেখোগে। প্রয়াগমে যেইসে গঙ্গাজীকে সাথ যমুনামায়ী আ কর মিলি হ্যায় হুঁয়া প্রয়াগজীমে পানিমে বহুত বদল হো যাতা হ্যায়। ত্রিবেণীমে ভি গঙ্গাজীসে সরস্বতী নিকল গিয়া। সব যমুনাজী মিলা তব ভি গঙ্গাজীকা হাল যেইসি বদল গিয়া, যব গঙ্গাজীসে সরস্বতী বাহার হো গয়া তবভি ওইসে গঙ্গাজীকা হাল বদল যাতা। তুমহারা ভি ওইসে হোগা। এক নদী নিকল যায়েগা, আউর এক ঘুঁসেগা। ইসিসে বহুত্‌ বদল হোগা!

সাধু চুপ করল। মন্মথও নীরব। সাধু আবার বললে—ইসমে খারাপ কুছ না হোগি, আচ্ছা হি হোগা। বাকী বহুত বদল হোগা!

মন্মথ কি বুঝল কে জানে সে একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। চায়ের ও খাবারের দাম মিটিয়ে বললে—আজ যাই!

সাধু হাত তুলে হেসে বললে—বহুত আচ্ছা!

যেতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে সে হাতের কাপড়-চাদরজোড়া সাধুর হাতে গুঁজে দিলে। বললে—নাও।

সাধু অবাক হয়ে বললে—ই কিয়া? কাপড়? ইয়ে লে কর কিয়া করেগা ভাই?

—নাও, তোমাকে দিচ্ছি। আমার তোমাকে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। বলে সে একটু হাসল।

—বহুত আচ্ছা! তুম দিয়া, হম ভি লে লিয়া! তুম্‌ হমকে দো কাপড়া দিয়া, ইয়ে লাখো রুপেয়া হো কর তুমহারা পাশ আয়েগা! বহুত আচ্ছা!

মন্মথ তার কথা শুনলে না। মন একান্ত বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছে। চলতে চলতে তার মনে হলো সাধু অস্পষ্টভাবে যে সব কথা বললে সেই সব কথাগুলো প্রদীপের মৃদু শিখার মতো সামনের অন্ধকারে আলো ফেলে তার জীবনকে তার কাছে অনেকটা স্পষ্ট করে তুলেছে। সাধুর কথার আলোয় সে যেন নিজের জীবনের অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে!

পরদিন সকালে নৌকোয় রওনা হয়ে সে দুপুর নাগাত হুগলীর ঘাটে এসে নামল। সেখান থেকে একটি মুটের মাথায় নিজের তোরঙ্গটি চাপিয়ে সে রওনা হলো।

পথ চলতে আজ কষ্ট নেই। শ্রাবণের আকাশ পাতলা মেঘে ছেয়ে আছে। পথে কাদা নেই, অথচ বৃষ্টিতে ধুলো সয়ে গিয়েছে। অথচ চলতে তার ভলাই লাগছিল।

তবু সমস্ত মনে কোথায় এক দুঃসহ বেদনা ও অভিমান একটা অনির্দিষ্ট পিণ্ডের মতো কোথায় যেন আটকে আছে। বার বার মনে হচ্ছে, পথ চলতে চলতে কোথাও কোনো নির্জন গাছতলায় বসে মাটির বুকে মুখটা রেখে খুব খানিকটা কাঁদে। কিন্তু কান্না আসছে না।

মুটে বোঝার ভারে ও টানে দ্রুতপায়ে চলছিল আগে আগে। তার টানে তাকেও বেশ জোরে চলতে হচ্ছিল।

মাঠের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে মুটে এক সময় বললে—বাবু, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলেন। এখুনি জল আসবে লাগছে।

কয়েক পা এগুতেই বৃষ্টির ছোট ছোট ফোঁটা পড়তে লাগল। পাশের একটা পুকুরের কাঁচের মতো স্থির জলের উপর চন্দনবিন্দুর মতো বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে নজরে পড়ল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তারা এগিয়ে গিয়ে গ্রামের প্রান্তে পথের ধারের একটি বাড়ির খড়ে-ছাওয়া নাছদরজায় আশ্রয় নিলে।

যেখানে আশ্রয় নিলে সে একটি আখড়া। কপালে, হাতে, বুকে হরিচন্দনের ছাপ-লাগানো এক প্রৌঢ় খোলা দরজা দিয়ে তাদের দেখতে পেয়ে সমাদর করে ডেকে এনে একেবারে বিগ্রহের মন্দিরের বারান্দায় বসালে। তার ব্রাহ্মণ পরিচয় পেয়ে প্রৌঢ়ের কি সমাদর, কি শ্রদ্ধা। তাকে না খাইয়ে ছাড়বে না। শেষে তার অনুরোধে মহাপ্রভুর বাল্যভোগের প্রসাদী ছানা ও মাখন খেতে হলো। মুটেটিকে যথেষ্ট পরিমাণ মুড়ি দিয়ে আপ্যায়িত করতে ভুল হলো না বাবাজীর।

খেতে খেতে আখড়াটিকে আসল দৃষ্টিতে সে দেখল। দরজার পাশেই দুটো প্রাচীন গাছের মতো শক্ত ও বড় লতার বিস্তৃতি। সে প্রশ্ন করে জানলে একটি মাধবী, অন্যটি মালতী। মাধবী লতাকে অবলম্বন করে মালতী লতা নিজেকে প্রসারিত করছে।

বাবাজী তার কৌতূহলে অত্যন্ত আপ্যায়িত হয়ে বললে—মাধবী বাবা বসন্তের ফুল, মাধবের বড় প্রিয়। আর ওই দেখেন মালতী এই বর্ষার ফুল তো সমস্ত গাছটা ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে।

বাবাজী আগ্রহের আতিশয্যে সেই টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যেই মালতী লতার কাছে গিয়ে কয়েকটি সাদা ফুল তুলে এনে দিলে তার হাতে। ফুলগুলির গায়ে তখনও জল লেগে রয়েছে। মন্মথ হাতে নিয়ে দেখলে ফুলগুলি যত শুভ্র, তত কোমল।

সেই সঙ্গে একটি মৃদু সকরুণ মধুগন্ধও রয়েছে। ফুলগুলির সকরুণ কান্নার মতো তার হাতে সামান্য জলের স্পর্শ লাগল।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। আকাশের দিকে চাইতেই তার মনে হলো যেন সারা মেঘলা আকাশটি অতি-বিস্তৃত একটি গম্ভীর, বিষণ্ণ আয়ত চোখের মতো তার একান্ত সন্নিকটে নেমে এসে তারই দিকে তাকিয়ে আছে। বিশেষ একজনের চোখের মতো।

আবার আরম্ভ হলো যাত্রা।

বাড়িতে গিয়ে সে যখন পৌঁছুল তখন দেবতার ভোগ হয়ে গিয়েছে। বাবা প্রসাদ পাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। মা বাবার জন্য আসন করে দিয়েছেন।

তাকে দেখেই গঙ্গাধর চমকে উঠে সহর্ষে বলে উঠলেন—এই, তুই এখন এলি? আগে তো কোনো খবর দিস নি।

গঙ্গাধরের মুখে সংযত হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু মন্মথর মুখে হাসি এলো না। তার বদলে বুকের অনির্দেশ ব্যথাটি কান্নার চেহারা নিয়ে ততক্ষণে গলার কাছে এসে ভিড় করেছে।

সে আগে মাকে প্রণাম করে, পরে গঙ্গাধরকে প্রণাম করতেই গঙ্গাধর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে বাপের বুকের ভিতর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

গঙ্গাধর কিছু বললেন না। তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তিনি অনুভব করলেন যে ছেলে লেখাপড়া করতে গিয়ে দিনে দিনে অতি উজ্জ্বল মূর্তি নিয়ে তাঁদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে সে আবার ফিরে এসেছে তাঁর বুকে।

অনেকক্ষণ পর নিজের বুক থেকে কাপড়ের খুঁট দিয়ে মন্মথর চোখের জল মুছতে মুছতে শান্ত কণ্ঠে স্ত্রীকে বললেন—দাও, মনুকেও আমার সঙ্গে ভাত দাও। সেই সকালে কখন খেয়েছে।

১১

আবার সেই প্রেসিডেন্সি কলেজ।

আবার সেই শরৎকাল, সেই সোনার আলো, সেই তরুণ যৌবন, সেই আনন্দ, অবাধ আনন্দ।

তবে এবার এফ. এ. ক্লাস থেকে বি. এ. ক্লাস। পরীক্ষাবিজয়ী তিন বন্ধু এবার খানিকটা করে দূরে চলে গেল পরস্পরের কাছ থেকে। মন্মথ অনার্স নিলে

ইংরেজীতে, লোকেশ নিলে ফিলসফিতে, আর ওদের দুজনকে অবাক করে সত্য অনার্স নিলে ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রীতে।

সত্যদের বসার ঘরে, যেখানে ওদের সমস্ত আলোচনা হয়েছে এতদিন ধরে, সেই-খানেই বি. এ.তে ভর্তির আগে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্যেকের মনের কথা প্রকাশিত হলো। কার মনে যে কোন্ কথা লুকানো থাকে তা কি অন্যেরা জানত ?

প্রথমেই সত্য প্রশ্ন করলে মন্মথকে—মনু, তুই কিসে অনার্স নিবি রে ?

মন্মথ একটু হেসে আড়চোখে একবার মালতীর দিকে চেয়ে সত্যর মুখের দিকে চেয়ে রইল। জবাব দিলে না।

সত্য বললে—তুই অবশ্য বাহাদুর লোক। সব সাবজেক্টই মোটামুটি ভালো জানিস। যে কোনো একটাতে অনার্স নিতে পারবি।

মন্মথ হেসে বললে—তার মানে কোনোটাতেই আমার বিশেষ ব্যুৎপত্তি নেই, এই তো ?

সত্য রেগে চুপ করে গেল।

মন্মথ তার কথার জবাব দিলে এবার—আহা বাপু, তুই তো শক্তপোক্ত পুরুষ মানুষ, আমাকে তুলে নাচাবার শক্তি রাখিস, তুই রাগ করে মুখ ভার করিস কেন ? ও তোকে মানায় না! বলছি, আমি কিসে অনার্স নেব।

—কিসে ?

—ইংরেজীতে।

সত্য একটু অবাক হলো বৈকি। মন্মথ এবারও ইংরেজীতে তার চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে। কিন্তু সে এবং মন্মথ দু জনেই জানে মন্মথ সত্যর মতো ইংরেজী লিখতে পারে না। এখন যত উপর দিকে লেখাপড়া যাবে কি বললের চেয়েও কেমন বললে সেটা দিনে দিনে অধিকতর মূল্যবান ও বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় মন্মথ ইংরেজীতে অনার্স নিতে চায় সব জেনে শুনেই।

সত্য একটু চুপ করে থেকে বললে—তা ভালই। তোর অসাধ্য তো কিছু নেই। তুই সব পারিস!

সত্যর কথায় কোথায় যেন একটু খেদের স্পর্শ ছিল। খেদটা বোধহয় এইজন্যে যে সত্যি সত্যি মন্মথর চেয়ে ভালো ইংরেজী লিখতে পারা সত্ত্বেও, মন্মথর চেয়ে বেশী ইংরেজী সাহিত্য পড়া সত্ত্বেও সে পরীক্ষায় ইংরেজীতেও মন্মথকে ডিঙিয়ে যেতে পারে না।

তার গোপন খেদের কথা মন্মথ জানে। জানে বলেই হেসে ব্যাপারটাকে হালকা করে দিলে সে। হেসে চিৎকার করে বললে—এই বাঙাল, শুনছিস ? সত্য কি

বলছে শোন।

লোকেশ এতক্ষণ এক মনে একখানা ভারী বিলেতী বইয়ের মূল্যবান সংস্করণ নাড়াচাড়া করছিল আপন মনে। লোকেশ যখন আপন মনে নিবিষ্ট থাকে তখন ওকে ডাকাডাকি করলেও সাড়া মেলে না, ও এত একান্তভাবে নিবিষ্ট থাকে। তাই লোকেশ শুনতে পেলে না। আরও বার দুয়েক ডাকতে তবে সে শুনতে পেলে, মুখ তুলে তাকালে শূন্য দৃষ্টিতে। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে সচেতন হলো খানিকটা।

তার ভাবসাব ওরা সকলেই ভালো করে চেনে। মন্মথ জিজ্ঞাসা করলে—ডাকলাম শুনতে পেলি না? কি করছিস কি?

ওর হয়ে জবাব দিলে মালতী। অতি সুন্দর মৃদু হাসির সঙ্গে বললে—ও আর কি করবে? ওরা যা কাজ তাই করছিল। ছোট ছেলে ছোট ছেলের কাজ করছিল। ওই অমন সুন্দর বইখানা, পড়বার নাম নেই, ছবি দেখছিল আপন মনে।

—ছবি দেখছিল? সত্য জিজ্ঞাসা করলে আশ্চর্য হয়ে।

—ওকে জিজ্ঞাসা কর, ও ছবি দেখছিল কি না ওই বলুক! মালতী বললে।

লোকেশের আচ্ছন্নতা তখনও কাটে নি। সে ওদের কথা কথা শুনে একটু হাসল শুধু।

মালতী তার মুখের দিকে চাপা হাসি নিয়ে তাকিয়ে বললে—কেন ছবি দেখছিল তাও আমি বলতে পারি!

সত্য বললে—বল্‌তো!

মালতী লোকেশের কাঁধে একটা হাত রেখে বললে—বলব রে?

লোকেশ মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল শুধু।

মালতী বললে—জানিস সত্য, এ ছবিগুলো দেখছিল আর ভাবছিল ও সেখানেই বসবাস করছে। সেখানকার জীবনটাই যেন ওর আসল জীবন। কিংবা আসছে জন্মে ও ওইসব জায়গায় সবগুলোতে এক একবার সেখানকার মানুষ হয়ে জন্মাবে।

মালতী তার কাঁধের উপর তার হাতটা রেখেই তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে তার কাঁধটা নাড়া দিয়ে বললে—হ্যারে, তুই কিসে অনার্স নিবি?

এবার তার শ্যাম শীর্ণ মুখের ভিতর সুগঠিত সাদা ধবধবে দাঁতের সারি প্রকট করে বললে—তুই বল আমার হয়ে আমি কিসে অনার্স নেব!

সত্য এবার চটে উঠল। মন্মথ পরিষ্কার ঠাট্টা করে হেসে উঠল।

সত্য বললে—ওঃ, উনি একেবারে সর্ববিদ্যাবিশারদ এসেছেন, ওঁকে যে কেউ যে কোনো সাবজেক্টে অনার্স নিতে বলবে উনি তাই নিয়ে নেবেন।

লোকেশ কারও কথায় রাগ করে না। সব কিছুতেই বেমক্কা হাসতে আরম্ভ করে, যেন সব ব্যাপারটাই পুরোপুরি হাসির। লোকেশ সেই হাসি হাসতে লাগল।
মালতী বললে—ও যে কি বস্তু তা তুই ভালো করে জানিস না সত্য, তাই বলছি কথাটা। ও কিসে অনার্স নেবে আমি ঠিক বলে দিচ্ছি। ও অনার্স নেবে 'ফিলসফি'তে। নাকি রে লোকেশ?
লোকেশ একটা চেয়ারে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসেছিল। ওর বসা, চলা, ফেরা সব কিছুই অস্বাভাবিক। মানুষটা এমনিতে অসাধারণ লম্বা, হাত-পাগুলো অনুপাতে আরও লম্বা। আর হাত পায়ের নড়াচড়ার ভঙ্গী দেখলে মনে হয় সেগুলো যেন আলতোভাবে ওর শরীরের সঙ্গে জোড়া আছে, একটু এদিক ওদিক হলে খুলে পড়ে যাবে। সত্যর মজবুত শরীর ব্যায়ামে পরিপুষ্ট। সে-ই ঠাট্টা করে বেশী। লোকেশকে বলে—তোকে নাড়াচাড়া করতে আমার খুব ভয় হয় রে বাঙাল। মনে হয় এই ঘটির ঠোকায় কি ধক্কায় তোর শরীরের সঙ্গে সুতো দিয়ে সেলাই-করা হাত-পা কখন খুলে বেরিয়ে যাবে। তাই ভয়ে তোর গায়ে আমি হাত দিই না।
আজও তেমনি অদ্ভুত ভঙ্গিতে চেয়ারে বসেছিল লোকেশ। একটা পা লম্বা করে সামনে ছড়ানো, অন্য পা-টা চেয়ারের উপর হাঁটু মুড়ে তুলে রাখা। সেই পা-টা দোলাতে দোলাতে সে বললে—ঠিক বলেছিস। আমার মনের কথা তুই জানিস। আমি মনে মনে ঠিকও করেছি অনার্স নেব 'ফিলসফি'তেই।
সত্য ঠাট্টা করে উঠল—ওঃ, বসেছে দেখ না যেন শাহানশা বাদশা বসেছে। আর কথা বলছে দেখ না, যেন স্বয়ং হাবার্ট স্পেনসার দর্শনের একটা শেষ সিদ্ধান্ত দিলেন।
লোকেশের অট্টহাসিতে সত্যর ঠাট্টা কোথায় ডুবে গেল।
মালতী হেসে বললে—হলো তো রে সত্য, হেরে গেলি তো! বাঙাল তোকে হারিয়ে দিলে!
তারপর লোকেশের মুখের দিকে চেয়ে সহাস্য মুখে বললে—বাঙাল, তুই লোক ভালো কিনা জানি না, তবে তুই মহা চালাক। তোকে হারানো অসম্ভব।
লোকেশের অট্টহাসিতে তখন এই গম্ভীর শান্ত বাড়িখানার শান্তি ও স্নিগ্ধ স্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গিয়ে সারা বাড়িটাই যেন কোন্ অকথিত অর্থহীন আনন্দে হা হা করে হেসে উঠেছে।
সত্য হাসতে হাসতে বললে—ওরে তোর পায়ে পড়ি রে, তুই তোর গাধার ডাকের মতো হাসি থামা। দয়া করে থামা।

মন্মথ এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটা পরম কৌতুকে উপভোগ করছিল। সে এতক্ষণে বললে—গাধা পাগল হলে কি সহজে থামে রে? থামাতে বললেও থামে না। থামাবার জন্য লাঠি দিয়ে পিটলেও ডাক থামায় না, ডাকতে ডাকতে ছুটে পালায়। তারপর যখন ইচ্ছা হয় তখন ডাক থামায়।

তাই ঘটল। অনেক হেসে, অনেকক্ষণ হেসে, লোকেশ থামল।

লোকেশ থামলে মন্মথ জিজ্ঞাসা করলে—তুই কিসে অনার্স নিবি রে সত্য?

সত্য পরিষ্কার জবাব দিলে—ফিজিক্স্ আর কেমিস্ট্রী!

লোকেশ আশ্চর্য হলো না, কিন্তু মালতী আর মন্মথ দুজনেই অবাক হয়ে বললে—তুই ফিজিক্স্-কেমিস্ট্রীতে অনার্স নিবি? কি ব্যাপার রে?

সত্য হাসল, বললে—অবাক হচ্ছিস কেন? মলি অবাক হচ্ছে, পছন্দ হচ্ছে না ওর। তার কারণ অবশ্য আমি জানি।

—কি কারণ? মালতীর ভুরু কুঁচকে উঠল।

সত্য বললে—তুই আর্টিস্ট মানুষ; সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এইসব ভালবাসিস, সেইজন্যে তোর ইচ্ছে নয় আমি ফিজিক্স্-কেমিস্ট্রীতে অনার্স নিই।

মালতী কোনো কথা বললে না, কেবল একবার নিচের ঠোঁটটা উলটে দিয়ে বড় বড় দুই চোখে একবার এক মুহূর্তের জন্য কেমন একটা ভঙ্গী করলে। মালতী উপস্থিত থাকলে মন্মথর দুই চোখ তো অহরহ তৃষ্ণার্তের মতো তার মুখের উপরেই নিবদ্ধ থাকে। তার সুকুমার মুখের এই অপরূপ চকিত ভঙ্গিটি সে মালতীর অজস্র ছবির সঙ্গে আপনার স্মৃতিতে মহামূল্য রত্নের মতো তুলে নিলে।

সে স্থির দৃষ্টিতে মালতীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চেয়েই ছিল, এই সময় উষা এসে ঘরে ঢুকল। সে এই দু বছরে বেশ লম্বা হয়েছে।

বছর পাঁচেক বয়স হলো তার। সে এগিয়ে মালতীর কাছে দাঁড়াল। কি বললে মালতীকে। সঙ্গে সঙ্গে মালতী উঠে দাঁড়াল উষার হাত ধরে।

তাকে চলে যেতে দেখে সত্য বললে—আরে তুই উঠলি যে! তুই কি কি কম্বি-নেশন নিবি সে নিয়ে তো কোনো কথা হলো না।

মালতী বললে—বাবা, আমি আর যাই নিই আর অঙ্ক কষতে পারব না। সংস্কৃত পড়তে পারি, কিন্তু আর অঙ্ক নয়!

সকলকে আশ্চর্য করে মন্মথ কথা বলে উঠল—সে কি, তুমি অঙ্কে ছেড়ে দেবে? সকলের সামনে মন্মথ প্রকাশ্যে এত সহজভাবে তার সঙ্গে কথা বলতে পারে না। আজ এভাবে তাকে কথা বলতে দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। বিশেষ করে মালতী। কিন্তু সে নিজের বিস্ময়কে একান্ত সহজে গোপন করে যথাসম্ভব সহজে

বললে—অঙ্ক নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাতে পারব না।

মন্মথ বললে—কেন, অঙ্কে তো তুমি ভালো নম্বর পেয়েছ। নব্বুই পেয়েছ।

মালতী হাসল, হেসে বললে—তা পেলে কি হবে, আমি আর কষ্ট করতে পারব না।

মন্মথ খুব জোর দিয়ে বললে—তুমি অঙ্কে এত নম্বর না পেলে কি ভালো রেজাল্ট্ করতে পারতে? কোনোক্রমে তা পারতে না। পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হলে অঙ্ক নিতে হবেই। অঙ্ক না নিলে, আর অঙ্ক নিয়ে অঙ্কেতে ভালো নম্বর না তুলতে পারলে এফ. এ.-তে কিছুতেই ভালো ফল করতে পারবে না। অঙ্ক ছেড়ো না, এফ. এ.র সাবজেক্টের মধ্যে অঙ্ক অবশ্যই নেবে!

তার কথা শুনে আর কোনো উত্তর না দিয়ে একান্ত বাধ্য মেয়ের মতো মালতী উষার হাত ধরে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে সত্যের প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলে গেল—কাকীমা ডাকছেন তাড়াতাড়ি। কাজ আছে।

বিকেলে সত্যদের বাড়ি যথারীতি বেড়াতে গিয়ে মন্মথ বুঝতে পারলে সকালবেলা সত্যের মা কোন্ কাজে কেন মালতীকে তখন ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

এবেলা লোকেশ আসে নি। সে একা উপরে বসার ঘরের দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে থমকে গেল। থমকে যেতে হলো তাকে। মস্তবড় ঘরখানা সচরাচর সুসজ্জিতই থাকে। কিন্তু আজ অত্যন্ত মহার্ঘভাবে তোলা সব চাদর বালিশ দিয়ে ঘরখানি উজ্জ্বলতর ভাবে সজ্জিত। প্রতিদিনের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে একটা পোশাকী চেহারা নিয়েছে। দরজার ওপাশে সামনাসামনি রঙীন রেশমের চাদর-পাতা চৌকিতে একটি প্রৌঢ়া ও একটি তরুণ বসে আছেন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসবার সময় একটা মস্ত ওয়েলার ঘোড়া-জোতা ব্রুহাম গাড়ি চোখে পড়েছিল। কিন্তু সে চোখে পড়লেও মনে ধরে নি। কারণ এমন অনেকে তো এঁদের বাড়ি বেড়াতে আসেন। তাঁদেরই কেউ এসে থাকবেন ভেবেছিল সে।

কিন্তু ঘরের দরজায় পা দিয়ে সে বুঝলে এঁরা অপরিচিত মানুষ।

দরজার কাছে বিব্রত অবস্থায় তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সত্যর মা তাকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে হাসিমুখে একটু বিশেষভাবেই যেন আহ্বান জানালেন—এস বাবা, এস। এসে ঘরের মধ্যে বস। সন্ধ্যা যেখানে বসে আছে ওইখানে ওর কাছে বস।

মন্মথ বুঝতে পারলে—এঁরা কেন এসেছেন। সন্ধ্যা ওঁদের এপাশে একটি চৌকিতে বিশেষ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে একান্ত লজ্জিতভাবে মুখ নিচু করে বসে আছে। মন্মথ বুঝতে পারলে এঁরা মাতা-পুত্রে সন্ধ্যাকে খুব সম্ভব বিবাহের জন্য দেখতে

এসেছেন। সে সন্ধ্যার কাছে গিয়ে বসল।

প্রৌঢ়ার বয়স হয়েছে। কিন্তু লজ্জায় এখনও তরুণ বয়সের পরিপাট্য আছে। তাকে সন্ধ্যার কাছে বসতে বলায় সে বেশ সহজভাবে তার পাশে গিয়ে বসল।

প্রৌঢ়ার মুখ কঠিন হয়ে উঠল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন সত্যর মাকে; খুব মৃদুস্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন—এ ছেলেটি কে, একে তো আমি চিনতে পারলাম না!

সত্যর মা অতিরিক্ত প্রীতি প্রকাশ করে বললেন—ওকে আমাদেরই এক ছেলে বলতে পারেন। ওর নাম মন্মথনাথ ভট্‌চাজ। আমার ছেলে সত্যর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে।

প্রৌঢার মুখের কাঠিন্য তাতে কমল না। তিনি আস্তে আস্তে, যেন বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—ভট্‌চাজ? তরে মানে ব্রাহ্মণ?

—হ্যাঁ। সেই সহজ হাসি হেসেই বললেন সত্যর মা। বাইরের এই ছেলেটিকে এই পরিবারের অন্তরঙ্গ পরিবেশের মধ্যে দেখে ভদ্রমহিলার মনে কেমন এক ধরনের বিরোধিতা জেগে উঠেছে সেটা বুদ্ধিমান ছেলে মন্মথ ঘরে ঢুকেই বুঝতে পেরেছে। সত্যর মা সেটিকে দূর করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সেটাও সে বুঝতে পারলে। তার মনে হলো সে যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে। মনে মনে এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। ভদ্রমহিলার শেষ প্রশ্নটি শুনে সে সত্যর মায়ের উত্তরের গায়ে গায়ে বললে, বেশ হাসিমুখে সপ্রতিভভাবেই বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ব্রাহ্মণ। আমরা বাবা পৌরোহিত্য করেন, গুরুর কাজ করেন।

ভদ্রমহিলার মুখ একটু বক্র হয়ে উঠল। বললেন—বাবা গুরুর কাজ করেন? মানে লোককে মন্ত্র দেন?

মন্মথ বুঝেছে তাকে যতক্ষণ কথা বলতে হবে ততক্ষণ সপ্রতিভভাবেই বলতে হবে। সে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কাউকে মন্ত্র দেন না। আমাদের বংশে অব্রাহ্মণকে মন্ত্র দেওয়া নিষেধ।

ভদ্রমহিলা এবার বেশ শক্তভাবে বললেন—তার মানে তুমি হিন্দু। ব্রাহ্ম নও। তা মন্ত্র নিয়ে কি হয়। সেই হ্রীং ট্রীং বলে জপ করতে হয় তো? তাতো ভগবানকে পাওয়া যায়?

কঠিন আঘাত পেয়েও মন্মথর মুখের হাসিটি নষ্ট হয় নি। কিন্তু বিরূপতা ধীরে ধীরে কঠিন থেকে কঠিনতর আঘাতের মধ্য দিয়ে একটা স্পষ্টতর মূর্তি ধারণ করতেই একদিকে সত্যর মা, অন্যদিকে নবাগত তরুণ ভদ্রলোকটি বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

কিন্তু তার আগেই মন্মথ উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখেই সত্যর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে—আমি এখন যাই মাসীমা। পরে আসব। সত্যর জন্তেই এসেছিলাম। কিন্তু দেখছি সত্য তো নেই!

তরুণ ভদ্রলোকটি এবার হাসিমুখে বললেন—বাঃ, চলে যাবেন কি মশাই? এসে-ছেন, আলাপ না করেই চলে যাবেন এ কেমন কথা? এটা আপনারই বা কেমন ভদ্রতা হবে? আমরা কি অপরাধ করলাম।

ঘরের আড়ষ্ট আবহাওয়াটিকে এক মুহূর্তে সহজ ও শীতল করে দিলেন ভদ্রলোক। সত্যর মা এই সুযোগ নিয়ে বললেন—উঠবে কেন? বস। সত্য এখুনি আসবে। সে ফুল আনতে বাগানে গিয়েছে।

বেশ প্রসন্ন মনেই আবার বসে পড়ল মন্মথ।

ভদ্রলোক তাকে হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন—আপনার নামটি তো শুনলাম। কি পড়েন?

—এবার এফ. এ. পাস করেছি।

সত্যর মা বাকীটুকু বলে দিলেন হাসিমুখে। সেইটুকু উল্লেখ করলেন যেটুকু না বললে মন্মথর সত্য ও পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। বললেন—মন্মথ এণ্ট্রান্সে ফার্স্ট হয়েছে। আমার ছেলে সত্যও অবশ্য লেখাপড়ায় ভালো, তবে মন্মথর মতো নয়! মন্মথর সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া করেই ভালো ফল করেছে।

কৌতুহলী হয়ে ভদ্রলোক বলেন—কেমন ফল করেছে?

মন্মথ বললে—এণ্ট্রান্সে থার্ড, এফ. এ.-তে ফোর্থ হয়েছে সত্যপ্রসাদ।

ভদ্রলোক তারিফ করে উঠলেন—বাঃ বাঃ এই তো, চমৎকার! এস ভাই, তুমি আমার কাছে এসে বস। তোমার সঙ্গে আলাপ করা তো আনন্দের কথা!

মন্মথ হেসে উঠে গিয়ে ভদ্রলোকের পাশে বসতে বসতে বললে—আমাদের তিন-জনের দলের যে থার্ড ম্যান তার নাম লোকেশ, লোকেশ সেন। সে এণ্ট্রান্সে সেকেণ্ড এফ. এ.-তেও সেকেণ্ড হয়েছে। সে-ই আমাদের সবচেয়ে ইণ্টারেস্টিং লোক। সে আজ আসে নি।

মন্মথ নবাগত ভদ্রলোকের পাশে বসে তাকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পেলে। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী হবে না। কি রূপবান মানুষ! দোহারা দীর্ঘ চেহারা। রঙ ফর্সা নয়, শ্যামলা। তাতেই যেন ভদ্রলোককে মানিয়েছে বেশী! ফর্সা রঙ হলে এত সুন্দর লাগত না। চাঁছা-ছোলা, কচি, টসটসে শ্যাম মুখখানি লাবণ্যে ঢলঢল। মুখখানা কেমন খানিকটা মেয়েদের মতো। অথচ বড় বড় চোখ দুটিতে অকুণ্ঠিত, উজ্জ্বল, প্রসন্ন দৃষ্টি চেহারায় একটা আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য ও চটুলতা এনে

দিয়েছে। দেখামাত্র যা ভালো লাগে। দেখলেই ভালবাসতেই ইচ্ছা করে।

মন্মথ একটু সম্ভ্রমের কুণ্ঠা প্রকাশ করে বললে—কিন্তু আপনার নামটা তো জানলাম না!

একটু হেসে তিনি সস্নেহে মন্মথর পিঠে হাত দিয়ে বললেন—নিশ্চয়! নিশ্চয়! আমার নাম এতক্ষণ না জানানোটা অপরাধ হয়ে গিয়েছে। আমার নাম নিরঞ্জন দাস।

প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা শান্ত অবহেলার সঙ্গে বললেন—অমন করে বললে কেন? পুরোটা বল! ওঁর নাম ডক্টর নিরঞ্জন দাস।

তাঁর কণ্ঠস্বরে যে প্রচ্ছন্ন অহংকার ছিল তাকে চিনতে ভুল হলো না মন্মথর। সে হেসে বললে—আপনি কোথায় প্র্যাকটিস করেন?

এবার প্রৌঢ়া হেসে উঠলেন একটু সশব্দে। সন্ধ্যা পর্যন্ত নিচুমুখে মুচকে হাসল। মালতী তার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরলে। প্রৌঢ়া বললেন—উনি ডাক্তার নন, ডক্টরেটের ডক্টর। দর্শন শাস্ত্রে পি. এইচ. ডি.।

নিরঞ্জনবাবু হাসিমুখে বললেন—ভাই, শুনে যত বড সড, ভারী-সারী মনে হচ্ছে সেসব আমি কিছুই নই। এলাহাবাদ কলেজে মাস্টারী করি। মাঝখানে বিলেতে দু বছর থেকে ওটা সংগ্রহ করে এনেছি। তা তুমি তো ভাই, তোমাকে তুমিই বললাম, কিছু মনে করো না, তুমি তো ভাই এফ. এ.তে ফার্স্ট হয়েছ, সংস্কৃত কেমন জান তুমি?

এবার সত্যর মা বললেন—তুমি ঠিক লোককেই ধরেছ বাবা! ও সংস্কৃত খুব ভালো জানে। এফ. এ.তে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহেশ ন্যায়রত্ন মশায়ের মতো মানুষ ওর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছেন।

মন্মথ বিনীত ভাবে বললে—মাসীমা আমাকে ছেলের মতো ভালবাসেন বলে অত করে বলছেন। তবে মাছ যেমন জন্মাবধি জলেই সাঁতার দেয়, আমিও তেমনি ছেলেবেলা থেকে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের ছেলে বলে, সংস্কৃতের মধ্যে বাস করেছি, সংস্কৃত নাড়াচাড়া করেছি।

নিরঞ্জনবাবু বললেন—তা হলে ভাই, আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে সংস্কৃত শিখতে। কি লজ্জার কথা বল তো ভাই, আমি দর্শন শাস্ত্র পড়াই, অথচ সংস্কৃত জানি না বলে মূল হিন্দু দর্শন পড়তে পারি না। আমাকে পড়তে হয় ম্যাক্স্‌মূলার!

—কিন্তু কি করে শিখবেন সংস্কৃত?

—তা ঠিক শিখব। আমি আপাতত ছুটিতে কলকাতায় আছি মাসখানেক! এরই মধ্যে সংস্কৃত শেখার গোড়াপত্তন করে ফেলব। তুমি আমাকে কেবল একটু সাহায্য করবে!

—খুব করব। আপনি আমার সাহায্য নেবেন এ তো আমার ভাগ্যের কথা।

এই সময় সত্য ঘরে ঢুকল হাতে বাগান থেকে সংগ্রহ করা ফুলের গোছা নিয়ে। সত্যই প্রতিদিনের মতো ফুলগুলি ভাগ করে বসার ঘরের তিনটি ভাসে, বাকীটা বাবা-মায়ের শোবার ঘরের দিয়ে এলো। সত্যর মা বেহারার হাতে খাবার ট্রে দিয়ে তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। হাতে হাতে খাবার পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সত্যর মা অতিথিদের সঙ্গে মন্মথ ও সত্যর হাতে খাবারের ডিশ তুলে দিলেন।

নিরঞ্জনবাবু বললেন—ঘরে অর্গান রয়েছে, কেউ গান শেখেন বুঝি?

মালতী, মন্মথ, সত্য সকলেই হাসল মুখ টিপে। এমন কি সন্ধ্যা পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে হাসল একটু।

সত্যর মা বললেন—হ্যাঁ, আমার মেয়েরা, আমার ছেলে, ওরা সব গান শেখে।

প্রৌঢ়া বিস্মিত হয়ে বললেন—ছেলেরাও গান শেখে? আশ্চর্য তো!

সত্যর মা হঠাৎ বললেন সত্যকে—লোকেশ কেন এলো না একবার নিচে গিয়ে দেখ তো সত্য।

মন্মথ বুঝলে সত্যর মা তাকে এই অপ্রিয় আলোচনার ভিতর থেকে সরিয়ে দিলেন। তারপর মালতীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—তোমার একটা গান শুনিয়ে দাও ওঁদের।

মালতী একবার কাকীমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিলে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে অর্গানের সামনে গেল। মালতী তাঁর মুখের দিকে চেয়েই রয়েছে, যেন কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায়। কিন্তু সত্যর মা তাকে কিছু বললেন না। সে আস্তে অর্গানের ডালাটি খুলে, পুরো হাতে চাপ দিয়ে হার্মোনিয়ামের সম্মিলিত শব্দকে আয়ত্তের মধ্যে আনল।

নিরঞ্জন বললে—আপনি তো গুণী মহাশয় লোক, তাহলে আমাদের গান শুনিয়ে দিন।

মালতী তখন লজ্জিত মুখে অর্গানে আলতোভাবে আঙুল চালিয়ে মৃদু মৃদু সুর তুলে চলেছে। সে এক সময় অর্গান বাজাতে বাজাতে দুই চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে গান ধরলে। অর্গানের সুরের সঙ্গে গলার সুর মিলতেই কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে উঠল। সে গাইছে :

হৃদয়-মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছে গোপনে।

অমৃত সৌরভে আকুল প্রাণ (হায়)
ভ্রমিয়া জগতে না পায় সন্ধান,
কে পারে পশিতে আনন্দ ভবনে।
তোমার করুণা—কিরণ বিহনে॥

গভীর ও গম্ভীর সুরের ভাগবত-প্রেমের গান। শুনতে শুনতে ঘরের মধ্যে একটি শান্ত, নম্র, নিস্তব্ধতা নেমে এলো। যেন আসন্ন সন্ধ্যার সূর্যালোকিত আনন্দ-উজ্জ্বলতার উপর একটি স্নিগ্ধ শ্যাম ছায়া বিস্তৃত হলো। সর্বাগ্রে সে প্রসন্নতা ছড়িয়ে পড়ল সত্যর মায়ের মুখে। তাঁর পরিপক্ব মুখখানি কেমন শান্ত গম্ভীর হয়ে গেল, চোখের দুটি পাতা নেমে এলো, দুটি হাত বোধহয় নিজের অগোচরেই বদ্ধাঞ্জলি হয়ে গেল। নিরঞ্জনবাবুর যে মা এতক্ষণ কেমন প্রচ্ছন্ন আস্ফালন করছিলেন, তাঁরও চোখ বন্ধ হয়ে গেল আস্তে আস্তে, হাত দুখানি জুড়ে গেল।

এ অভিজ্ঞতা পূর্বে আর একবার হয়েছে মন্মথর। যেদিন আনন্দমোহনবাবু আর শাস্ত্রীমশাই এসে এই ঘরেই গান শুনেছিলেন। এ অবশ্য আরও অপরূপ অভিজ্ঞতা। মনে হচ্ছে প্রার্থনা যেন মূর্তিমতী হয়ে এই ঘরে এসে ঘরের কেন্দ্রে, সকলের নম্র হৃদয়ের কেন্দ্রে হাত জোড় করে নতমস্তকে আবির্ভূত হয়েছে।

মন্মথ জানে এদের পূজা-পদ্ধতি ভিন্ন ধরনের। এদের পূজার প্রধান অঙ্গ প্রার্থনা। আর প্রার্থনার মূল আনুষঙ্গিক গান। এদের আসন লাগে না, ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য লাগে না। লাগে শুধু একটি নম্র, নির্মল হৃদয়, যে হৃদয়ে ঈশ্বরের আসন পাতা হয় প্রার্থনার মুহূর্তে।

সব শেষে সে তাকাল মালতীর দিকে। মালতীর হাত দুখানি অর্গানের উপর চলেছে আপন মনে, কিন্তু বড় বড় চোখ দুটির পাপড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আজ তার চোখের প্রান্তের দীর্ঘ ঘন রোমগুলি পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে, বুঝা যাচ্ছে। মুখখানি তার শান্ত গম্ভীর।

নিরঞ্জনবাবু কোট-প্যাণ্ট পরে থাকলেও তাঁকে বেমানান মনে হচ্ছে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন মালতীর মুখের দিকে। মন্মথ বুঝতে পারলে কেন তিনি এমনভাবে মালতীর দিকে তাকিয়ে আছেন। এ বাড়িতে ছেলে-মেয়েরা গান শেখে এ কথাটায় তাঁর মা যতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন নিরঞ্জনবাবুও তার চেয়ে বেশী কিছু মনে করেন নি। কারণ আজ অনেক সম্ভ্রান্ত বাড়িতেই গান শেখার চল হয়েছে। সেই অনুযায়ী গান শেখার ব্যবস্থা হয়। মেয়েদের গান জানাটা একটা বিশেষ ও অতিরিক্ত গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই রকম একটা ব্যাপার ভেবেছিলেন তাঁরা। কিন্তু তাঁর ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে।

মন্মথর সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল সন্ধ্যাদির মুখের দিকে চেয়ে। সন্ধ্যাদির চেহারাটি একটু ভারী। মুখখানি অন্য সকলের, অন্য ভাই বোনদের মুখের চেয়ে একটু বেশী ভরাট। কিন্তু মুখখানি লাবণ্যে সরলতায় ঢলঢলে। মুখে স্থায়ীভাবের মতো একটি প্রচ্ছন্ন হাসির ভাব সব সময় লেগেই থাকে। সেই সন্ধ্যাদি দামী জামা-কাপড় পরে, পাত্রপক্ষের সম্মুখে বিবাহের কন্যা হিসাবে পরীক্ষা দিতে এসেছিল। তার হাত দুখানিও জোড় হয়ে গিয়েছে। আর কি আশ্চর্য, তার বিস্ফারিত দুই চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। মন্মথর মনে হলো, সন্ধ্যাদি এসময় যদি জোরে ডাক ছেড়ে স্বচ্ছন্দে কাঁদতে পেত তা হলে স্বস্তি পেত। কিন্তু এই পরিবেশে তাকে স্বভাবতই শান্ত থাকতে হয়েছে। নিরঞ্জনবাবু একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

গান শেষ হলো। সকলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেশ কয়েক মিনিট সময় নিয়ে আবার শান্ত ও সহজ হলেন। সত্যর মা যেমন বসেছিলেন ঠিক তেমনই বসে রইলেন। নিরঞ্জনবাবুর মায়ের চোখের কোণে জল জমেছিল। তিনি হাতের তালু দিয়ে দুই চোখের জল মুছে চাইতেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল সন্ধ্যার চোখের অবিরল জলধারার দিকে। তিনি কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—খুব চমৎকার গান। আর তোমার শিক্ষাও খুব ভালো!

মালতী একটু হাসল। এ সব কথা শুনে সে অভিভূত হয় না, খুব একটা খুশীও হয় না, প্রশংসা সে বেশ সহজভাবেই গ্রহণ করে, করতে পারে। সে ডক্‌টর দাসের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে—আপনার কেমন লাগল তা তো বললেন না?

নিরঞ্জন একটু নড়েচড়ে বসে বললে—ভালো!

মালতী অদ্ভুত। সঙ্গে সঙ্গে সে আর এক কাণ্ড করে বসল। অর্গানে হাত দিয়ে বললে—এবার আপনাকে একখানা গান শোনাই!

বলেই সঙ্গে সঙ্গে সে অর্গানে আবার দ্রুত সুর তুললে। চঞ্চল সুর, মুখর কথা।

> সখী প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে।
> তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে॥
> যদি শুধায় কে দিল, কোন্ ফুল-কাননে,
> তোর শপথ আমার নামটি বলিস নে॥

এবার আর চোখ বন্ধ করে নি মালতী। গানের সুরের তালে তালে, শিল্পীর ও রসিকের আনন্দ পরিপ্লুত হয়ে, উজ্জ্বল চকিত চঞ্চল দৃষ্টিতে পরিহাস-হাস্যময় মুখে তরুণ ডক্‌টর দাসের দিকে চেয়ে গান গেয়ে চলল। সত্যর মা, সন্ধ্যা, এমন কি

মন্মথ পর্যন্ত এ মালতীকে চেনে। এ সেই মালতী যে গানের কথায়, স্বরে, ভাবে আবিষ্ট হয়ে সৃষ্টি করে নূতন ভাব, নূতন আনন্দ, নব নব অনুভব। কিন্তু ডকটর দাসের মা চোখ খুলে এবার স্থির দৃষ্টিতে মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখের দৃষ্টি তীব্র, মুখের নিম্নাংশ কঠিন হয়ে উঠল। এ কি ব্যবহার! একটি অল্পবয়সী মেয়ে সকলের প্রকাশ্য দৃষ্টির সম্মুখে একটি অনাত্মীয় তরুণের মুখের দিকে চেয়ে হেসে হেসে মাথা দুলিয়ে প্রগল্‌ভভাবে গান গাইছে। এ কেমন কথা, কেমন রুচি? এ তাঁর আরও খারাপ লাগছে এই কারণে যে তাঁর লেখাপড়া জানা ছেলে, অতি প্রসন্ন মুখে, লুব্ধ দৃষ্টিতে লোভীর মতো গায়িকার গানের সঙ্গে গায়িকাকেও যেন গ্রাস করতে চাইছে। তিনি যেন অতি তীব্র এক অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলেন।

গান শেষ হতেই তিনি বাঁচলেন। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি আর একবার নড়েচড়ে বসে বললেন—এবার তো আমাদের উঠতে হয়।

ডকটর দাস কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—বাঃ, বাঃ, চমৎকার! যেমন গান, তেমনি গাওয়া! রবিবাবুর গান নিশ্চয়!

কেউ কোনো উত্তর দেবার আগেই তাঁর মা ধীরে ধীরে একটু চিবিয়ে বললেন—আপনার বাড়িতে বুঝি গানের খুব চর্চা আছে?

কথাটা তিনি সত্যর মায়ের মুখের দিকে যথাসম্ভব ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে বললেন। কথাটার মধ্যে যে সূক্ষ্ম শ্লেষের তীক্ষ্ণ গোপন আঘাত ছিল তা এই সমাজের মানুষ হয়ে সত্যর মায়ের না বুঝবার কথা নয়। তাই কথাটি শুনে তাঁর সুন্দর, পরিপক্ক মুখখানি যেন একবার রাঙা হয়ে উঠল। তবু ভদ্রতার খাতিরে সে আঘাত যথাসম্ভব সামলে নিয়ে শান্তভাবে বললেন, আপনি ঠিক ধরেছেন। আপনি বুদ্ধিমতী, আপনার চোখে এড়িয়ে যাবে কি করে? গানের চর্চার কথা বলছেন? আমাদের বাড়িতে মালতীর কথা তো বাদই দিলাম, আমার ছেলে সত্যর কথাও বাদ দিলাম। আমার মেয়েরা দুজনেই গাইতে পারে। এমন কি আমার পাঁচ বছরের ছোট মেয়েটা—সেটাও বেশ সুর আর মাত্রা রেখে গুন গুন করতে শিখেছে।

ডকটর দাসের মায়ের অতি সুন্দর শীর্ণ কঠোর মুখখানি কঠোরতর হয়ে উঠল। তিনি বললেন—গান অবশ্যই খুব ভালো জিনিস। তা দিয়ে সব চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে প্রণাম নিবেদন করা যায়, করাও হয়। তার সীমা কোন্‌খানে তা আমি জানি না।

হয়তো আরও কিছু কঠিনতর কথা বলতেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু ডকটর দাস

বাঁচিয়ে দিলেন। তিনি শশব্যস্ত হয়ে বললেন—এ কি কথা বলছ মা? আজ যা শুনলাম, যা শুনলে তা শুনবার কল্পনাও করেছিলে এখানে আসবার সময়? আমার কথা বলতে পারি, আজ আমি এখানে যা শুনলাম, সে শুনতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। তারপর যা দেখলাম ওঁকে উনি তো একেবারে একজন পাকা আর্টিস্ট।

এরপর ডকৃটর দাসের বুদ্ধিমতী জননী আর কথা বাড়ালেন না। চুপ করে গেলেন। একটু সরে গিয়ে সন্ধ্যার পাশে দাঁড়ালেন তার পিঠে হাত দিয়ে। তাকে সস্নেহে বললেন—আজ যাই মা! এলাহাবাদ যাবার আগে আবার একদিন এসে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব, আলাপ করে যাব। কেমন?

সন্ধ্যা হাসিমুখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

ডকৃটর দাস একবার হাস্যমুখী সন্ধ্যার মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে মালতীর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন—মায়ের কথা তো শুনলেন। এলাহাবাদ যাবার আগে আবার একদিন আসছি। সে দিন পেট ভরে আমাকে আপনার গান শোনাতে হবে। আমি শুধু আপনার গান শুনতেই আসব।

ডকৃটর নিরঞ্জন দাসের এই অনুপম ডাক্তারিতে প্রসন্ন হৃদ্যতার স্পর্শে কথাবার্তায় গুমোট কেটে গেল। সত্যর মা অত্যন্ত আপ্যায়িত হয়ে বললেন—এসো বাবা, নিশ্চয় এসো। আপনিও আসবেন দয়া করে। আজ কথা দিয়ে গেলেন। না এলে জানব রাগ করে আসেন নি।

ডকৃটর দাসের মায়ের শীর্ণ মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল। হেসে বললেন—আমি আবার আসব তা তো আপনার মেয়েকে আগেই বলে রেখেছি।

এর পর একমাত্র সন্ধ্যা ছাড়া সকলেই নেমে গেলেন অতিথিদের বিদায় দিতে। তাঁরা নেমে আসতেই জ্যোতিপ্রসাদ আপনার চেম্বার থেকে উঠে এসে যোগ দিলেন। হাত জোড় করে বললেন—আপনারা এসেছিলেন, এ আমার কত সৌভাগ্যের কথা। স্বর্গীয় দাস মশাইকে আমি বাল্যকালে দেখেছি। উত্তর ভারতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে সারা জীবন ব্যয় করে গেলেন। অথচ কত বড় ডাক্তার ছিলেন। কীর্তিমান, পুণ্যবান মানুষ ছিলেন তিনি। আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া এ দুর্লভ ভাগ্য!

এবার ডকৃটর দাসের মা, স্বর্গীয় প্রচারক দাস মহাশয়ের পত্নী সত্যসত্যই পরিতৃপ্ত হলেন। তিনি গাঢ় কণ্ঠে বললেন—আপনার মেয়েকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। বড় শান্ত, ভক্তিমতী মেয়ে। আর দেখে মনে হলো বড় সরল।

বলে তিনি একবার কটাক্ষে চাইলেন মালতীর দিকে। তাঁর এ চাউনির অর্থ জ্যোতিপ্রসাদবাবু ছাড়া আর কারও অগোচর রইল না।

তবে যার দিকে তাকানো হলো সে তখন ডকৃটর নিরঞ্জন দাসের সঙ্গে হাসিমুখে সমস্ত দলের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। ডকৃটর দাসের সঙ্গে গল্প করতে করতেই সে নেমে এসেছিল। বিবাহের প্রসঙ্গ উঠতেই বুদ্ধিমান ডকৃটর দাস বুদ্ধিমানের মতোই সে আলোচনার স্থান থেকে প্রথা-অনুযায়ী একটু সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

মন্মথর মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। খুব বিষণ্ণ বোধ করতে লাগল সে। তার মনে হলো ওই যে মেয়েটি হাসিমুখে একজন আত্মীয়কে ভাবী পরমাত্মীয় জ্ঞান করে অতি প্রসন্ন উদারতার সঙ্গে তার চিত্তের সমস্ত সরসতা, রসিকতা ও মাধুর্য দিয়ে আপ্যায়ন করছে তাকে সঠিকভাবে কেউ চেনে না। তার এই চিরকালের পরমাত্মীয়রাও চেনে না তাকে সম্পূর্ণভাবে। ডকৃটর দাসকে এই প্রসন্ন ঔদার্যের সঙ্গে আপ্যায়ন করতে আর কেউ পারে নি!

সেই সঙ্গে আরও একটা কথা মনে হচ্ছিল তার। কিন্তু সে ভাবনায় ছেদ পড়ল। জ্যোতিপ্রসাদবাবু হাসিমুখে ক্রহাম গাড়িখানার দরজা খুলে ধরলেন মিসেস দাসের উঠবার জন্য। মিসেস দাস গাড়িতে উঠলেন। তারপর উঠলেন তাঁর ছেলে ডক্টর নিরঞ্জন দাস। জ্যোতিপ্রসাদ নিজে হাসিমুখে দরজা বন্ধ করে দিলেন। যাবার সময়েও ডক্টর দাস হাত নেড়ে সকলকে, বিশেষভাবে মালতীকে হাসিমুখে বিদায় জানালেন। অন্য সকলের হাসিমুখে বিদায় দিলে, মালতী সেই সঙ্গে নিজের হাত ডক্টর দাসেরই মতো তুলে একমুখ হাসির সঙ্গে হাত নেড়ে বিদায় জানালে। তার সুকুমার হাতের আঙুলগুলি চঞ্চলভাবে নেড়ে বিদায় দেবার ভঙ্গিটি দেখে মন্মথর বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। আহা, কি সুন্দর অপরূপ ভঙ্গী! এমন ভঙ্গিতে এই পৃথিবীতে কেউ কি কোনো দিন কাউকে এত সুন্দরভাবে বিদায় দিয়েছে?

গাড়িখানা চলে যেতেই যাঁরা অতিথিদের বিদায় দিতে নিচে নেমে এসেছিলেন তাঁরা সবাই উপরে যাবার জন্যে রওনা হলেন। কেবল মন্মথ দাঁড়িয়ে রইল। তাকে দাঁড়িয়ে যেতে দেখে মালতী একবার পিছন ফিরে তাকে দেখে, তার দিকে একবার চকিতভাবে তাকিয়ে অন্য সকলের সঙ্গে উপরে উঠে গেল। যেতে যেতে সত্য ফিরে বললে—কি হলো, দাঁড়িয়ে গেলি যে! আয়!

—না রে, আজ যাই!

তার যেন আজ এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল সে এদের থেকে পৃথক। এদের কেউ নয় যেন সে। আর, আর, নিজের কাছেও স্বীকার করতে লজ্জা, সে নিজের এত বিপুলশক্তি নিয়েও ডক্টর দাসের কাছে

যেন কত ছোট হয়ে গিয়েছে! যে সর্বাঙ্গীণ লাবণ্য, যা বুদ্ধিমত্তা, চরিত্র, ব্যবহার, শিক্ষা, বেশ, ভূষা, রূপ—সব কিছু মিলিয়ে তৈরি, যা ডক্টর দাসকে অপরূপ করে তুলেছে তা যেন কোনো দিন এ জীবনে অর্জন করতে পারবে না মন্মথ। নিজের অজ্ঞাতেই সে একবার নিজেকে ডক্‌টর দাসের সঙ্গে তুলনা করে নিলে। রূপ? অমন সুকুমার তারুণ্য থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেছেন। রূপ সে কোথায় পাবে? যারা পূর্বকালে একদা সমাজে লোকচক্ষে, বিশেষ করে স্ত্রীলোকের দৃষ্টিতে নিজেকে কুদর্শন করে তুলবার জন্য বিধাতা-দত্ত রূপকে চেষ্টা করে কুরূপ করে তুলত, যারা নিজের মস্তকের সম্মুখভাগ মুণ্ডিত করে পশ্চাৎভাগের কেশগুচ্ছে শিখা বন্ধন করে, তীব্রদৃষ্টিতে সংসারের ললিত শোভা ও ললিত বৃত্তির দিকে জ্বলন্ত অগ্নির মতো তাকিয়ে থাকত; মনুষ্য হৃদয়ের যে কোমল বৃত্তিগুলিকে অবলম্বন করে লতার মধ্যে রসের মতো ভোগের কামনা বাসা বেঁধে থাকে, তাকে যারা বংশানুক্রমিকভাবে উচ্ছিন্ন করবার সাধনা করত, সে তাদেরই বংশধর। সে রূপ পাবে কোথায়? রূপকে তো তারা সর্বদাহী তেজে রূপান্তরিত করত। যাকে এঃ বাহ্য বলে বংশানুক্রমিকভাবে হেয় করে এসেছে তাকে কি আজ চাইলেই ফিরে পাওয়া যায়? এই লম্বা হিলহিলে শরীর, যাকে ঘিরে আজ স্বল্পমেয়াদী বর্ষার ঢলের মতো যৌবনের সাময়িক লাবণ্য ও দীপ্তির স্পর্শ লেগেছে, চওড়া কপাল, লম্বা নাক, ছোট চোখ—এই নিয়েই তাকে এ জীবনের খেলা খেলে যেতে হবে।

আর লাবণ্য? লাবণ্যই বা আসবে কোথা থেকে? লাবণ্য পাবার জন্যে যে সচ্ছল, ভোগসমৃদ্ধ বংশক্রম ও জীবন প্রয়োজন, জন্মের পর ভোগের যে নিত্য আয়োজন দরকার তার কণামাত্রও তো সে পায় নি।

তবে হ্যাঁ, আছে। বিদ্যা আছে, মেধা আছে। ডক্‌টর দাস পণ্ডিত লোক, অনেক লেখাপড়া শিখেছেন। তবে কতটা পাণ্ডিত্য তিনি অর্জন করেছেন? তাঁর মননের শক্তি ও পরিধি কতখানি? সে যতদূর যেতে পারবে ততদূর যাবার কল্পনাও করতে পারবেন না পণ্ডিত-রসিক মানুষটি। আর মেধার সঙ্গে আছে নিজের মেধার সম্পর্কে সুগভীর প্রত্যয় যা আকাশস্পর্শী অহংকারের সামিল। বংশানুক্রমিক মেধা ও মননের চর্চার সঙ্গে এই প্রত্যয়েরও চর্চা হয়েছে। তার মধ্যে তা সুগভীর বিনয়ের আকারে প্রকাশিত। বাইরে থেকে লোকে কার বিনয় দেখে মুগ্ধ হয়। কিন্তু সে তো নিজে জানে এ বিনয়ের অর্থ কি!

সত্য তার পিঠে ঠেলা দিলে—কি হলো, জগন্নাথের মতো দাঁড়ালি যে! চল।

মন্মথর আর উপরে যেতে ইচ্ছা করছে না। তার ইচ্ছা হচ্ছে এইখান থেকেই চলে যেতে। বার বার মনে হচ্ছে সে এদের কে যে এই পারিবারিক ঘটনার

ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে উপস্থিত থাকবে ? অথচ আজ সে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিল তা আর সম্পন্ন হলো না। সে একবার পিরানের পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিলে। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। সে কি জানত আজ এমনি ধরনের একটা ভিড়ের মধ্যে পড়তে হবে ?

সত্য তার পিঠে একটা সজোরে ধাক্কা দিলে—কি করে, জগন্নাথের তুলনা দিলাম পছন্দ হলো না ? এবার বলছি শোন, বেতো ঘোড়ার মতো দাঁড়ালি কেন ? চল !

সে তাকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল। মন্মথও এক উদ্দেশ্যহীন যন্ত্রের মতো চালিত হয়ে উপরে উঠে চলল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সত্য বললে—সন্ধ্যাদির সঙ্গে ডক্টর দাসের বিয়ে হলে কেমন হবে বল তো ?

মন্মথ একটু ইতস্তত করে বললে—আচ্ছা সত্য, তোরা তো ব্রাহ্মণ, কিন্তু ডকটর দাসরা তো ব্রাহ্মণ নন। তা হলে কেমন করে বিয়ে হবে ?

সত্য একটু জোরের সঙ্গে তার কথার উত্তর দিলে। বললে—না, ওঁরা ব্রাহ্মণ নন, ব্রাহ্ম। আমরাও ব্রাহ্মণ নই, ব্রাহ্ম। কাজেই ব্রাহ্মের সঙ্গে ব্রাহ্মের বিয়ে হবে এর মধ্যে তো কোনো অসুবিধা নেই। ব্রাহ্মরা সকলেই পরমেশ্বরের সন্তান, সেখানে ইতর-বিশেষ নেই।

মন্মথ অনুভব করলে সত্যর কথার অন্তরালে একটা অকারণ ও অপ্রত্যাশিত জোর খেলা করে যাচ্ছে। সে বুঝলে কথাটা সত্যকে আঘাত করেছে। সে মুখে বললে —শুধু পাত্র হিসেবে বিচার করলে খুব ভালো পাত্র !

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সত্য সোৎসাহে বললে—শুধু ভালো পাত্র মানে ? এই বয়েসে বিলেতের ডক্টরেট। আর কি চমৎকার দেখতে ! তা ছাড়া ওঁর বাবা বিলেত-ফেরত মস্ত ডাক্তার ছিলেন এলাহাবাদে। খুব বড লোক আর তেমনি ধার্মিক মানুষ ছিলেন ! আপার ইণ্ডিয়া মানে ইউ পিতে বিখ্যাত লোক ছিলেন। তাঁর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়া একটা ভাগ্যের ব্যাপার। যাক, বাবা মা এবার বাঁচলেন।

মন্মথ একটু বিস্মিত হয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সত্যর মুখের দিকে।

সত্য বললে—বাবা-মা ভাববেন না ? মেয়ে বড়ো হয়েছে। আমার এক বছর আগে দিদি এণ্ট্রান্স পাস করেছে ! এখনও বিয়ে হয় নি।

উপরে গিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে সত্য কোথায় কি কাজে যেন উঠে গেল। ঘরে তখন আর কেউ নেই। শুধু মন্মথ, মালতী আর উষা।

মন্মথ উঠে দাঁড়াল। মালতীর মুখের দিকে নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে

বললে—আজ যাই ?

মালতীও উঠে দাঁড়াল। বড় বড় চোখে আরও বড় বড় করে তাকিয়ে সে যেমন কোনো কথা না বলেও অনেক কথা বলে, তেমনিভাবে তাকিয়ে বললে—যাবে ?

—হ্যাঁ। আমাকে বরং একটু এগিয়ে দাও না !

মন্মথ এ ধরনের অনুরোধ করে না কখনও। তাই এই অনুরোধ শুনে সে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—এগিয়ে দেব ? চল !

সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি নামতে নামতে মন্মথ বললে—আমার যে কিছু পাওনা আছে তোমার কাছে ?

মালতী তার দিকে তাকাল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সিঁড়িতে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে যেমন এক ধরনের মৃদু, কাম্পিত দীর্ঘ সুরে বললে—কী ?

বলে তার মুখের দিকে চাইতেই মালতীর মুখখানি কেমন হয়ে গেল। তার চোখের দৃষ্টি গভীরতর ও করুণ হয়ে উঠল। কি বলতে গিয়েও সে বললে না। তারপর সমস্ত ভঙ্গিটা পালটে হেসে বললে—কি দিতে হবে ?

তার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মন্মথ অতি তৃপ্ত হাসি হেসে বললে—যা দেবার তা তো না চাইতেই দিয়েছ !

তার পরিতৃপ্ত হাসি পরমুহূর্তে বিষণ্ণ হাসিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। একটু চুপ করে থাকল সে। বিষণ্ণভাবে বললে—কিন্তু আমি কি দেব তোমাকে ? তোমাকে দেবার মতো আমার তো কিছুই নেই !

মালতী মুখ নিচু করে সিঁড়ির মাঝখানেই দাঁড়িয়ে রইল। মন্মথও কিছুক্ষণ নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে নেমে গেল। মালতী দাঁড়িয়েই রইল যতক্ষণ না মন্মথ সব সিঁড়িগুলি নেমে নিচে বাঁক ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল ততক্ষণ। যাবার আগে মন্মথ একবার বাঁকের মুখে পিছন ফিরে তাকিয়ে তার মুখের হাসিটি আশ্চর্য ধনের মতো মনের পেটিকায় কৃপণের মতো সঞ্চয় করে কৃতার্থের মতো চলে গেল। কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারেও একটি অতিকৃতার্থ হাসি তখন তার সারা মুখে শুক্লপক্ষের প্রথম তিথির মৃদু জ্যোৎস্নার মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

১২

হোস্টেলে পৌঁছে গেটে ঢুকতেই তার দেখা হয়ে গেল রাধাশ্যামের সঙ্গে। রাধাশ্যাম হোস্টেলের মুখেই প্রতীক্ষারত বিরোধিতার মতো দাঁড়িয়েছিল। তাকে

দেখতে পেয়েই সে পরমোৎসাহে তাকে এক হাত দিয়ে বেড়ে ধরে অতি মধুর-ভাবে বললে—আয়, আয়! কতক্ষণ এসেছিস ভাই? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছিস?

—তা অনেকক্ষণ! কাঠকাঠ নিষ্প্রাণ কণ্ঠে জবাব দিলে রাধাশ্যাম।

সন্দেহপরায়ণা পত্নী যেমন স্বামী রাত্রি করে ফিরে এলে স্বামীর অঙ্গ স্পর্শ করে অনুভব করবার চেষ্টা করে স্বামীর দেহে কি দেহাবরণে কোথাও পরস্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শের কোনো চিহ্ন, সিঁদুরের দাগ কি সরু এক গাছা চুল, না হয় নারীর অঙ্গ-গন্ধ লেগে আছে কি না, তেমনি রাধাশ্যামও তার ব্যবহারের মধ্যে এই কিছুক্ষণ আগে মন্মথ কি বহন করে এনেছে, ঈর্ষাপরায়ণের মতো তাকেই খুঁজছিল। যা খুঁজছিল তা খুঁজে পেতেও তার দেরি হলো না। এই যে উৎসাহ ও আনন্দ মন্মথর মুখ দিয়ে হাত দিয়ে, বাক্য দিয়ে স্বতোৎসারে বেরিয়ে আসছে এ তার নিজের সৃষ্টি নয়, এ সে অন্য কোথাও থেকে নিশ্চিতভাবে সংগ্রহ করে এনেছে।

মন্মথ সব বুঝতে পারছে। সে বললে—এঃ, তা হলে তো ভারী অন্যায় হয়ে গিয়েছে শ্যাম। আয়!

বলে তাকে টানতে টানতে হোস্টেলের ভিতরে নিয়ে গেল।

রাধাশ্যাম থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললে—এখন যাব কি করে? এখন তো তোদের কি বলে, 'স্ট্যাডি অাওয়ার' আরম্ভ হবে।

—না, এখনও দেরি আছে, তুই আয়!

তার হাত ধরে হোস্টেলে ঢুকতে ঢুকতে বললে—তুই আর আসিস না কেন শ্যাম?

রাধাশ্যাম ভারী গলায় বললে—এসে কি করব? তুই তো থাকিস না। আমি কি শুধু তোর থাকবার জায়গাটা দর্শন করে ফিরে যাবার জন্যে আসব না কি?

মন্মথ হাসল। বললে—তা কেন? তুই আজ বলে যা কবে কখন আসবি, আমি ঠিক থাকব।

এবার খুশী হলো রাধাশ্যাম। বললে—আচ্ছা, আজ তো বুধবার, আমি শনিবার দিন আসব।

মন্মথ একটু ভেবে বললে—শনিবার তো হবে না ভাই—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রূঢ়ভাবে রাধাশ্যাম বললে—দেখলি, কেন আসি না! যেদিনটা বললাম সেদিন তোর সময় হবে না!

মন্মথ জানে ওর মনের ভিতর বিরোধিতা আর রাগ একটা গরম স্রোতের মতো এখন চলাফেরা করছে। সেটা বুঝেই সে হাসিমুখে বললে—শনিবার ওদের ওখানে যাব না। অন্য কাজ আছে। তুই শুক্রবার আয়।

রাধাশ্যাম মেনে নিলে।

মন্মথ জিজ্ঞাসা করলে—তুই কি আমাকে কিছু বলতে এসেছিলি ?

—হ্যাঁ। একটা খবর দেবার ছিল। বেশ গম্ভীরভাবেই বললে রাধাশ্যাম।

—বল্।

—পরশু তারিখ, শুক্রবার, বেলা একটার সময় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তোর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। তুই পৌনে একটার সময় তোর কলেজ থেকে বাবার সঙ্গে গিয়ে সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে দেখা করবি। তিনি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

মন্মথ খুশী হলো শুনে।

তার পরীক্ষার খাতা দেখে মহেশচন্দ্রই নিজে থেকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন কয়েক মাস আগে। তিনি সে কথা ভুলে যান নি। নিজে থেকে আবার আহ্বান জানিয়েছেন তাকে।

রাধাশ্যাম বললে—তাই যাস, তাহলে। ভুলিস না যেন।

তারপর বললে—আমি আজ যাই !

মন্মথ বললে—আচ্ছা।

সঙ্গে সঙ্গে মনে ধাক্কা লাগল রাধাশ্যামের মনে। অভিমানটা আবার রাগের চেহারা নিয়ে ফিরে এলো। ধাক্কাটা লাগল মন্মথর নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর থেকে। সে মনে মনে প্রত্যাশা করেছিল মন্মথ তাকে আরও কিছুক্ষণ বসতে বলবে, আরও খানিকটা গল্প করতে চাইবে। তা না করায় তার আহত অভিমান তাকে ক্রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারণ করালে—চললাম রে, আমি চলে গেলেই তুই বেঁচে যাস দেখছি।

অবাক্ হয়ে গেল মন্মথ তার আক্রমণের বক্র ধারা দেখে। সে আহত বিস্ময়ের সঙ্গে বললে—তোকে আমি কি বললাম রে, যার থেকে তোর মনে হলো তুই গেলে বেঁচে যাই ?

আরও ক্রুদ্ধ হলো রাধাশ্যাম। মন্মথর এ প্রশ্নের যা জবাব তা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার ক্ষমতা তার নেই। মন যা যা ভাবে তার সব কি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারে। তাই ভিন্ন পথে গিয়ে যুক্তিহীনের মতো সে প্রবলতর আঘাত করলে—তোর মন ঠিক বুঝিরে মন্ত, আর বুঝি বলেই ঠিক কথাই বলেছি। আচ্ছা, তুই আমার একটা কথার জবাব দিবি ?

মন্মথ তার কথায় কোনো জবাব দিলে না। এই কাল্পনিক অভিযোগের কোন্ উত্তর, অন্তত কোন্ সদুত্তর সে দিতে পারে ?

রাধাশ্যাম বললে—আচ্ছা, তুই কিসের জন্যে আমাদের এড়িয়ে চলিস ? আমাদের

সঙ্গ ছেড়েছিস ? তুই তো বামুন পণ্ডিতের ছেলে ! হ্যাঁ, মানলাম তুই লেখাপড়ায় ভালো ! তা ভালো হয়েও তো তুই সেই বামুন-পণ্ডিতের ছেলেই থাকবি। আর তার ওপর এক দেশবিখ্যাত পণ্ডিতের নাতনীর সঙ্গে তোর বিয়ে হবে। এ সব সত্ত্বেও তুই কি করে সত্যদের সঙ্গে অত মেলামেশা করিস ?

মন্মথর মনের ভিতর এক সঙ্গে দুই বিপরীত ভাব ধাক্কাধাক্কি করছে বেরিয়ে আসবার জন্য। রাগ আর ভয় ; দুর্দান্ত রাগ আর দুরপনেয় ভয়। সে দুই বিপরীতের তাড়নায় চুপ করে রইল নিজেকে সংযত করে। রাধাশ্যাম তার এই নীরবতাকে নিজের পরিপূর্ণ বিজয় বলে ধরে নিয়ে বললে—তোকে ভালবাসি তাই বললাম। আমার কথাটা ভেবে দেখিস, ভালো বলেছি কি মন্দ বলেছি। ভেবে দেখে বলিস। আমি চললাম।

বলেই মন্মথকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সে পেছন ফিরে বেরিয়ে গেল। তার মূর্তি মন্মথর চোখের সামনে দিয়ে সরে গেলেও সে নিষ্কৃতি অনুভব করলে না। মনে হলো রাধাশ্যাম যেন তাকে শুধু প্রহার করেই যায় নি, তার গায়ে ময়লা মাখিয়ে দিয়ে গিয়েছে, সেই সঙ্গে তাকে একটা ভয় দেখিয়ে গিয়েছে।

বি. এ. ক্লাস আরম্ভ হয়েছে কয়েক দিন আগে থেকে।

বড় ভালো লাগছে লেখাপড়া করতে। এ সময় তার ক্লাস কামাই করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু তবু ক্লাস কামাই করেই সে পৌনে একটার সময় সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে গিয়ে পূর্বনির্দিষ্ট সময় মতো উপস্থিত হলো। গোপীনাথ শাস্ত্রীমশাই তার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। সে উপস্থিত হতেই তিনি সোৎসাহে নিজের ডান হাত প্রসারিত করে বললেন—এসো, এসো। তোমারই জন্যে বসে আছি। আমি দেখে আসি ন্যায়রত্নমশাইকে। তিনি একটার সময় তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

শাস্ত্রীমশাই চটির শব্দ তুলে বড় বড় গোল থামকে এড়িয়ে প্রিন্সিপ্যালের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। আবার কয়েক মুহূর্ত পরেই হাসিমুখে বেরিয়ে এসে তাকে ডাকলেন—এসো মন্মথ, ন্যায়রত্নমশাই বললেন তিনি এখন তোমার জন্যই অপেক্ষা করছেন !

কি আনন্দের কথা !

সে প্রশান্ত হাসিমুখে শাস্ত্রীমশাইকে অনুসরণ করে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে গিয়ে ঢুকল। প্রশস্ত ঘর, দেওয়ালের গায়ে আলমারিতে আলমারিতে ছাদের ধার পর্যন্ত বই ঠাসা। দেখেই কত সুন্দর লাগে ! প্রশস্ত ঘরের একদিক চেয়ার-টেবিলে সজ্জিত,

ঘরের অপরার্ধ সমস্তটা জুড়ে নিচু চৌকি। তাতে সাদা চাদরের ফরাস পাতা। সেইখানে চারিপাশে স্তূপীকৃত থরে থরে বিন্যস্ত বই ও পুঁথির মাঝখানে একটি নিচু ডেস্ক রেখে মহেশচন্দ্র বসে কাজ করছেন। মাথার উপরে একটা টানাপাখা চলছে, তা সত্ত্বেও তিনি ঘামছেন অল্প অল্প। তাঁর ছোট ছোট চুলের জুলফির নিচে দিয়ে ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে উদ্যত, কপালেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে সাদা পোখরাজের দানার মতো।

মন্মথ হাসিমুখে ঘরে ঢুকতেই তিনি সামনের ডেস্কের উপর কাগজপত্র গুটিয়ে রেখে তার দিকে চাইলেন প্রসন্ন গম্ভীর মুখে। একবার দুজনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হতেই ন্যায়রত্ন মশাইয়ের স্মিত কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ওপর নিজের প্রসন্ন দৃষ্টি স্থাপিত করে সে দ্রুত পায়ে কৃতকৃতার্থের মতো জোড়হাতে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পাদস্পর্শ করে ভূমিষ্ঠ প্রণাম নিবেদন করলে।

এ প্রণামের মাহাত্ম্য মন্মথর গোপন মন জানে। যাঁকে প্রণাম নিবেদন করা হলো তিনি যেই হোন তিনি এই প্রণাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রণাম নিবেদন করলে তার জন্য স্নেহ ও সমাদরের আসনখানি নিজের মনে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে পেতে দেন। প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়রত্নমশাই তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, স্মিত মুখে উচ্চারণ করলেন—কল্যাণ হোক।

তারপর তাকে আর এক মুহূর্ত স্মিত কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে চৌকির সামনে চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললেন—বস। তুমিও বস গোপীনাথ।

হেসে বললেন—এই গ্রন্থের স্তূপের মধ্যে কোথায় বসাব? আর—

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গোপীনাথ শাস্ত্রী বললেন—আর এই বসাতেই সুবিধা স্বস্তি দুই হবে। আপনার সঙ্গে একাসনে বসতে অস্বস্তি হতো।

গোপীনাথের কথা শুনে মহেশচন্দ্র শুধু একটু হাসলেন।

মন্মথ হাসিমুখে সশ্রদ্ধভাবে বসলেও সে মহেশচন্দ্রকে খুঁটিয়ে দেখছিল। তার এই সময়ে হঠাৎ মনে পড়ল সেই অশীতিক্রান্ত বৃদ্ধ রামরাম স্মৃতিতীর্থকে। গোপীচন্দ্রের এই কথা শুনলে তিনি কি বলতেন তাও সে কল্পনা করে নিলে। তিনি এই কথা শুনে অকারণে দন্তহীন মুখে এক মুখ হেসে বলতেন—না হে, একাসনেই বস। সেই ভালো। আমার শিশু পৌত্র-পৌত্রী কি দৌহিত্র-দৌহিত্রী আমার কোলে যদি মূত্র কি বিষ্ঠা ত্যাগ করে তাহলে কি তাকে ফেলে দেব? তবে এইভাবের তফাতের সঙ্গে বয়সের তফাতটাও বিবেচনার বিষয়। সেটাও মন্মথর চোখ এড়ায় নি।

মহেশচন্দ্রের বয়স এখন কত হবে? বাহান্ন তিপান্ন, তার বেশী নয়। দীর্ঘাকার,

সমুন্নতদেহ পুরুষ ; তীক্ষ্ণ নাসা, আর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ অথচ প্রশান্ত। ঠোঁট দুটি পাতলা, চাপা। মুখখানি ভারী আবার ভারী নয়ও। মুখখানি দেখলে এক মুহূর্তে সম্ভ্রম হয়। মনে হয় গভীর আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন অথচ নম্র। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। সেখানে শুভ্র দক্ষিণোপবীতি উপবীতের সঙ্গে ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের গাঁথা একটি বড় মালা দু হালি করে গলায় দেওয়া। মাথার ছোট ছোট চুলে সামান্য পাক ধরেছে।

তিনি কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। বললেন—তোমার সংস্কৃতের উত্তর-পত্র আমি এবার পরীক্ষা করেছি। তোমার উত্তরের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা মেধারও অতি-রিক্ত, যা নিজের কুলধর্ম সম্পর্কে অবিচল আস্থা প্রাণের গভীরে না থাকলে আসে না। সেই কারণে তোমার খোঁজ করেছিলাম।

বলে তিনি থামলেন। মন্মথ স্মিত মুখে সশ্রদ্ধভাবে প্রশংসার পুরস্কার শিরোধার্য করে মাথা নিচু করলে।

মহেশচন্দ্র বললেন—তোমাদের বাড়ি তো হুগলী জেলায় গোবিন্দপুরে ?

—আজ্ঞে !

—আমি গোপীনাথের কাছে সংবাদ নিয়েছি ! তোমার পিতার নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ?

—আজ্ঞে !

—আমি আমাদের কুলপঞ্জী দেখেছি। তোমরা আমাদের দৌহিত্র বংশ।

শুনে মন্মথর স্মিত মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে সবিনয়ে বললে—আজ্ঞে আমার জানা ছিল না !

ন্যায়রত্ন একটু হেসে বললেন—এ তো এ কালে জানবার কথা নয় ? এ তোমার কোনো ব্যক্তিগত ত্রুটির ব্যাপার নয়। এ কালই এমনি। তোমার ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ আমাদের বংশের কন্যাকে বিবাহ করে গোবিন্দপুরে বসবাস করেন। তিনি বঙ্গদেশীয় কুলীন ছিলেন। এই বিবাহ সূত্রেই এখানে তাঁর বসবাস।

একটু চুপ করে থেকে পাশে রাখা উত্তরীয় দিয়ে মুখের ঘাম মুছে আবার বললেন —আমাদের বংশ সর্বৈব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশ এবং বহুবিস্তৃত। তার সঙ্গে আজ অন্তত তের চৌদ্দ পুরুষ শাস্ত্রচর্চা চলছে আমাদের বংশে। এর ফলে পাণ্ডিত্য যাই থাক, আমাদের বংশের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি প্রবাদের মতো প্রচলিত হয়েছে।

গোপীনাথ এই সময় কথা বললেন—ঠিক বলেছেন। ও প্রায় আপনার প্রবাদের কাহিনীর মতোই চলিত হয়েছে। হুগলী জেলার নারিট, ঝিকরে, শিয়াখালা, হরি-পাল এই সব জায়গায় পণ্ডিতসমাজের বর্তমানে মুখ্য পরিচয় হলো 'মহেশ ন্যায়রত্নের

গোষ্ঠী'। পণ্ডিতরা নিজেরাই এই বলে পরিচয় দিতে অহংকার বোধ করেন।
গোপীনাথ শাস্ত্রীকে এই সময় বাধা দিলেন মহেশচন্দ্র। মৃদু গম্ভীর স্বরে বললেন—ও কথা অমনভাবে উচ্চারণ করতে হয় না গোপীনাথ। আত্মপ্রশংসা মৃত্যুতুল্য পাপ। আর ও তো মিথ্যা প্রশংসা! আমি এমন কে যার নাম অমনভাবে চিহ্নিত করে উল্লেখ করতে হবে? যদি কোনো গৌরব থাকে সে আমার বংশের দীর্ঘ ধারাবাহিক তপস্যার!
গোপীনাথ তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললে—সে তো বটেই। এ তো আপনারই উপযুক্ত কথা! সব কথা তো সব কণ্ঠে উচ্চারিত হয় না, আর হলেও তা মানায় না।
মহেশচন্দ্রের কথাগুলি যেমন তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত বলে মন্মথর মনে হলো, গোপীনাথের কথাগুলি কিন্তু তেমন মনে হলো না। এ কথা ঠিক যে গোপীনাথ মিথ্যা কথা বলছেন না, বা অসুন্দর কিছু উচ্চারণ করছেন না। তবু তার মনে হলো তাঁর কথাগুলির অন্তরালে কোথায় যেন স্তাবকতার ক্ষীণ সুর প্রচ্ছন্ন আছে।
গোপীনাথ এই সময় মন্মথর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি ন্যায়রত্ন মশায়ের বংশের কথা জান?
মন্মথ হেসে বললে—কিছু কিছু জানি! অন্তত শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামীর নাম জানি।
মহেশচন্দ্রের মুখে একটি প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল। বললেন—আমাদের বংশ ও কুলকে পবিত্র করে গিয়েছেন শ্রীধর স্বামী। একসঙ্গে তিনি পণ্ডিত ও ভক্ত। তা যদি তিনি না হতেন তা হলে ওই মহৎ কর্ম সম্পন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না, আর সে কর্ম এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হতো না। এই শ্রীধর স্বামী ছিলেন আমার ঊর্ধ্বতন ত্রয়োদশ পুরুষ। তারপর বহু পণ্ডিতই জন্মেছেন আমাদের কুলে। শাস্ত্র ও জ্ঞানের চর্চা কোনো দিন বন্ধ হয় নি। অন্তত দুশো জন পণ্ডিত জন্মেছেন আমাদের বহুবিস্তৃত বংশে। আমার যদি কোনো গৌরব থাকে তা এই বংশেরই গৌরব বলতে পার!
ন্যায়রত্ন মশায়ের মৃদু গম্ভীর অনুচ্চ কণ্ঠের এই আন্তরিক কথাগুলি ঘরের মধ্যে একটি আশ্চর্য পবিত্র গাম্ভীর্যের নিঃশব্দ পরিমণ্ডল রচনা করে গেল। কথাগুলি শেষ হয়ে গেলেও গাম্ভীর্য ঘরের মধ্যে ধূপের গন্ধের মতো যেন রয়েই গেল।
একটু চুপ করে থেকে মহেশচন্দ্র একটু ভিন্ন সুরে বললেন—তবে কথা কি—বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন। তারপর মন্মথর দিকে চেয়ে বললেন—তুমি তো ত্রিবেণীর মহামহোপাধ্যায় রামরাম স্মৃতিতীর্থ মশাইকে দেখেছ? তাঁর শ্রেষ্ঠ

বিশেষত্ব কি বলতে পার ?

মন্মথ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলে। এ প্রশ্নের সে কি উত্তর দেবে তা সে বুঝে উঠতে পারলে না। এই সুমহৎ পণ্ডিতটি রামরাম স্মৃতিতীর্থ সম্পর্কে তার মুখ থেকে কি শুনতে চাইছেন তা আন্দাজ করতে না পেরে মন্মথ সবিনয়ে প্রশ্ন করলে—আপনার প্রশ্নটি যদি একটু পরিষ্কার করে বলেন! ন্যায়রত্ন যেন একটা খেলা পেয়ে গেলেন। হেসে বললেন—আমি ওঁর চারিত্রিক বিশেষত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করছি। ওঁকে দেখলে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বেশী করে কি মনে হয় ?

মন্মথ কপাল ঠুকে বলে ফেললে—ওঁর আশ্চর্য খুশী খুশী ভাব। সদাসর্বদা যেন কোনো রকম একটা খুশীতে উনি ডগমগ করছেন!

উৎসাহের আতিশয্যে অমন পণ্ডিত মানুষটি ডান হাতের তর্জনীটি তুলে বললেন—তুমি ঠিক ধরেছ। ওঁকে দর্শন মাত্রেই যা সর্বাগ্রে চোখে শুধু নয়, মনেও লাগে, তা হলো গিয়ে ওঁর মনের অবাধ ও স্থিত আনন্দ। সে আনন্দ কোনো মুহূর্তে ক্ষুণ্ণ হয় না।

একটু চুপ করে থেকে ন্যায়রত্ন বললেন—আমি জানতাম, তুমি চক্ষুষ্মান ছেলে, তুমি ঠিক দেখতে পেয়েছ। তা দেখলাম আমার অনুমান মিথ্যা নয়। এই স্থির ও অবারিত আনন্দময়তা এ সব বিদ্যা, সব জ্ঞান, সব আচার, সব বাক্যের ঊর্ধ্বে, সব কিছুর ওপারে। সবাই আমরা জ্ঞানের, বিদ্যার ও পরম জ্ঞানের তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত। কিন্তু নিজের জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও চিন্তা বার বার আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। আমরা যা বহু ক্লেশে, বহু তপস্যায় সংগ্রহ করি তাই আবার গণ্ডী রচনা আমাদের তারই মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। অথচ একে যে অতিক্রম করতে পারে অবহেলায় সে-ই পথের শেষে উপনীত হয়। রামরাম স্মৃতিতীর্থ মশায় নিজের জীবনে অর্জিত সব জ্ঞান, সব বিদ্যাকে অতিক্রম করে, সব কিছুকে বর্জন করেছেন 'এহ বাহ্য' বলে। সেই কারণেই ভারমুক্ত হয়ে আনন্দ-লোকে জীবিত দেহেই উপনীত হয়েছেন!

মন্মথ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মহেশচন্দ্র বললেন—এত জ্ঞান, এত শাস্ত্রাধ্যায়ন, এত মনন, এত আচার-আচরণ এ সবের প্রয়োজন কেন ?

বলে নিজেই উত্তর দিলেন—এর প্রয়োজন হলো আনন্দের বা পরম পদের সন্ধানের জন্যই। এদেরই মধ্য দিয়ে সন্ধান; অথচ সন্ধান করে সেখানে পৌছুবার সময় এই সন্ধানের সামগ্রীকে পরিত্যাগ করে গেলে তবেই সেখানে পৌছুনো যাবে।

তিনি প্রসঙ্গ শেষ করলেন—আমরা যা পারি নি, উনি তা পেরেছেন। আমরা যা

চাই তা পাই নি, উনি তা পেয়েছেন !

মন্মথ স্মিত মুখে তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কোনো কথা বললে না, বলতে সাহস হলো না তার। তার মনে হলো সেই বৃদ্ধের অপরিসীম প্রসন্নতার মধ্যে যে অভয় ছিল তারই প্রশ্রয়ে সে কত প্রশ্ন করেছিল, করতে পেরেছিল সেই বৃদ্ধকে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন করলে হয়তো তা এই জ্ঞানীর গাম্ভীর্যের রুদ্ধদ্বারে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসবে। তাই সে চুপ করে থাকল।

ন্যায়রত্ন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার হয়তো মনে প্রশ্ন হচ্ছে, তোমার এই একান্ত তরুণ বয়সে তোমার সঙ্গে এ সব আলোচনা করছি কেন ?

একটু চুপ করে থেকে বললেন—তোমার উত্তরপত্রের মধ্যে কোথাও কোথাও এক অন্তিম জিজ্ঞাসার অস্পষ্ট চিহ্ন ছিল। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। আর তুমি মহামহোপাধ্যায় রামরাম স্মৃতিতীর্থকে দেখেছ, তাঁর সঙ্গে ভাবীকালে তোমার ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক হবে, সেই কারণেই কথাগুলি বললাম।

গোপীনাথ এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন। তিনি এবার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা স্মৃতি-তীর্থমশাই তো আপনাদের বংশেরই মানুষ ?

মহেশচন্দ্র এবার যেন কথঞ্চিৎ লঘুভাবে বললেন—আমাদের বংশের কি বলছ গো ? উনি এখনও আমার দশ রাত্রির জ্ঞাতি। আমাদের উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ দুই সহোদর ছিলেন। তাই তো কয়েক বৎসর পূর্বে যখন 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রবর্তনের প্রস্তাব হলো এবং আমাকে সম্মানিত করে আমার নাম তালিকার সর্বোচ্চে দেওয়ার প্রস্তাব হলো তখন আমি মনে মনে ভীত হয়েছিলাম। আমি ম্যাকডোনেল সাহেবকে ধরে তার পরিবর্তন করে প্রথম নাম দিলাম নবদ্বীপের নৈয়ায়িক ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের। সেই সঙ্গে ওঁর নামও তালিকায় সন্নিবিষ্ট হলো। না হলে ও সম্মান আমার কাছে অপরাধের বোঝার সমতুল্য হতো।

এবার মহেশচন্দ্র তাকে এক বিচিত্র প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, তোমার সঙ্গে হাই-কোর্টের অ্যাডভোকেট জ্যোতিপ্রসাদবাবুর পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, নয় ?

মন্মথ মনে মনে সচকিত হলো, খানিকটা ভয়ও পেল। এ প্রশ্ন ও তার উত্তর-পরম্পরা তাকে কোথায় নিয়ে যাবে ? কতদূর যেতে হবে তাকে ? সে মনে মনে শক্ত হয়ে উঠল। বাইরে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে সে উত্তর দিলে—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি যখন মাইনরে বৃত্তি পেয়ে কলকাতায় পড়তে এসে হিন্দু স্কুলে ভর্তি হই তখন দু'জন বন্ধু পেয়েছিলাম। একজন সিংহবাড়ির বিভূতি। আর একজন জ্যোতি-প্রসাদবাবুর ছেলে সত্য। দু তিন বছর পর বিভূতিকে হিন্দু ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে

দেওয়া হয়। আর সত্যর সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে ওদের পরিবারের সকলের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। সেও আজ আপনার ছ'সাত বছর হয়ে গেল!

তার উত্তর শুনে, মন্মথর মনে হলো, মহেশচন্দ্র অখুশী হলেন না। একটু হেসে বললেন—আমি ওদের দু'জনেরই সংবাদ জানি। প্রথম জন ধনীর সন্তান, কালের সমস্ত দুষ্ট গুণ ওর মধ্যে বর্তমান। তবে কি জান? যে কাল অতি উদাসীন, যার কাছে কেউ প্রিয়ও নয়, অপ্রিয়ও নয়, সেই কালই ওদের ধীরে ধীরে বিস্মৃতি ও অনাদরের ছায়ায় আবৃত করে দেবে। আজ হয়তো সঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না, ধীরে ধীরে সকলের দৃষ্টিগোচর হবে। আর অন্যপক্ষে, কালের যদি পক্ষপাত থাকে বলে ধরে নাও, তাহলে কালের সেই সমাদরের আলো জ্যোতিপ্রসাদের উপর পড়তে আরম্ভ করেছে। কালের সেই প্রসন্নতার উত্তাপে ও প্রসাদে ওঁর নবীন তরুর শক্তি ও সৌন্দর্য নিয়ে বেড়ে উঠেছেন। একেই নারায়ণের পার্শ্বপরিবর্তন বলে বোধহয়!

মহেশচন্দ্র একটু নীরব থেকে বললেন—একেই কালের অভিপ্রায় বলে। সেই অভিপ্রায়েই তুমি ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশের মেধাবী সন্তান, তুমি সংস্কৃত না পড়ে নূতন কালের বিদ্যার মাধ্যম যে ইংরাজী ভাষা, সেই পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা করছ।

মন্মথ একটু নড়ে চড়ে বসল।

মহেশচন্দ্র একটু হেসে বললেন—তোমাকে তিরস্কার করবার জন্য অবশ্যই এ কথা বলি নি। তুমি সংস্কৃত না পড়ে ঠিকই করেছ। আমি গোপীনাথের কাছে শুনেছি, তুমি এখানে এসে হিন্দু ইস্কুলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণ আর কাব্যও পড়তে, তার পর একদা পরিত্যাগ কর! ও ঠিকই করেছিলে তুমি। কারণ সেদিন পরিত্যাগ না করলে আজ করতে হতো, নয়তো এর পরে করতে। এও কালের অভিপ্রায়। একে তোমার সৌভাগ্যই বলব। কারণ নূতন কাল যেখানে নব কলেবরে, নবীন বেশে কুমার কার্তিকেয়ের মতো উদ্গত হচ্ছেন, তুমি সেইখানে সেই শোভাযাত্রার সঙ্গী। তুমি ঠিক করেছ কি বেঠিক করেছ এ বলার চেয়ে একে তোমার সৌভাগ্যই বলছি। কিন্তু শুধু একটি কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে ইষ্টমন্ত্র জপের মতো। স্বধর্মে যেন নিয়ত প্রতিষ্ঠিত থাক; তা থেকে যেন কখনও ভ্রষ্ট না হও।

মহেশচন্দ্রের অনুচ্চ কণ্ঠের এই কথাগুলি বর্ষার মেঘগম্ভীর আকাশের অদৃশ্যলোকে মণ্ডিত গুরুগুরু মেঘধ্বনির মতো তার অন্তরে প্রতিধ্বনি তুললে। সে নম্র হয়ে, নত হয়ে, মাথাটি অবনত করে তাকে যেন গ্রহণ করলে, ধারণ করলে।

পরমুহূর্তেই আর এক মহেশচন্দ্রকে দেখতে পেলে সে। লঘুস্বরে মহেশচন্দ্র বল-

লেন—তুমি বললে না, জ্যোতিপ্রসাদবাবুর ছেলে তোমার বন্ধু। তোমার বন্ধুত্বের উল্লেখে আমার নিজের বন্ধুতার কথা মনে পড়ল। তোমাকে বলি।

তারপর আরও একটু হেসে বললেন—তুমি জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মশায়ের নাম জান ?

মন্মথ হেসেই বললে—আজ্ঞে জানি বৈকি। তিনি ন্যায়, দর্শন দুইয়েরই বড় পণ্ডিত ছিলেন।

মহেশচন্দ্র খুশী হলেন, বললেন—জান দেখছি। ভালো, খুব ভালো। নিজের কুল পরিচয়ের সম্পর্কে জ্ঞান ও অহংকার বড় কথা গো! তা জান, আমি দেশ থেকে কলকাতায় এসে প্রথম কিছু দিন পড়লাম আমার খুড়োমশাই ঠাকুরদাস চূড়ামণির কাছে। তারপর পড়তে লাগলাম জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মশাইয়ের কাছে। যখন কাওয়েল সাহেব 'কুসুমাঞ্জলি'র সম্পাদনা ও অনুবাদ করার জন্যে সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক তর্কপঞ্চানন মশায়ের সাহায্য চাইলেন আমি তখন সংস্কৃত কলেজের কনিষ্ঠতম অধ্যাপক; পুরো অধ্যাপকও নই, সহ-অধ্যাপক। তুমি তো 'কুসুমাঞ্জলি'র নাম শুনেছ। তোমার সংস্কৃতের উত্তরপত্রে আমি 'কুসুমাঞ্জলি'র উল্লেখ দেখেছি। পরমাত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে উদয় আচার্য প্রণীত এই হিন্দু প্রমাণের গ্রন্থটি হরিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের টীকাসমেত কাওয়েল সাহেব অনুবাদ করবেন স্থির করে তার মূল অর্থভেদে সাহায্য চেয়েছিলেন তর্কপঞ্চানন মশাইয়ের। তা তর্কপঞ্চানন মশাইয়ের বয়স হয়েছে, তা ছাড়া তিনি নানান কাজে কর্মে ব্যস্ত থাকেন বলে কাওয়েল সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন। প্রথমটায় আমি ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু ক'দিন যেতেই ভয় ভেঙে গেল আমার। কাওয়েল সাহেব সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ আর আমি সামান্য সহ-অধ্যাপক; নায়েব ইংরাজ আর আমি ইংরাজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তি—এসব ভুলে গেলাম। ভুলিয়ে দিলেন কাওয়েল সাহেবই।

গল্প জমিয়ে তুলেছেন মহেশচন্দ্র। গোপীনাথ ও মন্মথ দু'জনকেই আগ্রহী করে তুলেছেন তিনি।

তিনি বলে চললেন—আমি থাকি শ্যামবাজারে আর কাওয়েল সাহেব থাকেন রাসেল স্ট্রীটে। আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় কলেজের পর চলে যাই রাসেল স্ট্রীটে সাহেবের বাড়ি। গিয়ে দেখি সাহেব আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন। সে অপেক্ষার আগ্রহ ঠিক কর্মের আগ্রহ নয়। আমার বয়স তখন আর কত? সাতাশ আটাশ। আমি তখন সাহেবকে সংস্কৃত পড়াই। সাহেব আমার ছাত্র। কিছুদিন যেতে না যেতেই আমিও সাহেবের ছাত্র হয়ে গেলাম। আমি সাহেবের কাছে

ইংরাজী পড়তে লাগলাম। এই দদাতি-প্রতিগৃহ্ণাতির মধ্য দিয়ে আমাদের অসম বন্ধুত্ব আরম্ভ হলো। আমি সামান্য অধ্যাপক আর সাহেব সংস্কৃত কলেজের মহা-মান্য অধ্যক্ষ; তা ছাড়া সাহেব আমার চেয়ে বছর দশেকের বড়। কিন্তু পদমর্যাদা কি বয়স কোনো পার্থক্যই আমাদের মধ্যে আর রইল না, কিছুদিনের মধ্যেই সব গিয়ে আমাদের গভীর বন্ধুত্ব হলো। সে বন্ধুত্ব আজও শোধ হয় নি। এই তো সাহেব স্বদেশে বিলেতে চলে গিয়েছেন, আজও সে বন্ধুত্ব অটুট আছে!

বলে মহেশচন্দ্র স্মিত মুখে নীরব হলেন তারপর বললেন—তোমাদের বন্ধুত্ব যেন প্রাচীন বয়স পর্যন্ত অটুট থাকে আশীর্বাদ করি তোমাকে!

আবার একটু চুপ করে থেকে একটু গম্ভীরভাবে বললেন—দেখ, আমাদের বন্ধুত্বের চরিত্র কেমন ছিল! তিনি এবং আমি সমস্ত অসমতা সত্ত্বেও বন্ধুত্বের প্রসাদে পরস্পরের হৃদয়ের শ্লাঘ্যতম সম্পদ যা, শ্রদ্ধা, তা পরস্পরে পরস্পরকে দিয়েছিলাম। হৃদয়ের গূঢ় উপলব্ধি কি গাঢ় বেদনার কথা পর্যন্ত পরস্পরের কাছে মন খুলে নিভৃতে প্রকাশ করেছি, কোনো সংকোচ বোধ করি নি। কিন্তু পর-স্পরের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণে কেউ আমরা পরস্পরের জীবনে হস্তক্ষেপ করি নি। সাহেব জানতেন, পারস্পরিক এত প্রীতি এত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও আমি তাঁর বাড়িতে জলগ্রহণ করব না। তাই সে অনুরোধও তিনি কোনোদিন করেন নি আমাকে। এ কথা এত করে তোমাকে বললাম এই কারণে যে তোমারও বন্ধুত্ব ভিন্নমতের মানুষের সঙ্গে হলেও পরস্পরকে সম্মান করে উভয়েই যেন নিজ নিজ বিশ্বাস এবং আচরণে স্বপ্রতিষ্ঠ থাকতে পার।

উঠবার সময় বললেন—আমার সঙ্গে স্মৃতিতীর্থ মশায়ের দেখা হবে খুব শীঘ্রই। আমি তাঁকে তোমার কথা বলব। শুনলে তিনি প্রীত হবেন।

দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তেই উঠে দাঁড়াল মন্মথ। এমন পূজ্য মানুষের সমাদরে চিত্ত পরিপূর্ণ হলেও, সে অনুভব করছে রামরাম স্মৃতিতীর্থ নামক এক অনুপস্থিত ব্যক্তির বিশাল ছায়া তার জীবনকে যেন আবৃত করতে চলেছে?

কয়েক মাসে সেই বিশাল ছায়া স্পষ্টতর মূর্তিতে যেন কায়া নিয়ে তার জীবনে আবির্ভূত হলো।

পুজোর ছুটির মাত্র কয়েকদিন আগে গোপীনাথ শাস্ত্রী মশাই নিজে এলেন তার হোস্টেলে। এলেন এক মুখ হাসি নিয়ে। প্রশ্ন করলেন—পুজোর ছুটিতে বাড়ি যাবে তো? কবে ছুটি হবে?

গোপীনাথ শাস্ত্রী আসায় সে একটু বিব্রত হলো। বললে—ছুটি তো হবে আর কয়েক দিনের মধ্যেই। ছুটি হবে সাতই অক্টোবর। মহালয়ার দিন থেকে।

গোপীনাথ বললেন—তুমি যে একেবারে ইংরেজীনবিস হয়ে উঠলে হে! মহালয়া তোমার বিশে আশ্বিন।

তারপর বললেন—তোমার ওপর যে একটা হুকুম এসেছে হে!

সে মনে মনে বিব্রত হয়েই ছিল। এবার সেই সঙ্গে বিস্মিত হলো। বললে—কি হুকুম পণ্ডিতমশাই?

গোপীনাথ বললেন—রামরাম স্মৃতিতীর্থ মশাই তোমাকে একবার তাঁর কাছে যেতে বলছেন।

বলে হাসিমুখে পিরানের পকেট থেকে একখানি চিঠি বের করে তার হাতে দিলেন। বললেন—নাও পড।

পরমাগ্রহে, গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে চিঠিখানি নিয়ে সে খুলে ফেললে। খোলা চিঠি। ভুষো কালিতে লেখা, কোণওয়ালা পরিচ্ছন্ন অক্ষরের চিঠিখানি। বৃদ্ধ লিখেছেন:

শ্রীমান মন্মথনাথ ভট্টাচার্য দীর্ঘায়ুচিরনিরাপৎষু,

শ্রীমান্ ভাই জীবন, আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্বাদ জানিবে।

ভাই জীবন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। বৎসরের পর বৎসর আমার গৃহসম্মুখে অশ্বত্থ-বৃক্ষে পাকা পাতা ঝরিয়া পড়ে আর চাহিয়া চাহিয়া দেখি। ভাবি আর কতদিন! প্রতিদিন মনে হয় এইবার হয়তো ঝরিয়া পড়িব। যাহাই হউক, আমি আগামী কার্তিক মাস গঙ্গাতীরে নিয়মসেবা করিব। আর কতদিন থাকিব জানি না। তোমাকে একবার দেখিবার বড় প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে। সেই কারণে তোমাকে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তুমি আগামী দোসরা কার্তিক ত্রিবেণীতে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ কর। এ সম্পর্কে তোমার পিতাঠাকুর মহাশয়কেও পৃথক পত্রে অনুরোধ জানাইয়াছি। দুই একদিন থাকিবার মতো বস্ত্রাদি সহ আসিবে। আসিলে যেটুকু আশীর্বাদ দিতে অবশিষ্ট থাকিল সেটুকু তোমার মস্তক স্পর্শ করিয়া চুকাইয়া দিব। ইতি—

নিয়ত আশীর্বাদক

রামরাম দেবশর্মা

চিঠিখানি পরম আশীর্বাদের মতো হাতে করে নিয়ে সে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

গোপীনাথ বললেন—তাহলে তোমার কলেজ বন্ধ হচ্ছে বিশে আশ্বিন। তুমি বিশেই বাড়ি চলে যাও। তারপর তোমার পূজা তো হলো সাতাশে আশ্বিন। তিরিশে আশ্বিন তোমার বিজয়া দশমী, পয়লা কার্তিক একাদশী। তুমি দোসরা কার্তিক দ্বাদশীর দিন বাড়ি থেকে ত্রিবেণী চলে যেও।

অকস্মাৎ মন্মথর একটা কথা মনে হতেই সে কথঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হয়ে গোপীনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জিতভাবে বললে—কিন্তু পণ্ডিত মশাই—

—কি ?

—আমার কি যাওয়া উচিত হবে ?

বিস্মিত হয়ে গোপীনাথ প্রশ্ন করলেন—কেন ? যাওয়া উচিত হবে না কেন ? মন্মথ কোনো উত্তর দিলে না। সে লজ্জিত হয়ে মুখ নামালে। তার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে গোপীনাথ একটু হেসে বললেন—ও, বুঝেছি। বিবাহের পূর্বে যাওয়া উচিত হবে কিনা তাই চিন্তা করছ ?

সঙ্গে সঙ্গে তার দ্বিধা এক মুহূর্তে তিনি উড়িয়ে দিয়ে বললেন—ওহে, রামরাম স্মৃতিতীর্থ আহ্বান জানিয়েছেন, এর ওপরে কি আর কোনো কথা আছে ? ও বিধাতার আশীর্বাদের সমতুল্য। তোমার পিতাকে উনি পৃথক পত্র লিখেছেন। তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করে চলে যেও। একটু থেমে বললেন—আমি আজ আসি।

যেতে যেতে একটু থমকে পিছন ফিরে বললেন—তবে যেও কিন্তু !

১৩

দোসরা কার্তিক।

এক প্রহর বেলায় মন্মথ নামল ত্রিবেণীর ঘাটে নৌকা থেকে। সঙ্গে মাত্র একটি পেঁটরা। তাতে দু'খানি কাপড় আর একটি পিরান। যে কজন লোক ঘাটে দাঁড়িয়েছিল তাদের একজনকে মহামহোপাধ্যায়ের আবাসস্থল জিজ্ঞাসা করতেই সে উজ্জ্বল, সকৌতুক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তার-পর হাত জোড় করে কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলে—আজ্ঞে মশায়, আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

মন্মথ বললে—গোবিন্দপুর।

বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি সেই জলসিক্ত কাদার উপরেই তাকে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে তার পায়ের ধুলো বা জল মুখে কপালে ও মাথায় ঠেকিয়ে বললে—আজ্ঞে 'পভু' আমি তো আপনার জন্যেই 'অপিক্ষা' করে আছি। কত্তা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার লেগে। আপনার নাম কি মন্মথ ভট্টাজ ?

মন্মথ হেসে বললে—হ্যাঁ গো ! আমিই মন্মথ ভট্টাজ !

লোকটি হাত বাড়িয়ে বললে—আপনার মোটটি আমাকে দ্যান মশাই !

—না, ও আমিই নিয়ে যেতে পারব হে !

লোকটি তার হাত থেকে পেঁটরাটি প্রায় কেড়ে নিতে নিতে বললে—সি কি হয় প্রভু। আমি খালি হাতে আর আপনি মোট নিয়ে কত্তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন, সে কি করে হয়। কত্তা মুখে কিছু বলবেন না, কিন্তুক সে ঠিক হবে না !

লোকটি প্রগল্‌ভ। কিন্তু তার কথাগুলি প্রাকৃত জনের বাক্য হলেও মাধুর্যে ও আন্তরিকতায় বড় মধুর। সে বলছিল—কাল 'আত্তিরে' কত্তা আমাকে বলে 'আথ-ছিলেন' যে আপনার যা নাম, সেই নামের এক ছোকরা বাবু আসবেন তিবেণীর ঘাটে সোকাল বেলায় ! তা আমি তো সেই কোন্ ভোর থেকে বসে আছি আপ-নার লেগে !

মন্মথ হাসল। বললে—তা তো আমি জানতাম না বাপু যে তুমি আমার জন্যে ভোরবেলা থেকে গঙ্গার ঘাটে বসে আছ। আমি তো এক প্রহর রাত্রি থাকতে বেরিয়েছি, তা জানলে না হয় মাঝরাত্রিতে বাড়ি থেকে বের হতাম।

লোকটি রসিকতা বুঝে খুব খানিকটা হাসলে। বললে—না, না, সি কি কথা ! আপনি আত্তিরে না 'নিদ্দা' গিয়ে বেরুবেন এ কেমন কথা হোত ! তা ই আপনি ঠিকই করেছেন ! আর আমি গঙ্গার ঘাটে ভোর থেকে দাঁড়িয়েছিলাম তো কি হয়েছে ? আমরা দাঁড়ালাম তো কি হলো ? ই তো ভালই হয়েছে ! মা গঙ্গার কোলের কাছে, পায়ের কাছে বসে থাকা, ই তো আপনার ভাগ্যির বেপার গো। খানিকটা পুণ্যি হলো !

মন্মথ লোকটিকে খুশী করবার জন্তই একটু হাসল। চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলে —ভট্‌চাজ মশায়ের বাড়ি আর কত দূর ?

সোৎসাহে লোকটি হাত দিয়ে সামনে দেখিয়ে বললে—এই তো, কাছেই। আর এসে গেলাম। ওই তো বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

সত্যই গাছপালা আর বাঁশঝাড়ের আড়ালে মস্ত বড় বাড়ির মাথা দেখা যাচ্ছে। মন্মথ অবাক হয়ে বললে—ওই কি ভট্‌চাজ মশায়ের বাড়ি ? অত বড় পাকা বাড়ি ?

লোকটি বললে—ওই অত বড পাকা বাড়ি ভট্‌চাজ মশায়ের বটেও, আবার লয়ও !

—সে কি রকম ?

—ভট্‌চাজ মশায়ের নিজের বাড়ি না হলেও ও আপনার তাঁর নিজের বাড়িও বলতে পারেন। ও বাড়ি হলো আপনার বংশবাটীর জমিদারদের বাড়ি। তাঁরা ভট্‌-চাজ মশাইকে দেবতার মতো, গুরুর মতো খাতির করেন। ওঁরা কতবার বলেছেন,

ত্রিবেণীতে আমরা এত বড় বাগানবাড়ি করলাম, আপনি তাতে একবার এসে থাকুন পণ্ডিতমশাই। তা আমাদের কত্তাই থাকেন না। বলেন—বাবা, এ তো রাজার বাড়ি, আনন্দ করার জন্য তৈরি করেছ তোমরা। তা আমি তো বাবা, জানি বলেই তো ও বাড়িতে থাকতে পারি না। আমি 'দরিদ্দি' ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, আমার কি ও বাড়িতে থাকা উচিত না থাকতে পারি?

—তবে এবারে যে রয়েছেন!

—সেই তো কথা! এবারে নিজে থেকেই জমিদারদের খবর দিয়ে পাঠালেন—এবার ওদের বাড়িতে এই কাত্তিক মাসটা থাকবেন নিয়ম সেবার জন্যে। তা ওঁরা তো 'কেতাখ্থ'। বাড়ি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে দিলে! সেই বাড়িতে উনি এই গোটা কাত্তিক মাসটা থাকবেন। মাস পয়লা, সংক্রান্তির দিন আসতে নাই বলে তার আগের দিন ওনারা এসেছেন ই বাড়িতে।

অল্প পথ। কথা বলতে বলতে তারা একটা দুটো বাঁক ঘুরে বাড়ির সামনে পৌছে গেল। বাড়ির গেটের সামনে কয়েকজন তারই জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রায় সকলেই ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ। খালি না, নগ্ন গাত্রে শুভ্র উপবীত, মাথার চুল সকলেরই ছোট ছোট করে ছাঁটা, পিছনে সুপুষ্ট শিখা। পরনে খাটো কাপড়; খালি পা। সকলেরই গম্ভীর মুখ তাকে সানন্দ অভ্যর্থনার জন্য স্মিত হয়ে উঠেছে। সকলেরই চোখের দৃষ্টি প্রত্যাশা ও কৌতূহলে উজ্জ্বল।

মন্মথ বুঝলে এঁরা তারই মতো ভট্‌চাজ পণ্ডিতের বাড়ির মানুষ হলেও এঁরা আচারে আচরণে ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। উষাকাল থেকে নিদ্রার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এঁদের জীবন শাস্ত্রের অনুশাসনে গ্রন্থিবদ্ধ। সূর্যোদয়ের বহুপূর্বে এঁরা শয্যাত্যাগ করেন ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন। ব্রহ্মা, মুরারি, ত্রিপুরান্তকারীকে সর্বাগ্রে স্মরণ ও প্রণাম করতে হয়; তারপর বিবিধ দেবতার স্তব করে বিছানা থেকে মাটিতে পা দেবার পূর্ব মুহূর্তে বলেন—হে পৃথিবী, তোমাকে বিষ্ণু ধারণ করে আছেন, তুমি আমার সঙ্গে লোকসমূহকে ধারণ করে আছ। আমি তোমার দেহে পাদস্পর্শ করছি। আমার পাদস্পর্শজনিত অপরাধ ক্ষমা কর। তারপর আরম্ভ হয় এঁদের দিনযাত্রা। প্রাতঃকৃত্য, স্নান অন্তে প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ করে এঁরা জলস্পর্শ করেন। মন্মথ শুনেছে এঁরা যজমানের ক্রিয়া করেন না, এঁরা শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বিদ্যা ও জ্ঞানের চর্চা নিয়েই এঁরা জীবনযাপন করেন। প্রত্যেকেই অধ্যাপক, বিভিন্ন স্থানে তাঁদের এক এক জনের টোল আছে, সেখানে এঁরা অধ্যাপনা করেন। তবে দশকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠানে এঁদের নিমন্ত্রণ করলে, পণ্ডিত হিসাবে সে নিমন্ত্রণ এঁরা সসম্মানে গ্রহণ করেন। সেদিন

ক্রিয়ার শেষ পর্যন্ত এঁদের উপবাস। এঁদের শাস্ত্রজ্ঞানজনিত কোনো মাহাত্ম্য থাকুক আর না থাকুক, উপবাস করায় এঁদের কৃতিত্ব আছে। এঁরা প্রায় সকলেই বাড়ির বিধবার মতো আচরণ করে থাকেন। মাছ মাংস ডিম তো দূরের কথা, পেঁয়াজ, মসুরডাল, পুঁইশাক এ সবও আমিষের মধ্যে গণ্য করেন, স্পর্শ করেন না। এমন কি এ সবের সঙ্গে সম্পৃক্ত সব কিছুকেই এঁরা আমিষ বলে বিবেচনা করেন। এঁদের অধিকাংশ জনের গৃহেই পরমেশ্বর ব্রহ্মের প্রতীক বিষ্ণুর শিলামূর্তি শালগ্রাম শিলারূপে অবস্থান করেন। তাঁর সেবা হয় সর্বাগ্রে। গৃহের সর্বজ্যেষ্ঠের সম্মান এবং সর্বকনিষ্ঠের সমাদর একযোগে তাঁকে দেওয়া হয়। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, যে সব সংসারে শালগ্রাম প্রতিষ্ঠিত সেখানে তাঁকেই সংসারের লৌকিক জীবনযাত্রার বাইরে রেখেও সংসারের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠা করে সারা সংসারটি তাঁকেই যেন অনুবর্তন ও প্রদক্ষিণ করে চলে। নিত্য নিয়মিত সংসারের সমস্ত উৎসব এই শালগ্রাম-শিলারূপী বিষ্ণুর বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রতি-পালিত হয়। এঁরা সেই সব উৎসবের দিনে প্রায়শই উপবাসী থাকেন। অন্য দিনে দিনের মধ্যভাগ অস্তে নারায়ণের প্রসাদস্বরূপ অন্নগ্রহণ করেন। আহার মাত্র দুবার। রাত্রিতে খানিকটা দুধ, কি ছানা কিছু সাধারণ ফল, কেউ কেউ সেই সঙ্গে চারটি শুকনো মুড়ি চিবোন। দুধ কি জল দিয়ে ভিজিয়ে খাবার কোনো উপায় নেই। কারণ তা হলে সব 'ভিজেন' হয়ে যাবে। সে আহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সত্য বা মিথ্যা যাই হোক, ঈশ্বরকে জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করে, অহরহ সতর্ক শুচিতা পালন করে এঁরা জীবন যাপন করেন। তাই স্মৃতির শাসন অতি প্রবল এঁদের জীবনে, নানান সম্ভব-অসম্ভব আচার পালনের মধ্য দিয়ে এঁদের জীবন-যাত্রা। এ বড় ভয়ংকর জীবন। সব সময় শুচিতা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়, সব সময় ছুঁই ছুঁই সতর্কতা, এই বুঝি শুচিতা ও পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হলো।

সেই কারণেই সকলের সঙ্গে সস্মিত দৃষ্টি বিনিময় সত্ত্বেও সে সসম্ভ্রমে হাসিমুখে মাথা নত করলেও কাউকে প্রণাম করলে না। কালের রীতি অনুযায়ী উপস্থিত সকলকেই নিরাশ করলে। তার সূক্ষ্মভাবে যেন মনে হলো তাঁরা সকলেই যেন তার এই ব্যবহারে খানিকটা অপ্রস্তুত ও বিব্রত বোধ করছেন।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, হাসিমুখেই প্রশ্ন করলেন সৌজন্য প্রকাশ করে—আসতে কোনো কষ্ট হয় নি তো?

যথাবিহিত বিনয়ের সঙ্গে প্রায় কৃত কৃতার্থের মতো সে সশ্রদ্ধ হাসিমুখে বললে—না! কোনো অসুবিধা হয় নি।

আবার প্রশ্নকর্তাই হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন—বাড়ি থেকে কখন বের হতে হয়ে-

ছিল ? অনেকটা রাত্রি থাকতে ?

মন্মথ বুঝলে তাকে একেবারে সোজাসুজি 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে প্রশ্নকর্তা দ্বিধা বোধ করছেন, সেই কারণে এই ভাববাচ্যে প্রশ্ন। সে সমান কৃতকৃতার্থতার সঙ্গে জবাব দিলে—আজ্ঞে, তা একটু রাত্রি থাকতেই বেরুতে হয়েছিল। বেশ খানিকটা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে। তারপর ভোর ভোর নৌকোয় উঠেছি।

প্রশ্নকর্তা বললে আপ্যায়িত করে—তাহলে দেহ ক্লান্ত হয়েছে, হাতমুখ ধুতে হয়!

মন্মথ সবিনয়ে বললে—আজ্ঞে, আগে ওঁর সঙ্গে দেখা করি, তারপর হাতমুখ ধোব। উনি কোথায় ?

মহামহোপাধ্যায় রামরাম স্মৃতিতীর্থকে সে কি বলে সম্বোধন করবে তা অনেক ভেবেও সে স্থির করে উঠতে পারেনি। এঁরা যে কারণে ভাববাচ্যে 'কর' বা 'করুন'-এর বদলে 'করা হয়' বলছেন সেও ঠিক একই কারণে সর্বনাম আশ্রয় করে 'উনি' বলে উল্লেখ করলে। তাতে অবশ্য বুঝবার কোনো অসুবিধা হলো না। যিনি তার সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি বললেন—বাবা পুজো করছেন!

মন্মথ একটু বিস্মিত হলো। বললে—এত বেলায় ?

যিনি 'বাবা' বলে স্মৃতিতীর্থকে উল্লেখ করলেন তিনি বোধহয় ওঁর পুত্র। তিনিই জবাব দিলেন—ওঁর প্রাতঃসন্ধ্যা ভোরেই হয়ে গিয়েছে। এখন গোপালের সামনে পূজা করছেন। নিত্যপূজা আমরাই করি। উনি বলেছেন নিয়ম সেবার মাসটায় উনি পূজা করবেন। তাই করছেন। পূজা বোধহয় শেষ হয়ে এলো। এস, বাড়ির ভিতর এস!

এতক্ষণে স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাকে 'এস' বললেন।

সকলের সঙ্গে সদলবলে সে বাড়ির বারান্দায় গিয়ে উঠল। উঠতেই যে যা মৃদু কণ্ঠে বলছিল সব নীরব হয়ে গেল। নিশ্চুপ বাড়ির ভিতর থেকে স্তোত্র পাঠের আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। সে স্তোত্রটিতে চিনতে পারলে, বৃদ্ধের কণ্ঠ-স্বরকেও স্মরণ করতে পারলে। অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ অবারিত, আবেগ কম্পিত কণ্ঠে প্রণাম নিবেদন করছেন :

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে
করুণা পারাবারা বরুণালয় গম্ভীরা
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে।

সে অন্য সকলের সঙ্গে নীরব হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল নিশ্চুপ হয়ে। অবারিত

কণ্ঠে আবৃত্তি করতে গিয়ে মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধের কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসছে।
এ সময় কি ঘটছে তার খানিকটা আন্দাজ করতে পারে মন্মথ। গোপালরূপী শালগ্রামকে সিংহাসনের উপর সম্মুখে রেখে বৃদ্ধ পূজাশেষ করে শেষপূজা নিবেদন করছেন। আসনের উপর বসে হাতজোড় করে তিনি পূজা নিবেদন করছেন; মন নিবিষ্ট করতে করতে একাগ্র মন ধীরে ধীরে নম্র নত হয়ে এসেছে! বিশ্ব-সংসারের পরম ধাতা ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর চরণে এই গোপালের মাধ্যমে তাঁর প্রাণ প্রস্ফুট পুষ্পে আলগ্ন মৌমাছির মতো আলগ্ন হয়ে গিয়েছে। সেই আস্বাদনের তৃপ্তি তাঁর প্রাণ পরিপূর্ণ করে এই মুহূর্তে দুই চোখ দিয়ে ধারায় ধারায় বিগলিত হয়ে আসছে। পুরো মানুষটারই এসময় রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে, পুরো মানুষটিই বোধহয় দ্রব হয়ে, বিগলিত হয়ে যাচ্ছে।
সকলেই নীরব, নিশ্চুপ। ওদিকে ঘরের মধ্যে স্তোত্রপাঠ সমাপ্ত হলো। চারিদিকে অখণ্ড নীরবতা। বাড়ির নিচেই গঙ্গার জলধারায় কলকল ধ্বনি স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার সঙ্গে সামনের বাগানের করবী শিউলি আর টগরের গাছের ডালে ডালে পাখি ডেকে ডেকে এ ডাল ও ডাল করছে। সেই পাখির ডাক এবং ডাল নড়ার মৃদু শব্দ পর্যন্ত অতি স্পষ্ট হয়ে কানে এসে বাজছে।
ঘরের ভিতর থেকে পরিপূর্ণ উচ্চ কণ্ঠের একটা ডাক উঠল ওরই মধ্যে—গোপাল! হে গোপাল!
আবার সব নীরব। সেই নিশ্ছিদ্র নীরবতা।
তারপর ঘরের ভিতর থেকে আহ্বান এলো—রামময়! রামময় আছ?
যিনি মন্মথর সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলেন তিনি সাগ্রহে, সসম্ভ্রমে, উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিয়ে উঠলেন—যাই বাবা!
তিনি বোধহয় এই ডাকটিরই প্রতীক্ষা করে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি সাড়া দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে চলে গেলেন।
কয়েক মুহূর্ত পরেই তিনি হাসিমুখে বেরিয়ে এসে সর্বাগ্রে মন্মথকে লক্ষ্য করে বল-লেন—এস। তোমাকে ডাকছেন!
তারপর সকলেরই দিকে হাসিমুখে তাকালেন তিনি। মন্মথর সঙ্গে সঙ্গে সকলেই মন্মথর পিছনে পিছনে ভিতরের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।
রামরাম গরদের কাপড় পরে, গরদের উত্তরীয় কাঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মুখে এক মুখ হাসি। তাঁর সঙ্গে মন্মথর সহাস্য দৃষ্টি বিনিময় হতেই তিনি নিজের হাসিকে প্রসারিত করে বার কয়েক সমঝদারের মতো ঘাড় নাড়লেন। মন্মথ সসম্ভ্রমে পদ-ক্ষেপ দ্রুততর করে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল প্রণাম করবার জন্য।

কিন্তু বৃদ্ধ হাঁ হাঁ করে উঠলেন—আমাকে নয়, আমাকে নয়, সর্বাগ্রে সর্বজ্যেষ্ঠকে প্রণাম নিবেদন কর। তিনি তোমার চোখের সম্মুখেই রয়েছেন এ ঘরে। ওই যে! বলে বৃদ্ধ রুপোর মাঝারি একটি সিংহাসনের দিকে আঙুল দেখালেন। সেখানে সিংহাসনাসীন গোপাল রয়েছেন।

মন্মথ মনে মনে লজ্জিত হলো। এমনধারা ভুল হওয়া তার উচিত হয় নি। সে নিজেকে সংশোধন করে সিংহাসনাসীন গোপালকে প্রণাম করলে ভূমিষ্ঠ হয়ে। তারপর সে উঠে দাঁড়াল। প্রণাম করবার জন্য সশ্রদ্ধ হাসিমুখে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতেই দীর্ঘকায় বৃদ্ধ তাকে নিজের দীর্ঘ দুই হাত প্রসারিত করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন! সে জড়িয়ে ধরার মধ্যে এমন এক আশ্চর্য আবেগ ও আন্তরিকতা ছিল যা বৃদ্ধের বুকের সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ দুই হাতের চাপের মধ্যে সে অনুভব করতে পারল। বৃদ্ধ তার থেকে বেশ খানিকটা লম্বা। বৃদ্ধ তার মাথার চুলের উপর নিজের মুখখানি কয়েক মুহূর্ত স্থাপন করে রাখলেন। বৃদ্ধের বুকের সঙ্গে আলগ্ন তার মাথা ও কান তাকে বৃদ্ধের দ্রুততর হৃদ্‌স্পন্দনকে তার গোচরে এনে দিলে। বৃদ্ধ তাকে পেয়ে যে আনন্দে অধীর হয়েছেন এটা স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে সে। অথচ বৃদ্ধের সঙ্গে তার কতটুকু পরিচয়!

বৃদ্ধের আলিঙ্গনের মধ্যে কিছুক্ষণ আবদ্ধ থেকে সে মৃদুস্বরে বললে—আপনাকে কিছু দেবার আগেই তো আপনি দিয়ে চলেছেন। আমাকে ছাড়ুন, আপনাকে প্রণাম করি।

বৃদ্ধ হাসলেন। হেসে বললেন—তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে? তা দিলাম। তোমাকে কতক্ষণ আর ধরে রাখব ভাই? আমার আর সময় কতটুকু? তা আমার কি মনে হচ্ছে জান?

ইতিমধ্যে ভূমিষ্ঠ প্রণাম সেরে নিয়ে হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে মন্মথ বললে—কি মনে হচ্ছে বলুন?

বৃদ্ধ হাসিমুখেই প্রশ্ন করলেন—তুমি চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়েছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ?

—চণ্ডীদাসে আছে—মণি নও, মানিক হও, হার নও যে

কেশের করি বেশ।

নারী যদি না গড়িত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি

লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥

আমার তাই তো মনে হচ্ছে ভাই! মনে হচ্ছে তোমাকে আভরণ করে অনুক্ষণ গলায় ঝুলিয়ে রাখি।

মন্মথ এই পরম পূজনীয় বৃদ্ধের এ সমাদর শিরোধার্য করে হাসিমুখে মাথা নত করলে।

স্মৃতিতীর্থ তার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে তার চুলগুলি ঠিক করে দিতে দিতে বললেন—তোমাকে আদর করে তোমার সজ্জিত চুল এলোমেলো করে দিয়েছি ভাই! তা তুমি জল খেয়েছ?

—আজ্ঞে না, এখনও খাই নি, এইবার খাব। এখনও আমার হাত-পা ধোওয়া হয় নি!

স্মৃতিতীর্থ বিস্মিত এবং মন্মথর যেন মনে হলো তিনি একটু বিরক্ত হলেন—আমি যখন পুজো করছি তখন তুমি এসেছ, আর এখনও তুমি হাত মুখ ধোও নি? এরা তার ব্যবস্থা করে নি?

মন্মথ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললে—আমিই ধুই নি। ওঁরা বলেছিলেন হাত পা ধুয়ে নিতে। আমিই বলেছিলাম—আপনাকে প্রণাম করে তারপর হাতমুখ ধোব।

বৃদ্ধ তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে রইলেন তার কথা শুনে। তারপর একবার গলা ঝেড়ে গলা পরিষ্কার করে নিলেন। মন্মথর কথার অর্থ তিনি বুঝেছেন! তীর্থদর্শন বা সাধুপুরুষ দর্শনের একটি প্রচলিত রীতি আছে। তীর্থে, দেবস্থলে বা সাধুপুরুষের আবাসস্থলে এলে, ধুলো পায়ে সর্বপ্রথম তীর্থপতি দেবতা বা সাধুকে দর্শন করতে হয়, তারপর অন্য কাজ।

বৃদ্ধ আবার একবার গলা ঝাড়লেন। মন্মথ বুঝতে পারলে আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, সেই কারণে তিনি গলা ঝেড়ে গলা পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর সহজভাবে তার পিঠে হাত রেখে বললেন—যাও, হাত মুখ ধুয়ে এস। এসে আমার কাছে বস। জল খাও।

মন্মথ সপ্রতিভভাবে বললে—হাতমুখ ধুতে যাবার আগে সকলের সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দিন। আমার এখনও পর্যন্ত কারও সঙ্গে পরিচয়ও হয় নি, প্রণামও করা হয় নি কাউকে।

বৃদ্ধ আবার অকস্মাৎ পরমানন্দে বার কয়েক দ্রুত ঘাড় নেড়ে হাসিমুখে বললেন—এসে পড়েছ যখন তখন সব হবে। তার জন্য আর চিন্তা কি? তুমি আগে হাত মুখ ধুয়ে এস। এসে জল খাও।

তারপর সামনে দাঁড়ানো জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বললেন—মন্মথকে নিয়ে যাও রামময়!

মন্মথর মনে হলো এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা প্রত্যেকেই এই বৃদ্ধের আদেশ পালন করতে পারলে কৃতার্থ হয়। রামময় তাকে মৃদুস্বরে বললেন—এস

বাবা !

রামময়ের পিছনে পিছনে ঘরের বাইরে আসতে রামময় বললেন—এ তো বড়-লোকের বাড়ি। এখানে কোনো অসুবিধা নেই। সবই তোমাদের কলকাতার মতো ব্যবস্থা। স্নানের পৃথক ঘর আছে। সেখানে স্নানের জল আছে। গামছাও দেওয়া আছে। তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।

মন্মথ বিব্রত হলো। একি কথা ! তিনি বাইরে অপেক্ষা করবেন কেন ? মন্মথ লজ্জিতভাবে বলল—না না, তার কোনো দরকার নেই। আপনি যান।

রামময় হেসে বললেন—তোমার দরকার না থাকলে কি হবে আমার দরকার আছে যে ! উনি বলেছেন, তা তো কোনোক্রমে অমান্য করা চলে না।

বলে রামময় একটু হাসলেন।

হাত-মুখ ধুয়ে মন্মথ স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে—আপনি যে কেন দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমার লজ্জা লাগছে !

আপ্যায়িত হয়ে রামময় হেসে বললেন—বাবা, এও তোমার নারায়ণসেবার অঙ্গ। তুমি অতিথি, নারায়ণ।

বৃদ্ধের কাছে গিয়ে পৌঁছুতেই বৃদ্ধ বললেন—এইবার আমি নিশ্চিন্ত। আমার কাছে বসে জলযোগ কর। ওহে রামময়, যাও, শরৎকালীকে বল ওর বাল্যভোগ নিয়ে আসতে।

বলে বৃদ্ধ একটু হাসলেন। মন্মথ বুঝতে পারলে যে বৃদ্ধ 'বাল্যভোগ' শব্দটি প্রয়োগ করে নিজের রসিকতা নিজেই উপভোগ করলেন। কারণ বাল্যভোগ বাল-গোপালের ভোগের জন্যই সচরাচর প্রযুক্ত হয়।

মন্মথও তাঁর হাসির ভাগ নিয়ে বললে—কিন্তু দাদু, তার আগে যে আর একটু কাজ আছে আমার !

—কি কাজ ভাই ?

—আমার তো প্রাতঃসন্ধ্যা করা হয় নি ! সেটা করতে হবে তো !

বৃদ্ধ তার মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে তারপর তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন—প্রাতঃসন্ধ্যা করবে ? তা তার জন্য আর বিশেষ চিন্তা কি ? কর !

বলে আবার উপস্থিত জনদের দিকে তাকিয়ে বললেন—ওহে রামজয়, তোমার দাদা তো গেলেন বাল্যভোগ আনতে। তার পূর্বেই যে আরও কিছুর প্রয়োজন। আমার ঘরে গরদের একখানা নূতন কাপড়-চাদর আমি এখানে আসবার আগে রেখে এসেছিলাম, সেই গরদের জোড়টা নিয়ে এস। তাড়াতাড়ি এস।

মন্মথ বিব্রত হয়ে পড়ল। বললে—আমার এই ধুতি কাপড়েই তো দিব্যি হবে !

গরদের দরকার কি!
বৃদ্ধ সজোরে মাথা নেড়ে বললেন—আছে। প্রয়োজন আছে।
মন্মথ আবার প্রতিবাদ করলে। বললে—আমি হোস্টেলে তো সুতি কাপড় জামা পরেই দুবেলা সন্ধ্যাআহ্নিক করি।
আগের মতোই জোরের সঙ্গে বৃদ্ধ বললেন—তা কর বেশ কর। আতুরে নিয়মো-নাস্তি। কিন্তু এখানে গরদ পরেই কর। ও তো আমি তোমার জন্যেই বের করে রেখেছিলাম, তোমাকে দেব বলে। তা সেটা পরে তুমি আমার চোখের সামনে প্রাতঃসন্ধ্যা করবে, সে তো আরও ভালো হবে, আমার আরও ভালো লাগবে।
বাল্যভোগ আসার আগেই গরদের কাপড়-চাদর এসে পৌছুল। পরিণত বয়স্ক রামজয় তখন হাঁপাচ্ছেন। তাঁর হাত থেকে কাপড়-চাদর নিয়ে মন্মথর হাতে দিয়ে বৃদ্ধ বললেন—যাও, পাশের ঘর থেকে বস্ত্রপরিবর্তন করে এস।
মন্মথ কাপড়-চাদর নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তবু শেষ বার মৃদু প্রতিবাদ করলে—এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ একেবারে অধিকন্তু হলো।
বৃদ্ধ এবার একটু কঠিন কণ্ঠে বললেন—না, অধিকন্তু হয় নি। তুমি যাও বস্ত্র পরি-বর্তন করে এস। আর প্রতিবাদ করো না।
বৃদ্ধের মৃদু কঠিন কণ্ঠস্বর থেকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মন্মথ বুঝতে পারলে এ আদেশ লঙ্ঘন করা যাবে না। এই অলঙ্ঘনীয় ব্যক্তিত্ব ও আদেশে বৃদ্ধ নিজের পরিপার্শ্বকে আপনার পছন্দমতো নির্ভুলভাবে পরিচালন করেন। পাশের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে শুনতে পেলে বৃদ্ধ একটু উচ্চকণ্ঠস্বর করে বলছেন—তুমিই তো আমার অধি-কন্তু হে! সংসারে সব অধিকন্তুই না হলে চলে যায়। কিন্তু একবার আয়ত্ত হয়ে গেলে সেই অধিকন্তুই সব চেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। বুঝলে!
দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কাপড় বদলাতে বদলাতে মন্মথ হাসল। তাকে পেয়ে বৃদ্ধ কি করবেন তা যেন স্থির করতে পারছেন না। সে যখন কাপড় বদলে বেরিয়ে এলো তখন বৃদ্ধ পরমানন্দে বললেন—আহা, দেখ তো, দেখ তো, কেমন লাগছে। মনে হচ্ছে স্বয়ং মন্মথনাথ নব কলেবরে তরুণ রূপ ধরে আবির্ভূত হলেন।
বিব্রত মন্মথ পূজার আসন খুঁজছিল।
বুঝতে পেরে বৃদ্ধ বললেন—আসন খুঁজছ? ওই তো গোপালের সিংহাসনের সামনে ওই তো আসন! বসে পড়!
—আমি ওই আসনে বসব?
নিজের স্বভাবমতো সজোরে মাথা নেড়ে বৃদ্ধ বললেন—হ্যাঁ বসবে! বসে পড়। আমি উঠে যাব ঘর থেকে? অসুবিধা হবে না?

—না না, কিছু অসুবিধা হবে না। আপনি থাকুন। আপনি থাকলেই বরং ঘরটা পুজোয় ভরে থাকবে।

বৃদ্ধ হা হা করে হেসে বললেন—থাকতে বলছ ? আচ্ছা থাকি ! তুমি পুজো সেরে ওঠ, তারপর সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

সকলে নিঃশব্দে ঘর থেকে চলে গেল। বৃদ্ধ একেবারে নীরব হয়ে গেলেন। মন্মথ গিয়ে পূজার আসনে বসল। সামনে একখানি বড় পিঁড়ির উপর রুপোর ছোট্ট সিংহাসন। সেই সিংহাসনে রেশমের সুখাসনে স্বর্ণ-উপবীতধারী, চন্দন-চর্চিত-অঙ্গ, পুষ্প-ভূষিত, অনন্ত-চৈতন্যের আধার স্বরূপ শালগ্রাম শিলা-রূপী গোপাল পুষ্পশয্যার মধ্যে উপবিষ্ট রয়েছেন। চন্দন, তুলসী ও ফুলের গন্ধের এক ধারা-বাহিক ঐতিহ্যবাহী ব্রহ্মশিলা ও সিংহাসনের সম্মুখে বসে মন বড় পরিতৃপ্ত হলো। এ পরিতৃপ্তি পাওয়ার অভ্যাস তার আছে, গড়ে উঠেছে বালককাল থেকেই। উপনয়নের আগে বাবা গঙ্গাধর যখন পুজো করতেন, অথচ কিছু স্পর্শ করতে দিতেন না, তখন থেকেই এই সমাবেশ ও এই পূজা তার ভালো লেগেছে। তখন কবে উপনয়ন হবে এই ভেবে মন অধৈর্য হতো। তারপর উপনয়ন হলো দেবতার আরও কাছে যাবার অধিকার পেলে, তারপর দেবতার অঙ্গস্পর্শ করে সেবার অধিকারও হলো। কাজেই এ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়ের মধুরতম অংশ। কিন্তু সেখানে বসেও তার আজ মন স্থির হলো না। পিছনেই কম্বলের উপর সুপ্রাচীন বৃদ্ধ বসে আছেন। তাঁর উপস্থিতি সম্মুখস্থ দেবতার উপস্থিতির চেয়েও প্রবলতর ভাবে তার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করছে। সে কোশাকুশি নিয়ে আচমন আরম্ভ করলে।

কিন্তু পিছনে বইয়ের পাতা ওল্টানোর অতি ক্ষীণ শব্দও যেন নিশ্চুপ স্তব্ধতার মধ্যে কানে এসে বাজছে। মন্মথ লক্ষ্য করেছিল বৃদ্ধের পাশে কম্বলের উপর পঞ্জিকা রাখা ছিল। বৃদ্ধ পঞ্জিকায় মনোনিবেশ করেছেন। ওঁদের জীবনযাপন ও প্রাণ-ধারণের ধারা নিয়ন্ত্রিত করে পঞ্জিকার নির্দেশের জন্য বোধহয় বৃদ্ধ পঞ্জিকার পাতা উলটে চলেছেন।

মনঃসংযোগ হলো না। কিছুক্ষণ গায়ত্রী জপ ও মনে মনে কিছু মন্ত্রোচ্চারণ করে সে পূজা সমাপ্ত করলে। তারপর প্রণাম করে উঠে পড়ল।

উঠতেই একবার বৃদ্ধের চোখে চোখ পড়ল। স্মিত মুখে বৃদ্ধ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—হয়ে গেল ?

সে হেসে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই আনুষ্ঠানিক ভাবে হলো। কাজের কাজ কিছু হলো না। মন স্থির হলো না।

বৃদ্ধ হেসে বললেন—তা না হোক, ওতেই হবে। অনুষ্ঠানটাই কি কম কথা! আর আমার গোপাল ওতেই প্রীত হবেন, সন্তুষ্ট হবেন। যাও বস্ত্র-পরিবর্তন করে এস। শরৎ তোমার জন্যে গোপালের প্রসাদ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এতক্ষণে মন্মথ দেখতে পেলে তার পিছন দিকে দরজার কাছে এক দীর্ঘ শীর্ণ বিধবা দাঁড়িয়ে আছেন। মাথার কাঁচা পাকা চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে পরিষ্কার থান কাপড়। মন্মথ বুঝতে পারলে, এ কাপড় উনি এইমাত্র বদলে এসেছেন তার সামনে আসবার জন্য। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন স্থির হয়ে। চোখে তাঁর ভাবলেশ-হীন দৃষ্টি। ঠোঁটের প্রান্তে কোন্ ভাব খেলা করছে তারও আভাস পাবার উপায় নেই। কারণ একটা খুঁটে হাত ঢেকে সেই হাত দিয়ে রেখেছেন নাকের নিচে যাতে মুখ ও চিবুক ঢাকা পড়ে গিয়েছে। সে পরিষ্কার বুঝতে পারলে ভদ্রমহিলা তাকে অতি তীক্ষ্ণ সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখছেন। তাঁর মধ্যে যেন একটা প্রচ্ছন্ন বিরূপতাও আছে। এ দৃষ্টি স্মৃতিতীর্থের দৃষ্টির মতো প্রসন্নতা ও সমাদরে পরিপূর্ণ নয়।

স্মৃতিতীর্থ সাগ্রহে বললেন—মন্মথ, উনি আমার কনিষ্ঠা। আমার সংসারের কর্ত্রী। নাম শরৎকালী। ওঁকে প্রণাম কর।

মন্মথ এই শ্রেণীর মানুষদের চেনে। বাইরে থেকে এদের দেখে তার বিরক্ত লাগত, কৌতুক বোধ হতো আরও অল্প বয়সে। এই গ্রাম্য বিধবারা সকলে কঠিন, বিরূপ দৃষ্টিতে দেখে, ক্ষেত্রবিশেষে যখন মুখ খোলেন তখন অবলীলাক্রমে অন্যের অতি নিষ্ঠুর সমালোচনা করেন, ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চ কণ্ঠে কটু গালাগাল করতেও এঁদের কুণ্ঠা নেই। কিন্তু পরবর্তী কালে একটু বয়স বাড়লে সে এঁদের মনটিকে মোটা-মুটি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে। এঁরা জীবনের অতি সাধারণ কোনো সুখ পান না। অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়ে সংসারের সুখ, এমন কি সব হাসি ও আনন্দ থেকে সমাজ ও স্মৃতি এঁদের বঞ্চিত করেছে। প্রাণের সহজ প্রীতি ও আনন্দকে অহরহ শাসনে নষ্ট করে নিজেকে পাথরে পরিণত করতে হয়েছে। সুখহীন, প্রীতিহীন নিরানন্দ জীবনে যা অবশিষ্ট থাকে তা বৈধব্যের শুষ্ক আচার পালন। অথচ তৃষিত প্রাণ সংসারের কাছ থেকে আপনার দাবি পাবার জন্য অহরহ হাহাকার করে। তাই যেখানে কারও ব্যবহারে এতটুকু উদাসীনতা সেখানেই শুষ্ক চিত্তের অহংকার আহত হয়ে চিত্তকে ক্রুদ্ধ বিষাক্ত গোক্ষুরের মতো ফুঁসিয়ে তোলে। আবার এতটুকু সমাদর পেলে, বিশেষ করে সে সমাদর বেশী কি অযাচিত হলে সেই চিত্তই তার মমতা ও প্রশংসার ভৃঙ্গার উজার করে দিয়ে অভিষিক্ত করে দেয়। মন্মথ তাই কৌশলটি জানে।

তাই স্মৃতিতীর্থ বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই পূজার কাপড়েই সসম্ভ্রমে দ্রুত পদে হাসি-মুখে এগিয়ে গেল। তারপর স্মৃতিতীর্থ ও গোপালকে যেমন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছিল তেমনিভাবে ভূমিষ্ঠপ্রণাম করে, মুখ তুলে বললে—আপনার পা ছোঁব?
ততক্ষণে শীর্ণ স্থির মূর্তি চঞ্চল হয়েছে, ঠোঁটের আবৃত প্রান্ত থেকে কাপড় সরে গিয়ে মৃদু হাস্যরঞ্জিত ঠোঁট প্রকাশিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কথাও ফুটল। তিনি সাগ্রহে বললেন—সে কি কথা ভাই। তুমি আমার পা ছোঁবে, এ তো আমার ভাগ্যি। ছোঁও তাই, ছোঁও। কোনো দোষ হবে না।
এই আলাপ আলোচনার মধ্যে মন্মথ লক্ষ্য করলে বৃদ্ধের জরাগ্রস্ত মুখে এক ধরনের আনন্দ যেন পঞ্চপ্রদীপের শিখার মতো প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। শরৎকালী বললেন—আবার কাপড় বদলাবে কেন ভাই? ওই গরদ পরেই খাও, আমি বরং ওই কাপড়ে তোমাকে দু দণ্ড দেখি। সাক্ষাৎ শিবের মতো লাগছে। তুমি খেতে বস। খেয়ে উঠে কাপড় বদলাবে!
বৃদ্ধ যেন আনন্দ চাপতে পারছে না। তিনি বললেন—তাই বসে যাও ভাই। শরৎ যখন বলেছে তখন আর দ্বিধা করো না। শরতের কথা আমার সংসারে মনু-পরাশরের নির্দেশের সমতুল্য।
শরৎকালী একটু হাসলেন।
মন্মথ খেতে বসল। এ সব পদ্ধতির সঙ্গে তার পরিচয় আছে। কিন্তু এত পরিপাটি সে কোথাও দেখে নি। যেমন পরিচ্ছন্ন তেমনি পরিপাটি। গালচের আসন পেতে, জল দিয়ে জায়গাটি মুছে, একখানি বড় শ্বেত পাথরের থালা নামানো। থালার পাশে দুটি শ্বেত পাথরের বাটি, একটি শ্বেত পাথরেরই সরপোষ-ঢাকা শ্বেত পাথ-রের গেলাস। থালাখানির চারিপাশে ফলের কুচি, প্রায় সমস্ত থালাখানিকে পূর্ণ করে সাজানো। সবেরই পরিমাণ সামান্য। ছোলা ভিজে, মুগ ভিজে থেকে আরম্ভ করে বহু ধরনের ফলে থালাখানি সজ্জিত। শুকনো মেওয়া ফলও রয়েছে তিন চার রকমের। থালার মাঝখানে বাড়ির তৈরি দুটি নারকেলের সন্দেশ। পাথর বাটির একটিতে মাখন, একটিতে ছানা, দুইয়ের সঙ্গেই বেশ খানিকটা করে কাশীর চিনি দেওয়া; খাবার সময় কেবল মেখে নিতে হবে।
সব একবার দেখে নিয়ে মন্মথ শরৎকালীর মুখের দিয়ে চেয়ে বিব্রতভাবে বললে—এত খাবো কি করে?
শরৎকালী তার থালার কাছে উবু হয়ে বসলেন। কোথা থেকে তাঁর হাতে এক-খানা পাখা এসে জুটেছে। তিনি হেসে বললেন—খাও। সবই সামান্য সামান্য রয়েছে। খেয়ে ফেল, কিছু ফেলে রেখো না। গোপালের প্রসাদ তো। আর

খেতেও বেলা হবে।

মন্মথ খেতে আরম্ভ করলে।

পিছনে কম্বলের উপর বসে বৃদ্ধ স্মৃতিতীর্থ তখনও পাঁজির পাতা উলটে যাচ্ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন—মন্মথ কোথায় খাবে শরৎ?

শরৎকালী সহজভাবেই বললেন—কেন, বাড়ির ভেতরেই খাবে!

বৃদ্ধ বললেন—বললেন মন্মথকে—কি ভাই, কোথায় খাবে তুমি? বাড়িতে, না এখানে আমার সঙ্গে? আমার তো ইচ্ছা ছিল যে তুমি আমার হবিষ্যান্নের ভাগ গ্রহণ কর।

শরৎকালী প্রতিবাদ করলেন—দেখ দেখি দাদা, এ তোমার অত্যাচার নয়? ওই অল্পবয়সী ছেলেকে ডেকে এনেছো আদর করে, তাকে তুমি হবিষ্যি খাওয়াবে কেন বাপু? আমি সকালবেলা ওর জন্যে গঙ্গার ভালো মাছ যোগাড় করে রেখেছি। বড় বৌমা কত যত্ন করে রান্না করেছে! আর তুমি বলছ তোমার সঙ্গে খেতে! পণ্ডিত হলে আর মাথায় কিছু থাকে না!

মন্মথ এক সঙ্গে অনেক কথা ভেবে নিলে। বাড়ির ভিতর গিয়ে জামাই না হয়েও জামাই-আদর নিতে তার মোটেই ভালো লাগবে না। আর এইভাবে সে এখন থেকে জড়িয়েও পড়তে চায় না। তাছাড়া সব চেয়ে বড় কথা, বৃদ্ধ ব্যথিত হবেন। সে এবার কথা বলে উঠল—ঠাকুমা, একটা কথা বলব?

শরৎকালী তাকে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে দিলেন, বললেন—আমি ঠাকুমা নই ভাই, দিদিমা! তা বল কি বলবে!

মন্মথ বললে—আমি নিয়ম-সেবার কথা শুনেই মনে মনে ঠিক করে এসেছিলাম যে যদি বাধা না থাকে তাহলে হবিষ্যান্নের প্রসাদ পাব!

হা হা করে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ। উচ্চকণ্ঠে বললেন—দেখলে তো শরৎ, আমারই জিত হলো।

শরৎকালীর মুখ ভারী হবার আগেই মন্মথ বললে—আর মাছ আমি রাত্রিতে খাব। অসুবিধা কি!

বৃদ্ধ হা হা করে হাসতে লাগলেন। শরৎকালীও প্রসন্ন হলেন। বৃদ্ধ মন্মথকে বললে —তুমি ভাই স্মৃতির পণ্ডিত হলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট বিধান দিতে পারতে। আর তোমার বিধানে শাস্ত্রও ক্ষুণ্ণ হতো না, আবার বিধান পেয়ে সমাজও তৃপ্ত হতো। তা স্মৃতির ভাগ্য ভাই! কালধর্মে যত উৎকৃষ্ট মেধা, সব নিয়োজিত হচ্ছে বিদেশী ভাষা শিক্ষায়!

শেষের দিকে কথাগুলি একটু বেদনার সঙ্গেই উচ্চারিত হলো। অকস্মাৎ কি মনে

পড়ায় বললেন—আজ তো আবার শিম খেতে নেই। মনে আছে তো?
শরৎকালী হেসে বললেন—তা আছে।
তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন—চিঠি গিয়েছে সবারই কাছে।
বৃদ্ধ বললেন—গিয়েছে বলেই তো আমার ধারণা! একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি!
পরক্ষণেই গলা তুলে ডাকলেন—ওহে রামময়!
রামময় যেন পিতার আহ্বানের জন্যই দরজার ওপারে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ছুটে এসে দাঁড়ালেন—বাবা!
স্মৃতিতীর্থ বললেন—হ্যাঁহে, তোমার পিসীমাদের কাছে সব পত্র ঠিক ঠিক গিয়েছে তো?
সবিনয়ে মৃদু হাসির সঙ্গে রামময় বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ! সব আজ বিকেল থেকেই আসতে আরম্ভ করবেন দেখুন!
স্মৃতিতীর্থ পরিতৃপ্ত হলেন। তারপর মন্মথকে বললেন—ভাই, তোমাকে আমার সঙ্গে ক'দিন থাকতে হবে। আপত্তি হবে না তো?
কি উত্তর দেবে ভেবে মন্মথ বিব্রত হয়ে পড়ল। এ বাড়ির সে ভাবী জামাতা। সে সমাদরেই তার সমাদর। তার উপর সে সম্পর্কে আর কোনো কথাবার্তা হয় নি উভয়পক্ষে। তার বাবা আসবার সময় মহামহোপাধ্যায় রামরাম স্মৃতিতীর্থের কথা লঙ্ঘন না করার নির্দেশ দিয়েও তাকে পরোক্ষভাবে যথাসম্ভব কম দিন থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু কলেজও এখন বন্ধ যে অজুহাত দেবে যে কলেজ কামাই হবে। অথচ এমন মাননীয়, এমন সুন্দর, এমন অলঙ্ঘনীয় পুরুষের এমন আগ্রহাতিশয্যকে ক্ষুণ্ণ করতে বড় মায়া হলো। সে দ্বিধার মধ্যে কি উত্তর দেবে ভাবছিল।
তার উত্তর না পেয়ে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন—কি ভাই, অসুবিধা হবে? সংকোচ বোধ হচ্ছে।
মন্মথ মন স্থির করে নিলে। বললে—সংকোচ একটু হচ্ছে বই কি! তবে ক'দিন থাকতে হবে বলুন, থাকব!
একান্ত পরিতৃপ্ত হয়ে বৃদ্ধ বললেন—বেশীদিন নয় ভাই, মাত্র ক'টা দিন! আজ তো দোসরা! তেসরা আমার সব ভগ্নীরা আসছে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তার পর দিন কলকাতার দুই ভাইকে দীক্ষা দেব এখানে। তাদের কাছে আমি প্রতিশ্রুত। তার পর দিনটা শুধু তুমি আর আমি কাটাব। তার পরদিন ৬ই তারিখ। সেদিন তোমাকে ছুটি দেব, তুমি বাড়ি যাবে।
মন্মথ হিসেব করে নিলে। তাকে তিনটে দিন থাকতে হবে। সে ঘাড় নেড়ে

বললে—বেশ আপনি যেমন আদেশ করছেন তেমনি হবে।
বৃদ্ধ পুলকিত ও নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন—ওহে রামময়, আমি তো এদিকে মন্মথকে আটকালাম। ওদিকে তুমি কলকাতায় গোপেশ্বর-ভূপেশ্বরকে ঠিক ঠিক যেমন বলেছিলাম সেই রকম পত্র লিখেছ তো? তেসরা রাত্রিতে এখানে আসবে, পরদিন দীক্ষা দেব, সন্ধ্যার সময় ওরা কলকাতা ফিরে যেতে পারবে!
রামময় সসম্ভ্রমে মাথা নেড়ে সব ঠিক আছে বলে বৃদ্ধকে পুনরায় নিশ্চিন্ত করলেন। মন্মথর কানে গোপেশ্বরের-ভূপেশ্বরের নাম যেতেই সে চকিত হয়ে প্রশ্ন করলে—কোন্ গোপেশ্বর-ভূপেশ্বরের কথা বলছেন? পাথুরেঘাটার?
বৃদ্ধ হেসে বললেন—হ্যাঁগো! ওরা দুই ভাই। মস্ত ধনী লোক। ওদের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ইন্দুমতী আমার শিষ্যা! তুমি ওদের চেনো নাকি?
মন্মথ হেসে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, সামান্য চিনি। এঁরা তো মস্ত ধনী লোক। গোপেশ্বরবাবুর মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে আমি কিছুদিন ছিলাম। গোপেশ্বরবাবুদের বাড়িতেও গিয়েছি।
—আচ্ছা! বেশ, বেশ! বৃদ্ধ সানন্দে বললেন। তারপর বললেন—এ তো ভালই হলো। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে! অবাক্ হয়ে যাবে তারা। তা ভাই, তুমিও অবাক্ হবে। অবাক্ হবে আমার ভগ্নীদের দেখে। জান ভাই, আমার পিতারা দুই সহোদর ছিলেন। আমার খুড়ো মশাই অল্পবয়সে মারা যান। বাবা আমার অল্পবয়সে বিপত্নীক হয়ে আবার বিবাহ করেছিলেন। আমার সহোদরা, বৈমাত্রেয় আর খুড়তুতো সব মিলিয়ে আমার আট ভগ্নী। আজ কে যে আমার সহোদরা আর কে যে বৈমাত্রেয় কি খুড়োর কন্যা সব ভুলেও গিয়েছি। সবাই আজ আমার সহোদরা। দেখবে কাল! আর জান ভাই, এই আট ভগ্নীর আমি একমাত্র ভাই! তাই আমার আদর খুব। দেখবে কাল!
শরৎকালী হেসে বললেন—তুমি দেখবে, তোমাকেও দেখবে সবাই। তোমাকে দেখতেই সব আসছে!
তাঁর কথাটা যেন চাপা দেবার জন্যই বৃদ্ধ রামময়কে বললেন—বাবা, সকলকে একবার ডাক। মন্মথর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই!
বৃদ্ধের মুখ থেকে কথা উচ্চারিত হবামাত্র দরজার ওপাশ থেকেই সবাই এসে এক মুহূর্তে হাজির হলো। এক দল ভট্টাচার্য! সবারই গলায় শুভ্র উপবীত, সবারই উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, সবারই মাথায় মোটা এক গোছা করে শিখা।
মহামহোপাধ্যায় রামরাম স্মৃতিতীর্থ একে একে নিজেদের স্বজনদের সঙ্গে মন্মথর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবার পদ্ধতিটি বিচিত্র। সর্বপ্রথম

তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন ভাগিনেয়দের সঙ্গে। হাত তুলে সকলকে বললেন—বসো সকলে, আমার কম্বলে আমার চারিপাশে বসে যাও।

তারপর বললেন মন্মথকে—ভাই, এঁরা সকলেই তোমার জ্যেষ্ঠ এবং প্রণম্য। এঁদের পরিচয় দিই, তুমি একে একে প্রণাম কর। এই দুজন আমার ভাগিনেয়। শ্রীমান অমূল্যরতন আর শ্রীমান জীবনরতন। আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শরৎকালীকে তো দেখলে। তাঁর দুই পুত্র।

কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়, শীর্ণ দুই ব্রাহ্মণ সন্তান। মধ্যবয়সী। বৃদ্ধ বললেন—আমার ভগ্নী এই দুটি শিশুপুত্রকে নিয়ে খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়। তারপর থেকে আমার কাছে ওরা আছে গোপালের আশ্রয়ে, আমার শিয়ো ভূষণের মতো! ওদের একজন আমার যে যৎসামান্য বিষয়সম্পত্তি আছে দেখাশোনা করে। আর একজন গোপালের সেবা করে।

বলতে বলতে একটু হেসে মন্মথর পিঠে সস্নেহে হাত রেখে বললেন—তোমাদের ইংরেজীতে যে কি বলে যেন—'অ্যাসিসট্যাণ্ট' নাকি, তাই। মানে সহকারী!

বলে তিনি জোরে হেসে উঠলেন। মন্মথও হাসল, বেশ জোরেই হাসল। বৃদ্ধের মুখে ইংরেজী উচ্চারণ শুনে এক বিচিত্র কৌতুক অনুভব করলে সে। অন্য সকলেও হাসল। তবে সে হাসি একান্ত মৃদু, নিঃশব্দ। তাঁর প্রতি সম্ভ্রমবোধেই এঁরা বোধহয় বৃদ্ধের সামনে এইভাবেই হাসেন।

মন্মথ জিজ্ঞাসা করলে—আপনি ইংরেজী জানেন তাহলে?

একান্ত সহজেই বৃদ্ধ বললেন—কই আর শেখা হলো ভাই? একজন ইংরেজীনবিসকে পেলে শিখতাম। তুমি যদি আর একটু বড় হতে আর তোমার সঙ্গে যদি ক'বছর আগে আলাপ হতো তা হলে শিখবার চেষ্টা করতাম। এ জন্মে আর হলো না বুঝলে! পর জন্মে তোমার ছেলে হয়ে জন্মে তোমার চেয়েও বেশী করে ইংরেজী শিখব!

ভাগিনেয়দের পরিচয় দিয়ে তারপর পরিচয় দিলেন জামাতার। বললেন—বুঝলে ভাই, আমার দুই পুত্র আর এক কন্যা জীবিত। আরও কয়েকটি হয়েছিল। সূতিকাগারেই তারা মারা গিয়েছে। আমার একমাত্র কন্যার স্বামী ইনি, স্বরূপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। নবদ্বীপের অধ্যাপক। ন্যায়ের পণ্ডিত। মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহনের ছাত্র।

মন্মথ একবার তাকিয়ে দেখলে মানুষটির দিকে। মেদহীন, দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ পুরুষ। এখানে যতজন উপস্থিত রয়েছেন তার মধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল, সর্বাপেক্ষা প্রিয়দর্শন মানুষ। গম্ভীর, প্রসন্ন। মন্মথ বুঝলে এই ব্যক্তিটির কন্যার সঙ্গেই তার

ভাগ্য জড়িত হবে ঘনিষ্ঠ হয়ে। তিনি তার মুখের দিকে স্থির, গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। কিন্তু মন্মথ অনুভব করছে, এই স্থিরতা ও গাম্ভীর্যের অন্তরালে গভীর স্নেহ ক্ষরিত হচ্ছে তাঁর দৃষ্টি থেকে। প্রণাম করবার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় দুখানি হাত সস্নেহে রেখে অতি মৃদুস্বরে বললেন—কল্যাণ হোক।

পরক্ষণেই তিনি তার কাছ থেকে সরে গিয়ে দূরে বসলেন।

এরপর বৃদ্ধ বললেন—আর আমার এই বৃদ্ধ বয়সের দুই চক্ষু বল দুই চক্ষু, দুই হাত বল দুই হাত, দুই যষ্টি বল দুই যষ্টি, ওরা আমার সব, আমার দুই পুত্র, রামময় আর রামজয়।

বলে তিনি একটু হাসলেন।

মন্মথ বললে—দাদু, একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না ?

—বল ভাই, বল ! তোমার কোথায় কি কিছু মনে করতে পারি ?

—দাদু, আপনার পুত্ররা আপনার চক্ষুও নন, হাতও নন। ওঁরা আপনার পুত্রই। তার চেয়ে কম কিছু নন, বেশী কিছু নন।

—কেন ভাই, এ কথা কেন বলছ ?

—বলছি এই জন্যে যে আপনার চোখ, হাত, পা সব এত মজবুত আছে যে আপনাকে আর কারও সাহায্য নিতে হবে না।

হা হা করে হেসে উঠলেন স্মৃতিতীর্থ। অন্যান্যরা কিন্তু হাসল না, বরং বিস্মিত হয়ে পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল। মন্মথ সেটা লক্ষ্য করলে। লক্ষ্য করে একটু অবাক হলো। হাসির কথায় এঁরা হাসেন না কেন ?

বুদ্ধিমান ছেলে, সে এর কারণটা অনুমানে বুঝতে পারলে।

তার মনে হলো, বোধহয় এঁরা স্মৃতিতীর্থকে এমন সসম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখেন যে তাঁর সামনে এঁরা কেউ সশব্দে হাসতেও পারেন না, রসিকতা করা দূরের কথা। তাঁরা বোধহয় কল্পনাও করতে পারেন না যে স্মৃতিতীর্থের সঙ্গে কেউ সহজভাবে কোনো রসিকতা করতে পারে।

সেই দিন বিকেলবেলাতেই এ নিয়ে কথা হলো।

অল্প সময়ের মধ্যেই তার মোটামুটি আলাপ হয়ে গেল সকলের সঙ্গে। তার আলাপটা প্রায় সরস ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হলো অমূল্যরতন আর জীবনরতনের সঙ্গে। বিশেষ করে জীবনরতনের সঙ্গে। জীবনরতনের মধ্যে এমন একজন আনন্দময়, অবিষয়ী মানুষ আছে যে ওকে পরমাগ্রহে গ্রহণ করলে।

এঁদের সঙ্গে আলাপ করে মন্মথ পরিষ্কার বুঝতে পারলে স্মৃতিতীর্থ তার সম্পর্কে নিজের অকারণ স্নেহ ও মমতা দিয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের হৃদয়ে এমন একটি

সমাদরের আসন তার আসার আগে থেকেই পেতে রেখে দিয়েছেন যে ও আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাদরের আসনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

জীবনরতন অল্পসল্প আলাপের পরই বললে—ওহে মন্মথবাবু, তোমার সঙ্গে সেই আমাদের আলাপ হলো, পরিচয় হলো। কিন্তু আর কিছু দিন আগে হলো না কেন?

অন্য সকলে জীবনরতনের কথায় একটু হাসলেন। কিন্তু কেন হাসলেন তা মন্মথ বুঝতে পারল না। তাই সে প্রশ্ন করলে—এ কথা কেন বলছেন?

জীবনরতন একটু হেসে বললেন—কেন বলছি? কেন বলছি জান? তুমি আসার সময় থেকে মামার মেজাজ অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। তুমি তো বাবা, রামরাম স্মৃতিতীর্থ কি পদার্থ তা জান না, দেখ নি! স্মৃতিতীর্থ রাজা-মহারাজা, সাহেব, জজ-মেজিস্ট্রেট কারও পরোয়া করেন না। সমাজের মাথার মণি উনি। কারও দিকে ভুরু কুঁচকে চাইলে সে মাটিতে এক হাত বসে যায়। অতি অল্প কথার, রাশ-ভারী মানুষ। সেই মানুষ এক হেসে কথা বলেন আমার মা, মানে ওঁর বোনের সঙ্গে। তা ছাড়া সংসারে সবারই কাছে ভয়ের মানুষ। তুমি কি গুণ জান বাবা, তুমি আসার সঙ্গে সঙ্গে ওই মানুষ উনুনের ওপর কড়াইয়ে গরম দুধ উথলে ওঠার মতো বার বার আনন্দে উথলে উঠছেন। এই মানুষের এই চেহারা নিজের চোখে না দেখলে তো বিশ্বাস করা যাবে না! সেই জন্যেই বললাম কথাটা।

রামময় বললেন—তা জীবন কথাটা অন্যায় বলে নি বাবা! তুমি যখন আমাদের ভাগ্যগুণে, আমাদের ভাগ্যগুণে ছাড়া আর কি বলব, যখন এসে পড়েছ তখন ক'-দিন থেকে যাও। এখন দু'দিন ভিড় যাবে। এই ভিড়ভাড় কেটে গেলে তুমি একটা দুটো দিন বাবার সঙ্গে নিরিবিলি কাটিয়ে যাও। তাতে বাবা খুব আনন্দ পাবেন। তোমারও বোধহয় খুব খারাপ লাগবে না।

পাড়াঘরের অনেক লোকই সেখানে উপস্থিত ছিল। তারাও সকলে সমর্থন করলে এ কথা। বৃদ্ধ হরগোবিন্দ বিশ্বাস এখানকার বর্ধিষ্ণু মানুষ; বয়সে রামময়ের চেয়ে অনেক বড়। স্মৃতিতীর্থের এক অতি গুণমুগ্ধ জন। তিনিও সমর্থন করে বললেন—পণ্ডিত মশাইয়ের এ চেহারা কখনও দেখি নি বাপু। রাশভারী মানুষ, পণ্ডিত, চিরকাল দেখে আসছি ভারী গম্ভীর মুখ, চিরকাল শুনে আসছি অল্পস্বল্প দু চারটে কথা। ব্যস, দু কথাতেই শেষ হুকুম কোর্ট-কাছারীর বাড়া। অবিশ্যি শুনেছি বাড়ির ভেতরে কখনও সখনও শরৎকালীর কথায় কি রামময় রামজয় কি আমা-দের সরস্বতীর ছেলেমেয়ের সঙ্গে রসিকতা করে হা হা করে হাসেন। সে হাসি দূর থেকে নিজের ঘরে বসে বসে শুনেছি। এমন হয়েছে ভট্চাজ বাড়ি থেকে জোর

গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠে বাড়িতে মেয়েদের শুধিয়েছি—কিসের শব্দ বল তো ? ওরা এ শব্দ চেনে। বলেছে—পণ্ডিতকতামশাই হাসছেন। তা সে এত দিন কানেই শুনেছি, চোখে দেখি নি। এত দিনে চোখে দেখলাম। কিন্তু এ আর এক রকম। এ যেন মানুষটা আনন্দে ফুর্তিতে গলে গলে পড়ছে। এর কারণ কি তা তো বাপু জানি না। তবে কারণ যাই হোক, উপলক্ষ্য যে বাপু তুমি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ চোখে দেখেও আনন্দ গো! তাই রামময় যা বলছে তুমি বাবা সবারই কথা শুনে দু দিন বেশী করে থেকেই যাও। আমরা ক'দিন পণ্ডিতকর্তাকে নিয়ে একটু আনন্দ করি।

মন্মথ ধরেই নিয়েছে তাকে থাকতে হবে ক'দিন। নিজের মনের সঙ্গে একটা বুঝা-পড়াও সে করে নিয়েছে। স্মৃতিতীর্থের বুদ্ধিমত্তা ও মাত্রাজ্ঞানকে সে বার বার মনে মনে প্রশংসা না করে পারে নি। আজ সারা দিনের মধ্যে কি একা থাকার সময়, কি অন্য সকলের সঙ্গে আলাপের সময় একবার ঘুণাক্ষরে তার সঙ্গে নিজের দৌহিত্রীর বিবাহের কথা উল্লেখ করেন নি, কিংবা তাঁর বাড়ির অন্দরমহলে নিয়ে যাবার জন্য বা বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য কোনো আয়োজন করেন নি। বরং তার সঙ্গে বাড়ির যাতে কোনো সংশ্রব না ঘটে তার একটা পাকা ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজেই করে রেখেছেন।

১৪

পরদিন সকালে প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে যখন সে জীবনরতনের সঙ্গে গঙ্গার ধারে ধারে গ্রামটা দেখে বেড়িয়ে ফিরে স্মৃতিতীর্থ মশাইয়ের ঘরের দরজায় পা দিলে তখন সে বিস্মিত হয়ে গেল। তার উনিশ বছরের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিস্ময় বোধ করলে সে।

রাশভারী গম্ভীর মহামহোপাধ্যায় রামরাম স্মৃতিতীর্থ তাঁর কম্বলের উপর অসংখ্য মহিলা পরিবৃত হয়ে বসে মুখের হাসি মনের খুশী চাপবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু হাসি আর খুশী তাঁর সমস্ত প্রাণ উপচে বেরিয়ে আসছে। তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার, একটি অল্পবয়সী, বছর চল্লিশ বয়সের পূর্ণ-যৌবনা সুন্দরী মহিলা, লাল-পাড় মটকার শাড়ি পরে, হাতে শুধু এক গাছি করে সোনার শাঁখা-বাঁধা, হেসে গড়িয়ে পড়ছেন। কোনো একটা কিছু কথার শেষাংশের শেষটা এই হাসি দিয়ে সম্পূর্ণ হচ্ছে। রামরাম স্মৃতিতীর্থের পাশে বসে কোনো মানুষ, বিশেষ করে কোনো স্ত্রীলোক যে এমন করে হাসতে পারে, তা মন্মথর কল্পনার বাইরে ছিল।

জীবনরতনের সঙ্গে ঘরে ঢুকতেই রামরাম হাসিমুখে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে সানন্দ ঝোঁক দিয়ে বললেন—এসো। বসো সামনের কম্বলে, আমার চোখের সামনে। তার আগে আমার ভগ্নীদের প্রণাম কর!

তারপর বললেন—জান ভাই, আমার কি ভাগ্য, আমরা আট বোন এক ভাই। আমরা সবাই আজও জীবিত আছি! আচ্ছা, আগে তোমার সঙ্গে সবারই পরিচয় করিয়ে দিই। শরৎকালীর সঙ্গে তো তোমার আগেই পরিচয় হয়েছে। তারপর এই কালীমাত, কিরণকালী, মতিকালী, আন্নাকালী, পঞ্চাননী, চারুশীলা আর কাত্যায়নী। এদের সবাইকে ভাই, আমি কোলে-পিঠে মানুষ করেছি, মেরেছি, ধরেছি, শাসন করেছি, আবার আদর করেছি।

মন্মথ একে একে সবাইকে প্রণাম করতে সকলেই সস্নেহে তার চিবুকে হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। কেবল সর্বজ্যেষ্ঠা শরৎকালী বাদ ছিলেন। তিনি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

তাঁকে উঠতে দেখে স্মৃতিতীর্থ জিজ্ঞাসা করলেন—কি শরৎ, তুমি উঠলে যে?

তাঁর স্বভাবমতো স্থির মৃদু কণ্ঠস্বরে তিনি বললেন—আমার কি বসে থাকলে চলবে? বাড়িতে এত আত্মীয়বন্ধু, অতিথি-স্বজনের সমাগম, রান্নাবান্নার ব্যবস্থা দেখি গিয়ে। বৌমারা তো সব এখনও 'চোটো' বউ হয়েই আছে। হুকুম তামিল করতে পারে, নিজে থেকে কিছু করতে পারে না।

মন্মথর মনে হলো এই কক্ষ-পরিপূর্ণ আনন্দ যেন এই মহিলাটিকে স্পর্শও করতে পারে নি। বরং কোথায় যেন একটা বিরাগ নিয়েই তিনি চলে যাচ্ছেন একে সহ্য করতে না পেরে। স্মৃতিতীর্থের মতো মানুষও তাঁর অন্তরে এ আনন্দকে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন নি। তিনিও ভগ্নীর কথা শুনে নীরব হয়ে গিয়ে তাঁর কথা এবং সেই সঙ্গে যেন তাঁর অন্তরের শুষ্ক বিরাগও শিরোধার্য করে যেন মেনে নিলেন।

সমস্ত আসরটি যেন শরৎকালীর চলে যাওয়ার সংকল্পে শুষ্ক আড়ষ্ট হয়ে উঠল। ঘরখানা অকারণেই নীরব হয়ে গেল। সব হাসি তার আগেই শুকিয়ে গিয়েছে।

শরৎকালী ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন এমন সময় ঘরের নীরবতার মধ্যে মন্মথ ছোট্ট করে পিছন থেকে ডাকলে—দিদি।

শরৎকালী মন্থর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন—আমাকে বলছো?

মন্মথ হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়েছিল আগেই। তাঁর কাছে এগিয়ে যেতে যেতে সসম্ভ্রমে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ! বলতে বলতে সে আবার তাঁকে প্রণাম করলে।

শরৎকালী বিস্মিত হয়ে বললেন—আবার প্রণাম করলে কেন ভাই ?

—এটা আপনার এখানকার পাওনা দিদি। সকলের আগে আমার আপনাকে প্রণাম করা উচিত ছিল !

শরৎকালীর স্বভাব-কঠিন পাথরের মতো মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তিনি নিয়ম মতো তার চিবুক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন।

মন্মথ একটু হেসে বললে—আর একটু বসবেন না ?

শরৎকালী বললেন—না গোপাল, আর বসবো না। আমি বাড়িতে যাচ্ছি, কিন্তু আমার মনটা তো এইখানেই তোমার কাছে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াবে ভাই। এই আনন্দের আসর ছেড়ে যেতে কি আমারই ভালো লাগছে ? এই সব বোনগুলো এসেছে কতদিন পরে ! ওদের মুখে একটু ভালমন্দ দিতে হবে তো ! তাছাড়া গোপাল আছেন, দ্বিতীয় গোপাল হয়ে তুমি রয়েছো। তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার একটু ব্যবস্থা করব না ! আজ রাত্রিতে তোমাকে মাছের অম্বল খাওয়াব। আমি এখন যাই গোপাল !

কথার মধ্য দিয়ে বিগলিত অন্তরের মধু সারা ঘরে গঙ্গাজলের মতো ছিটিয়ে দিয়ে শরৎকালী বেরিয়ে গেলেন। যে মহিলাটি সব চেয়ে অল্পবয়সী, যতদূর মন্মথ মনে রাখতে পেরেছে তাতে যার নাম কাত্যায়নী, তিনি এক মুখ হেসে স্মৃতিতীর্থের জানুতে হাত দিয়ে নাড়া দিলেন—দাদা !

স্মৃতিতীর্থ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চকিত হয়ে সাড়া দিলেন—উঁ ?

কাত্যায়নী হেসে বললেন—আপনার পণ্ডিত বলে খুব বড় নাম ! কিন্তু আপনার চোখও খুব সরেস।

আবার স্মৃতিতীর্থের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন রে ?

পরমানন্দে সমঝদারের ভঙ্গিতে মন্মথর দিকে আঙুল দেখিয়ে কাত্যায়নী বললেন—আপনি কি জিনিসই খুঁজে বের করেছেন দাদা ! চোখের বাহাদুরী আছে তা হাজার বার স্বীকার করছি।

স্মৃতিতীর্থের মুখ বালকের অহংকৃত মুখের মতো হাসিতে ভরে গেল। তিনি আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে লাগলেন। মধ্যে মধ্যে সকৌতুক দৃষ্টিতে মন্মথর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

কাত্যায়নী বললেন—জেঠামশাই অল্পবয়সে মেজদিদির বিয়ে দিয়ে মারা গেলেন। তারপর বিয়ে দেবার ভার পড়ল বাবার হাতে। আজ ভাবি বাবার যদি আপনার

মতো চোখ থাকত!
এতক্ষণে স্মৃতিতীর্থের ষষ্ঠ সহোদরা পঞ্চাননী বললে—তা হলে কি হতো রে কাতু?
কাত্যায়নী হেসে যেন তার অতি বর্ষীয়ান বড় ভাইয়ের কোলে গড়িয়ে পড়ল হাসতে হাসতে। অনেক হেসে, আরও অনেক কষ্ট করে হাসি থামিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বললে—কেন বুঝতে পারলে না?
—না! তখন পঞ্চাননীর মুখেও হাসি দেখা দিয়েছে।
—বামুনের গরুর সঙ্গে ঘর করতে করতে তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি সব গিয়েছে। এ বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় তো বুদ্ধি কম ছিল না তোমার। এক ঘটি বুদ্ধি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলে। সে সব খুইয়েছ। সেই কথাই তো বলছিলাম দাদাকে। দাদা দেখে বিয়ে দিলে আমাদের এক একজনকে এক একটা বামুনের গরুর সঙ্গে ঘর করতে হতো না।
স্মৃতিতীর্থ বোধহয় এবার মুখের হাসি সত্য সত্যই গোপন করা প্রয়োজন বোধ করলেন। তিনি নিজের মুখ হেঁট করে মাথার চুলে হাত বুলোতে লাগলেন মুখের হাসি গোপন করবার জন্য।
পঞ্চাননীর ঠিক উপরের ভগ্নী আন্নাকালী সব চেয়ে হাসিখুশী মানুষ, আর তাঁর স্বামীর অবস্থা সবচেয়ে ভালো। কিন্তু পাণ্ডিত্য কি বিদ্যার কোনো খ্যাতি নেই। সে হেসে বললে—তা ভাই পঞ্চী, কাতু তো মিথ্যা বলে নি। বামুনের গরু দুধ দেয় ভালো, কিন্তু গরু তো!
মেজ ভগ্নী কালিমতী বললে—ও নিয়ে দুঃখ করে কোনো লাভ নেই ভাই। যার ভাগ্যে যা জুটেছে সেই ভালো। বেশী পণ্ডিত হলে ভালো হয়, না বেশী পয়সা থাকলে ভালো হয়, তা কি করে বলব?
কাত্যায়নী হাত নেড়ে বললে—ত্রিবেণীর ভট্‌চাজ বাড়ির মেয়ে হয়ে ও কথা তোমার মুখে মানায় না মেজদি।
স্মৃতিতীর্থ মাথার স্বল্পাবশিষ্ট চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—তা কাতু, বামুনের ঘরের গরুই হোক আর ঘোড়াই হোক, আজও তো বাপু, কোনো গরু তোমাদের পেট ফুটিয়ে দেয় নি শিং দিয়ে কি ছেঁচেও দেয় নি পা দিয়ে। তোমরা তো সবাই বহাল তবিয়তে আছ, আর পাতিব্রতা স্ত্রীর যা প্রধান কর্ম, সেই কর্ম করছ প্রাণপণে।
অতি সরলা বালিকার মতো কাত্যায়নী প্রশ্ন করলেন—কি কাজ দাদা?
হাসতে হাসতে স্মৃতিতীর্থ বললেন—বুঝতে পারলে না? আমি তোমাদের পরমানন্দে পতিনিষ্ঠার কথা বলছি।

সারা ঘরে এবার হাসির হররা কেনিয়ে উঠল।
হাসি একটু কমলে মন্মথ প্রশ্ন করলে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব দাদু ?
—কর ভাই, কর।
—আচ্ছা, আপনার কুলমন্ত্র কি কালী ?
স্মৃতিতীর্থ বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—তুমিই বল না ভাই !
—আমার তো তাই মনে হয়।
স্মৃতিতীর্থ উৎসাহিত হয়ে বললেন—কি করে তোমার মনে হলো ভাই ?
মন্মথ হেসে বললে—দেখলাম, আপনার সব ভগ্নীর নামের শেষে কি সঙ্গে কালী নাম রয়েছে। এই থেকেই মনে হয় কর্তারা কালী নাম যাতে বার বার উচ্চারণ করে ইষ্টকে স্মরণ করতে পারেন সেই জন্যই এই ব্যবস্থা।
কাত্যায়নী মন্মথর দিকে চেয়ে বললেন—তা হ্যাঁ ভাই. জলটল খাও ; সেই কখন বেড়িয়ে এসেছ ?
আরও আলাপ চলত হয়তো কিন্তু সংবাদ এলো কলকাতার পাথুরেঘাটার ইন্দুমতী গোপেশ্বরবাবুর কাছ থেকে সরকার এসেছে চিঠি নিয়ে। স্মৃতিতীর্থ বললেন—সেই লোককে এখানে নিয়ে এস।

সরকার এসেছে কলকাতা থেকে গোপেশ্বরবাবুদের দুই ভাইয়ের দীক্ষার প্রাথমিক ব্যবস্থা অগ্রিম করতে।
তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে একটু রুষ্ট হয়ে উঠে এলেন স্মৃতিতীর্থ। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই সরকার তাঁর পাদস্পর্শ না করে, দূর থেকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে উঠে হাত জোড় করে দাঁড়াল। বললে—আজ্ঞে, প্রথমেই অপরাধের জন্যে মার্জনা চাইছি। আপনি যখন আসতে বলেছিলেন আমি তার আগেই এসে ত্রুটি করেছি। আজ্ঞে, পিসীমা আর দুই বাবুরই এমন আগ্রহ যে তাঁরা আগে আমাকে পাঠিয়ে আপনাকে প্রণাম জানিয়ে বলতে বললেন—ওঁরা যথাসময়েই এসে উপস্থিত হবেন। ওঁদের আগ্রহের জন্যেই আপনাকে বিরক্ত করা। আপনি ওঁদের মাপ করবেন।
চপলার বাপের বাড়ি থেকে লোক এসেছে শুনে মন্মথও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল। সে দেখলে, কর্মচারীটির অতি সুচারু ও সুসজ্জিত বিনয় বাক্য শুনে স্মৃতিতীর্থের অপ্রসন্নতা দূর হয়ে গেল। তিনি হেসে বললেন—তা বাপু, বিরক্ত একটু হয়েছিলাম মিথ্যা বলব না। তা বেছে বেছে এমন উপযুক্ত লোককে তারা পাঠিয়েছে যার বাক্য বিন্যাসের উপর তার নিজের এবং তার কর্তাদের অগাধ বিশ্বাস। তাই আর রাগ করি কি করে ?

তারপর আবার একটু হেসে বললেন—তবে কথাটা কি জান বাবা, এ সব তো বকলমের কাজ নয়। এ সব কাজে মধ্যস্থতা চলে না। যার কাজ তাকেই করতে হয়। গুরুও ধনী দরিদ্রকে দুই পৃথক মন্ত্র দেন না, আর ইষ্টও ধনীকে পারে নিয়ে যাবার জন্যে পৃথক নৌকা পাঠান না। এক মন্ত্র, এক নৌকা সকলের। তা যখন এসেছ, এসেছ, ভালই করেছ। তুমি আমার অতিথি, নারায়ণ। মধ্যাহ্নে গোপালের প্রসাদ গ্রহণ করো আমার গৃহে।

বলে তিনি মন্মথর পিঠে হাত দিয়ে বললেন—চল ভাই, আমরা আমাদের আসরে ফিরে যাই।

ফিরে যেতে যেতে বললেন—তুমি এখানেই বিশ্রাম কর বাবা। দেখতেই পাচ্ছ, এ আমার দীনগৃহ নয়, এ ধনীর আবাস। এখানে কোনো অসুবিধা হবে না তোমার। ত্রিবেণীতে গঙ্গা স্নান কর, গোপালের প্রসাদ পাও, তোমার প্রভুদের কর্ম কর। একেই বাবা, রথ দেখা আর কলা বেচা বলে বুঝেছ।

বলে তিনি হাসতে হাসতে আবার ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন।

এই সদানন্দ পুরুষটির মধ্যে যে একজন নির্লোভ তেজস্বী, অকুতোভয় মানুষ আছে তার সামান্য পরিচয় পেলে মন্মথ।

চৌঠা কার্তিক দীক্ষার দিন।

এই জমিদারবাড়ির নিজেরই যে বাঁধানো ঘাট আছে সেইখানেই দীক্ষা দেবার স্থান ঠিক করেছেন স্মৃতিতীর্থ।

যেমন হুকুম ছিল তেমনিভাবে চপলার পিসীমা ইন্দুমতী নিজের দুই ভাই গোপেশ্বর ও ভূপেশ্বরকে নিয়ে কলকাতা থেকে ত্রিবেণীতে পৌঁছুলেন বজরা করে। বজরা জমিদারবাড়ির ঘাটে বেঁধে সংবাদ পাঠালেন তাঁরা যে তাঁরা এসেছেন এবং স্মৃতিতীর্থ নির্দেশ দিলে তাঁরা বজরা থেকে নামবেন এবং এসে তাঁকে প্রণাম করবেন।

মন্মথ তাঁর কাছে কাছেই ছিল। মন্মথ লক্ষ্য করলে, বৃদ্ধ ইন্দুমতীকে বড় স্নেহ করেন। যে কর্মচারীটি সংবাদ নিয়ে এসেছিল তাকে তিনি বললেন—হ্যাঁ, ইন্দুমাকে তাঁর ভাইদের নিয়ে আসতে বল। আমার কাছে এসেছে, আমার সঙ্গে এখুনি সাক্ষাৎ করবে বই কি। আসতে বল। আমি তো ওদের জন্যেই বসে আছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চপলার পিসীমা তাঁর দুই ভাইকে নিয়ে এসে সসম্ভ্রমে বৃদ্ধের ঘরের দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন। মস্ত ঘরের একদিকে গোপালের সিংহাসন, অন্যদিকে কম্বলের ভূমিশয্যায় দুটি শয্যা, একটি বৃদ্ধের অন্যটি মন্মথর। নিজের বিছানায় বসে ছিলেন বৃদ্ধ। তাদের দেখে পরম সমাদরের সঙ্গে ডাকলেন—এস, এস মা এস! তোমাদের জন্যেই তো এই পঁচাশি বছর বয়সে জেগে বসে আছি।

ওঁরা সকলে ঘরে এসে ঢুকলেন অতি সন্তর্পণে। মন্মথ সবিস্ময়ে দেখলে বাপ খুড়ো আর পিসীমার পিছনে পিছনে আর ও কে ঢুকল! ও যে চপলা। ও মা!

প্রথমেই ইন্দুমতী এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হলেন গুরুর পা স্পর্শ করে।

তাঁর প্রণাম শেষ হতেই গোপেশ্বর গিয়ে ভগ্নীর মতোই প্রণাম করলেন। তিনি অবুঝ ছোট ছেলের মতো কাঁদছেন। কেন কাঁদছেন কে জানে।

তাঁর প্রণাম শেষ হলে স্মৃতিতীর্থ তাঁর মাথায় হাত দিয়ে শুধু মৃদু স্বরে বললেন—শান্ত হও!

তাতে গোপেশ্বরের কান্না আরও বেড়ে গেল।

আর কনিষ্ঠ ভূপেশ্বর স্থির, প্রায় পাথরের মূর্তির মতো প্রণাম করলেন। অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম। তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠলেন। তাঁকেও মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন স্মৃতিতীর্থ।

তারপর চপলা প্রণাম করলে। প্রণাম শেষ করেই হাসিমুখে মন্মথর কাছে গিয়ে তার একখানা হাত চেপে ধরে বললে—ওমা, গঙ্গাজল, তুমি এখানে!

চপলা আশ্চর্য। যেখানে তার পিসীমা, বাবা, কাকা সসম্ভ্রমে ও সভয়ে চুপ করে আছে সেখানে চপলা অসংকোচ যেন। সে হাসিমুখে খানিকটা কৌতুক করেই মহামান্য বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলে—আমার গঙ্গাজলকে কেমন দেখছেন দাদু?

স্মৃতিতীর্থ একবার এই প্রগল্ভ মেয়েটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে তাকে যেন যা দেখবার যতখানি দেখবার দেখে নিলেন। তারপর সরস হাসির সঙ্গে প্রশ্ন করলেন—মন্মথ তোমার গঙ্গাজল হলো কি করে?

চপলা কিছু বলবার আগেই তার পিসীমা ইন্দুমতী কৈফিয়তের সুরে বললেন—সে অনেক কথা বাবা! ওর সঙ্গে অদ্ভুতভাবে আমাদের পরিচয়। চপলা ওকে একবার কটু কথা বলেছিল, তার ফলে ব্রহ্মশাপে জামাই প্রায় মরতে বসেছিল। সেবার আবার ওর দয়াতেই জামাই বেঁচে উঠল। সে প্রায় গল্পকথার মতো। সেই থেকে আমাদের বাড়িতে চপলির শ্বশুরবাড়িতে ওর আদর আর সম্মান দেবতার মতো।

স্মৃতিতীর্থ একটু হাসলেন। কোনো কথা বললেন না।

তারপর তিনি ভিন্ন কথায় চলে গেলেন। প্রশ্ন করলেন—তোমরা ধনী কিন্তু আমি যেমন বলেছিলাম তেমনি করেছ তো? বেশী জিনিসপত্র আনো নি তো?

ভাইয়েরা কিছু বলবার আগেই ইন্দুমতী বললেন—না বাবা, আপনি যেখানে নিষেধ করেছেন সেখানে কোনো বাড়তি জিনিসপত্র আনবার সাহস করব কি করে?

স্মৃতিতীর্থ মিষ্টভাবে বললেন—ভালই করেছ মা। পুরোহিত যেমন একটি যুবা পুরুষের সঙ্গে একটি যুবতীর বিবাহবন্ধন স্থাপন করে দেন, গুরুও তেমনিভাবে পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরীর সঙ্গে ভক্তের চিরজীবনের অদৃশ্য, অজ্ঞাত গ্রন্থিকে দৃশ্য ও জ্ঞাত করে দিয়ে নূতন বন্ধন স্থাপন করে দেন। যে গ্রন্থিতে তিনিও চিরদিন চির-ঘটকের মতো অবস্থান করেন। মায়ের কোলে শিশু যেমন নগ্ন হয়ে মায়ের সমাদর লাভ করে তেমনি ঈশ্বরের পদপ্রান্তে নগ্ন থাকবার জন্য সব আভরণ, সব আবরণ, সব অহমিকা পরিত্যাগ করে উপস্থিত হতে হয়। তাই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক, রাজসিকতার স্পর্শলেশশূন্য।

ওঁরা সকলেই হাত জোড় করে স্মৃতিতীর্থের সামনে মেঝের উপর বসে তাঁর কথা শুনছিলেন। এবার ইন্দুমতী প্রশ্ন করলেন—তা হলে বাবা, আমরা রাত্তিরটা গঙ্গার উপরে বজরাতেই থাকি ? কাল ভোরে স্নান করে আপনার কাছে ভাইদের নিয়ে আসব ?

স্মৃতিতীর্থ পরমাদরে বললেন—কেন মা, বজরায় থাকবে কেন ? এইখানে এই বাড়িতে আমার কাছে থাকবে ! আমি তো সেই ব্যবস্থাই করে রেখেছি। উপরের বড় ঘরখানা, 'হল' না কি বল তোমরা. সেই ঘরে তোমরা থাকবে। আমি সাত আটখানা কম্বল উপরের ঘরে রেখে দেবার ব্যবস্থা করেছি। আজ তো মা তোমার ভাইদের সংযম।

তারপর গোপেশ্বর ও ভূপেশ্বরের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—আজ দিনে তোমরা হবিষ্যান্ন খেয়েছ তো ?

জবাব দিলেন ইন্দুমতী—আজ্ঞে, আপনি যেমন বলেছিলেন।

স্মৃতিতীর্থ বললেন—আমি রাত্রিতে দুধ আর মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করে রেখেছি। তাই খাবে সকলে।

তারপর চপলার দিকে ফিরে বললেন—তুমি কি খাবে ভাই ? আমার বাড়িতে মাছ ভাতেরও ব্যবস্থা আছে। তোমার গঙ্গাজল মন্মথ দিনে আমার নিয়ম-সেবার হবিষ্যান্নের ভাগ গ্রহণ করে, রাত্রিতে মাছ-ভাত খায়। তুমি ইচ্ছা করলে মাছ-ভাতও খেতে পার ! আর তুমি সধবা মানুষ, তোমার মাছ-ভাত খাওয়াই ভালো।

চপলা আবদারের সুরে বললে—আমিও বাবা-কাকা-পিসীমার সঙ্গে আজ হবিষ্যি করেছি। আপনি কাল বাবা-কাকার সঙ্গে আমাকেও দীক্ষা দিন না দাদু। দেবেন ?

হা হা করে হেসে উঠলেন স্মৃতিতীর্থ। হাসতে হাসতে বললেন—সব কিছুরই সময় আছে ভাই। মাঘ-ফাল্গুন মাসে আমে মাত্র মুকুল ধরে, পাকতে লাগে বেশ কয়েক মাস। শীত বসন্ত পার হয়ে গ্রীষ্মকাল এলে ফল পরিপুষ্ট হয়, তখন গ্রীষ্মের প্রবল

উত্তাপে সেই পরিপুষ্ট ফল পাকতে আরম্ভ করে। তোমারও সেই পরিপক্কতার কাল আসুক, আমি আশীর্বাদ করে রাখছি তোমাকে, তোমার দীক্ষা নেবার জন্য গুরু তোমাকে আপনি আহ্বান করবেন। কোনো চিন্তা করো না।

চুপ করে যেতে হলো চপলাকে।

বৃদ্ধ এই সময় গলা তুলে ডাকলেন—ও বাবা রামময়, আছ নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠপুত্র হাজির।

তাঁকে তিনি প্রশ্ন করলেন—গৌরাঙ্গকে সংবাদ দিয়েছ?

—আজ্ঞে, দিয়েছি।

—ভোরে ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্নান করে আসতে বলেছ তো?

—আজ্ঞে।

—আজ সে সারাদিন সংযম করে আছে তো?

—ঠিক আছে। তুমি এবার এঁদের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। তার আগে ওঁদের রাত্রির আহারের জায়গা করে দিতে বল। শরৎকে আমি সব বলে রেখেছি। তুমি ব্যবস্থা কর। বিলম্ব করো না। ওরা পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আছেন।

রামময় চলে গেলেন।

চপলা আবার তার প্রার্থনা পুনরাবৃত্তি করলে। বললে—দাদু, আপনি আমাকে দীক্ষা দেবেন না তা হলে? কিন্তু যে অবস্থার কথা বললেন তা হতে হতে কি আর আপনি তখন থাকবেন?

উচ্চকণ্ঠে এবার হেসে উঠলেন স্মৃতিতীর্থ। বললেন—এই তো, এবার ঠিক বুঝতে পেরেছ। পরিপক্ক হতে অনেক সময় লাগে। এর আগে যদি দীক্ষা দিই তা হলে তাতে কাজ হবে না, বীজমন্ত্র বন্ধ্যা হয়ে মরে যাবে। আর তুমি মন্মথর গঙ্গাজল, তুমি আমারও গঙ্গাজল হলে আজ থেকে।

কথাগুলির মধ্যে এমন মাধুর্য ছিল যা সকলেরই অন্তর স্পর্শ করল। চপলার চোখে জল এলো। সে আর কিছু বললে না।

তার মাথায় হাত দিয়ে তিনি সস্নেহে বললেন—যাও, এইবার খাওয়া-দাওয়া কর গিয়ে। তোমারও আজ মাছ-ভাত খেয়ে কাজ নেই। তুমি দিনে যখন সংযম করে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেছ তখন রাত্রিতেও ফলাহার কর।

পুত্র রামময় ও ভাগিনেয় জীবনরতন ওদের নিয়ে যাবার জন্য তখন লণ্ঠন হাতে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছেন।

পরদিন এক প্রহর রাত্রি থাকতে মন্মথকে উঠতে হলো।

কার ডাকে যেন তার ঘুম ভেঙে গেল। কে অত্যন্ত মৃদু স্বরে বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে ডাকছে। কাকে ডাকছে? আবছা ঘুমের মধ্যে ডাকটা কানে আসতেই সে উঠে বসল। সে কান পেতে শুনে বুঝতে পারলে চপলা ডাকছে তাকে গঙ্গাজল বলে।

সে আর স্মৃতিতীর্থ একই ঘরে কম্বলের বিছানায় রাত্রি যাপন করেছেন। সে বিছানাতে বসেই একবার চারিপাশটা লক্ষ্য করে নিলে। মাথার শিয়রে কিছু দূরে দেওয়ালের ধারে সিংহাসনে গোপাল এখনও শয়ান। কিন্তু কমানো লণ্ঠনের মৃদু আলোয় সে দেখলে কম্বলের বিছানায় স্মৃতিতীর্থ উঠে বসে আছেন, গায়ে তাঁর একখানা চাদর জড়ানো। কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ হলেও খোলা-মেলা জায়গা আর নদীর ধার বলে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা রয়েছে। স্মৃতিতীর্থ চাদর জড়িয়ে নিঃশব্দে জপ করছেন।

মন্মথ একটু ইতস্তত করে মৃদুস্বরে বললে—দরজা খুলব?

স্মৃতিতীর্থ ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। শেষ রাত্রির স্বল্প আলোয় আবছা অন্ধকারে তাঁর মাথাটা নড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মস্ত মাথাখানাও একই সায় দিলে। সে উঠে নিঃশব্দে দরজা খুলে দরজার কাছে দাঁড়াল। সে প্রশ্ন করলে—এত ভোরে উঠেছ কেন? এখনও তো রাত্রি আছে।

চপলা নিচুগলায় বললে—ওমা, রাত্রি কোথায়? আর একটু পরেই তো বাবা, কাকা, পিসীমা সব গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। আমিও যাব, তাই যাবার আগে তোমায় ডাকতে এসেছি।

—কেন? এই ভোরে স্নান করতে হবে? ওরে বাবা. সে আমি পারব না।

এই সময়ই ঘরের ভিতর বিছানার উপর স্মৃতিতীর্থ ভরাট গলায় ডেকে উঠলেন—কালী, কালী, মা করুণাময়ী। জয় কালী করুণাময়ী! গোপাল।

এই পরিপূর্ণ অন্তরের ডাক শুনে মানুষের বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে ওঠে। ওরা দু'জনেই তাঁর দিকে একবার তাকালে। দেখতে তিনি হাত জোড় করে বিছানাতেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণত হলেন।

প্রণাম শেষ করে তিনি ডাকলেন—মন্মথ!

এ সেই গলা, সেই কণ্ঠস্বর যে কণ্ঠস্বরে মহামহোপাধ্যায় রামরাম স্মৃতিতীর্থ সমাজপতি হিসাবে, স্মৃতির বিধানদাতা হিসেবে, গুরু হিসেবে আদেশ দেন।

মন্মথ তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি বললেন—দেখ তো ভাই, আমার রামময় কোথায়। ডাক তো তাকে।

মন্মথ বিস্মিত হয়ে বললে—তিনি কি উঠেছেন?

স্মৃতিতীর্থ হেসে বললেন—আমি উঠেছি আর সে ওঠে নি এ কি হয় ? সে উঠেছে, এই বাড়িতেই কি এই বাড়িরই গঙ্গার ঘাটে আছে, ডাক তাকে।

রামময় এলেন। পিতা কিছু প্রশ্ন করবার আগেই বললেন—আপনার স্নানের জন্যে গরম জল বসানো হয়েছে।

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—গরম জলে স্নান করব কেন হে ? গঙ্গাজল আজ কি দোষ করলে ?

রামময় মৃদুস্বরে বললেন—কার্তিক মাস পড়েছে, শেষ রাত্রিতে একটু ঠাণ্ডা রয়েছে তো। তাই গরম জলে স্নানই ভালো হবে।

বৃদ্ধের সেই স্বভাবসিদ্ধ হা হা হাসি। সে হাসি হেসে পুত্রের উদ্বেগ ও পরামর্শ তিনি উড়িয়ে দিলেন। বললেন—কিছু হবে না হে, তোমার বাবার কিছু হবে না। অন্তত গঙ্গাজলে স্নান করে কিছু হবে না। আর বালককাল থেকে এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তো গঙ্গাই আমার দেহকে প্রতিদিন শীতল আর গ্লানিহীন করেছেন।

তারপর পরম কৌতুকের সঙ্গে বললেন—ওই দেখ মন্মথ আর আমার গঙ্গাজল গঙ্গাজলে অবগাহন স্নানের জন্য চলেছে। আমি ওদের সঙ্গে স্নান করতে যাব।

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আমার কাপড়চোপড় নিয়ে ঘাটে চল।

তারপর উচ্চকণ্ঠে বললেন—ওহে গঙ্গাজল, মন্মথ, দাঁড়াও ভাই, আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।

পরমানন্দে ওদের সঙ্গে স্নানে নামলেন বৃদ্ধ। কিন্তু স্নান করে উঠে কাঁপতে লাগলেন। পুত্র রামময় কাপড় গামছা, চাদর নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি শুকনো গামছা দিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ মুছে কাপড় বদলে দিয়ে একখানা গরম চাদর দিয়ে বৃদ্ধকে মুড়ে দিলেন।

বৃদ্ধ হেসে পুত্রকে বললেন—তোমার আমার সম্পর্কে বিবেচনায় দেখি ভুল হয় না হে ! এই ভক্তি-শ্রদ্ধা-সেবা দিয়ে যদি তুমি গোপালের সেবা করতে তা হলে এতদিনে গোপাল তোমাকে দয়া করতেন।

পুত্র কোনো উত্তর দিলে না। তিনি ভিজে কাপড়খানি গামছাতে জড়াতে লাগলেন।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন—সব প্রস্তুত হয়েছে ? গৌরাঙ্গ এসেছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ !

বৃদ্ধ সোৎসাহে বললেন—তবে আর কি, চল ! গোপালকে প্রণাম করে এসে দীক্ষা দিয়ে দিই !

গঙ্গার ঘাটের চাতালে দীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে।

বাইরের লোকজন বিশেষ কেউ উপস্থিত নেই। ইন্দুমতী, গোপেশ্বর ও ভূপেশ্বর ছাড়া আর রয়েছে মন্মথ ও চপলা। আর স্মৃতিতীর্থের পুত্র রামময়, রামজয় ও ভাগিনেয় জীবনরতন। জীবনরতন সব আয়োজন করছেন।

মন্মথ লক্ষ্য করলে অতি অল্প আয়োজনের কথা বললেও রাশীকৃত জিনিসে পূজা-স্থলীর একটা পাশ পরিপূর্ণ। সব জিনিসপত্র আবছা অন্ধকারের জন্য ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, তবে তার স্তূপীকৃত অবয়ব থেকে তার পরিমাণ বোঝা যাচ্ছে।

মন্মথ একবার চারিপাশে, চারিদিকে চেয়ে দেখলে। মাথার উপরে অতি বিস্তৃত অন্তহীন আকাশ এখনও অন্ধকার। গঙ্গা এখানে পূর্ববাহিনী। সামনে নদীর উপরে অপার ঝাপসা শূন্যতা। সেখানে কুয়াশা জমে আছে ঘন হয়ে। মাথার উপরে আকাশের পশ্চিম প্রান্তে প্রায় পূর্ণ চাঁদ অস্ত গেল। কেবল পশ্চিম আকাশের অঙ্ক-শায়ী হয়ে শুকতারা জগন্নাথের মাথায় অতি উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মতো জ্বলছে; পূর্বদিকে অতি দূরে আকাশের নিম্নতম প্রান্তে আকাশে অস্পষ্ট রক্তাভা ফুটতে আরম্ভ করছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল কাছেই বিশাল নদীর জলস্রোত নিম্ন কলস্বরে বয়ে চলেছে। প্রায়ান্ধকার ও কুয়াশার জন্য নদীর জলও ভালো করে দেখা যায় না। এই আশ্চর্য অপরিচিত পরিবেশের প্রভাবেই বোধহয় সকলেই অতি মৃদুস্বরে কথা বলছে। এমন কি তার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে চপলা যে চপলা সেও কথা বলছে অতি মৃদুস্বরে।

চপলা এক সময় নিম্নকণ্ঠে মন্মথকে বললে—আজ তো দীক্ষা হবে বাবার আর কাকার? কিন্তু দেখ তিনখানা আসন পাতা হয়েছে!

মন্মথ ভালো করে না দেখেই বললে—তা তো পাতবেই। যিনি দীক্ষা দেবেন তাঁর আসন তো সবচেয়ে আগে পাততে হবে।

চপলা অসহিষ্ণু হয়ে বললে—সে কি আর আমি জানি না? কিন্তু দেখ, সব সমেত চারখানা আসন পাতা। একখানা উত্তরমুখ করে আর বাকী তিনখানা পূর্বমুখ করে।

মন্মথ লক্ষ্য করে দেখলে। সত্যিই তো, আসন একখানা বেশী। তাহলে আরও কেউ আছে দীক্ষা নেবার!

এই সময় স্মৃতিতীর্থ এসে উপস্থিত হলেন।

তিনি এসেই ডাকলেন—রামময়, জীবন।

পুত্র এবং ভাগিনেয় বৃদ্ধের দুপাশে এসে দাঁড়ালেন।

তারপর তিনি ডাকলেন—গৌরাঙ্গ!

অন্ধকারের মধ্য থেকেই একটি অপরিচিত প্রৌঢ় মানুষ এসে দাঁড়াল। অবাক হলো সবাই। এ কে, এলোই বা কোথা হতে? এতক্ষণই বা কোথায় ছিল?
সকলেই তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। অন্ধকারের মধ্যে উপস্থিত প্রতিটি জনের দৃষ্টির অর্থ বুঝতে না পারা গেলেও সে দৃষ্টিতে যে প্রতিক্ষেত্রেই বিস্ময় ছিল এতে মন্মথর অন্তত কোনো সন্দেহ ছিল না। আর এই পরিচ্ছন্ন, সুশ্রী, শোভন অভিজাত মণ্ডলীর মাঝখানে এই সামান্য মানুষটির আকস্মিক উপস্থিতির অন্তরালে স্মৃতিতীর্থের কোনো স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে তাও মন্মথ অভ্রান্তভাবে বুঝতে পারলে। চপলা তার হাতে চাপ দিয়ে মৃদু স্বরে ইঙ্গিতে বললে—কে?
—জানি না। বলে মন্মথ চুপ করে গেল। সে এই দু'দিনে স্মৃতিতীর্থের মুখে অন্তত দু'বার গৌরাঙ্গ নামটি উচ্চারিত হতে শুনেছে আর বুঝেছে যে এ মানুষটি স্বয়ং স্মৃতিতীর্থের আহ্বানেই এখানে উপস্থিত হয়েছে।
মানুষটি সংকুচিত হয়ে চুপ করে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। শীর্ণকায়, খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ এক প্রৌঢ়। পরনে ক্ষারে কাচা ধুতি, তারই এক প্রান্ত উর্ধাঙ্গে জড়ানো। তারই অবকাশে তার গায়ের কালো রঙের উপর সাদা উপবীতের এক অংশ দেখা যাচ্ছে।
স্মৃতিতীর্থ আসনে বসে ছিলেন। তাকে দেখতে পেয়েই পরম সমাদরের সঙ্গে সোচ্চার আহ্বান জানালেন—গৌরাঙ্গ, এসেছ? এস, জীবন তোমার জন্যে আসন পেতে রেখেছে। এস, তোমাকেই আগে দীক্ষা দেব।
প্রৌঢ় সসংকোচে সসম্ভ্রমে মাথা হেঁট করে, জোড় হাতে ভিড় কাটিয়ে আসনের কাছে এগিয়ে গেল। সর্বাগ্রে গঙ্গাকে প্রণাম করে সে জোড়হাতে স্মৃতিতীর্থকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। তারপর নিঃশব্দে আসনে বসল।
অন্ধকার দ্রুত পরিষ্কার হয়ে আসছে। তবু সব ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে মন্মথর মনে হলো যেন প্রৌঢ় নিঃশব্দে কাঁদছে।
স্মৃতিতীর্থ মৃদুস্বরে বললেন—কেঁদ না, চোখ মোছ। আশীর্বাদ করছি ইষ্টমন্ত্র তোমার মধ্যে স্ফুরিত হবে, তুমি মায়ের কৃপা লাভ করবে।
তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তাকে সস্নেহে তিনি কাছে টেনে আনলেন, তারপর তার দক্ষিণ কানে মুখ দিয়ে অতি মৃদু স্বরে ইষ্টমন্ত্র দান করে দীক্ষা দিলেন। তারপর নিজের দুখানি পা প্রসারিত করে দিলেন তার সম্মুখে। সেই প্রসারিত দুই পায়ের উপর প্রৌঢ় নিজের অঞ্জলির মধ্যে রাখা এক মুঠো সাদা ফুল গুরুর পায়ের উপর যত্নে ছড়িয়ে দিয়ে তাঁর দুই পায়ের উপর মাথা রাখলে। বেশ কিছুক্ষণ পর সে মুখ তুললে। তারপর চোখ মুছতে মুছতে সে যেমন নিঃশব্দে এসে-

ছিল তেমনি নিঃশব্দে উঠে গেল। উঠে যাবার সময় স্মৃতিতীর্থ বললেন—আজ দুপুরে আমার কাছে প্রসাদ গ্রহণ করবে। সেই সঙ্গে গলা একটু তুলে বৃদ্ধ পুত্রের হাতে কিছু তুলে দিয়ে বললেন—রামময়, গৌরাঙ্গের প্রণামী আধুলিটি রেখে দাও। সবটাই একটা নিঃশব্দ বিস্ময়ের মধ্যে স্বপ্নের মতো সম্পন্ন হলো। সে উঠে যেতেই স্মৃতিতীর্থ আহ্বান করলেন—এস গোপেশ্বর!

পর পর দুই ভাইয়ের দীক্ষা সম্পন্ন হলো। রাশি রাশি পদ্মফুল গুরুর পায়ে নিবেদন করলেন দুই ভাই। সেই সঙ্গে গরদের কাপড়-চাদর আর দুটি আংটি। একটি হীরের আর অন্যটি পান্নার।

দীক্ষা দিয়ে প্রণাম ও দক্ষিণা স্পর্শ করে গ্রহণ করে স্মৃতিতীর্থ উঠে দাঁড়ালেন। সদ্য-উদিত সূর্যকে প্রণাম করে বললেন—বাবা, আজ থেকে তোমরা আমার আত্মজের সমতুল্য হলে। তোমাদের আত্মিক সব শুভাশুভের দায় ও ভার আমার হলো। আমার আদেশ ঈশ্বরের আদেশ বলে পালনীয়। ওই সদ্যোদিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রণাম কর, সম্মুখে পতিতপাবনী গঙ্গা, ওঁকে প্রণাম কর। অন্তরে প্রার্থনা কর যেন তোমাদের সব পাপ স্খলিত হয়, সব গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সব সংশয় মোচন হয়।

ওঁদের প্রণাম সম্পন্ন হলে তিনি সব গাম্ভীর্য পরিত্যাগ করে বললেন—তোমরা আজ আমার প্রসাদ গ্রহণ করবে। ভয় নাই, আমি যেমন কানে ফুঁ দিতে জানি, তেমনি শাঁখেও ফুঁ দিতে পারি। আবার সেই সঙ্গে উনুনেও ফুঁ দিতে জানি। বত্রিশ বছর বয়সে আমার স্ত্রীর-বিয়োগ হয়েছে। সেও তোমার পঞ্চাশ বছরের বেশী হয়ে গেল। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অনেক বৎসর আমি স্বপাকে রান্না খেয়েছি। এই তো নিয়ম-সেবার মাস চলেছে, নিজেই স্বপাকে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করে খাচ্ছি, আমার সঙ্গে মন্মথও খাচ্ছে। ওকে জিজ্ঞাসা কর, আমি কেমন রান্না করি। আমার ধারণা তোমাদেরও খুব খারাপ লাগবে না!

তারপর মন্মথকে বললেন—চল ভাই, আমার কাজ শেষ হয়েছে, চল এবার বাড়ির মধ্যে যাই।

তিনি আর ভ্রূক্ষেপ না করে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন। বিকেলের দিকে ইন্দুমতী ভাইদের ও চপলাকে নিয়ে কলকাতা চলে গেলেন নৌকো করে। পরম আনন্দিত পরিবেশের মধ্যেই তাঁরা বিদায় নিয়ে গেলেন। বিদায় দেবার সময় ইন্দুমতীর মাথায় হাত রেখে বৃদ্ধ বললেন—মা, আজকের দিনটার বিষয় মনে থাকবে তোমার। তোমাকে যখন কলকাতায় তোমাদের বাড়িতে দীক্ষা দিই, সেদিন তুমি রান্না করে আমাকে খাইয়েছিল। আর আজ আমি তোমাদের

রান্না করে প্রসাদ দিলাম।

গোপেশ্বর হাত জোড় করে ছলছল চোখে বললেন—এমন সুন্দর জিনিস জীবনে, বড়লোকের ছেলে হয়েও খুব কম খেয়েছি বাবা!

ওঁদের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে তাঁদের নৌকোয় তুলে দিয়ে পুত্র ভাগিনেয় জামাতাকে সঙ্গে নিয়ে, মন্মথর কাঁধে হাত দিয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে এলেন। তারপর গোপালকে প্রণাম করে বিছানায় এসে বসে পরম তৃপ্তির সঙ্গে বললেন—এই তো হয়ে গেল! যা কর্তব্য ছিল সব শেষ করলাম!…বলে হাত দুখানি ঝেড়ে অন্তরের তৃপ্তিকে প্রকাশ করলেন। তারপর ভাগিনেয় জীবনরতনের দিকে ফিরে রসিকতার সঙ্গে বললে—হ্যাঁরে জীবন, ধনীলোকদের দীক্ষা দিলাম, ওরা কি দিলে?

জীবনের সঙ্গে মাতুলের বোধহয় এক ধরনের অন্তরঙ্গতা আছে। তিনি বেশ সহজ রসিকতার সঙ্গেই বললেন—আজ্ঞে তা দিয়েছ ভালই। বড়লোক তো!

—কি দিয়েছে?

—নানান জিনিসপত্রের মধ্যে দুটো অঙ্গুরী দিয়েছে। বোধহয় মূল্যবান জিনিস!

মন্মথ বললে—দামীই। গঙ্গাজল বলছিল, আংটি দুটোর একটা হীরের, একটা পান্নার!

স্মৃতিতীর্থ বললেন—নিয়ে এসো তো, দেখি একবার!

জীবনরতন চলে গেলেন।

স্মৃতিতীর্থ আবার বললেন—রামময়, গৌরাঙ্গ যে আধুলিটি প্রণামী দিয়েছে তাই দিয়ে কাল গোপালের জন্যে বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করো বাবা। ওর প্রণামী বড় দুর্লভ বস্তু, বড় পবিত্র।

জীবনরতন আংটি দুটি ভেলভেটের বাক্স সমেত নিয়ে এলেন। স্মৃতিতীর্থ একবার বাক্স খুলে সে দুটি দেখে পান্নার আংটির বাক্সটি ভাগিনেয়ের হাতে তুলে দিলেন। বললেন—এটা তুই রাখ, তোর মেয়ে বড় হয়েছে। বিয়েতে পাত্রাভরণের সঙ্গে জামাইকে দিবি।

অন্য আংটিটি বাক্স থেকে বের করে তিনি মন্মথর একখানি হাত সস্নেহে তুলে নিয়ে তার আঙুলে পরিয়ে দিলেন।

মন্মথ বিস্মিত ও বিব্রত হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—আবার কেন দিচ্ছেন?

বৃদ্ধ তার মুখের দিকে চেয়ে একটু অর্থহীন হাসি হেসে বললেন—দিলাম। আমার সঙ্গে ক'দিন কাটিয়েছিলে তার স্মৃতি হয়ে থাকবে। এই বুড়োকে মনে পড়বে এর দিকে তাকালে।

—আংটি না থাকলেও মনে পড়বে দাদু!

বৃদ্ধ হাসলেন, আর কোনো কথা বললেন না।

তার পরই কম্বলের উপর শুয়ে পড়লেন।

রামময় পিতাকে শুতে দেখে একটু শঙ্কিত হয়ে পিতার কাছে এসে, পাশে বসে, প্রশ্ন করলেন—বাবা, আপনি শুলেন যে?

ভাগিনেয় জীবনরতন বললেন—দাদা যে কি বলেন! বয়স হয়েছে, সারাদিন পরিশ্রম হয়েছে। সেই ভোর রাত্রিতে গঙ্গায় স্নান করেছেন, তারপর পুজো করেছেন এক প্রহর, তারপর এই চুরাশি বছর বয়সে সাত আট জনের রান্না করেছেন রাঁধুনী বামুনের মতো। পরিশ্রম হয় নি? কাজেই বিশ্রাম করতে শুতে হবে না, শোবেন না?

রামময় তাঁর কথায় কান না দিয়ে পিতার মুখের উপর ঝুঁকে মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলেন—শরীর কি অসুস্থ লাগছে বাবা?

স্মৃতিতীর্থ কথা না বলে একটু হাসলেন। ক্লিষ্ট হাসি।

সঙ্গে সঙ্গে রামময় পিতার গায়ের উত্তাপ পরীক্ষার জন্য তাঁর গায়ে হাত দিলেন। শঙ্কিত হয়ে বললেন—এ কি, এ যে জ্বর হয়েছে! অনেক জ্বর।

সকলেই চকিত হয়ে উঠল। জ্বর হয়েছে? এই বয়সে অনেকটা জ্বর হয়েছে! সকলেই বিভ্রান্ত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে নীরবে তাকাতে লাগল।

সমস্ত নীরবতা ভঙ্গ করে চুরাশি-বর্ষীয়, শয়ান বৃদ্ধ মৃদু স্বরে বললেন—রামময়, আমাকে তীরস্থ কর!

তাঁর মৃদু কণ্ঠের কটি কথা গম্ভীর বর্ষণগর্ভ মেঘধ্বনির মতো সকলের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হলো।

১৫

রাত্রি এক প্রহর হতে না হতে, শুধু ত্রিবেণী কেন, সমগ্র অঞ্চলটিতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল—চুরাশি বৎসর বয়স্ক মহামান্য সমাজপতি মহামহোপাধ্যায় রামরাম স্মৃতিতীর্থ মশাই গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে দেহরক্ষা করবার জন্য তীরস্থ হয়েছেন। তাঁর এ বৎসর কার্তিক মাসে এই নিয়ম সেবাকে এই তীরস্থ বাসনার সঙ্গে যুক্ত করে অনেকে বললেন—উনি মনে মনে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করেই এবার নিয়ম সেবা করতে মনস্থ করেছিলেন। কেউ কেউ আবার তাঁর অভিপ্রায়কে পিতামহ ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করে বললেন, বড় মানুষ, ইচ্ছামৃত্যু বরণ করবেন

বলেই সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, সমস্ত ভগ্নীদের কাছে ডেকে এনেছিলেন ! এর মধ্যে অনাত্মীয় যারা তারা প্রাত্যহিক জীবনের চেয়ে বৃহত্তর ও মহত্তর কিছুর অস্পষ্ট আস্বাদ পেয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

সমস্ত অঞ্চলেই তাঁর এই তীরস্থ হওয়াকে অবলম্বন করে এক আশ্চর্য উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো। কিন্তু তিনি যাদের পরিবারের মানুষ তাঁরা বিপুল বেদনায় বিমূঢ় হয়ে গেলেন। আসন্ন প্রিয় বিচ্ছেদের বিষণ্ণতায় সমগ্র পরিবেশ আপ্লুত হয়ে গেল। রামময় পিতার আদেশ শুনে অনেকক্ষণ বিস্ফারিত শূন্য দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সকলেই ততক্ষণে তাঁর বিছানার চারিপাশে এসে ভিড় করেছে। ছোট ছেলে রামজয় পাশের বিছানা থেকে একখানা পাতলা কম্বল গুটিয়ে বালিশের মতো করে তাঁর কাছে এসে ডাকলেন—বাবা, মাথাটা তুলুন তো, এই কম্বলখানায় বালিশের মতো মাথা দিন ! বৃদ্ধ তখন চোখ বন্ধ করে নিজের নাড়ি দেখছেন।

বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের আহ্বানে একবার চোখ খুলে আবার বন্ধ করে কম্বলের বালিশে মাথা দিলেন। এই সময় দাঁড়ালেন বৃদ্ধের একমাত্র জামাতা স্বরূপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। রামময়ের পিঠে হাত দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—দাদা, আপনি কবিরাজ ডাকার ব্যবস্থা করুন। আগে কবিরাজ দেখুন, তারপর যা হয় করা যাবে !

জামাতার কথা তাঁর কানে গিয়েছিল। তিনি চোখ ঈষৎ খুলে জামাতার দিকে চাইলেন। ক্লিষ্টভাবে হেসে বললেন—আমাকে তীরস্থ করতে দেরি করো না। অবশ্য এখনি কিছু হবে বলে মনে করি না। কবিরাজ দেখিয়ে কি করবে ? যাবার কাল সমাগত, এবার যেতে হবে, যাব। যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছি। কবিরাজের কি প্রয়োজন ? তবে তোমাদের ইচ্ছায় বাধা দেব না। তোমরা ডাকতে পার।

একসঙ্গে অনেকগুলি কথা বলে তিনি যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ করলেন।

কিছুক্ষণ পর আবার চোখ খুলে চারিদিকে চেয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগলেন। আত্মীয়-স্বজন সকলেই চারিপাশে বসে। তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখে এর ওর মুখের দিকে চাইতেই রামময় একটু ঝুঁকে প্রশ্ন করলেন—কাউকে খুঁজছেন বাবা ?

—মন্মথ ? মন্মথ কই ?

আত্মীয়-স্বজনের এই ভিড়ের মধ্যে থেকে মন্মথ একটু সরে গিয়েছিল। সে এই ক'দিনের সমগ্র ঘটনার অভিঘাত মনে মনে পরিপাক করবার চেষ্টা করছিল।

জীবনের সঙ্গে মৃত্যু এত কাছাকাছি বাস করে? জীবনের আনন্দক্ষেত্রে সেখানকার মৃত্তিকা থেকেই এমনি অকস্মাৎ রুদ্রের সহচর শূলহস্ত নন্দীর মতো আবির্ভূত হয়? এখানে কেমন ভয়ের ও বিহ্বলতার স্পর্শ সে সকলের মনে সঞ্চারিত করেছে! কিন্তু কি আশ্চর্য। যাকে কেন্দ্র করে এই ভয়বিহ্বলতা তাঁর কিন্তু কোনো ক্লৈব্য নেই। কিন্তু তিনি শয্যাশায়ী হয়েছেন। মন্মথ সবিস্ময়ে অনুভব করছে, তিনি আর ওই ভূমিশয্যা ত্যাগ করে উঠবেন না!

ওই কথাটা ভাবতেই তার চোখে জল এলো। কে এই বৃদ্ধ, ক'দিনের পরিচয়, কিন্তু নিজের বুক উজাড় করে কেমন করে তাকে ভালবেসে গেলেন! হঠাৎ তার নাম ধরে সকলে ডাকতেই সে সচকিত হয়ে উঠল। বৃদ্ধ তাকে ডাকছেন শুনে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে বসল। তাঁর মুখের উপর ঝুঁকে সে ধরা গলায় প্রশ্ন করলে —আমাকে ডাকছেন দাদু?

বৃদ্ধের রোগকাতর কিন্তু প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ওই চোখের জলেই যেন বৃদ্ধ অনেকটা জোর ফিরে পেলেন। তার একখানা হাত মুঠো করে ধরে একটু হেসে বললেন—আরে পাগল। কাঁদছ কেন? আমার তো কোনো দুঃখ নেই, কোনো ভয় নেই! আমি তো চোখ বন্ধ করলেই অনুভব করছি যাঁকে সারাজীবন ডেকেছি সেই মা আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে কোলে তুলে নেবার জন্যেই এসেছেন।

মন্মথ হা হা করে কেঁদে উঠল।

বৃদ্ধই বললেন—রামময় মন্মথকে দেখো! ওর যেন কোনো অযত্ন না হয়!

এই সময় বাড়ির মেয়েরা সংবাদ পেয়ে সকলে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন। জমিদার বাড়ির মস্ত বড় হলঘরখানা ভর্তি হয়ে গেল।

মন্মথ সরে এলো ভিড় থেকে। এসে বাইরে দাঁড়াল।

এই সময়েই কবিরাজ মশাই এলেন। ভিড় সরে গেল। কবিরাজ দেখে বলে গেলেন —এখনি কিছু ঘটার আশঙ্কা নাই। তবে উনি যখন নির্দেশ দিয়েছেন তখন তীরস্থ করাই ভালো।

কবিরাজের নির্দেশে ও বৃদ্ধের ইচ্ছায় তাঁকে তীরস্থ করা হলো। যেখানে বসে সেদিন শেষ রাত্রিতে তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন সেই চাতালেই তাঁর অন্তিম শয্যা পাতা হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিনাম সংকীর্তনের ধ্বনি শোনা গেল—ও নামের তরী বাঁধা ঘাটে, ডাকলে নিতাই পার করে।

এরপর কার্তিকের ছয়, সাত ও আট তারিখ পুরো তিন দিন এবং নয়ই কার্তিকের অপরাহ্ণ পর্যন্ত স্মৃতিতীর্থ তীরস্থ হয়ে জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুকে অবলম্বন করে সমগ্র অঞ্চলে এক আশ্চর্য সশ্রদ্ধ সমারোহের সৃষ্টি হলো। এ তো মৃত্যু নয়, এ সজ্ঞানে প্রসন্ন মনে স্বেচ্ছায় যেন মহাপ্রস্থান।

জমিদারবাড়ির গেট বন্ধ করে দিয়ে সেখানে বন্দুকধারী চাপরাশি মোতায়েন করে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই রাস্তা থেকে বাড়ির গেট পার হয়ে গঙ্গার ঘাটে কেউ যেতে পারে নি। কিন্তু বাড়ির সামনে পথে এবং অন্য দিকে নৌকোয় গঙ্গার উপরে অবিশ্রাম অজস্র জনসমাগম। আর দিবারাত্র হরিনামের ধ্বনি। স্মৃতিতীর্থের অধিষ্ঠানভূমিকে কেন্দ্র করে জনতা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে যেন মাটি ও জলের যুক্ত পথে একটি বৃত্ত রচনা করে প্রদক্ষিণ করে ফিরেছে। সকলেরই কামনা এই পুণ্যবান মানুষটিকে একবার দেখে পুণ্য সঞ্চয় করবে। যে মৃত্যুর ভয়ে সকলেই মনে মনে ভীত ও আর্ত, সেই মৃত্যুকে কেউ প্রসন্ন মনে আবাহন করে হাসিমুখে বরণ করেছে এ সংবাদ পেলে মানুষ যতখানি বিস্মিত হয়, মনে আশ্বাস পায় তার চেয়ে অনেক বেশী। তাতে সাময়িকভাবে মৃত্যুভয়ও তিরোহিত হয়।

এরই মধ্যে একদিন হুগলীর কালেক্টর ঘোড়ায় চেপে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এলেন। মহামহোপাধ্যায় উপাধি স্মৃতিতীর্থের পাণ্ডিত্যের খ্যাতির সরকারী স্বীকৃতি। কাজেই স্মৃতিতীর্থের নাম সরকারী কর্তৃপক্ষের অগোচর ছিল না। সেই মানুষ এইভাবে মহাপ্রস্থান করছেন জেনে জেলার ক্যালেক্টর শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছিলেন।

তাঁকে গেট খুলে বাড়ির ভিতর দিয়ে ঘাটের চাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি জুতো খুলেই গেলেন বৃদ্ধের কাছে। তাঁর নমস্কারের উত্তরে বৃদ্ধ ক্লিষ্ট কিন্তু হাসিমুখে শয্যা থেকেই নমস্কার জানালেন।

কালেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন—ডাক্তার বা ঔষধের প্রয়োজন আছে কিনা। থাকলে তিনি তার ব্যবস্থা করতে পারেন। উত্তরে তাঁকে জানানো হলো—কোনো ঔষধ এমন কি কোনো খাদ্যও উনি গ্রহণ করছেন না।

কালেক্টর বিস্মিত হলেন—কোনো খাদ্য উনি খাচ্ছেন না? তা হলে?

একজন জানালেন—উনি শুধু দুধ আর গঙ্গাজল খেয়ে আছেন। এখন দেহান্তেরই প্রার্থনা করছেন।

কালেক্টর শ্রদ্ধা জানিয়ে ফিরে গেলেন।

নয়ই তারিখ দুপুরের দিকে রামময় পিতার পায়ে হাত দিয়ে দেখে বললেন—জ্বর উপশম হয়েছে। অঙ্গ একেবারে শীতল হয়ে গিয়েছে।

স্মৃতিতীর্থ বললেন—জ্বর উপশম হয়ে গিয়েছে ? জয় কালী। এইবার শিবজ্বর আসবে। আমার উপবীত আমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সঙ্গে জড়িয়ে দাও। আর আমাকে ডেকো না।
বলে তিনি চোখ বন্ধ করলেন। তারপর জপ করতে করতেই এক সময় মহাপ্রয়াণ করলেন।

কান্নায় সমগ্র অঞ্চলটা যেন ভেঙে পড়েছে।
গঙ্গার ঘাট থেকে বৃদ্ধের শোকাকুল স্বজনদের কাছ থেকে মন্মথ সরে এলো। সেও কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে সে এসে বাগানের বৃহৎ নিমগাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল। কার্তিক মাসের দুপুরের রৌদ্রে এখনও বেশ উত্তাপ।
চোখ মুছে শান্ত হতে দেখলে বাগানের মধ্যে আম গাছের তলায় বাঁধানো বেদীর উপর একজন কে মুখ গুঁজে কাঁদছে। ফুলে ফুলে কাঁদছে। মন্মথ এগিয়ে যেতে বুঝলে একটি মেয়ে।
সে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে বললে—শুনছ, অমন করে কাঁদে না। ছি, অত কাঁদতে নেই। কেঁদ না।
মেয়েটি মুখ তুলে চাইলে। দশ এগারো বছর বয়স! পদ্মফুলের মতো মুখখানি। কেঁদে কেঁদে বড় বড় চোখ দুটি রাঙা হয়ে উঠেছে। চোখের পাপড়িতে অনেক জল লেগে রয়েছে।
মেয়েটি তার চোখ বড় বড় করে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপরই শশব্যস্ত হয়ে বেদীর উপর থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে চলে গেল ঘাটের দিকে।
মন্মথ প্রথমটায় তার এ ব্যবহারের কারণ বুঝতে পারলে না। পরক্ষণেই তার একটা কথা মনে হলো। এ কি সেই ? যার কথা সেই রাধাশ্যাম একদিন বলেছিল ওদের বাড়িতে ?
তাই হবে বোধহয়! তা না হলে অমন করে ছুটে পালাবে কেন ?

তারপর সে এক লোকারণ্য।
পণ্ডিত, আচারশীল ব্রাহ্মণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহাপুরুষ রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। দূর দূরান্তর থেকে অসংখ্য মানুষ আর গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে হরিনাম সংকীর্তনের দল এসে মৃত্যুশোককে এক মহোৎসবে পরিণত করে দিয়ে গেল। তাঁর দেহান্তের সংবাদ পেয়েই হুগলীর কালেক্টর আবার ঘোড়ায় চড়ে এসে উপস্থিত হলেন। মহামহোপাধ্যায়ের পুত্র, জামাতা ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি

নির্দেশ দিলেন—স্মৃতিতীর্থের দেহ সঙ্গে সঙ্গেই সৎকার করা হবে না। স্থির হয়েছিল শেষ রাত্রিতে সূর্যোদয়ের পূর্বে দেহ চিতায় চাপানো হবে। তার আগে পর্যন্ত দেহ এই জমিদারবাড়ির হলঘরে শায়িত থাকবে। অসংখ্য মানুষ, যারা একবার স্মৃতিতীর্থকে শেষ দেখা দেখতে ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসছে তারা একে একে তাঁকে দেখে প্রণাম নিবেদন করে যাবে।

সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী দেহ একখানি খাটের উপর শায়িত করে, কপালে বুকে চন্দন দিয়ে রাম নাম অঙ্কিত করে সকলের শেষ দর্শনের জন্য জমিদারবাড়ির রাস্তার উপরের গেট খুলে দেওয়া হলো। কালেক্টর-সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন।

শেষ রাত্রিতে মৃতদেহ গঙ্গাতীরে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হলো।

মন্মথ সমস্তক্ষণ বৃদ্ধের প্রাণহীন দেহের পাশে আতুরের মতো বসে ছিল। তার একটা আশ্চর্য বিস্ময়ের ঘোর কিছুতেই আর কাটছে না। দোসরা কার্তিক থেকে দশই কার্তিক, গণনায় এই ন'দিন সে এখানে রয়েছে, তাকে থেকে যেতে হয়েছে। এরই একটা অংশ অশীতিপর বৃদ্ধের সহচর্যে কি উত্তপ্ত, কি গাঢ় আনন্দের কাল! আর তারপর কি বিষণ্ণতা! দুইয়ে মিলে তাকে এখনও অভিভূত, বিমূঢ় করে রেখেছে। মানুষটা এই ছিল, এই নাই! এ কি বিস্ময়!

দশই একটা বেলা কাটিয়ে সে রামময়কে সবিনয়ে বললে—আমি তা হলে চলে যাই! আবার বাবার সঙ্গে শ্রাদ্ধের দিন সকালে আসব!

রামময় তার পিঠে হাত দিয়ে সজল চক্ষে বললেন—যাবে? যাবে তো নিশ্চয়! তবে কাল যেয়ো। আমি বরং নৌকার ব্যবস্থা করে রাখি। আজ তো তোমার শরীর খুব ক্লান্ত আছে। কাল সারাদিন বিশ্রাম পাও নি, রাত্রিতেও নিদ্রা হয় নি।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—আমাদের তো বিশ্রামেরও সময় নেই! আমার ভগ্নীর ত্রিরাত্রির কাজ। সে তো আজ থেকেই ব্যবস্থা করতে হবে। একটি মানুষকে অবলম্বন করে সব সুখ, সব আনন্দ, সব দুঃখ, সব উদ্বেগের অবসান হয়েছে। এখন যা যা কৃত্য আছে সব করতে হবে তো! তুমি বরং ওপরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়।

তাঁরা সকলে শ্রাদ্ধের ফর্দ করতে বসলেন। মন্মথও কিছুক্ষণ তাঁদের কাছে বসে রইল। জীবনরতন তাকে তাড়া দিলেন। তিনি তাকে এই ক'দিনে 'মাতুল' বলে সম্বোধন করতে আরম্ভ করেছেন। তিনি বললেন—চল মাতুল, তোমাকে শুইয়ে দিয়ে আসি।

তাকে উপরের ঘরে এনে কম্বলের উপর শুইয়ে নিজেও তার বিছানার একপাশে বসে পড়লেন। ট্যাঁক থেকে বিড়ি ও চকমকি বের করে একটি বিড়ি ধরালেন।

এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে হেসে তৃপ্তির সঙ্গে বললেন—বুঝলে মাতুল, ধূমপানের বড় তৃষ্ণা হয়েছিল। তাই তোমার কাছে বসতে এলাম। ওঁরা সব পণ্ডিত মানুষ, শ্রাদ্ধের ফর্দ করতে গিয়ে নানান বিচার করবেন, তর্ক করবেন। কথা যত হবে কাজ তার চেয়ে অনেক কম হবে। তা ওঁরা সব করুন!

মন্মথ হঠাৎ বললে—জীবনমামা, আমাকে খানিকটা কাগজ আর দোয়াত-কলম এনে দিতে পারেন?

জীবনরতন একটু অবাক হলেন। হেসে বললেন—কি করবে গো কাগজ-কলম নিয়ে?

মন্মথ হেসে বললে—এনে দিন না যদি অসুবিধা না হয়।

জীবনরতন পোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—তুমিও যে পণ্ডিত হবার জন্যে জন্মেছ সেটা মধ্যে মধ্যে ভুলে যাই, বুঝলে! তা দাঁড়াও, তোমার কাগজ-কলম নিয়ে আসি।

কাগজ-কলম হাতে পেতেই মন্মথ নিবিষ্ট হয়ে গেল তাই নিয়ে। দেখে জীবন-রতন চলে গেলেন।

যেতে যেতে আবার ফিরলেন তিনি। দরজা থেকেই ডাকলেন—মাতুল!

শূন্য কাগজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মন্মথ চুপ করে বসেছিল। সে কোনো সাড়া দিলে না।

জীবনরতন তার অন্যমনস্কতা দেখে প্রশ্ন করলেন—কি ভাবছ?

তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অন্যমনস্কভাবে সে বললে—কিছু না।

তারপর রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করলে—এই জিজ্ঞাসা করতেই ফিরলেন নাকি?

জীবনরতন বললেন—না, একটা কথা মনে হলো, তাই শুধোতে এলাম। দুপুরে কি খাবে?

—আপনারা যা খাবেন তাই! আমার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা কিসের?

—আমাদের সঙ্গে হবিষ্যি করবে?

মন্মথ হাসল। বললে—এবার ত্রিবেণী এসে হবিষ্যি করেই কাটল। তার আর আলাদা ব্যবস্থা করার দরকার কি?

—বেশ! জীবনরতন চলে যাচ্ছিলেন। পিছন থেকে মন্মথ প্রশ্ন করলে—আচ্ছা, দাদুর শ্রাদ্ধ কবে?

—বিশে কার্তিক হবে। কাল থেকে দশ দিন ধরে উনিশে। তার পরদিন।

—কি বার হবে?

—মঙ্গলবার!

মন্মথ চুপ করে গেল। জীবনরতন বললেন—তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম কর। আমি খাবার সময় ডাকতে আসব তোমাকে।

জীবনরতন চলে গেলেন।

তিনি যখন ফিরলেন মন্মথকে খাবার জন্য ডাকতে তখন দেখলেন মন্মথ অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন। অনেক ডাকাডাকির পর সে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসল।

জীবনরতন বললেন—চল, হবিষ্যান্ন প্রস্তুত। দেরি করলে পিণ্ড হয়ে যাবে। সবাই অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্যে।

মন্মথ হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। তার হাতে একখানি কাগজ, যে কাগজ জীবনরতন এনে দিয়েছিলেন তারই একটা টুকরো। মন্মথ কাগজখানা হাসিমুখে তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলে।

তিনি প্রশ্ন করলেন—কি গো?

মন্মথ হাসিমুখেই বললে—পড়ে দেখুন না!

জীবনরতন নিবিষ্টমনে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে সেটা পড়ে সোৎসাহে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—আরে মাতুল, তুমি তো সহজ লোক নও। বলে কাগজখানা পড়তে লাগলেন:

শান্তঃ স্নিগ্ধঃ স্মরণ-সুখদঃ
সভা সারথির্ভবে মে
পিতা যাতো হরিপদযুগং
গঙ্গাতীরাম্বু সঙ্গঃ।
আদ্যং কৃত্যং ধরণীজ-দিনে
রিক্ত বাহু প্রমাণে
ঊর্জে সদ্ভিঃ চরণরজসা
পূয়তাং দীন গেহঃ॥

উচ্চকণ্ঠে শ্লোকটি আবৃত্তি করে জীবনরতন সর্বান্তঃকরণে তারিফ করে উঠলেন—বাহবা, বাহবা, চমৎকার হয়েছে। আরে মাতুল, তোমার পেটে তো অনেক বিদ্যে আছে দেখি! বহুৎ আচ্ছা, এইটাই শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন পত্র করে ছাপাতে হবে। চল, সবাইকে দেখাই আগে।

জীবনরতন বালকের মতো খুশী হয়ে ছুটলেন সকলকে দেখাতে।

মন্মথ পিছন থেকে চিৎকার করে বললে—এই দেখ কাণ্ড! আর সকলকে দেখাবার কি দরকার আছে? শুনছেন, শুনুন। শুনুন।

কাগজখানা জয়ধ্বজার মতো হাত তুলে উড়িয়ে জীবনরতন সোজা গিয়ে হাজির

হলেন যেখানে রামময়, রামজয়, জামাতা স্বরূপচন্দ্র ও গ্রামের অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা শ্রাদ্ধের ফর্দ করতে ব্যস্ত।

স্বরূপচন্দ্র হেসে বললেন—কি গো শ্যালকপ্রবর, হাসিই বা কিসের আর কাগজটাই বা কি?

জীবনরতন ঘাড় নেড়ে বললেন—সে আর আপনাকে বলছি না বিদ্যাভূষণমশাই আগে আমার দাদাদের দেখাই।

রামময় গম্ভীর মানুষ। তারপর পিতৃশোকে এই বয়সেও একান্ত কাতর হয়েছেন। ক্লিষ্ট হাসি হেসে বললেন—কি রে জীবন?

—দেখুন দাদা মন্মথর কাণ্ড? বলে কাগজখানি তিনি রামময়ের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

কাগজ হাতে নিয়েই রামময় বললেন—এ যে শ্লোক হে!

বিজয়গর্বে জীবনরতন হেসে বললে—হ্যাঁ, পড়ে দেখুন একবার!

রামময় পড়ে একটু হেসে কাগজখানি স্বরূপচন্দ্রের হাতে দিয়ে বললেন—দেখ স্বরূপ; পড়ে দেখ! এ তো আমার স্মৃতি নব্যন্যায় কি বেদান্ত নয়, এ তোমার কাব্য—ব্যাকরণশাখার অন্তর্গত, তুমি পড়ে দেখ!

স্বরূপচন্দ্র নিবিষ্টচিত্তে পড়ে কিছুক্ষণ পরে নিজের আনন্দ যথাসম্ভব গোপন করে গম্ভীরমুখে বললেন—ভালই তো!

রামময় অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন—ভালই তো কি বলছো হে? রীতিমতো বিস্ময় উদ্রেককারী রচনা। দেখহে, রামজয়, তুমি দেখতো!

বলে কাগজখানি স্বরূপচন্দ্রের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রামজয়ের হাতে ধরিয়ে দিলেন। রামজয় পড়ে হেসে চোখের জল মুছে বললেন—এত সুন্দর যে আবার বাবাকে মনে পড়ে গেল দাদা। 'পিতা যাতো হরিপদযুগং গঙ্গাতীরাম্বুসঙ্গঃ'। আঃ, পড়ে আর আবৃত্তি করে মনে হচ্ছে গঙ্গাজলে শয়ান পিতার পাদস্পর্শ করলাম। বড় সুন্দর!

রামময় গালের পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—তা হলে এক কাজ করা যাক। এই শ্লোকটিই আমাদের পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্র করে ছেপে দেওয়া যাক। কি বল রামজয়? স্বরূপচন্দ্র কি বল? আপনারা সব কি বলেন?

রামজয় সঙ্গে সঙ্গে বললেন—এতে আর কথা কি আছে?

স্বরূপচন্দ্র যথাসম্ভব গম্ভীরভাবে মৃদুকণ্ঠে বললে—তা মন্দ কি?

সকলের সামনে শ্লোকটি আবৃত্তি করে অর্থ ব্যাখ্যা করে সকলের সমর্থন নিয়ে শ্লোকটিকে রামরাম ভট্টাচার্য মশায়ের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র হিসেবে ছাপার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করা হলো।
রামজয় একটু দুঃখের হাসি হেসে বললেন—আমার কি মনে হচ্ছে জানেন দাদা!
রামময় তাকালেন ভাইয়ের মুখের দিকে ভাই কি বলতে চায় তা শুনতে।
রামজয় বললেন—এই শ্লোকটি পড়ে বেশী করে মনে হলো। মনে হলো নারায়ণ আমাদের দিক থেকে পার্শ্ব পরিবর্তন করছেন।
—কেন, এ কথা বলছো কেন?
—বলছি সংগত কারণেই। আপনি দেখুন তো, মন্মথ বলে একটি ইংরেজীনবিস ছাত্র এটি রচনা করেছে। এটি যদি আমার, আপনার কি স্বরূপের টোলের কোনো ছাত্র রচনা করতো তা হলেই সেটি শোভন ও সংগত হতো। কিন্তু আপনি কল্পনা করতে পারেন, আমাদের টোলের কোনো ছাত্র এই শ্লোকটি অথবা এমনি একটি শ্লোক রচনা করেছে?
রামময় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—এ তুমি সত্য কথাই বলছো। মেধাবী সব ছাত্রই এখন ইংরেজী শিখবার দিকে ঝুঁকেছে।
রামজয় বললেন—আপনি ব্যাপারটি ভালো করে অনুধাবন করুন। এ শ্লোক আমাদের টোলের কোনো ছাত্রের রচনা করার ক্ষমতা নেই। আবার অন্যপক্ষে দেখুন, একটি ইংরেজীনবিস ছাত্রের এমনি একটি শ্লোক রচনা করার কল্পনা এসেছে!
স্বরূপচন্দ্র বললেন—এ সত্যই বলেছেন। বিদ্যাসাগর যে বিদ্যাসাগর তিনি সংস্কৃতেরই পণ্ডিত, কিন্তু তিনি বলতে গেলে সাহেব লোক। এ সংস্পর্শ দোষ বাঁচিয়ে আর আমরা চলতেও পারবো না, আর সময় সময় মনে হয়, চলাও বোধহয় সমীচীন হবে না।
স্বরূপচন্দ্র নীবব হতেই সকলেই নীরব হয়ে রইলেন। বুঝা গেল স্বরূপচন্দ্রের উক্তি সমবেত ভট্চাজমশাইদের অধিকাংশেরই মনঃপূত হয় নি। বুদ্ধিমান স্বরূপচন্দ্র সেটুকু অনুধাবন করার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন—আমাদের কর্তারও মত অনেকটা ওই রকমই ছিল। তাঁর উদারতার অন্ত ছিল না। ছিল না বলেই এই ছেলেটিকে তিনি সস্নেহে কাছে টেনেছিলেন। সমবেত জনদের মধ্যে একজন ভট্চাজ মশাই সশব্দে গলা ঝেড়ে অন্তরের বিরূপতাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেই বললেন—এ কথা ঠিক যে স্মৃতিতীর্থ মশাই অতি উদার চরিত্রের ও উদার মতের মানুষ ছিলেন। তাই বলে এ কথা ঠিক নয় যে তাঁর উদারতা অন্তহীন ছিল। তিনি এই বালকটিকে সস্নেহে কাছে টেনেছিলেন সে ইংরেজীনবিস বলে নয়, সে অত্যন্ত মেধাবী, বিনয়ী এবং সদবংশজাত বলে।
ভট্চাজ মশাইদের মধ্যে বাদানুবাদ সমুপস্থিত দেখে রামময় বিচলিত হলেন।

তিনি পিতার বশংবদ পুত্র হলেও পরিণতবয়স্ক, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বিচক্ষণ পুরুষ। তিনি মাথার তৈলহীন চুলে হাত বুলিয়ে হেসে বললেন, ভগ্নীপতিকেই বললেন —স্বরূপচন্দ্র, তোমার আজ একটু গোলমাল হচ্ছে কেন?

সসম্ভ্রমে স্বরূপচন্দ্র বললেন—কিসের গোলমাল দাদা?

রামময় মৃদু হেসে বললেন—এ একেবারে সেই ঋষি শ্রাদ্ধের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে না? শেষ পর্যন্ত বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া না হয়!

স্বরূপচন্দ্র প্রসন্ন মনে হেসে উঠলেন।

রামময় এই সুযোগে বললেন—আমার তো মনে হচ্ছিল, এখন শ্রাদ্ধের ফর্দ না হয়ে এ তর্কসভায় রূপান্তরিত হয় বুঝি!

স্বরূপচন্দ্রও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। জ্যেষ্ঠ শ্যালকের কথা হাসির সঙ্গেই মেনে নিলেন।

ঠিক এই সময়ে একখানা দু ঘোড়ায় টানা চকচকে মস্ত জুড়িগাড়ি বাড়ির হাতার সামনে, গেটের ওপাশে রাস্তার উপরে এসে দাঁড়াল। ভট্চাজ পণ্ডিতের আসরে জুড়িগাড়ির আবির্ভাব একটু বিস্ময়কর বই কি!

রামময় রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন—আমাদের এখানেই কেউ এলো নাকি?

তারপর জীবনরতনকে বললেন—জীবন, তুমি একবার দেখ ভাই কেউ এলো নাকি? এলে কারা এলো!

আর দেখতে যেতে হলো না। গাড়ির দরজা খুলে ধরেছে কোচোয়ান। প্রথমেই নামলেন ইন্দুমতী, তারপর ভূপেশ্বর আর গোপেশ্বর। সকলেরই খালি পা, অশৌচের বেশ। চপলাও এসেছে সঙ্গে।

রামময় জীবনরতনকে বললে—ভাই, দারোয়ানকে দরজা খুলে দিতে বল। এ তো দরিদ্র ব্রাহ্মণের অনাবৃত গৃহ নয়, এ রাজপ্রাসাদ!

জীবনরতন ছুটতে ছুটতে গিয়ে দারোয়ানকে দিয়ে গেট খুলিয়ে দিলেন। সমস্ত পণ্ডিতমশাইরা এই ধনী মানুষগুলির দিকে সসম্ভ্রমে চেয়ে আছেন। তাঁরা আসছেন।

এই ক'জনের ধীর খালি পায়ে আসার মধ্যে শোকের এমন একটি মহিমা প্রকাশিত হচ্ছিল, যা সকলেরই মনে আবার শোককে শান্ত মূর্তিতে জাগ্রত করে দিলে।

রামময় উঠে দাঁড়ালেন। হাতজোড় করে বললেন—আসুন!

বলা মাত্র সেই তিনজন পরিণতবয়স্ক মানুষ একসঙ্গে আতুর শিশুর মতো একযোগে হুহু করে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতেই তাঁরা উঠে এলেন বারান্দায়।

রামজয় আবার নীরবে কাঁদতে আরম্ভ করেছেন। রামময়ের দৃষ্টিও সজল হয়ে উঠেছে। তিনি গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—কাঁদবেন না, অমন করে কাঁদবেন না। অমন করে কাঁদলে স্বর্গযাত্রীর যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটবে।

গোপেশ্বর চোখের জল মুছতে মুছতে আসন গ্রহণ করলেন। বিছানো কম্বলের মাঝখানে রামময়ের সামনেটা থেকে অন্য সকলে সরে গিয়ে ওঁদের সকলের বসার জায়গা করে দেওয়া হলো।

গোপেশ্বর অকস্মাৎ রামময়ের একখানি হাত নিজের দুই হাতে ধরে আরও প্রবল-ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আপনি আমাদের দুই ভাইকে এবং আমার ভগ্নীকে মার্জনা করুন, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।

সকলেই বিস্মিত। রামময় বিস্মিত ও সেই সঙ্গে বিব্রত। তিনি শশব্যস্ত হয়ে বল-লেন—কি অপরাধ করেছেন আপনারা ?

গোপেশ্বর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ছোট ছেলের মতো কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আমরা আপনাদের পিতৃহত্যা করেছি, আমাদের গুরুহত্যা করেছি!

রামময় ওঁদের মনটি এবার বুঝতে পারলেন। মৃদু হেসে বললেন—এ সব কেন বলছেন ? এ সব কি বলে ? কোনো অপরাধ করেন নি আপনারা। নিজেকে অমন অপরাধী ভাববেন না!

এবার ইন্দুমতী চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন—বাবার মৃত্যুসংবাদ শুনে থেকে দুই ভাই অনবরত ছোট ছেলের মতো কাঁদছে আর বলছে, আমরাই গুরুহত্যা করলাম। আমাদের এ দীক্ষার কি দবকার ছিল ? কাঁদছে, আজ দুদিন দুজনে জল পর্যন্ত খায় নি। উপোস করে আছে। ওদের খেতে বলবার সাহস তো কারও নেই। আমি দু একবার চেষ্টা করেছি। তাও কিছু খাওয়াতে পারি নি। খেতে বললেই বলছে—দাঁড়াও, গুরুহত্যার প্রায়শ্চিত্ত হোক! তারপর খাব।

একটু চুপ করে থেকে ইন্দুমতী বললেন—আমার নিজেরও তাই মনে হচ্ছে দাদা! নিজেকেই আসল অপরাধী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমি অনুরোধ না করলে তো বাবা ওদের দীক্ষা দিতেন না। আর ওদের দীক্ষা দিয়েই উনি শুয়ে পড়লেন। সেই যে শুলেন আর উঠলেন না।

ওঁদের অন্তরের অনুভবের আন্তরিকতা উপস্থিত সকলেরই অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করলে। ওঁদের কান্না দেখে অনেকেরই চোখে জল এসেছে। রামজয় তো কান্নায় উচ্ছ্বসিত।

রামময় শুধু চুপ করে আছেন। বললেন—এ কথা এমন করে ভাববেন না। বাবার পঁচাশি বছর বয়স হয়েছিল। তিনি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে মহাপ্রস্থান করে-

ছেন। এ দিকটা দেখছেন না। ভাবছেন না কেন, তিনি আপনাদের দীক্ষা দেওয়া তাঁর শেষ কর্তব্য জ্ঞান করেছিলেন।

রামময়ের কথায় ওঁরা সান্ত্বনা পেলেন। রামময় ছাড়া আর কেউ সান্ত্বনা দিলে ওঁরা বোধহয় তা অন্তরে গ্রহণ করতে পারতেন না।

রামময় বললেন—ইন্দু, এখন বাবা নেই। এখন আমার আদেশই আংশিকভাবে গুরুবাক্য বলে মানতে হবে! এ কথা মান তো?

ইন্দুমতী কলকাতার অভিজাত সমাজের শীর্ষস্থানীয়াদের মধ্যে। কিন্তু এই পল্লী-বাসী গুরুপুত্রের মুখের কথায় এমন কিছু ছিল যা তিনি মনে প্রাণেই গ্রহণ করলেন। কথা বলতে বলতেই তাঁর নিজের অগোচরেই দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেইভাবেই সসম্ভ্রমে তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন—বলুন!

রামময় বললেন—সর্বাগ্রে নিজে একটু জল খাও। ভাইদের একটু জল খাওয়াও। আমি পিসীমাকে খবর দিই!

রামময় জীবনরতনকে বাড়ির ভেতর পিসীমা শরৎকালীর কাছে পাঠালেন ওদের জলপানের ব্যবস্থা করবার জন্যে।

জীবনরতন যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন এমন সময় ইন্দুমতী বললেন—কিছু জিনিস আছে গাড়িতে। দাদা আদেশ দিলে সেগুলো বাড়ির ভেতর পাঠিয়ে দিতে পারি।

রামময় বুঝলেন ওরা কলকাতা থেকে আসবার সময় অশৌচ উপলক্ষে কিছু জিনিস-পত্র নিয়ে এসেছে। রামময় বললেন—এনেছে যখন, তখন জীবন ভাই, ওগুলো বাড়ির ভেতর নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। তবে এর প্রয়োজন ছিল না। গ্রামের প্রতিবেশীরা যা দিয়েছেন তাই আমরা সমস্ত পরিবারে খেয়ে উঠতে পারছি না!

একটু হেসে রামময় বললেন—আর তা ছাড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ি তো! আতপ চাল আর গব্য ঘৃতের অভাব হয় না কোনোদিন। আর সেই সঙ্গে ফল-ফুলুরিও তো কিছু কিছু থাকেই।

এই জমিদারবাড়ির যে ঘরে নিয়মসেবার সময় গোপাল আর গোপালের সেবক সেই বৃদ্ধ বাস করছিলেন সেই ঘরেই ওঁদের জলখাবার জায়গা হলো। সে ঘর এখন সম্পূর্ণ শূন্য। ইন্দুমতী, গোপেশ্বর আর ভূপেশ্বর এই ক'টা দিন আগেই এই ঘরে কম্বলের ওপর বৃদ্ধকে প্রণাম করেছিলেন। আজ সে ঘর সম্পূর্ণ শূন্য, হাঁ হাঁ করছে। গোপাল বৃদ্ধের শেষ পূজা ও প্রণাম গ্রহণ করে ভট্‌চাজ বাড়িতে নিজের চির-কালীন আসনে ফিরে গিয়ে আবার অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আর বৃদ্ধ শেষ পূজা ও প্রণাম নিবেদন করে চিরকালের মতো চলে গিয়েছেন। হাঁ হাঁ করা শূন্য ঘরখানা ওঁদের সেই কথাই মনে করিয়ে দিলে। ওঁদের মনের ভিতরটা আবার হুহু করে

উঠল। শরৎকালী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে ওঁদের খেতে না বললে ওঁদের খাওয়াই হতো না।

বাইরে তখন জীবনরতন রামময় রামজয়কে মহা সমারোহ সহকারে স্বর্গত মাতুলের ধনী শিষ্যরা কি কি এনেছেন তাই বর্ণনা করছিলেন। জীবনরতন বলছিলেন—বড়লোকের আনা জিনিস, সবই উৎকৃষ্ট। চাল, ঘি সে আপনার যাকে বলে ফাস্টো কেলাস। তা ছাড়া ফলমূল সেও আপনার হরেক রকমের। আমি সে সমস্ত নামও জানি না। আর তাদের জাত স্বজাতির মধ্যে যাকে বলে সেরা, শ্রেষ্ঠ।

সকলের অজ্ঞাতে রামময় একথার তাঁর ঠোঁট কুঞ্চিত করলেন। পার্থিব বস্তুর, বিশেষ করে খাদ্যের এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মধ্যে কোথাও একটা স্থূল লোভ যেন বেশ স্পষ্টভাবে উঁকি মারছে। তিনি জীবনরতনকে ভালো করেই জানেন। এর স্বভাবটাই আনন্দময় এবং কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বসিত। সেই কারণে এই স্থূল লোভের কথাও ওর মুখে অশালীন শোনাচ্ছে না। তিনি অবশ্য জীবনরতনের মধ্যে যে এক সামান্য পার্থিব সম্পদ-ভিক্ষু, লোভী বাস করে দীনের মতো, তার সংবাদও অজ্ঞাত নন। তাই এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে জীবনরতনের অন্তরের লোভকে অকপটভাবে প্রকাশিত হতে দেখে কিছুটা লজ্জিত, কিছুটা বিরক্ত হলেন। সেই কারণেই তাঁর ঠোঁট কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

সকলের সামনে ওর এই লোভের প্রকাশকে ভদ্র ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবার জন্যে তিনি হেসে বললেন—জীবন, তোমার মধ্যে যে ঔদরিক ব্রাহ্মণ বাস করে তাকে আশীর্বাদ করি। বিবিধ ফলে, ঘৃতে, মিষ্টান্নে তার জিহ্বা ও উদর পরিতৃপ্ত ও পরিপূর্ণ হোক।

জীবনরতন হেসে তাঁর কথা মেনে নিয়ে বললেন—ওঁরা যা এনেছেন, আমি সে সব রেখে দিতে বলেছি মাকে। চতুর্থীর কাজের দিনে সে সব খরচ হবে। আমাদের বিদ্যাভূষণ মশাইয়ের খরচ কিছু কমবে।

হঠাৎ রামময় বললেন—তুমি আর এক কাজ কর জীবন!

জীবনরতন হাসি মুখে বললেন—হুকুম করুন, লক্ষ্মণ-ভরতের মতো না হোক, হনুমানের মতো 'জয় রাম' বলে এখুনি লাফিয়ে পড়ব।

রামময় বললেন—ওঁদের খাওয়া হলো কিনা দেখ! খাওয়া হয়ে গিয়ে থাকলে ওঁদের এখানে নিয়ে এসো! আমি ওঁদের সঙ্গে অন্য কিছু কথা বলব আর—

—'আর' বলে কি বলছেন?

—আর একবার মন্মথকে ডেকে নিয়ে এসো। তাঁর কলকাতায় যাবার ব্যবস্থা

করে দি। ও বরং ইন্দুমতীদের সঙ্গে ওদের গাড়িতেই ফিরে যাক! ওকে আর ক'দিন আটকে রাখব?

যার নাম করা হলো সে তখন গঙ্গার ঘাটে।

খাওয়ার পর সে আবার উপরের ঘরে ফিরে এসেছিল। খাওয়ার পর শুয়ে আর ঘুম আসছিল না দেখে উত্তর দিকের খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

কার্তিক মাসের মধ্যাহ্নের আকাশে খর উজ্জ্বল রৌদ্র সত্ত্বেও সদ্যবিগত শরৎকালের সেই চির নবীন স্বর্ণাভা যেন কোথায় লুকিয়ে থেকে এক অপরূপ মহিমা ক্ষরণ করছে। আর নদীর উপরের আকাশ কি নীল, কি নির্মল, কি বিপুল! তারই নিচে ভরা গঙ্গা নিম্নকণ্ঠে কলধ্বনি করতে করতে বয়ে চলেছে। যে মনে মৃত্যুর সদ্য স্পর্শ লেগে রয়েছে সেই মন এই অকলঙ্ক বিপুল শোভার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে যেন নম্র ও নত হয়ে এলো। এই বৃহৎ আকাশ আর নদীর পটভূমিতে মাটির বুকের গাছপালা বসতি যেমন একান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়, মৃত্যুর নিঃশব্দ গম্ভীর পটভূমিকাতেও মানুষের জীবন, নিজের জীবনকে মন্মথর তেমনি সামান্য অতি ক্ষুদ্র বলে মনে হলো। আর একবার হঠাৎ একটা আবেগের মতো মনে হলো, যাই একবার এই ঘাট থেকে গঙ্গার অগাধ জলরাশির এক অঞ্জলি স্পর্শ করে আসি।

বড়লোক জমিদারের বড় শখের বাড়ি। বাড়ির সামনে দিয়ে বড় সিঁড়ি যেমন আছে, তেমনি অন্দর মহলের দোতলা থেকে নিচে গঙ্গার ঘাটে নেমে যাবার জন্যও ঘোরানো সিঁড়ি আছে। বোধহয় বাড়ির ভেতর থেকে বাইরের মহলের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়ে মেয়েরা যাতে দোতলা থেকে নেমে সোজা গঙ্গার ঘাটে যেতে পারে সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। সেই সিঁড়ি ধরে মন্মথ আস্তে আস্তে নিচে নেমে ঘাটের প্রশস্ত চাতালে গিয়ে পৌঁছুল।

দুপুরের রৌদ্রে শান বাঁধানো চাতাল বেশ তেতে রয়েছে। চাতাল থেকে একবার ঘাট বরাবর গঙ্গার কোল পর্যন্ত সে চেয়ে দেখলে। ওই তো ওই ডান দিকের ওই বাঁধানো জায়গাটায় বৃদ্ধ সেদিন এক দীন-দরিদ্রকে আর দুই মহা-অভিমানী, মহা-ধনীকে এক সঙ্গে দীক্ষা দিলেন। তারপর ওইখানেই মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তীরস্থ ছিলেন। আর আজ জায়গাটা দুপুরের রৌদ্রে খাঁ খাঁ করছে। গঙ্গার জলে সেদিনের জলধারার যেমন একবিন্দু অবশেষ নেই, উপরের আকাশে যেমন সেদিনের মেঘের আর কুয়াশার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই, তেমনি ওই বাঁধানো জায়গাটায় এই সেদিনের ঘটনার তিলমাত্র অবশেষ নেই। নেই, নেই।

কিন্তু ওকি ? ঠিক যেখানটায় বৃদ্ধ মহাপ্রয়াণ করেছিলেন সেইখানে ক'টা কি যেন পড়ে রয়েছে ! কি ওগুলো ?

মন্মথ এগিয়ে গেল ফুল, কিছু মল্লিকা কেউ ছড়িয়ে দিয়েছিল, রৌদ্রের তাতে ঝলসে গিয়েছে। এইবার শুকিয়ে গিয়ে নদীর ধারের এলোমেলো বাতাসে সব কিছুর মতোই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে !

সেইখানটায় দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ ফুলগুলো দেখলে। একটা ফুল তপ্ত ঘাট থেকে তুলে নিলে অকারণে। হঠাৎ নজর পড়ল ঠিক বাঁধানো ঘাটের পাশেই কে বসে রয়েছে গামছা মাথায় দিয়ে ! বোধহয় মাছ ধরছে। নাঃ ছিপ তো নেই !

সে মৃদুস্বরে ডাকলে—কে ?

গামছা মাথায় লোকটি চমকে মুখ তুলে চাইলে তার দিকে। অতি সাধারণ, শীর্ণ, শ্যাম একখানি মুখ। জীবনের ঝড়-ঝাপটায় বহু রেখায় রেখাঙ্কিত। বড় ক্লিষ্ট, বড় বিষণ্নতায় নিমগ্নতা থেকে সে ফিরতে পারছে না। একটু নড়েচড়ে বসে মৃদু উদাস কণ্ঠে বললে—এই বসে আছি ! এমনিই।

—তা ওখানে ওই ভিজে মাটিতে বসে আছেন কেন ?

লোকটি বললে—ঘাটের সানের ওপর যে বড্ড গরম গো ! খানিকক্ষণ গঙ্গার জল দিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে বসেছিলাম বাপু ! তা বড়লোকের বাড়িরও যত তাত, রোদের তাতও তত। তাই এই নেমে মা-গঙ্গার কোলের কাছে বসে আছি—বলে সে একটু হাসল।

লোকটি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি তো মন্মথ ?

হ্যাঁ। আপনি আমাকে চেনেন ? কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনতে পারলাম না।

লোকটি ম্লান হাসি হেসে বললে—আমাকে আর তুমি চিনবে কি করে ? আমার নাম গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গ চট্টরাজ। আমি—

লোকটি আর কিছু বলবার আগেই মন্মথ উৎসাহিত হয়ে বললে—আপনাকেই তো সেদিন স্মৃতিতীর্থ মশাই ভোরবেলায় সর্বপ্রথম খুব আদর করে দীক্ষা দিলেন ?

লোকটি হেসে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললে—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। ঠিক ঠিক ! তুমি ঠিক ধরেছ। তা না হলে কি আর তুমি মন্মথ হয়েছ ?

মন্মথ হাসল। জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু এই দুপুরে রোদে এখানে অমন করে গামছা মাথায় বসে আছেন কেন ? আমি ভাবলাম, বুঝি আপনি মাছ ধরতে বসেছেন। কিন্তু ছিপ দেখতে পেলাম না তো !

এইবার গৌরাঙ্গ হাসল হা হা করে। অনেকক্ষণ হাসল। হেসে নিয়ে বললে—তুমি খাসা বলেছ বাবা ! মাছ ধরতে বসেছি কিন্তু ছিপ নাই !

ধীমান মন্মথ বুঝতে পারলে প্রৌঢ় রূপকে কথা বলছেন। কথাটার রূপক অর্থ ধরেছেন। মন্মথ একটু হাসল তাঁর কথা শুনে।

প্রৌঢ় মানুষটি গামছাখানি আবার ভালো করে মাথায় রাখতে রাখতে সরলভাবে বললে—বুঝলে বাবা, ভেবেছিলাম এই সামান্য ক'দিনের জীবনটা মাছ না ধরেই কেটে যাবে। তাই ছোটবেলা থেকে লেখাপড়াও করি নি, ঘর-সংসারেও মন ছিল না, বাউরার মতো মাঠে ঘাটে, দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিছু করি নি বাবা। না, ভগবান-টগবানের ধার-কাছ দিয়েও হাঁটি নি। এমনিই ঘুরে বেড়িয়েছি। যেখানে মন হয়েছে গিয়েছি। ভিক্ষে করে খেয়েছি। ভিক্ষে চেয়ে না পেলে না খেয়েই কাটিয়েছি। বুঝলে বাবা, চালাকি করতে গিয়েছিলাম। মতলব ছিল, অন্যে মাছ ধরবে, আর আমি কষ্ট না করে, গায়ে-হাতে কাদা না লাগিয়ে অন্যের ধরা মাছের ভাগ নিয়ে এই ক'দিনের জীবনটা কাটিয়ে দেব কোনো রকমে।

তার কথা শুনতে মন্মথর বেশ লাগছিল। এক ধরনের সরসতা আছে ওর মনে ও মুখের কথায়। সে মাঝপথে তাকে বাধা দিয়ে বললে—কত বয়েস হলো আপনার?

—তা তোমার বছর ষাটেক হবে।

—দেখে তো মনে হয় না অত বয়েস হয়েছে আপনার!

প্রৌঢ় হাসল। হেসে বললে—মনে হয় না? তা বেশ! ভালো বলছো, শুনতেও ভালো লাগছে। তা জান, এক একটা লোক থাকে বয়স চোর। বয়স তারা চুরি করে রাখে। তাদের পাকানো দড়ির মতো চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে না। বিশ কি চল্লিশ, চল্লিশ কি ষাট বুঝবার জো নেই। আমার চেহারা সেই রকম। তা বুঝলে, যা বলছিলাম, এদিক ওদিক ঘুরেছি, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্ত এমনি করেই কাটিয়ে দিলাম। তা এমনি করে যারা বাউণ্ডুলের মতো ঘোরে তারা নেশা-ভাঙ করেই। তোমাকে মিথ্যা কথা বলব না বাপু, নেশাভাঙের দোষ আমার নেই। খাই ওই বিড়ি। তুমি হয়তো বলবে, নেশা করার পয়সা পান কোথা? পয়সা জুটলে খাই, না জুটলে যারা বিড়ি খায়, তাদের কাছে বসে বিড়ির ধোঁয়াটার গন্ধ শুঁকি। আমার তেষ্টা দেখে কেউ দয়া করে একটা দিলে বর্তে যাই! তখন ধরিয়ে তেষ্টা মেটাই।

বলতে বলতে ট্যাঁক থেকে একটা লম্বা কৌটো বের করতে করতে বললে—এই দেখ, নেশা কেমন পাজি জিনিস দেখ। বলতে বলতে বিড়ির তেষ্টা লেগে গেল। দাঁড়াও ধরাই একটা।

মন্মথর কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে সেই লম্বা চোঙের মতো কৌটো থেকে বিড়ি

বেরুল, শোলা আর চকমকি বেরুল। চকমকি ঠুকে শোলায় আগুন জেলে বিড়ি ধরিয়ে আবার সব যথাস্থানে রেখে এক মুখ ধোঁওয়া ছেড়ে সে বললে—শোন তারপর। এই সব বাউণ্ডুলে লোকের কারও কারও আর একটা দোষ ধরে। মহা দোষ বুঝলে? তুমি ছেলেমানুষ। তা হলেও তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তুমি বুঝবে। দোষটা হলো মেয়েমানুষের পেছনে ঘোরা! এতে কত বিপদ তা বুঝেও তারা নিজেকে সামলাতে পারে না। মধ্যে মধ্যে মারধোরও খায়। কেউ কেউ এই করতে গিয়ে অপঘাতে মরে মার খেয়ে। তা বাপু আমার এ রোগও কোনো কালে হয় নাই। ভগবানের দয়া। আমার যা অবস্থা ছিল তাতে ওই দুই রোগের একটা থাকলেই কবে মরে গিয়ে ভবযন্ত্রণা শেষ হয়ে যেত। তা বুঝলে, কপালে কষ্ট আছে, দুটোর একটা রোগও ধরে নি, মরিও নি। এখান ওখান যত্র-তত্র ঘুরে বেশ ছিলাম, হেসে খেলে কেটে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ফাঁদে পড়ে গেলাম।

মন্মথর কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল। সে জিজ্ঞাসা করলে—ফাঁদে পড়লেন? সে কি রকম?

ঘাড় নেড়ে গৌরাঙ্গ চট্টরাজ বললে—ঐ তো রকম গো।

বিড়িটা নিভে গিয়েছিল। দু টান টেনে নিভে গিয়েছে নিশ্চিত হয়ে বিড়িটা সে ছুঁড়ে গঙ্গার জলে ফেলে দিলে। স্রোতে ভেসে যাওয়া বিড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে—যাঃ বেটা, চলে যা গঙ্গাসাগর! চলে যা! আমিও যাব তোর পেছু পেছু খানিক যা দেরি!

তারপর মন্মথর দিকে ফিরে বললে—সে বেশ খাসা রকম হলো। খাসা ফাঁদ! কি হলো বলি শোন!

হেসে মন্মথ বললে—বলুন!

—হলো কি, গিয়েছি হরিদ্বার। কত সাধু। সব সাধু! এক বেটা সাধু একটা ছেঁড়া কোট পরে জলের ধারে বসে আছে। নোংরা চেহারা, এক মুখ দাড়ি-গোঁফ! দেখে আমার কেমন মজা লাগল। হাসি লাগছিল। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাতজোড় করে পেনাম করে বললাম—পেনাম বাবা! সঙ্গে সঙ্গে সাধু রেগে আগুন। আমাকে প্রায় মারতে আসে আর কি! আমি তো অবাক বললাম—আমি কি দোষ করলাম বাবা যে এমন চোটপাট করছেন। সাধু বললে—হারামজাদা, বদমাস, মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে নেচে নেচে, হেসে খেলে বেড়াচ্ছ। যা বাড়ি যা! গিয়ে বিয়ে-সাদী কর! মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দে! কি খুঁজছিস বেটা নিজেই জানিস না। যা খুঁজছিস তা ঘরে বসে পাবি। বাড়ি ফিরে না গেলে ফেসাদে পড়বি! বুঝলে, সাধুর গালমন্দ খেয়ে বাড়ি চলে এলাম। ব্যস, এসেই

মায়ের চোখের জল মোছাতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম। মা তো আমাকে পেয়ে কেঁদে সারা, আনন্দে আত্মহারা। মা আমার ঘরে ফেরার আশা ছেড়েই দিয়েছিল। এখন যখন বললাম—মা, এইবার থেকে তোমার কাছেই থাকব। আর কোথাও যাব না, অমনি মা আমাকে পেয়ে বসল! বললে—বাবা বিয়ে কর! আমি মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম। মাকে ভয়ও দেখালাম—বিয়ে করতে বললে পালিয়ে যাব। তখন মা এক চাল চাললে জান! মা ঠাকুরমশাইয়ের পায়ে গিয়ে পড়ল।

সব শুনে ঠাকুরমশাই বললেন—তোমার ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। বলো, আমি ডেকেছি।

ওরে বাবা, অত বড় মানুষটা ডেকেছে, না গিয়ে পারি!

বুঝলে বাবা, সেই যে গেলাম, সেই আর এক প্যাঁচে জড়িয়ে গেলাম। ঠাকুরমশাই আমার সঙ্গে কথা বলে শেষে বললেন—মা বিয়ে করতে বলেছে, বিয়ে করছ না কেন?

হাত জোড় করে বললাম—ঠাকুরমশাই, আমি তো বামুনের ঘরের গরু, তার ওপর আমার বয়েস এখন পঁয়তাল্লিশ, এই বয়েসে কি সংসার করা উচিত হবে আমার?

তা ঠাকুরমশাই হেসে বললেন—দেখ বাবা, কিসের জন্যে সারা সংসার ছুটে বেড়িয়েছ তা তুমিই জান। তবে আমি তোমাকে এটা বলতে পারি, যদি তুমি কিছু খুঁজেই থাক, তা হলে যা খুঁজেছ তা পাওনি। পাওনি কেন বলছি তুমি বোঝে দেখ যা খুঁজেছ তা যদি পেতে তা হলে আর তুমি বাড়ি ফিরতে না তোমার মায়ের কাছে!

কথাটা আমার মনে লাগল। সত্যিই তো কিছু পেলে কি আর ফিরতাম।

ঠাকুরমশাই বললেন—এখন যখন মায়ের কাছে ফিরেছ তখন মা যা বলছে তাই কর। আমি তো রইলাম। আমি আশীর্বাদ করছি তুমি সুখে থাকবে, আর যা পাবার তা মায়ের কোলের কাছে, বাপের ভিটেতে বসে পাবে।

ব্যস, হয়ে গেল। ডবল ফাঁদে পড়লাম। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এক চৌদ্দ বছরের মেয়েকে বিয়ে করে সংসার পাতলাম। মা তো খুশী হয়ে তোবড়া গালে চোখের জল ফেলে বার বার আশীর্বাদ করলে. ঠাকুরমশাইকে জোড়ে প্রণাম করে এলাম। ঠাকুরমশাই আশীর্বাদ করলেন, সুখে থাক, আনন্দে থাক।

তা আশীর্বাদের জোরে সুখেও ছিলাম, আনন্দে ছিলাম। কিন্তু ফ্যাসাদের ফাঁস আস্তে আস্তে চেপে বসতে লাগল। বিঘে দশেক নিষ্কর জমি ছিল পৈত্রিক। তাতেই

সুখে স্বচ্ছন্দে চলে যেত প্রথম প্রথম। ভাবতাম এমনি করেই চলে যাবে।

ঘর-সংসার করি, জমি-জেরাত দেখাশোনা করি, আর সন্ধ্যেবেলায় একবার করে ঠাকুরমশাইয়ের পায়ের কাছে গিয়ে বসি। সারাদিনের ঝুট-ঝামেলায় ময়লা ধুয়ে আসি তাঁর কথা শুনে।

বেশ ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বেশ থাকতে দিলে না সংসার। সংসার বেড়ে গেল, দশ বছরে পাঁচটা ছেলেমেয়ে হলো, পাঁচটা খাবার মুখ বাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসাদ আরও ভালো করে পাকল।

এইবার রোজগার করার জন্যে এগুতে হলো। এতদিন ধরে রেখেছিলাম অন্য-লোকে মাছ ধরবে, আর আমি সেই মাছ খাব। কিন্তু এবার বিধি বাধ সাধলে। মাছ ধরতে বেরুতে হলো। কিন্তু বেরিয়ে দেখলাম, মাছ ধরতে বেরিয়েছি, কিন্তু হাতে ছিপ নেই। মাছ ধরার কায়দা জানি না। লেখাপড়া তো শিখি নাই গো! রোজগার হবে কি করে? মাছ ধরব কি দিয়ে? সারাদিন মাছ ধরতে গিয়ে দিনের শেষে খালি হাতে ফিরে আসায় বড় কষ্ট গো! মাছ ধরেছ কখনও? ধর নাই? তা হলে আর কি করে বুঝবে?

সেই মন নিয়ে ঠাকুরমশাইয়ের পায়ের কাছে গিয়ে বসতাম সন্ধ্যেবেলায়। মুখের হাসি শুকিয়ে গেল, বুকের ভেতর চোখের জল থৈ থৈ করতে লাগল, ঠাকুর-মশাইয়ের কাছে গিয়ে চোখের জল, বুকের কষ্ট চেপে রেখে চুপ করে বসে থাক-তাম, রাত্রি এক প্রহর হলে শুকনো মুখে উঠে আসতাম।

উনি একদিন বললেন—হ্যাঁরে, গৌরাঙ্গ, তোর নাকি সংসারে খুব টানাটানি যাচ্ছে?

কিছু বললাম না। হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলাম।

তা ঠাকুরমশাই বললেন—আমার কাছে লুকোস না। আমি তোকে আরও দু-চার বিঘে ধানের জমি যোগাড় করে দোব? না হয় এই সব নতুন পাটের কল হচ্ছে ওইখানে চাকরি করবি?

হাত জোড় করে বললাম—আর ওসব বলেন না ঠাকুরমশাই। বেশ আছি। দুঃখে কষ্টে বেশ কেটে যাচ্ছে। কিছু করতে হবে না।

ঠাকুরমশাই মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—তুই বড় নির্লোভ রে! কিন্তু সেই সঙ্গে কাঠ-গোঁয়ার! থাক্, তোর জন্যে কিছু করব না, কেউ করলে বারণও করে দেব।

সেইদিনই তিনি বলেছিলেন—তোকে দীক্ষা দেব আমি!

সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম—কবে দেবেন?

ওঁর কথা শুনে খুব উৎসাহ আর আনন্দ হয়েছিল।
উনি হেসে বললেন—কিছু ভাবিস না। আমি মরবার আগে তোকে দীক্ষা দিয়ে যাব।
তারপর জান বাবা, আরও কটা বছর গেল। সেই জান তো, 'বিয়ে হলেই পুত্র কন্যা, আসে যেন প্রবল বন্যা।' তা আরও দুটি সন্তান হলো। তার মানেই দুঃখ-কষ্ট বাড়ল। এই সময়ে একটা মেয়ে, বছর চারেক বয়েস, ধড়াস করে মরে গেল। বলা নেই, কওয়া নেই, দুদিনের জ্বরে মরে গেল আচমকা। মনে বড় ব্যথা পেলাম, বড় কষ্ট হলো। ঠাকুরমশাইয়ের পায়ে ধরে অনেক কাঁদলাম। শেষে বললাম—এইবার আমাকে দীক্ষা দেন! বড় কষ্ট!
বললেন—দোব, ঠিক সময়ে দোব!
তা এই এক ধাক্কাতে মনটা বদলে গেল বাবা। এতকাল, প্রায় এই ষাট বছরের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও বেশ হালকা হালকা ছিলাম। এইবার সেটা গেল। বুড়ী মা আমার এখনও বেঁচে। আমার চার বছরের মেয়েটা মরতে বুড়ী সোচ্চার করে কাঁদলে আমার জন্যে—ওরে বাবারে তোকে এ দুঃখ দোব বলে তো আমি সংসার করতে বলি নাই রে। মাকে আর কিছু বলি নাই। চোখের জল মুছতে মুছতে মনে মনে বললাম—তুমি না চাইলে কি হবে, এই তো নিয়ম বাবা! তুমি এটি চাইবে, ওটি চাইবে না, তা কি হয়? তুমি সংসারের সুখটি খাবে, দুখটি খাবে না এ বললে তো চলবে না। আমের শাঁসটি খেয়ে আঁটিটি ফেলে দেবে এখানকার সে নিয়ম নয়। তুমি আম যদি না খাও সে এক কথা। কিন্তু পাকা আমে এখানে তুমি একবার কামড় বসালেই তোমাকে আঁটি সুদ্ধ গিলতে হবে। বুঝলাম বাবা, হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। ঠাকুরমশাইকেও বললাম। আব্দার করে আরও বললাম—দীক্ষা দিন এবার!
তা ঠাকুরমশায়ের সেই এক কথা—দেব রে দেব, ঠিক সময়ে দেব।
বলে বললেন—এক কাজ কর। তোর যে ঠাকুরকে ভালো লাগে সেই ঠাকুরকে ডাক্। তাঁর পুজো কর।
বলার পর থেকে কোথায় আর যাব, ওঁর গোপালের দরজাতেই ঘুরতে লাগলাম। যাই আর হাতজোড় করে দাঁড়াই। করতে করতে মনটা ঠাণ্ডা হয়ে এলো।
এমন সময় ঠাকুরমশাই বললেন—আয়, এইবার আমার এই নিয়মসেবার মধ্যে তোকে দীক্ষা দেব!
সামনে দুপুরের উদাস রৌদ্রবিস্তীর্ণ আকাশ গঙ্গার বুক পর্যন্ত নেমে এসে যেন অলস তন্দ্রায় চোখ বুজে আছে। গঙ্গার জলধারা প্রবল বেগে অথচ নিঃশব্দে বয়ে

চলেছে। আর তারই সামনে মন্মথ আর গৌরাঙ্গ চট্টরাজ দুজনেই ঘাটের পাশে ভিজে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর কথা শেষ হবার পরও দাঁড়িয়ে আছে। মন্মথ দেখলে শীর্ণ দেহ প্রৌঢ়ের চোখ জলে ভর্তি হয়ে এসেছে। মনের আবেগ চোখে জল হয়ে ঠেলে উঠে এসেছে।

চোখের জল দেখে মন্মথ বললে আপনাকে দীক্ষা দেবার সময় তো আমি এখানে ছিলাম।

চোখে জল নিয়েই হেসে গৌরাঙ্গ বললে—সে তো আমি জানি গো! দীক্ষার কথা মনে হতেই মন খারাপ করছে! মনে হচ্ছে অতবড় মানুষটা, বাপের মতো বল বাপের মতো, ঠাকুরদাদার মতো বল তাই, অমন মানুষটা শেষ যা দেবার আমাকেই দিয়ে গিয়েছে। ভাবলেই বুকের ভেতরটা হু হু করছে। অমন মানুষ-টাকে আর দেখতে পাব না ভাবলেই কষ্ট লাগছে।

এই সময় পিছন থেকে সাড়া উঠল—গঙ্গাজল!

গঙ্গাজল? তার মানে চপলা এসেছে? সে এই অপরিচিত ভট্চাজ্জ মশাইদের ঘরে, তাঁদের সুপ্রচুর আদর-আপ্যায়ন সত্ত্বেও বড় অস্বস্তি বোধ করছিল। কাজেই চপলার গলা শুনে সে খুব খুশী হলো। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে ঘাটের পাকি-কটা উপরে সে দাঁড়িয়ে আছে।

সে একা নয়। তার সঙ্গে তার পিসীমা আর তার বাবা কাকারা রয়েছেন। আরও একজন লোক রয়েছে সঙ্গে। তার হাতে মস্ত এক ঝুড়ি। দেখে সে ছুটতে ছুটতে ঘাটের পাশ থেকে ঘাটে উঠে এসে চপলার কাছে দাঁড়াল। তার একখানা হাত নিজের দু হাতে তুলে নিয়ে হাসিমুখে বললে—গঙ্গাজল! বাঁচলাম প্রাণ এসে গিয়েছে।

তার হাতখানি যে ধরা আছে মন্মথর হাতে সে সম্পর্কে চপলা কোনো ভ্রূক্ষেপও করলে না। দেখে ইন্দুমতীর দুই ভ্রূ কুঁচকে উঠল। মুখে অবশ্য তিনি কিছু বললেন না। চপলা কিন্তু দেখছিল। তবে সে একমুখ হেসে বললে—এ আবার কেমন কথা? আমি আসায় তুমি বেঁচে গেলে—কি করে?

মন্মথ হেসে বললে—এই ভটচাজ মশাইদের আদর আর নিতে কেমন লাগছে! আর পারছি না! কাউকে তো চিনি না! যাক, তবু তোমাকে চেনা মানুষ পেয়ে গেলাম! তা এ ঘাটে কি করছ?

চপলার পিসীমা ও বাবা কাকাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই চপলার পিসীমা ইন্দুমতী বললেন—এঁদের আপনার জন হবে তুমি। আদর তো নিতেই হবে

মন্মথ লজ্জিত হয়েও বললে—আগে তো হই, তারপর যা হয় হবে। এখনও তো

সম্পর্ক হয় নি। তা পিসীমা, ঘাটে এই তাতের ভেতর কি করছেন?
ইন্দুমতী বললেন—কলকাতা থেকে আসবার সময় এক ঝুড়ি পদ্মফুল এনেছিলাম। ঠাকুরমশাইয়ের নামে এই গঙ্গার ঘাটে দেবার জন্যে। তা দেখলাম ওঁদের তাতে আপত্তি।
মন্মথ অবাক হলো—আপত্তি? কে আপত্তি করলে?
—ঠাকুরমশাইয়ের ভাগনে ওই যে জীবন না কি নাম যেন!
—কি বলছিল জীবন মামা?
—ফুলগুলো দেখে খুব খুশি হয়ে বললে, বাঃ বাঃ, ভারী সুন্দর জিনিস এনেছেন তো? গোপালের বড় আনন্দ হবে পুজো নিতে। তা আমি নরম করে বললাম—আমি তো আপনাদের গোপালের জন্যে আনি নি, আমি এনেছি আমাদের গুরুর জন্যে। তা ভদ্রলোক বললেন হাসতে হাসতে—গোপালকে দিলেই আপনাদের গুরুকে দেওয়া হবে। ও বললেন, তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। গোপাল তুষ্ট হলেই আপনার গুরুও তুষ্ট হবেন। তা তোমাকে মিথ্যে বলব না, শুনে বাপু খুব ভালো লাগল না। এ কি কথা, আমরা ফুল আনলাম গুরুর জন্যে, আর সে ফুল লাগবে গোপালের পুজোয়! আমার মুখ দেখে বড়দা, মানে ঠাকুরমশাইয়ের বড় ছেলে হেসে বললেন—জীবন ঠিকই বলেছিল ইন্দু। তা তোমাদের যখন মন মানছে না, তখন জীবন, তুমি একটা কাজ কর। তুমি কয়েকটা ফুল নিয়ে যাও গোপালের জন্যে। বলার সঙ্গে সঙ্গে জীবনবাবু দু হাতে খামচে সবগুলো ফুল ধরে তুলে বুকে চেপে ধরে নিয়ে চলে গেলেন। বাকীগুলো নিয়ে এলাম। এই যেখানে এই ঘাটে উনি ভূপেশ্বর গোপেশ্বরকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, যেখানে উনি অন্তর্ধান হয়েছিলেন সেইখানে ঢেলে দিয়ে যাব।
কথা শেষ করে ইন্দুমতী সঙ্গের লোককে বললেন—যাও ফুলের ঝুড়িটা গঙ্গার জলে ডুবিয়ে নিয়ে এস। আর চপলি মা, এই পাত্রটা করে জল তুলে নিয়ে জায়গা-টায় ঢেলে দে!
ততক্ষণে গৌরাঙ্গ এসে দাঁড়িয়েছে। সব দেখে শুনে সে খুব খুশী হয়ে বললে—বা, বা, এ খুব খাসা হবে গো! দাও মা, আমাকে দাও।
বলে গৌরাঙ্গ চপলার হাত থেকে জলের পাত্রটি নিয়ে জল তুলে এনে ঘাটের রানাটি ধুয়ে দিলে। তারপর গোপেশ্বরের হাতে পাত্রটি দিয়ে বললে—যান বাবু, আপনারা দুজনেও এক ঘটি করে জল তুলে এনে জায়গাটায় ঢেলে দেন। মনে করুন, মরা বাবাকে জল দিচ্ছেন।
গোপেশ্বরেরও কথাটা ভালো লেগেছে। কিন্তু একজন অতি সাধারণ লোক তাঁদের

সঙ্গে এমন সহজ মাখামাখির সুরে কথা বলছে এতে তাঁর অভিজাত মন সঙ্গে সঙ্গে একটু বিরক্ত হলো। ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। দেখতে পেয়ে গৌরাঙ্গ বললে—আমাকে চিনতে পারছেন না বাবুমশাই ? আমি সেই লোক, যাকে ঠাকুর মশাই আপনাদের সঙ্গে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তা বরং আমাকেই দেন তাতে আপনাদের কষ্ট হবে, আমি দু ঘটি জল বরং আপনাদের দু জনার জন্যে এনে ঢেলে দি।

গোপেশ্বর চিনতে পেরে এবার খুশীই হলেন। বললেন—না, না, ভাই, ও আমরাই পারব। আপনাকে কেন করতে হবে ?

গৌরাঙ্গ ততক্ষণে ওঁদের সঙ্গের লোকটির হাত থেকে ফুলের ঝুড়িটা নিয়ে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে জলসিক্ত করে নিয়েছেন। সে ফুলগুলি এনে সেই জলসিক্ত রানার উপর ঢেলে ফেলে সেগুলি একে একে যত্ন করে সাজিয়ে দিয়ে প্রণাম করলে। গৌরাঙ্গের দেখাদেখি অন্য সকলেও প্রণাম করলেন জায়গাটায়।

মন্মথও প্রণাম করলে। প্রণাম করবার ভঙ্গিটি তার বড় সুন্দর। দুটি হাত পুষ্পরাশির দুপাশে রেখে মাথাটি একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মাটিতে যাকে বলে লুটিয়ে দিলে মন্মথ। তার প্রণাম করাটা যে একটা দায়সারা শ্রদ্ধা প্রকাশ নয়, সত্যকারের আন্তরিক প্রণাম, তা ইন্দুমতী, চপলা, ভুপেশ্বর, গোপেশ্বর সবারই নজরে পড়ল, মনেও ধরল।

চপলা পিসীমার গায়ে টিপে মন্মথর প্রসারিত হাতের আঙুলের দিকে দেখিয়ে মুখ টিপে হেসে মৃদুস্বরে বললে—দেখেছ ?

ইন্দুমতী বললেন—কি ?

—বুঝতে পারছ না ? মন্মথর ডান হাতের আঙুলটা দেখ।

ইন্দুমতী মৃদু হেসে বললেন—তাই তো।

তারপর চপলাকে মৃদু স্বরে বললেন—ঠাকুরমশাই নাতজামাইকে নাতজামাই হবার আগেই আদর করে আংটিটা দিয়ে গিয়েছেন দেখছি। তা ভালো, সৎপাত্রেই পড়েছে !

মন্মথ প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচার খুঁট দিয়ে কপালের জলটা মুছতে লাগল।

এই সময় ঘাটের মাথা থেকে ডাক এলো জীবনের। জীবন ডাকছে—দিদি, ও দিদি ! আপনারা আসুন। দাদা ডাকছেন আপনাদের।

তারপর মন্মথকেও সে ডাকলে—ও মাতুল, এস বাবা, তোমারও ডাক পড়েছে। দাদারা ডাকছেন তোমাকে।

মন্মথ গৌরাঙ্গকে বললে—আমি যাই তা হলে ?

জীর্ণ শুকনো মুখে এক মুখ হেসে গৌরাঙ্গ বললে—এস বাবা !

মন্মথও হেসে তাকে একটা প্রণাম করলে। গৌরাঙ্গ প্রত্যাশা করে নি। সে হাঁ হাঁ করে উঠল। পিছিয়ে গেল দু'পা। শশব্যস্ত হয়ে বললে—আরে কর কি, কর কি?

প্রণাম শেষ করে মন্মথ বললে—ঠিকই করলাম; আপনাকে প্রণাম না করে গেলে পরে আমারই খারাপ লাগত।

গৌরাঙ্গর চোখ ছলছল করে উঠল। বললে—বাবা ঠাকুরমশাই পাকা জহুরীও ছিলেন বুঝতে পারছি। তিনি খাঁটী জিনিসই বেছে ছিলেন। ভুল হয় নি। বাবা, আমি মানহীন লোক, আমাকে মান দিয়ে তুমি নিজেরই মান বাড়ালে!

ঘাটের মাথা থেকে জীবন আবার ডাকলেন—মাতুল হে, উঠে এস, এসে আমাকেও বরং একটা প্রণাম কর। আমিও আশীর্বাদ করি। তুমি বাবা, সহজ মানুষ নও। তুমি তোমার দু পাশের সব ভাব-ভালবাসা কুড়িয়ে নেবে? কিছুই ছেড়ে যাবে না?

কথাটা মন্মথর কানে এসেছিল।

না, কিছুই ছেড়ে যাবার ইচ্ছা নেই তার। জীবনের সবটা তার ছোট্ট দু হাতের অঞ্জলিতে তুলে পান করার সাধ। কিন্তু কতটুকু ধরে দু হাতের অঞ্জলিতে? ওই তো চোখের সামনে বিপুল বিস্তার গঙ্গার মাটিমাখা অথচ অতি পবিত্র জলধারা বয়ে চলেছে! তার সব জলটাকে ছোঁবার ও পাবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তার কতটুকুই বা স্পর্শ করতে পারে! স্নানের সময় মাত্র খানিকটা জলে তার ছোঁওয়া লাগে। ঠিক তেমনি ভাবেই শোকে ও সুখে, ক্ষোভে ও আনন্দে, লাভে ও ক্ষতিতে, আশায় ও হতাশায় ওতপ্রোতভাবে মেশামেশি মাখামাখি হয়ে যে জীবন তাকে কখনও ডুবিয়ে, কখনও ভাসিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে তার সবটারই স্বাদ গ্রহণ করার তার সাধ। কিন্তু কতটুকু নিতে পারে সে? তার দুই হাতের মুঠোয় আর ছোট্ট বুকে কতটুকু ধরে? তবু সবটার জন্যই তো সে দুই হাত বাড়িয়েছে, মন পেতেছে অন্নপাত্রের মতো। পুরো বিশ্বসংসারটাই যে চাই তার! না পেলে সে বাঁচবে কেমন করে? আর সে বাঁচায় লাভ কি?